

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

www.maktabatulabrar.com

برهان القرآن

তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

(চতুর্থ খণ্ড)

[সূরা নাবা-সূরা নাছ]

তত্ত্বাবধানে

হযরত মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪।

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, 'আহকামে যিন্দেগী', 'ফাযায়েলে যিন্দেগী',
'বয়ান ও খুতবা', 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ'
ও 'ইসলামী মনোবিজ্ঞান' প্রভৃতি।

প্রকাশনায়

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স
কিতাব মার্কেট, মাদরাসা রোড
(যাত্রাবাড়ি মাদরাসা সংলগ্ন)
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
মোবা: ০১৭৬৪-১৮৫৬৫৪

আরও পাওয়া যায়

মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে বুরহানুল কুরআন
(৪র্থ খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল, ১৪৩০ হিজরী,
মার্চ, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ,
চৈত্র, ১৪১৫ বাংলা

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

দ্বিতীয় সংস্করণ
মুহাররম ১৩৪০ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্য : ৫০০/= (পাঁচশত টাকা মাত্র)

সূচিপত্র

❑ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের কথা ১৭
❑ **পারা– ৩০** ১৯
❑ **সূরা নাবা** ১৯
সূরার নামকরণ ২০
প্রশ্নকারী কারা ছিলেন? ২১
কী বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল ২১
মহা সংবাদটি কী? ২১
কেয়ামত কবে হবে ২৪
কেয়ামতের নিদর্শনাবলি ২৫
কেয়ামতের সময় গোপন রাখার রহস্য ২৭
দলবদ্ধ হয়ে আসার অর্থ ৩২
জীবনের সফলতা ৩৬
নেয়ামতের প্রকারভেদ ৩৬
দুই প্রকার নেয়ামতের রহস্য ৩৭
জান্নাত লাভের উপায় ৩৭
শাফাআতের অধিকার ৩৯
রূহ–এর অর্থ ৪০
صف (কাতার)–এর সংখ্যা ৪৩
সাকরাতুল মউত ৪৪
❑ **সূরা নাযিআত** ৪৬
হযরত মূসা (আ.)-এর খবর ৫৯
হযরত মূসা (আ.) কে ছিলেন ৫৯
ওয়াদিয়ে তুয়া ৬০
'তুয়া মুকাদ্দাস' কেন? ৬১
হযরত মূসা (আ.) তুয়ায় কেন? ৬২
হযরত মূসা (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ৬২
হযরত মূসা (আ.)-এর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ৬৩
নবুওয়াতের মাকসাদ ৬৩
ফিরআউনের পরিচয় ৬৪

হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের প্রতি ৬৫
নবীগণের গোত্র বিশেষে প্রেরিত হওয়া প্রসঙ্গ ৬৬
ফিরআউনের সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গ ৬৬
দাওয়াতের মূলনীতি ৬৮
তাযকিয়ার অর্থ ৬৯
তাযকিয়া লাভের উপায় ৬৯
হামানের পরামর্শ ৭১
الاية الكبرى (বড় নিদর্শন) কী ছিল? ৭১
সত্যের জ্ঞান ঈমান নয় ৭৪
অহংকারের পরিণাম ৭৪
পৃষ্ঠপ্রদর্শনের দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? ৭৫
ফিরআউনের প্রভুত্যের দাবি ৭৮
ফিরআউন মুশরিক ছিল কি? ৭৯
ফিরআউন কি নাস্তিক ছিল? ৮৩
ফিরআউন কি মুমিন ছিল? ৮৪
ঈমানের প্রকার ৮৫
ফিরআউনের মুখে মাটি দেয়া হল কেন ৯০
ইবনুল আরাবীর প্রকৃত মতামত ৯১
ফিরআউন জাহান্নামী ৯৩
মুমিনগণ জাহান্নামী নয় ১০৪
মুমিনদের প্রতি সর্তকবাণী ১০৪
আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় ১০৬
কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা ১০৭
হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর ঘটনা ১১৩
মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের প্রতি সতর্ককারী ১১৫
ভীতি প্রদর্শন কাদের প্রতি ১১৫
দয়া ও করুণা ভয়ের পরিপন্থি নয় ১১৬
❑ **সূরা আবাসা** ১১৭
সূরার নামকরণ ১১৭
শানে নুযুল ১১৭
ইবনে উম্মে মাকতুম ১১৮
নবীগণ মাসূম ১২০

www.maktabatulabrar.com

নবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের যথার্থতা ১২০
অন্ধকে অন্ধ বলে ডাকা ১২২
সমালোচনার নিয়ম ১২২
সমালোচনার শর্তাবলি ১২৩
তাবলীগী জামাত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর ১২৭
ইসলামী শিক্ষাবিদদেরকে দিক-নির্দেশনা ১২৮
কাফেরদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ ১৩০
মহান আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ১৩০
হেদায়াত গ্রহণ না করার কারণ ১৩১
অস্বীকারকারীদের প্রতি দাওয়াত প্রসঙ্গ ১৩২
উগ্রপন্থিদের প্রতি দাওয়াত প্রসঙ্গ ১৩৩
কুরআনে ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থিত নয় ১৩৮
কুরআনের আজমত ১৩৮
খাদ্য গবেষণার রহস্য ১৫২
খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা দ্বারা কোন্ দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে? ১৫২
খাদ্য সামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে কী শিক্ষা লাভ হয়? ১৫৩
কৃষিগবেষণার গুরুত্ব ১৫৪
কৃষিগবেষণার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৫
আয়াতে পানীয় সামগ্রীর কথা বলা হয়নি কেন? ১৫৭
চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু– পানি, যমিন ও খাদ্যের প্রকারাদি ১৫৮
কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ১৬১
পলায়নের বিশদ বিবরণ ১৬২
হক এবং অধিকারের প্রকারভেদ ১৬৩
চেহারা উজ্জ্বল করার বিশেষ আমলসমূহ ১৬৫
নূরের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস ১৬৬
উম্মতে মুহাম্মাদীর নূর ১৬৬
ঈমান এবং তাওহীদের নূর ১৬৭
মু'মিন পাপীদের নূর ১৬৭
নূর পরিদর্শনের স্থান এবং উপায় ১৬৮
অন্তরদৃষ্টির হাকীকত ১৬৮
ফানা ফিল্লাহ-র হাকীকত ১৬৮
ওলীদের অন্তরদৃষ্টি ১৭০

www.maktabatulabrar.com

বস্তুজগতে নূর পরিদর্শন ১৭১
অন্তরদৃষ্টি লাভ করার উপায় ১৭২
❑ **সূরা তাকভীর** ১৭২
সূরা প্রসঙ্গে বিশেষ বাণী ১৭৪
কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন ১৭৫
সূর্য কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? ১৭৭
হাশরের ময়দান এবং সূর্য ১৭৭
কেয়ামতের দ্বিতীয় নিদর্শন ১৭৮
তারকারাজি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ১৭৯
কেয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন ১৭৯
পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা ১৮০
কেয়ামতের চতুর্থ নিদর্শন ১৮০
কেয়ামতের পঞ্চম নিদর্শন ১৮১
জীব-জন্তুর হিসাব নিকাশ ১৮১
কেয়ামতের ষষ্ঠ নিদর্শন ১৮২
সমুদ্র ও জাহান্নাম ১৮৩
পানি ও অগ্নি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৪
কাফেরদের দল উপদল ১৮৭
মুসলমানদের দল উপদল ১৮৭
আত্মার সংযোজন ১৮৮
মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থান ১৮৮
রূহের সংযোজন পদ্ধতি ১৮৯
জীবন্ত কবরস্থকরণ ১৯০
ভঙ্গুর আইনের প্রতিফল ১৯০
জীবন্ত কবরস্থকরণের কারণসমূহ ১৯০
নারীমুক্তি অভিযান ১৯১
অর্থাভাবে নারী হত্যা প্রসঙ্গ ১৯৫
বিচারের মূল বিষয়বস্তু কী হবে ১৯৭
কাফেরদের বিচার করে লাভ কী? ১৯৮
কাফেরদের না-বালেগ সন্তানদের হুকুম ১৯৮
হাদীছের বিরোধ নিরসনের পদ্ধতি ২০৫
ফিতরতের অর্থ ২০৮

রসূল (সা.) ও জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলির মধ্যে সাদৃশ্য ২২০
রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীরিক শক্তি প্রসঙ্গ ২২১
জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলি বিশদভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য ২২১
❑ **সূরা ইনফিতার** ২২৫
রব ও কারীম ব্যবহারের উদ্দেশ্য ২২৮
ধোঁকার কারণ ২২৮
মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর এক মহা এহসান ২৩০
আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে কি? ২৩১
تكذيب دين -এর অর্থ ২৩৪
ফেরেশতার অস্তিত্ব ২৩৬
অন্তরের আমল সংরক্ষণ ২৩৭
নাপাক অবস্থার আমল ২৩৯
আল্লাহ পাকের জানা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমল সংরক্ষণের হেকমত ২৩৯
কাফেরদের আমল সংরক্ষণ করা হয় কি না ? ২৪০
গোপন তথ্য অনুসন্ধান প্রসঙ্গ ২৪৪
আবরার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় ২৪৬
আবরারদের গুণাবলি ২৪৭
ফুজ্জার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় ২৪৭
ফুজ্জারগণ চির জাহান্নামী কি না? ২৪৮
❑ **সূরা মুতাফ্ফিফীন** ২৪৯
সূরা পরিচিতি ২৫০
পরিমাপ এবং ওজনে হেরফের করা প্রসঙ্গ ২৫৫
আনুগত্য সৃষ্টির উপায় ২৫৭
ওজন ও মাপে হেরফের করার শাস্তি কাদের জন্য প্রযোজ্য? ২৫৮
অপকর্মের মূল উৎস ২৬১
হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর একটি ঘটনা ২৬২
অপকর্ম থেকে মুক্তির উপায় কী? ২৬৩
বড় দিন পরিভাষার বিভ্রান্তি ২৬৪
বড় দিনের ভয়াবহতা ২৬৫
হিসাবের সময়সীমা কত দীর্ঘ হবে? ২৬৬
হিসাবের সুদীর্ঘ সময়ে মুমিনদের অবস্থা কী হবে ২৬৬
মানুষের ন্যায় জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে কি না? ২৬৮

www.maktabatulabrar.com

গোনাহগার মুমিনদের অবস্থা কী হবে? ২৬৮
সিজ্জীন কী জিনিস ২৭০
সিজ্জীন ও জাহান্নাম ভিন্ন ভিন্ন, না অভিন্ন ২৭২
সিজ্জীনে প্রবেশপদ্ধতি ২৭৩
সিজ্জীন সম্বন্ধে ইনজীল-এর বর্ণনা ২৭৪
বরযখী জীবনে গোনাহগার মুমিনদের অবস্থানস্থল ২৭৫
সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনে আত্মার সংরক্ষণের অর্থ ২৭৭
সিজ্জীনে শয়তান ও তার সহচরদের অবস্থান প্রসঙ্গ ২৭৮
অন্তরের মরিচা তথা আবর্জনা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? ২৮০
অন্তর মরিচাযুক্ত তথা আবর্জনাযুক্ত হয় কীভাবে? ২৮১
অন্তরকে আবর্জনামুক্ত করা এবং রাখার উপায় কী? ২৮২
আল্লাহর দর্শন লাভের অর্থ ২৮৩
অন্তরদৃষ্টিতে দর্শন লাভ ২৮৩
আখেরাতে আল্লাহর দর্শন ২৮৪
পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম ২৮৮
ইল্লিয়্যীন পরিচিতি ২৮৯
ইল্লিয়্যীন কোথায় অবস্থিত? ২৯০
আমলনামার বিশদ বিবরণ ২৯৫
জান্নাতের পুরস্কার দুই প্রকার ২৯৬
জান্নাতীদের সিংহাসন লাভ ২৯৬
সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে কি কি দেখবে? ২৯৬
জান্নাতীদের মুখমণ্ডলের সজীবতা ২৯৭
জান্নাতের শরবত প্রসঙ্গ ২৯৮
প্রতিযোগিতার বস্তু ২৯৮
তাসনীমের পরিচয় ২৯৮
❑ **সূরা ইনশিকাক** ৩০২
সূরা পরিচিতি ৩০৫
জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জীবনের দর্শন ৩০৫
হিসাবের প্রকারভেদ ৩১০
যে আমল দ্বারা হিসাব সহজ হবে ৩১০
বামহাতে আমলনামা প্রদানের কারণ ৩১১
شفق -এর অর্থ ৩১৩

شفق কথা দিয়ে শপথের তাৎপর্য ৩১৪
রাত্রির শপথের তাৎপর্য ৩১৪
চন্দ্রের শপথের তাৎপর্য ৩১৫
আয়াতের খেতাব তথা সম্বোধন প্রসঙ্গ ৩১৮
ঈমান আনয়নের উপায় ৩২১
সাজদা এবং মালেকী মাযহাব ৩২৩
হানাফী, শাফিয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব ৩২৫
সাজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম ৩২৬
হযরত উমর (রা.)-এর আমল ৩২৭
ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাত পরিভাষা প্রসঙ্গ ৩২৮
কুফ্‌রির পরিণাম ৩৩২
পরশ্রীকাতরতা ৩৩২
আল্লাহর রহমত লাভের উপলক্ষ্য ৩৩৩
নেক আমল বলতে কী বুঝায়? ৩৩৩
❑ সূরা বুরূজ ৩৩৪
সূরা পরিচিতি ৩৩৪
بروج (বুরূজ)-এর অর্থ ৩৩৬
بروج (বুরূজ) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মতামত ৩৩৬
মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতামত ৩৩৭
بروج (বুরূজ)-এর সঠিক অর্থ ৩৩৮
প্রতিশ্রুত দিবস ৩৩৯
হকের সাথে বাতিলের সংঘাত ৩৪৪
গর্ত খননের ঘটনা ৩৪৫
আল্লাহ পাক হাজির নাজির ৩৫৩
গর্ত খননকারীদের শাস্তি বিধান ৩৫৪
নেক আমলের সংজ্ঞা ৩৫৬
প্রকৃত সফলতা ৩৫৭
আযাবের কঠোরতার বিবরণ ৩৫৯
ودود (ওয়াদূদ)-এর ব্যাখ্যা ৩৬০
غفور (গাফূর) গুণ কাদের বেলায় কার্যকরী হয়? ৩৬১
আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও স্নেহময়ী, তাহলে শাস্তি কেন? ৩৬২
ক্ষণস্থায়ী জীবনের অপরাধের কারণে অনন্তকালীন শাস্তি কেন? ৩৬৩

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহর ক্ষমা ও স্নেহ গুণ কি পাপাচারিতাকে অনুপ্রাণিত করে? ৩৬৩
আরশ পরিচিতি ৩৬৫
একটি শিক্ষণীয় কথা ৩৬৬
ফিরআউন এবং ছামূদের দৃষ্টান্ত ৩৬৬
কাফেরদের মিথ্যাচারিতার নমূনা ৩৬৭
সুবিচারের অন্যতম গুণাবলী ৩৬৮
পবিত্র কুরআন সুসংরক্ষিত ৩৬৯
لوح (লওহ)-এর পরিচয় ৩৭০
محفوظ (মাহফূজ)-এর ব্যাখ্যা ৩৭০
লওহে মাহফূজে সংরক্ষণের অর্থ ৩৭১
কুরআন সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে শিয়াদের ভিন্নমত প্রসঙ্গ ৩৭৪
লওহে মাহফূজের বিষয়বস্তু ৩৭৫
❑ সূরা ত্বরিক ৩৭৬
সূরার নামকরণ ইত্যাদি ৩৭৭
طارق (ত্বরিক)-এর বিশদ বিবরণ ৩৭৯
النجم (নাজম)-এর বিশদ বিবরণ ৩৮০
الثاقب (ছাক্বিব)-এর অর্থ ৩৮২
نفس (নফ্‌স) তথা আত্মা দ্বারা কাদেরকে কুঝানো হয়েছে? ৩৮২
نفس (নফ্‌স)-এর হেফাজত দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ৩৮৩
حافظ (হাফিজ) তথা সংরক্ষণকারী কে? ৩৮৩
কী সংরক্ষণ করা হয়? ৩৮৫
কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? ৩৮৬
কেন সংরক্ষণ করা হয়? ৩৮৬
পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি ৩৮৬
আলোচ্য আয়াতের বীর্য সংক্রান্ত তত্ত্বকে যারা অবাস্তব বলে ৩৮৯
সন্তান কার বীর্যে সৃষ্টি হয় পিতার না পিতা-মাতা উভয়ের? ৩৯০
সন্তানের আকৃতি গঠনে কার বীর্যের প্রভাব পড়ে? ৩৯২
আত্মা কি বীর্যের তৈরী? ৩৯২
সেই গোপন বিষয়াদি কি, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেয়া হবে? ৩৯৪
গোপন বিষয়াদি প্রকাশের পদ্ধতি ৩৯৫
সমস্ত গোপন বিষয়ের বিচার হবে কি? ৩৯৬
❑ সূরা আ'লা ৪০১

সূরার নামকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ৪০২
সূরাটি মাদানী না মক্কী? ৪০৩
উচ্চস্বরে যিকির ৪০৪
নামায আরম্ভ করার নিয়ম ৪০৪
বিশেষ আদব ৪০৫
সাজদার তাসবীহ ৪০৫
সুবহানা রব্বিয়াল আলা-এর ফযীলত ৪০৫
সত্তার বড়ত্ব এবং পবিত্রতা ৪০৬
বিধর্মীদের সমালোচনার তরীকা ৪০৮
ইমাম মালিক কর্তৃক আল্লাহর নামের সম্মান রক্ষার অপূর্ব নমূনা ৪০৯
আল্লাহর নামসমূহের অপব্যবহারের নমূনা ৪০৯
আল্লাহর প্রতি অবাঞ্ছিত গুণাবলি আরোপের নমূনা ৪১০
আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে মত মতান্তর ৪১০
আল্লাহ পাকের নামের সংখ্যা প্রসঙ্গ ৪১১
ربك শব্দের ব্যাখ্যা ৪১৩
الاعلى শব্দের ব্যাখ্যা ৪১৩
আল্লাহ পাক কোথায় অবস্থিত? ৪১৪
خلق শব্দের ব্যাখ্যা ৪১৬
আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা কি না ৪১৭
❑ **সূরা গাশিয়া** ৪২০
❑ **সূরা ফাজর** ৪২৫
ইরাম জাতির পরিচয় ৪২৬
ছামূদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ৪২৭
❑ **সূরা বালাদ** ৪৩৪
❑ **সূরা শাম্‌স** ৪৪০
❑ **সূরা লাইল** ৪৪৪
❑ **সূরা দ্বোহা** ৪৫০
❑ **সূরা ইনশিরাহ** ৪৫৪
❑ **সূরা তীন** ৪৫৭
التين (তীন) কি? ৪৫৮
طور (তূর)-এর পরিচয় ৪৫৮
❑ **সূরা আলাক** ৪৬১

www.maktabatulabrar.com

কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযেল হয় ৪৬২
❑ **সূরা ক্বদর** ৪৬৭
القدر (কদর) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা ৪৬৮
লাইলাতুল কদরের ফযীলত ৪৬৯
লাইলাতুল কদর কোন্ রাত? ৪৬৯
❑ **সূরা বাইয়িনা** ৪৭০
❑ **সূরা যিলযাল** ৪৭৫
❑ **সূরা আদিয়াত** ৪৭৭
❑ **সূরা ক্বারিয়া** ৪৮০
আমলের ওজন প্রসঙ্গ ৪৮২
❑ **সূরা তাকাছুর** ৪৮৩
❑ **সূরা আস্‌র** ৪৮৫
সূরার সারমর্ম ৪৮৬
❑ **সূরা হুমাযা** ৪৮৬
সূরার সারমর্ম ৪৮৭
❑ **সূরা ফীল** ৪৮৯
আসহাবে ফীল-এর ঘটনা ৪৯০
❑ **সূরা কুরাইশ** ৪৯১
❑ **সূরা মাঊন** ৪৯৩
সূরার সারমর্ম ৪৯৪
❑ **সূরা কাউছার** ৪৯৬
❑ **সূরা কাফিরূন** ৪৯৮
❑ **সূরা নাস্‌র** ৫০০
❑ **সূরা লাহাব** ৫০১
❑ **সূরা ইখলাস** ৫০৪
❑ **সূরা ফালাক** ৫০৬
❑ **সূরা নাস** ৫০৯
সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর বিশেষ উপকারিতা ৫১১
কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে মিল ৫১১

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) এর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا .

والصلاة والسلام على رسوله المبعوث إلى كافة الناس ليفسر لهم ما نزل إليه من ربه تفسيرا أما بعد!

'কুরআনে মাজীদ' মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কামিয়াবী অর্জন করার দিক-নির্দেশনা সম্বলিত এক মহান কিতাব। 'কুরআনে মাজীদ' মানব জাতির সার্বিক হেদায়াতের নিমিত্তে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। জীবনের এমন কোন বিষয় নেই, যে ব্যাপারে কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। সেসব দিক-নির্দেশনার বাণী কুরআনে কারীমে কোথাও বিবৃত হয়েছে সংক্ষেপে, কোথাও কিছুটা সবিস্তারে, কোথাও স্পষ্ট ভাষ্যে, কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতে। যুগ যুগ ধরে মুফাস্সিরীনে কেরাম বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে সেসব সংক্ষিপ্ত বিবরণকে সবিস্তারে এবং ইশারা-ইঙ্গিতকে স্পষ্ট ভাষ্যে ব্যাখ্যা-বিবরণ প্রদান করে কুরআনের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে সহজসাধ্য ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, আর এই ধারা চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। কুরআনের বিস্ময় শেষ হবে না কোন দিন!

মুফাস্সিরীনে কেরামের রচিত ও সংকলিত এসব তাফসীরগ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত তাফসীরগ্রন্থাদির সিংহভাগই আরবী ভাষায় রচিত ও সংকলিত। উর্দূ ভাষাতেও বেশ কিছু তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষাতেও বেশ কিছু আরবী, উর্দূ তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকখানা মৌলিক তাফসীরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলা ভাষায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করা, যাতে সব ধরনের হুকুম-আহকাম এবং সব ধরনের দিক-নির্দেশনাসহ কুরআনে কারীমের ইশারা-ইঙ্গিত থেকে লব্ধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেমতে 'বুরহানুল কুরআন' নামে কাঙ্ক্ষিত তাফসীরের কাজ শুরু করি। প্রথমে ৩০ তম পারা থেকে কাজ আরম্ভ করি। ৩০ তম পারার সিংহভাগ কাজ সম্পন্নও হয়ে যায়। মাসিক 'আল-জামেয়া' তে রচিত অংশগুলো প্রকাশিতও হতে থাকে। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম তাফসীরের এ অংশগুলো দেখে আমাকে এই ধারায় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু বহুমুখী কাজের ব্যস্ততায় কাজ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না বলে মনে হল। তারপর একসময় আরও কিছু উলামায়ে কেরামের সহযোগিতায় অবশিষ্ট কাজ চূড়ান্তে উপনীত করার পরিকল্পনা মনে জাগে। সেমতে আমার বিশেষ স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন করার ইরাদা করি। তাঁর মাধ্যমে আরও কয়েকজন লেখককে নিয়ে কাজটির ব্যাপারে মাশওয়ারা করি এবং রচনা ও সংকলনের কিছু নীতি নির্ধারণ করে কাজ শুরু করা হয়। প্রায় তিন বৎসর তিন মাসের মেহনতে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত তাওফীক ও রহমতে কাজটি বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়। এ ক্ষেত্রে যাদের থেকে যেভাবে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

তার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের শুরুতে প্রদান করা হয়েছে। তবুও এখানে বিশেষভাবে আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যার নাম উল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন চট্টগ্রাম নিবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব মোহাম্মাদ মহসীন চৌধুরী সাহেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন ফাউন্ডেশন ফর হিউমান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট'-এর বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের বেলায়ও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে উত্তম প্রতিদান এনায়েত করুন।

ইতিপূর্বে তাফসীরটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা তওবার শেষ পর্যন্ত অংশটুকুর তাফসীর সম্পন্ন হয়েছে। এখন ৩০ নং পারার তাফসীর সমন্বয়ে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল। ইনশাআল্লাহ অচিরেই অবশিষ্ট পারাগুলোর সমন্বয়ে বাকি দুই খণ্ডও প্রকাশিত হবে। এই খণ্ডের শুরু থেকে সূরা আলা পর্যন্ত অংশটুকুর তাফসীর বিশদভাবে রচনা করা হয়েছিল, যার বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্নমুখী ব্যস্ততার কারণে সেই ধারায় অবশিষ্ট অংশটুকু সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই এখন সংক্ষিপ্তভাবে সেই অংশটুকুর তাফসীর লিখে দেয়া হল।

এই তাফসীরের রচনা সংকলনসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে যারা যেভাবেই শরীক হয়েছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে আরও কামনা করি, বাংলাভাষী মুসলমান নর-নারীর জন্য এই তাফসীরগ্রন্থটি যেন কুরআনে কারীমের শিক্ষাগ্রহণ ও আমলের উৎস হয়ে থাকে, আমীন।

বিনীত

২৫/১১/১৪৩০ হিজরী
২৩/৩/২০০৯ ঈসায়ী

(মাওলানা) মাহমুদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

পারা-৩০

(৭৮) সূরা নাবা, মাক্কী
৪০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) লোকেরা পরস্পর কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١
(২) মহা সংবাদের বিষয়ে?	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝٢
(৩) যে বিষয়ে তারা বিতর্কে আছে।	الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣
(৪) কখনও নয়, সত্বর তারা জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤
(৫) আবার বলছি, কিছুতেই নয় তারা অতি সত্বর জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

عَمَّ কোন্ বিষয়ে, يَتَسَآءَلُوْنَ লোকেরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে?, عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ মহা সংবাদের বিষয়ে, الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ যে বিষয়ে তারা, مُخْتَلِفُوْنَ বিতর্কে আছে, كَلَّا নিশ্চয়ই না, سَيَعْلَمُوْنَ সত্বর তারা জানতে পারবে, ثُمَّ আবার বলছি, كَلَّا নিশ্চয়ই না, سَيَعْلَمُوْنَ তারা অতি সত্বর জান্‌তে পারবে।

ভাবার্থ

লোকেরা কী বিষয় নিয়ে এতো আলোচনা পর্যালোচনা করছে? 'মহা সংবাদ' নিয়ে, অর্থাৎ, রিসালাত (রসূল মনোনীত করা) নিয়ে, মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' নিয়ে, না কেয়ামত ও হাশর-নাশর নিয়ে। তবে কি তারা এসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে? এরূপ সন্দেহ পোষণ করা অনর্থক। সত্য নিয়ে কৌতুক করা মারাত্মক ভুল। তাদের এই ভুল অতি সত্বর ধরা পড়বে, যখন সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিতভাবে দেখা দিবে।

শানে নযুল

যখন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে মক্কাবাসী-দেরকে 'ইসলাম' গ্রহণের দাওয়াত পেশ করলেন এবং শিরক-বিদআত ও কুফ্‌রী বর্জন করত তাওহীদী আকীদায় দীক্ষিত হয়ে 'সিরাতুল মুস্তাকীমে' চলতে আহ্বান জানালেন, তখন মক্কাবাসীগণ স্বাভাবিক-ভাবেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দেয়, আর একদল বিদ্রোহে মেতে ওঠে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেই মুহূর্তে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমর্থনে এবং বিদ্রোহীগণকে সতর্ক করে 'সূরা নাবা' নাযেল করেন। (তাফসী-রে ইব্‌নে জারীর, তাফসীরে ইব্‌নে আব্বাস)

সূরার নামকরণ

সূরাটির প্রারম্ভে نباء (নাবা) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দটি 'সূরায়' বর্ণিত বিষয়াদির সাথে নিগুঢ় সম্পর্ক রাখে বিধায় এই নামে সূরাটির নামকরণ হয়েছে। কুরআনে কারীমের অনেক সূরারই নাম এভাবে হয়েছে।

এই সূরায় মৌলিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে–

(১) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতের প্রতি খোদায়ী সমর্থন এবং বিদ্রোহী-দের প্রতি হুশিয়ারী।

(২) আল্লাহর কুদরত ও কালিমার বর্ণনা।

(৩) কাফেরদের শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা।

(৪) মুত্তাকীদের গৌরবময় জীবনের আলোচনা।

(৫) কেয়ামত ও হাশর-নাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা।

তাফসীর

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ (লোকেরা পরস্পর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে?)

আরবী 'ধাতু হতে' يتساءلون শব্দটির উৎপত্তি। سؤال শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা। يَتَسَآءَلُوْنَ শব্দটির অর্থ পরস্পর জিজ্ঞাসা করা, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা। (তাফসীরে কাবীর পৃ. ৩০১ খ. ৮।)

প্রশ্নকারী অথবা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদকারী কারা ছিল এবং কী বিষয় নিয়ে ছিল এই জিজ্ঞাসা, এই দুইটি বিষয়ই এখানে মূলত আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্নকারী কারা ছিলেন?

প্রশ্নকারীগণ মুসলমান এবং কাফের উভয়ই হতে পারে। তবে উভয়ের প্রশ্নের লক্ষ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। মুমিন-মুসলমানগণ নবীর খেদমতে প্রশ্ন করতেন অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে। তারা প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর নিগুঢ় তথ্য উপলব্ধি করে আল্লাহর মারেফাত এবং প্রশান্তি লাভে ধন্য হতেন। আর কাফের ও মুনাফেকরা প্রশ্নের মাধ্যমে মুমিন-মুসলমানদেরকে দ্বিধাগ্রস্থ ও সন্দেহবান করতে সচেষ্ট হত। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ পৃ. ২০৬ খ. ৪।)

কিন্তু এখানে 'মুমিনগণও প্রশ্নকারী ছিলেন'-এ ধারণাটি বোধগম্য নয়। কারণ, এখানে যে ধরনের ধমকের সুরে প্রশ্নকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মুমিনগণকে বর্ণিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ধমকের সুরে প্রতিবাদ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। (রুহুল মাআনী পৃ. ৩খ. ৩০।) বরং যারা এ ধরনের উদ্দেশ্যে নবীকে প্রশ্ন করেছে, 'আল কুরআন' তাদেরকে প্রশংসার পাত্র বলে অভিনন্দিত করেছে।

সুতরাং প্রশ্নকারী শুধুমাত্র 'কাফের ও মুনাফেকরা ছিল' একথাই চূড়ান্তভাবে বলা যায়। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের এটাই অভিমত। (তাফসীরে কাবীর, মাজহারী, রুহুল মাআনী।) পরবর্তী আয়াতসমূহেও এটা প্রমাণিত হয়।

কী বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল

কী বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ (মহা সংবাদের বিষয়ে।)

কী বিষয় নিয়ে কাফের-মুনাফেকদের জিজ্ঞাবাদ ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেছেন, عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ, মহা সংবাদ সম্পর্কে। النباء 'নাবা' শব্দের অর্থ 'সংবাদ'। العظيم 'আজীম' শব্দের অর্থ 'মহা'। অতএব النباء العظيم 'আন্নাবা-উল আজীম' শব্দের অর্থ মহা সংবাদ। মহা সংবাদটি কী ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

মহা সংবাদটি কী?

কারও কারও মতে 'রিসালাত' (নবী প্রেরণের বিষয়টি) কে 'মহা সংবাদ' বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নির্দেশে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত ঘোষণা পড়ে শোনালেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ .

অর্থাৎ, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আসমান যমীনের মালিকের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনিই প্রাণদান এবং প্রাণ হরণ করে থাকেন। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি আস্থাবান হও, উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁকে অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও। (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

তখন কাফের ও মুনাফেকরা আতংকিত স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদে লিপ্ত হয়। তারা বলাবলি করত, ভাই শুনেছ? মুহাম্মাদ 'নবী' দাবি করে বসেছে। আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলে সে নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছে এবং আরও আজগুবী কথা শুনাচ্ছে! তার হল কী? কাল পর্যন্ত যে লোকটিকে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হতো, আজ তাঁর হঠাৎ করে কী হয়ে গেলো? এ ধরনের পাগলামী কেন শুরু করেছে? যুক্তিহীন উক্তি করে তাঁর কী লাভ হবে? আল্লাহর বুঝি আর কাজ ছিল না! তিনি সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ, ধনবান, প্রজ্ঞাবান ও বংশীয় লোকদেরকে বাদ দিয়ে মাতৃ-পিতৃহীনকে নির্বাচিত করেছেন? তার মধ্যে 'নবী' মনোনীত হওয়ার মত কী যোগ্যতা রয়েছে? সে না জানে লেখাপড়া, না জানে কিছু। আবার দেখছি খায়-দায় হাট-বাজারও করে। এ ব্যাপারে একটি আয়াতে এরূপ বর্ণনা এসেছে–

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْ لَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا .

অর্থাৎ, এই রসূলের কী হলো, খাদ্য ভক্ষণ করে, হাটে-বাজারেও যায়? তার সাথে ফেরেশতাকে কেন প্রেরণ করা হলো না? (সূরা ফুরকান : ৭)

তারা বলতে চাইত যে, তার সাথে ফেরেশতাকে কেন প্রেরণ করা হলো না? কারণ, তাদের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্যে পাপ করার শক্তি নেই। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, বরং যা করতে আদিষ্ট হয় একমাত্র তা-ই করে থাকে। অথবা ফেরেশতাদেরকে সহচর হিসাবে পাঠানো হতো, তাহলেও তাদের সমর্থনে তাকে নবী হিসাবে মেনে নেয়া আমাদের জন্য কিছুটা সহজ হতো এবং যুক্তিযুক্ত হতো!

আবার অনেকে বলতো মিথ্যাই বা বলি কি করে? যার সততা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতার কোনো নজীর নেই, যিনি আমাদের মধ্যে এতদিন 'আল-আমীন' হিসেবে পরিচিত; যার জীবন একটি আদর্শ, যার জীবন কলুষমুক্ত, যার জীবনে কলংকের কোনো চিহ্ন নেই, আমরা তাঁকে মিথ্যুকই বা বলি কি করে? ইত্যাদি।

কারও কারও মতে 'মহান সংবাদ' দ্বারা 'আল-কুরআন'-কে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত যখন নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীকে শিরক-বিদআত এবং কল্পনাপ্রসূত মতাদর্শকে বর্জন করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রদত্ত জীবনাদর্শ মানবজীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের আহ্বান জানা-লেন, আহ্বান জানালেন 'আল-কুরআনের' পুরাপুরি অনুসরণ করে আল্লাহর রহমতের ভাগী হওয়ার। যে মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

অর্থাৎ, আমি বরকতময় এই মহান কিতাবটি নাযিল করেছি অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া হয়। (সূরা আনআম : ১৫৫)

তখন কাফেরগণ অহেতুক বিভিন্ন রকমের সমালোচনা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, বড়ই অযৌক্তিক কথা! আল্লাহর কালাম মুহাম্মাদ-এর উপর নাযেল হবে কী করে! অথচ সে আমাদের মতই একজন মানুষ! যদি মানুষের প্রতিই নাযেল হবার ছিল, তবে আমাদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণীও তো অনেক ছিলেন, তাদের উপর নাযেল হল না কেন? সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা মুহাম্মাদ-এর মনগড়া রূপকথার গ্রন্থ অথবা জিন শয়তানের আছর কিংবা যাদু-টোনারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ বলতো, 'এটা আল্লাহর কালাম কী করে হতে পারে! এতে বর্ণিত সকল বিষয়বস্তু স্বতঃসিদ্ধভাবে আমাদের পূর্বসূরিদের ধ্যানধারণার পরিপন্থি।' কিন্তু আবার আল কুরআনের বাচনভঙ্গি, সাহিত্য অলঙ্কার, কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়বস্তু, কুরআনে কারীমে বর্ণিত আত্মশুদ্ধির নিয়মকানুন, রাষ্ট্রীয় কাঠোমোর আলোচনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিধানসমূহের বর্ণনা, সমাজ পরিবর্তনের কর্মসূচি, বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ইত্যাদি চিন্তা করে তারা হতভম্ব ও পেরেশান হয়ে পড়ত যে, কী করে একজন উম্মী তথা নিরক্ষর ব্যক্তি এ ধরনের উচ্চ মানের কিতাব রচনা করতে পারে?

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে 'মহা সংবাদের" দ্বারা উক্ত আয়াতে 'কেয়ামত'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং কেয়ামতের পর হাশর-নাশরের প্রতি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে এ ধরনের বাচনভঙ্গি এবং কঠোর ভয় প্রদর্শন একমাত্র কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ (তাফসীরে কবীর); কিন্তু যদি 'মহা সংবাদ' বলতে একসাথে তিনটিকেও উদ্দেশ্য নেয়া যায়, তবে এরও অবকাশ আছে। কারণ, আল কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় এগুলোকে 'মহা সংবাদ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া এর প্রত্যেকটি বাস্তবেও মহা সংবাদই বটে।

বস্তুত যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনালেন, হাশর-নাশরের মারাত্মক চিত্র তাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন, তখন তারা সতর্কতা অবলম্বন তো দূরের কথা; বরং উল্টো অস্বীকার এবং সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করল। তারা বলতো, এগুলো কল্পনামাত্র, এর কোনো বাস্তবতা নেই। এ মর্মে কয়েকটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হল।

مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ .

অর্থাৎ, আমরা জানি না কেয়ামত কি, এটা কল্পনা মাত্র, যাতে আমাদের আস্থা নেই। (সূরা জাছিয়া : ৩২)

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ .

অর্থাৎ, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, পুনরায় আমরা কখনও জীবিত হবো না। (সূরা আনআম : ২৯)

مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ .

অর্থাৎ, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, কাল পরিক্রমায় আমারা ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা জাছিয়া : ২৪)

যদি তাদেরকে বলা হত যে, যদি এর কোনো কিছুর বাস্তবতা না-ই থাকবে, তবে মানুষ মৃতুবরণ করে কেন? এর পেছনে কার শক্তি কার্যকর থাকে? তখন তারা স্পষ্ট ভাষায় বলত, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানে আমরা মরি এবং বেঁচে থাকি। এর পেছনে সময় ও কালই কার্যকরী, কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে থাকে।

তাদের ধারণা ছিল কেয়ামত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য মোটেই সত্য নয়। আর যদি ঘটনাক্রমে কেয়ামত সংঘটিত হয় অথবা যদি মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয় এবং হাশর-নাশরে বিচারের সম্মুখীন হয়, তবুও আমাদের কোন ভয় নেই। কারণ, আমরা এখানে যেমন শক্তিশালী এবং টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পদের অধিকারী, তেমনি সেখানেও ধনেজনে বলবান থাকব। এগুলোর সাহায্যে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সমর্থ হব। যেমন এক আয়াতে তাদের এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে,

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا .

অর্থাৎ, আমি তোমা অপেক্ষা ধন-সম্পদে বেশি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে বেশি শক্তিশালী। (সূরা কাহাফ : ৩৪)

আরেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً .

অর্থাৎ, তারা বলে, গণনার কয়টি দিন ছাড়া আমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে না। (সূরা বাকারা : ৮০)

অর্থাৎ, তারা বলতে চাইত, যদি ঘটনাচক্রে একান্তভাবে আমাদেরকে 'জাহান্নামে' যেতেও হয় তবে তা হাতেগোণা কয়েক দিনের জন্য মাত্র।

মূলত স্বাভাবিক অবস্থা অনুসারেই তাদের এই ধারণাটি জন্মে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় যারা ধনশীল অথবা জনশক্তির অধিকারী হয়, তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস কেবলমাত্র বস্তুকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। সুতরাং তাদের জন্য এ ধরনের ধারণা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তাদের এ ধারণাটি কি সত্য? যদি সত্য না হয়ে থাকে (এবং আসলেও সত্য নয়) তবে এ ধারণার সূত্র ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে কীভাবে এবং কে করবে? তা হবে কুরআন ও হাদীছ প্রদত্ত তথ্য থেকে; আর কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا .

অর্থাৎ, বিচারের দিন নির্ধারিত আছে। (সূরা নাবা : ১৭)

কেয়ামত কবে হবে?

কেয়ামত সংঘটিত হবে এ বিষয়টি চূড়ান্ত হলে এর পর এ প্রশ্নটিও স্বাভাবিক এসে যায় যে, তা কবে হবে। তাই এই প্রশ্নটি যেমন ছিল মুমিনদের মনে, তেমনি ছিল কাফেরদের মনেও, তবে উভয়ের

www.maktabatulabrar.com

মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। আর তা ছিল নীতিগতভাবে। মুমিনগণ কেয়ামতের সত্যতার প্রতি পুরো বিশ্বাসী ছিল। তারা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞাসার মনোভাব রাখত। আর তা রাখত মনের তৃপ্তি লাভের জন্যে ও প্রশান্তির জন্যে। তাদের এই জিজ্ঞাসু মনোভাবকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জিজ্ঞাসার সাথে তুলনা করা যায়। মৃত এবং ক্ষত-বিক্ষত দেহ প্রত্যক্ষ করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی অর্থাৎ, হে আমার প্রতি পালক, আমাকে দেখান আপনি কী করে মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন। এর উত্তরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, اولم تؤمن অর্থাৎ, হে ইব্রাহীম তুমি কি বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্রাহীম (আ.) উত্তর করলেন, بَلٰی وَلٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি, তবে সরাসরি দেখে তৃপ্তি লাভ করতে চাই।

বস্তুত মুসলমানদের জিজ্ঞাসা ছিল ঈমানী মজবুতী লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কাফেরগণ অস্বীকারের ভিত্তিতে, ভর্ৎসনার সুরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে চাইত। তারা অতি ধৃষ্টতার সাথে বলে বেড়াত–

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ .

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতির দিবস কবে হবে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো? (সূরা ইয়াছীন : ৪৮)

উভয়ের প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উত্তর শুনে মুমিনগণ তৃপ্ত হয়ে যেত, আর কাফিরগণ আরও বেশি উপহাস এবং প্রহসনে লিপ্ত হতো।

কেয়ামত কবে হবে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জিবরাঈলের মধ্যে আলোচিত প্রসিদ্ধ হাদীছের দ্বারা তা প্রতীয়মান হয়। হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মতে হযরত জিবরাঈল (আ.) একদিন হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে অতিব আদবের সাথে দুজানু হয়ে বসে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন– اخبرنی عن الساعة অর্থাৎ, আমাকে বলুন কেয়ামত কবে হবে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন,

ما المسؤول عنها باعلم من السائل .

অর্থাৎ, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে আমার বেশি কিছু জানা নেই।

এ উত্তর দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চাইলেন যে, এ বিষয়টি আমারও জানা নেই এবং আপনারও জানা নেই। কারণ, কেয়ামতের সুনির্দৃষ্ট তারিখ কেবল আল্লাহ পাকই জানেন, অন্য কেউ মোটেও জানে না; তবে কেয়ামতের কিছু আলামত তথা নিদর্শন রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে কেয়ামতের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়।

কেয়ামতের নিদর্শনাবলি

হযরত জিবরাঈল বলেন, اخبرنی عن الساعة অর্থাৎ, তবে আমাকে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীছে মাত্র কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে, উলামায়ে কেরাম

কুরআন এবং হাদীছে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর উপর ভিন্ন কিতাবাদিও রচনা করেছেন। এই আলামতসমূহের প্রতি আমাদের ঈমান রাখা আবশ্যক। কারণ, এগুলোর সত্যতা স্বীকার করা ঈমানের অঙ্গ। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো নিজের পক্ষ থেকে বলেননি, বরং কোন কোনটি ওহীয়ে জলী, অর্থাৎ প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে পেয়েছেন, যেগুলো কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। আর কোন কোনটা ওহীয়ে খফী অর্থাৎ গোপন ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যেগুলো হাদীছের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা তার কোনটিই তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেননি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی .

অর্থাৎ, তিনি মনগড়া কোন কিছু বলেন না, যা কিছু বলেন ওহী সূত্রেই বলে থাকেন। (সূরা নাজম : ৩)

اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیْقَاتًا .

অর্থাৎ, বিবেচ্য দিনটি নিঃসন্দেহে একটি সুনিশ্চিত দিন। (সূরা নাবা : ১৭)

এখানেও কেয়ামতের নিদর্শনাবলি এবং অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেগুলো গোপন ওহীর মাধ্যমে নয়, বরং প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন।

يوم الفصل (ইয়াওমুল ফাছল) কী?

আরবীতে يوم শব্দটি রাত দিন উভয়টিকে বোঝায়, তবে এখানে সময়ের অর্থে নেয়া হয়েছে। الفصل এর অর্থ সিদ্ধান্ত, সুতরাং– يوم الفصل এর অর্থ হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। যেহেতু মহান আল্লাহ এই সময়ে জিন ও মানুষ জাতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যে ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি করার কারও মোটেই অধিকার থাকবে না। সেজন্যে এই সময়কে الفصل চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বলা হয়। সেদিন আল্লাহ পাক সত্যপরায়ণ এবং অপরাধীদের মধ্যে সকলকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিবেন,

وَ امْتَازُوا الْیَوْمَ اَیُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۞

অর্থাৎ, হে অপরাধীগণ, তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াছীন : ৫৯)

অধুনা এ বিশ্বে ধর্ম ও আদর্শগতভাবে মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সহজে তা বোঝা মুশকিল, কিন্তু কেয়ামতের দিন তেমন হবে না, বরং সেদিন আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথে কে কাফের কে মুমিন, কে মুনাফেক কে মুখলিছ, কে অপরাধী এবং কঠিন অপরাধী তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে কোন্ মতাদর্শের অনুসারী। যারা যে মতবাদের অনুসারী সে মতবাদের নেতাদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবেই তারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবে। সেদিন কারও আত্মগোপন করা সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না কোন কিছু গোপন করার। এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ .

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রতিটি মানুষকে তাদের নেতাসহ ডাকব। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭১)

অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ ۙ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا ۙ۝ وَّ یَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ۝ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ وَّ یَصْلٰی سَعِیْرًا ؕ

অর্থাৎ, যাদের ডানহাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের হিসাব অতি সহজ হবে। তারা অতি আনন্দ উল্লাসের সাথে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাবে। আর যাদের আমলনামা তাদের পিছন থেকে দেয়া হবে, তারা ভয়ে কম্পিত সুরে ধ্বংস আহ্বান করবে, (কিন্তু কোন উপকার হবে না।) তারা অবশ্যই চিরস্থায়ীভাবে অগ্নিদগ্ধ হবে। (সূরা ইনশিক্বাক্ব : ৭-১২)

তাদের এই বেদনাদায়ক অবস্থা কেন হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক এর পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ؕ

অর্থাৎ, এজন্য যে, তারা অস্থায়ী জীবনে পরিবার পরিজনে আত্মভোলা হয়ে বিমগ্ন ছিল। (সূরা ইনশিক্বাক্ব : ১৩)

এসব আয়াতে বোঝানো হয়েছে, তারা বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। সেজন্যই আজ তাদের এই দুর্দশা। এই শাস্তির কারণ কেবল তাদের অপরাধ প্রবণতা। মহান কৃপাময় ন্যায়বিচারক রব্বুল আলামীন তাদের প্রতি মোটেও জুলম করবেন না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ ؕ

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক কখনই বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (সূরা হা মীম সাজদা : ৪৬)

কেয়ামতের সময় গোপন রাখার রহস্য

এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের মনে উদয় হয় যে, কেয়ামতের সুনির্দৃষ্ট তারিখ গোপন রাখা হল কেন? এতে কী রহস্য নিহিত রয়েছে? এর প্রকৃত রহস্য একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। তিনি علام الغيوب 'গোপনীয় বিষয়েও সর্বজ্ঞ"। মানুষের জ্ঞান অতি সীমিত। মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত হোক না কেন, তার পক্ষে গায়েবের গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের আশ্রয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নূরে ঈমান ও ঈমানী সুচিন্তার বদৌলতে যা কিছু বলে, তা ইসলামের মূল ধারার বহির্ভূত ও পরিপন্থি না হলে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সেরূপ করে আল্লাহর নিকট পুণ্যের পূর্ণ আশা পোষণ করতেও কোন বাধা নেই।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের এ বিষয়টি ভাল করে বোঝার দরকার যে, কেয়ামত সংগঠিত হবে কেন? এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিঞ্চিত ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর জীবন

অস্থায়ী জীবন। এই অস্থায়ী জীবনে মানুষ এসেছে স্থায়ী জীবনের উপকরণ যোগাবার জন্য। মানুষ তার সৃষ্টি রহস্য ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে স্রষ্টা প্রদত্ত এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবনবিধান অনুসরণ করে ইবাদত রিয়াজতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করবে। ফলে মৃত্যুর পর সে মানুষ চিরসুখী হয়ে অনন্তকাল জীবনযাপন করবে। পক্ষান্তরে যদি মরিকিাময় ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধোঁকায় পড়ে প্রকৃত প্রচেষ্টাকে ভুলে যায় আর ইবাদত-বন্দেগী বর্জন করে পশুত্বের ডাকে চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য রয়েছে অনন্তকালের জীবনে চিরস্থায়ী অশান্তি এবং কঠোর শাস্তি। মহান রব্বুল আলামীন এই উভয় শ্রেণির বিচারক হবেন। ন্যায়বিচারক হিসেবেই তিনি ফয়সালা করবেন। সেমতে কারও জন্য জান্নাতের ফায়সালা করবেন আর কারও জন্য জাহান্নামের। তখন সকলকেই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। সেই মহাবিচারের জন্য হবে এই কেয়ামত।

কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার নিজে স্মরণ করতেন এবং উম্মতকেও স্মরণ করতে ওছিয়ত করেছেন। কারণ, কেয়ামতের এই ভয়াবহ অবস্থার ছাপ মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বসলে সে মানুষ অন্যায় করতে পারবে না, অপরাধ করতে পারবে না। বস্তুত যাতে করে মানুষ এবং জিন জাতির প্রাণে আল্লাহর ভয়ভীতি বেশি সৃষ্টি হয়, সেজন্যেই হয়তো কেয়ামতের সুনির্দৃষ্ট তারিখটি গোপন রাখা হয়েছে। আর বাস্তবেও এটাই যুক্তিসংগত মনে হয়। কারণ, কেয়ামতের সুনির্দৃষ্ট তারিখ গোপন রাখার কারণে যে কোন সময় কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, ফলে অন্তরে ভয়ভীতি বেশি সঞ্চারিত হয়। এজন্যেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনির্দৃষ্ট সময় কেয়ামত সংগঠিত হবে বলে উম্মতকে সতর্ক করতেন এবং যে কোন মুহূর্তে সংগঠিত হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করতেন।

ভয়ভীতির বিষয় অনির্দৃষ্ট থাকলে যে ভয়-ভীতি বেশি হয় এটা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। যেমন কোন রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা কোন অপরাধী রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় অপরাধী সাব্যস্ত হলে আর যে কোন সময় গ্রেফতার হওয়ার ভয় থাকলে সে গ্রেফতারের ভয়ে সর্বক্ষণ আত্মগোপন করে থাকে, পালিয়ে বেড়ায়। পক্ষান্তরে গ্রেফতারের সময় নির্ধারিত থাকলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার মধ্যে তেমন ভয় আসে না এবং তার পূর্বে সে সতর্ক হওয়ার বা আত্মগোপন করার প্রয়োজন বোধ করে না। হ্যাঁ, যদি যে কোন সময় গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায় সে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে এবং আত্মগোপন করাকে প্রয়োজনীয় মনে করবে। ঠিক এমনি করেই কেয়ামতের বিষয়টিকে বুঝে নিতে হবে। অবশ্য এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এই বিবেচনা খোদাদ্রোহীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আল্লাহপ্রেমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এখানে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে, সেদিন শুধু কাফেরগণই নয় এবং শুধু মুমিনগণও নয়; বরং সেই মহাদিবসে নবীগণও ভীতসন্ত্রস্ত হবেন এবং সেই ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে তাঁরাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছেন। (তবে নবীদের ভয়-ভীতি ও অন্যদের ভয়-ভীতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।) তাই আল্লাহপ্রেমিকদের মধ্যে ভয় আসবে না বা আসতে হবে না এমন তো নয়।

www.maktabatulabrar.com

(৬) আমি কি করিনি জমিনকে বিছানা?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ﴿٦﴾
(৭) এবং পর্বতমালাকে (জমিনের জন্য) পেরেক?	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ﴿٧﴾
(৮)আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (নারী-পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায়,	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ﴿٨﴾
(৯) এবং আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি নিবারক।	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ﴿٩﴾
(১০) আর আমি রাতকে করেছি আবরণ,	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ﴿١٠﴾
(১১) আর আমি করেছি দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময়,	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ﴿١١﴾
(১২) এবং আমিই নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে মজবুত সপ্তাকাশ।	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ﴿١٢﴾
(১৩) এবং আমি সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ﴿١٣﴾

শব্দার্থ

اَلَمْ نَجْعَلِ আমি কি করিনি, الْاَرْضَ যমীনকে, مِهٰدًا বিছানা, وَالْجِبَالَ এবং পর্বতমালাকে (যমীনের জন্য), اَوْتَادًا পেরেক, خَلَقْنٰكُمْ আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, اَزْوَاجًا (নারী-পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায়, وَجَعَلْنَا এবং আমিই করেছি, سُبَاتًا ক্লান্তি নিবারক, نَوْمَكُمْ তোমাদের নিদ্রাকে, الَّيْلَ রাতকে, لِبَاسًا আবরণ, النَّهَارَ দিনকে, مَعَاشًا জীবিকা উপার্জনের সময়, وَبَنَيْنَا এবং আমিই নির্মাণ করেছি, فَوْقَكُمْ তোমাদের উর্ধ্বদেশে, شِدَادًا মজবুত, سَبْعًا সপ্ত আসমান, وَجَعَلْنَا এবং আমিই সৃষ্টি করেছি, سِرَاجًا একটি প্রদীপ, وَهَّاجًا উজ্জ্বল।

আয়াতসমূহের সারকথা

এখান থেকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যাতে কেয়ামত অস্বীকারকারীরা বুঝতে পারে, এ কুদরতওয়ালা খোদা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম।

তাফসীর

وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا (পর্বতমালাকে [যমীনের জন্যে] পেরেক)

যেমন কোন জিনিসের মাঝে পেরেক লাগানোর দ্বারা সেটা স্বস্থানে অটল হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ তাআলা পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনকে নড়াচড়া থেকে সুস্থিত করে দিয়েছেন। তাই পাহাড়-পর্বত হল

www.maktabatulabrar.com

যমীনের জন্যে পেরেক সদৃশ। এই পাহাড়-পর্বত দ্বারা যমীনের স্থিতি লাভ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا (তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি [নারী-পুরুষ] জোড়ায় জোড়ায়)

অর্থাৎ, পুরুষের হৃদয়ের প্রশান্তি ও বিনোদন এবং মানব বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নারীকে তার জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি নিবারক।)

পরিশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ-মনের প্রশান্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা নিদ্রা সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ায় আর কোন শান্তি হতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا (রাতকে করেছি আবরণ।)

অর্থাৎ, পোশাক যেমন দেহকে ঢেকে রাখে, তেমনি রাতের আঁধার প্রকৃতিকে ঢেকে নেয়। ফলে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কেবল নিদ্রাই দেননি, বরং নিদ্রার জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিরও ব্যবস্থা করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (দিনকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়।)

আল্লাহ তাআলা মানুষের সুখ-শান্তির জন্য যেমন নিদ্রা দান করেছেন এবং দান করেছেন নিদ্রার পরিবেশ রাত, তেমনি জীবিকা উপার্জনের জন্য দিয়েছেন আলোকজ্জ্বল দিন, যাতে সে কাজ-কারবার করে জীবন নির্বাহ করতে পারে।

وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধদেশে মজবুত সপ্ত আসমান।)

আল্লাহ তাআলা সপ্ত আসমানকে করেছেন এত মজবুত ও সুস্থিত যে, আজ পর্যন্ত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার স্বরূপে সামান্য বিচ্যুতি আসেনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আকাশের অস্তিত্ব এবং আকাশের সংখ্যা সাতটি হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীম ও সহীহ হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন এ আয়াত দ্বারা আকাশ সাতটি হওয়া প্রমাণিত। বোখারী মুসলিমসহ বহু হাদীছের কিতাবে মেরাজের হাদীছ বর্ণিত রয়েছে, তাতে আকাশ সাতটি হওয়া এবং প্রত্যেকে আকাশের দরজা থাকা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সেসব দরজা খুলে দেয়ার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অতএব বিজ্ঞানীরা যদি আকাশ পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে আকাশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে সেটা হবে তাদের অরাগতার বহিঃপ্রকাশ, সেটা আদৌ সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়।

وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا (আমিই সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।)

এখানে মানুষের আরামের সে উপকরণের কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হল সূর্যের আলো ও তাপ।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾	(১৪) এবং আমিই জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।
لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾	(১৫) যাতে তদ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ।
وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾	(১৬) এবং পাতাঘন উদ্যানসমূহ।
اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾	(১৭) নিশ্চয় বিচারদিবস একটি নির্ধারিত সময়।
يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾	(১৮) (অর্থাৎ) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা দল দল হয়ে উপস্থিত হবে।
وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾	(১৯) এবং আসমান খুলে যাবে। অতঃপর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।
وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾	(২০) আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে। ফলে তা বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

শব্দার্থ

وَاَنْزَلْنَا এবং আমিই বর্ষণ করেছি, مِنَ الْمُعْصِرٰتِ জলধর মেঘমালা থেকে, ثَجَّاجًا প্রচুর مَآءً বৃষ্টি, لِّنُخْرِجَ بِهٖ যাতে তদ্বারা উৎপন্ন করি, حَبًّا শস্য, وَنَبَاتًا ও উদ্ভিদ, اَلْفَافًا পাতাঘন, وَجَنّٰتٍ উদ্যানসমূহ, اِنَّ নিশ্চয়, يَوْمَ الْفَصْلِ বিচার দিবস, مِيْقَاتًا একটি নির্ধারিত সময়, يَوْمَ যেদিন, يُنْفَخُ ফুঁৎকার দেয়া হবে, فِى الصُّوْرِ শিঙ্গায়, فَتَاْتُوْنَ অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে, اَفْوَاجًا দল দল হয়ে, وَفُتِحَتْ এবং খুলে যাবে, السَّمَآءُ আসমান, فَكَانَتْ অতঃপর হয়ে যাবে, اَبْوَابًا বহু দরজা, سُيِّرَتْ স্থানচ্যুৎ করা হবে, الْجِبَالُ পাহাড়সমূহকে, فَكَانَتْ ফলে তা পরিণত হবে, سَرَابًا বালুকারাশিতে।

তাফসীর

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا (আমি [আল্লাহ] জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।)

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আয়াতে এসেছে– وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً অর্থাৎ আসমান থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। সুতরাং তাতে আসমান অর্থ শূন্যমণ্ডল।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا (নিশ্চয় বিচার দিবস একটি নির্ধারিত সময়।)

যোগসূত্র

আল্লাহর নেয়ামত ও কুদরতের কথা বর্ণনা করার পর এখান থেকে আবার কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا (যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে।)

দু'বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, সেদিন হবে বিচারদিবস। এ সময় সব মানুষ দলে দলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا (অতঃপর তোমরা দল দল হয়ে উপস্থিত হবে।)

দলবদ্ধ হয়ে আসার অর্থ

প্রত্যেক নবীর উম্মত পৃথক পৃথকভাবে দলবদ্ধ হয়ে আসবে। অতঃপর মু'মিনগণ ও কাফেররা পৃথক পৃথক হবে। আবার মু'মিনদের মধ্যেও নেককার ও বদকারের দল পৃথক পৃথক হবে। মোটকথা প্রত্যেক দল অপর দল থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

وَ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا (এবং আসমান খুলে যাবে। অতঃপর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।)

অর্থাৎ, আসমানের একটা বড় অংশ একসঙ্গে খুলে যাওয়ায় মনে হবে, যেন একস্থানে অনেক দরজা খোলা হয়েছে। বস্তুতঃ ফেরেশতাদের অবতরণের জন্যই এভাবে আসমান খুলে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুৎ করা হবে। ফলে তা বালুকা রাশিতে পরিণত হবে।)

যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়, সে পাহাড় স্বস্থান হতে বিচ্যুৎ হয়ে বালুকাস্তূপে পরিণত হবে। এসব ঘটনা শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় ঘটবে। (বয়ানুল কুরআন)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾	(২১) নিশ্চয় জাহান্নাম ওতপেতে রয়েছে।
لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾	(২২) সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।
لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾	(২৩) সেখানে তারা অনন্তকাল পড়ে থাকবে।
لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾	(২৪) সেখানে না তারা কোন প্রকার শীতলতার (আরামের) স্বাদ গ্রহণ করবে আর না কোন পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

www.maktabatulabrar.com

(২৫) উত্তাপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।	اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
(২৬) (এটা তারা) উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ (পাবে)।	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾

শব্দার্থ

اِنَّ جَهَنَّمَ নিশ্চয় জাহান্নাম (অর্থাৎ, জাহান্নামের ফেরেশতাগণ, كَانَتْ مِرْصَادًا ওঁৎপেতে রয়েছে (অর্থাৎ, প্রতীক্ষায় রয়েছে), لِلطَّاغِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদের, مَاٰبًا প্রত্যাবর্তনস্থল, لّٰبِثِيْنَ পড়ে থাকবে, فِيْهَآ সেখানে, اَحْقَابًا অনন্তকাল, لَا يَذُوْقُوْنَ না স্বাদ গ্রহণ করবে, بَرْدًا শীতলতার (আরামের), وَّلَا شَرَابًا আর না কোন পানীয় বস্তুর, اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত, جَزَآءً প্রতিদান, وِّفَاقًا উপযুক্ত।

তাফসীর

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎপেতে রয়েছে।)

ভিন্ন মতে এ আয়াতের অর্থ হল নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎপাতার স্থল। অর্থাৎ জাহান্নামের ফেরেশতাগণ কাফেরদের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে আছেন। (বয়ানুল কুরআন)

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا (সেখানে তারা অনন্তকাল পড়ে থাকবে।)

অর্থাৎ, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের আযাব শেষ হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) যদিও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অপরাধের জন্য চিরস্থায়ী কেন? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর হল তারা চিরস্থায়ী হায়াত পেলেও চিরস্থায়ী কুফরীতেই লিপ্ত থাকত, তাই তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি এ হিসেবেই দেয়া হবে। অতএব উপর্যুক্ত প্রশ্ন অবান্তর। এ সম্বন্ধে সামনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا (সেখানে না তারা কোন প্রকার শীতলতার (আরামের) স্বাদ গ্রহণ করবে আর না কোন পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।)

অর্থাৎ, না তারা শীতলতার স্নিগ্ধ আরাম লাভ করবে, না কোন সুপেয় পানীয়, যাতে পিপাসা নিবারণ হবে; বরং ফুটন্ত পানি পাবে যার উত্তাপে চেহারা ঝলসে যাবে, আঁতুড়িসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পেট থেকে বের হয়ে আসবে এবং তাদেরকে দোযখীদের যখম নির্গত পুঁজ দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সকল প্রকার আযাব থেকে রক্ষা করুন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

جَزَآءً وِّفَاقًا ([এটা তারা] উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ [পাবে]।)

অর্থাৎ, জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে এটা তাদের বাতিল বিশ্বাস ও অপকর্মের পূর্ণ প্রতিদান হবে। এটা অতিরিক্ত শাস্তি নয়, বরং তাদের কর্মের সমীচীন শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

(২৭) তারা হিসাবের আশঙ্কা রাখত না।	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
(২৮) এবং আমার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করত।	وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
(২৯) আর আমি প্রত্যেক বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি।	وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
(৩০) সুতরাং (এখানে তোমরা তোমাদের সেই কৃতকর্মের) স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব।	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

শব্দার্থ

اِنَّهُمْ তারা, لَا يَرْجُوْنَ আশঙ্কা রাখত না, حِسَابًا হিসাবের, كَذَّبُوْا তারা অস্বীকার করত, كِذَّابًا দৃঢ়ভাবে, بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহকে, كُلَّ شَيْءٍ প্রত্যেক বিষয়ই, اَحْصَيْنٰهُ সংরক্ষিত রেখেছি, كِتٰبًا লিখিতভাবে, فَذُوْقُوْا সুতরাং (এখানে তোমরা তোমাদের সেইকৃত কর্মের) স্বাদ গ্রহণ কর, فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ আমি তোমাদের বৃদ্ধি করতে থাকব না, اِلَّا عَذَابًا তবে শাস্তি।

তাফসীর

وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا (আর আমি প্রত্যেক বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।)

অর্থাৎ, সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবিশেষ অবগত আছেন এবং তাঁর সে পরিপূর্ণ ইলম অনুযায়ী সবকিছু নিয়মতান্ত্রিকভাবে দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সামান্য নেকী-বদী কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। সবকিছুই তিনি অবগত। সবটার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণেরও শাস্তি ভোগ করতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন-কাফের সকলের আমল আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।

فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا (আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব।)

অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ বাধ্যতামূলকভাবে, মৃত্যু উপস্থিত না হলে আরও বেড়েই চলতে। তেমনি আজ আল্লাহ তাআলা তোমাদের আযাব কেবল বৃদ্ধিই করতে থাকবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দোযখের আযাব হবে অশেষ, অনন্তকালীন। সে আযাবের কোন শেষ নেই, বরং আযাব কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। অতএব একশ্রেণির লোক যে বলে, অপরাধীদের নির্ধারিত আযাব শেষ হওয়ার পর জাহান্নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাদের মত ঠিক নয়। জাহান্নাম চিরস্থায়ী, তার আযাবও চিরস্থায়ী; এমনিভাবে জান্নাত চিরস্থায়ী, তার নায-নেয়ামতও চিরস্থায়ী। জান্নাত-জাহান্নাম কখনও বিলুপ্ত হয়ে যাবে না।

(৩১) প্রকৃত সফলতা কেবল মুত্তাকীদের জন্যই।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
(৩২) তাদের জন্যে রয়েছে বাগ-বাগিচা ও আঙ্গুরসমূহ।	حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
(৩৩) এবং সমবয়স্কা যুবতি রমণীগণ।	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
(৩৪) এবং পরিপূর্ণ পান পাত্র।	وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
(৩৫) তারা সেখানে মিথ্যা ও বাজে কথা শোনবে না।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
(৩৬) হিসাব মোতাবেক তোমার প্রতিপালকের দেয়া পরিপূর্ণ প্রতিদান।	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
(৩৭) যিনি আসমান ও জমীন এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, অতীব দয়াময়, তাঁর সাথে কথা বলবে এমন সাধ্য কারো নেই।	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾
(৩৮) যেদিন রূহ এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, কেউ কথা বলতে সক্ষম হবে না, তবে যাকে অতিশয় দয়াময় অনুমতি দিবেন এবং যে সঠিক বলবে।	يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

শব্দার্থ

مُتَّقِيْنَ মুত্তাকী পরহেযগারগণ, مَفَازًا সফলতা, حَدَائِقَ শব্দটি حَدِيْقَةٌ -এর বহুবচন, বাগ-বাগিচা, اَعْنَابًا আঙ্গুরসমূহ, كَوَاعِبَ যুবতী রমণীগণ, اَتْرَابًا সমবয়স্কা, كَاْسًا পানপাত্র, دِهَاقًا পরিপূর্ণ, لَغْوًا বাজে কথা, كِذّٰبًا মিথ্যা, خِطَابًا কথা। يَوْمَ যেদিন, يَقُوْمُ দাঁড়াবে, اَلرُّوْحُ রূহ, اَلْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ, صَفًّا সারিবদ্ধভাবে, لَا يَتَكَلَّمُوْنَ কথা বলতে সক্ষম হবে না, اِلَّا مَنْ তবে যাকে, اَذِنَ অনুমতি দিবে, اَلرَّحْمٰنُ দয়াময়, وَقَالَ এবং বলবে, صَوَابًا সঠিক।

যোগসূত্র

ইতিপূর্বের আয়াতসমূহে জাহান্নামীদের কর্মফলের ভয়ানক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতীদের সফলতা এবং পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে একদিকে ভয়-ভীতি সঞ্চার হয়, অপরদিকে আশা-ভরসা সঞ্চার হয়। উভয়ের সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় কাফেরগণ সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুমিনগণ সৎপথের উপর দৃঢ়তা অর্জন করে আর এই পথে চলাকালীন বিপদ-আপদে ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হয়। এ মর্মেই বলা হয়েছে,

الإيمان بين الخوف والرجاء .

অর্থাৎ, ঈমান ভয়-ভীতি এবং আশা-ভরশার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

তাফসীর

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا (প্রকৃত সফলতা কেবলমাত্র মুত্তাকীদের জন্যই। তাদের জন্যে রয়েছে বাগ-বাগিচা এবং আঙ্গুর সমবয়স্কা যুবতি রমণীগণ এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা সেখানে মিথ্যা ও বাজে কথা শোনবে না।)

জীবনের সফলতা

ইহকালে এবং পরকালে জীবনের সফলতা কেবলমাত্র মুত্তাকীদেরই, তবে ইহকালের সফলতা অনেক সময় বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু পরকালে মুত্তাকীদের সফলতা এবং বিদ্রোহীদের ব্যর্থতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর প্রকৃত সফলতা পরকালের সফলতাই। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে বস্তুজগতের সফলতার বিষয় আলোচিত হয়নি। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে মুত্তাকীদের যে প্রচুর ভোগের সামগ্রী প্রদান করা হবে, তা গণনা করে শেষ করা যায় না, তারই কয়েকটি বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

নেয়ামতের প্রকারভেদ

পরকালের নেয়ামতসমূহ দুই ধরনের হবে। যথা:

(১) যেগুলোর নমুনা বস্তুজগতে নেই। আকৃতির দিক দিয়েও এবং স্বাদ ও ভিটামিনের দিক দিয়েও। এ মর্মেই হাদীছে কুদছীতে বর্ণিত হয়েছে,

اعددت لعبادى الصالحين مالا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

অর্থাৎ, আমি আমার নেকবান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, মানুষ যা কল্পনায়ও আনতে পারে না।

(২) যেগুলোর নমুনা বস্তুজগতে বিদ্যমান রয়েছে, তবে আকৃতির দিক দিয়ে, স্বাদ এবং ভিটামিনের দিক দিয়ে নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا .

অর্থাৎ, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। (সূরা বাকারা: ২৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ .

অর্থাৎ, তোমাদের মন যা চাবে জান্নাতে তা বিদ্যমান রয়েছে, আর যা আবেদন করবে তাও বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষমাশীল পরম করুণাময় মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানদারী স্বরূপ। (সূরা হা মীম সাজদা : ৩১-৩২)

www.maktabatulabrar.com

আলাচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

দুই প্রকার নেয়ামতের রহস্য

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে পাকে সাধারণত দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামতের কথাই বেশি উল্লেখ করা হয়। কারণ, প্রথম প্রকার নেয়ামত মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তাশক্তির উর্ধ্বের বিষয়। আর উর্ধ্বের বিষয় বলেই সেগুলোর আলোচনা দ্বারা সর্বসাধারণের মধে তুলনামূলকভাব্যে আকর্ষণ কম সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামত যেহেতু পার্থিব জগতের নেয়ামতসমূহের নমুনা, যা মানুষ সর্বদা উপভোগ করছে। সে কারণে মানুষ দ্বিতীয় প্রকারের নেয়ামত সম্বন্ধে উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম, আর সেজন্যই দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকারের নেয়ামতের কথা বেশি বেশি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামত আকৃতির প্রশ্নে এক হলেও স্বাদ, ভিটামিন ও অন্তর্নিহিত সুষমার প্রশ্নে এক হবে না, এমনিভাবে পার্থিব জগতের নেয়ামতসমূহ ক্ষণস্থায়ী এবং সাময়িক, কিন্তু পরকালের এই নেয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী হবে।

পার্থিব জগতের নেয়ামত উপভোগ করার ক্ষেত্রে বৈধ এবং অবৈধতার প্রশ্ন আছে, কিন্তু পরকালে এই প্রশ্ন থাকবে না। অতএব পার্থিব জগতে যারা অবৈধ উপায়ে এই নেয়ামতসমূহ উপভোগ করছে তারা অপরাধী এবং অপরাধীর বেশে কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহর বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং যে শাস্তির পরিণাম অশান্তি তা প্রকৃতপক্ষে আদৌ শান্তি নয়।

যারা পার্থিব জগতে অবৈধভাবে দ্বিতীয় প্রকারের নেয়ামত ভোগ করে আত্মহারা এবং মুত্তাকী-দেরকে এক্ষেত্রে বঞ্চিত মনে করে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, তাদেরকে উপহাস ও ভর্ৎসনা করে থাকে, পরকালে তারা এ ধরনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে এ ধরনের নেয়ামতের উপরে মুত্তাকী-দের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অপরাধী এবং বঞ্চিত পাপিষ্ঠগণ স্বচক্ষে এ অবস্থা দেখে জ্বলেপুড়ে মরবে। এভাবেও জাহান্নামীদেরকে ব্যথিত এবং মনোকষ্টের সম্মুখীন করা হবে। এটা হল তাদেরকে মনস্তাত্ত্বিক কষ্ট দেয়া।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (হিসাব মোতাবেক তোমার প্রতিপালকের দেয়া পরিপূর্ণ প্রতিদান।)

এ আয়াতে জান্নাত লাভকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিদান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুঝা গেল জান্নাত এবং জান্নাতের পুরস্কারের অধিকারী হওয়া মুত্তাকীদের নেক আমলের বদৌলতেই, তাই এখানে জান্নাত লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

জান্নাত লাভের উপায়

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

অর্থাৎ, যে জান্নাতের তোমরা অধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের আমলের বিনিময়েই। (সূরা আরাফ : ৩৫)

www.maktabatulabrar.com

বস্তুত মুত্তাকীদের জান্নাত এবং পুরস্কারের অধিকারী হওয়া তাদের নেক আমলের বদৌলতেই। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, বান্দার আমলের বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান করা আল্লাহর জন্য অবশ্যম্ভাবী এবং ফরয কি না? এ সম্পর্কে সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত এই যে, আমলের বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব বা ফরয নয়; বরং আল্লাহ পাক বান্দাকে কেবল মাত্র তাঁর দয়া ও অসীম করুণায় জান্নাত দান করে থাকেন। অবশ্য মহান আল্লাহর দয়া এবং কৃপার উপযোগী হওয়ার জন্য ইসলামী জীবন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন তথা আমল করা বাঞ্চণীয়। এ বিষয়টি ঠিক এরূপ যে, কোন লোকের চাকুরী পেতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই সে চাকুরীর যোগ্যতা থাকতে হবে, কিন্তু যোগ্যতা থাকলেই যে চাকুরী পেয়ে যাবে তা জরুরী নয়।

এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, আল্লাহর এক বান্দা অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিল। প্রাপ্ত বয়সের পর মৃত্যু পর্যন্ত সে কোন দিন ছগীরা-কবীরা কোন প্রকার গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, তাই তার ধারণা ছিল, সে তার আমলের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে, আল্লাহর দয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, যাও আমার দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে ভাববে, আমি শুধু আল্লাহর দয়াতেই জান্নাতে যাব? আমার তো বহু আমল রয়েছে, আমি তো আমার আমলের বদৌলতে জান্নাতের অধিকারী হব। তখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন; একে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। কারণ, সে আমার রহমতের প্রত্যাশী নয়, বরং তার আমলের বিনিময়ে জান্নাত পেতে চায়। নির্দেশ মোতাবেক তাকে জাহান্নামের দিকে নেয়া হতে থাকবে। যতই জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে জাহান্নামের আগুনের তাপে তার পিপাসা বাড়তে থাকবে। পিপাসায় সে হায় হায় করে চিৎকার করতে আরম্ভ করবে। এমন সময় আল্লাহর নির্দেশে একজন ফেরেশতা একটি গ্লাসে করে সামান্য কিছু পানি নিয়ে ফেরীওয়ালার মত এই বলে বলে জাহান্নামী ব্যক্তিটির সম্মুখে হাজির হবে, 'আজ কি কেউ এই গ্লাসের সামান্য পানির বিনিময়ে আমাকে তাঁর সমগ্র জীবনের ইবাদতসমূহ দিয়ে দিতে পার'? তখন সেই পিপাসা কাতর লোকটি চিৎকার দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমার সমস্ত জীবনের ইবাদতগুলো তুমি গ্রহণ কর এবং তোমার গ্লাসের সামান্য পানিটুকু আমাকে দাও, আমি তা পান করে প্রাণ রক্ষা করি। কারণ, পানির পিপাসায় এখন প্রাণ যাওয়ার পথে। তখন পানিওয়ালা বারংবার বুঝাবে যে, 'দেখ এটুকু পানি দ্বারা তোমার পিপাসা নিবারণ হবে না, অথচ তোমার জীবনের সমস্ত ইবাদত এর বিনিময় হিসেবে দিয়ে দিলে পরে তোমার কী উপায় হবে? সুতরাং বুঝে শুনে বল। কিন্তু সে একই কথা বলতে থাকবে, পানিটুকু আমাকে দাও, পান করে প্রাণ বাঁচাই, পানির পিপাসায় জীবন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম! এমতাবস্থায় গায়েবী আওয়াজ আসবে– হে আমার ঈমানদার বান্দা! একগ্লাস পানির বিনিময় তোমার সমস্ত জীবনের ইবাদতের মূল্য, এ ধরনের কত গ্লাস পানি তোমার জীবনে তুমি পান করেছ? তুমি কি তার মূল্য দিতে সক্ষম? আর কেবল পানিই নয়, আমার কী পরিমাণ নেয়ামত তুমি উপভোগ করেছ, সেগুলোর বিনিময় প্রদান করতে কি তুমি সক্ষম? না হলে আবার ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়ার দাবি কর কেমন করে? সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ

পাকের অগণিত নেয়ামতের একটির বিনিময় প্রদান করাও বান্দার জন্য সম্ভব হতে পারে না, অবশিষ্ট বান্দা যা কিছুই পায় মাত্র আল্লাহর দয়া এবং কৃপাস্বরূপ। অতএব আমল করলে তার বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়, বরং আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমলদার বান্দাকে দয়া করে জান্নাত দান করেন এবং এই জান্নাত দান করা নিজের উপর নিজেই ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا (তাঁর সাথে কথা বলবে এমন সাধ্য কারও নেই।)

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর সাথে কোন প্রকার কথা বলার কারও অধিকার থাকবে না এবং কেউ সক্ষমও হবে না; অথচ বহু আয়াত এবং হাদীছ পাকে অনেকেই শাফাআতের অধিকার পাবে বলে বর্ণিত আছে। তাই শাফাআতের অধিকার সম্পর্কে তথ্য জানা প্রয়োজন। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

শাফাআতের অধিকার

আল্লাহ পাক যাদেরকে শাফাআতের অথবা কোন প্রকার কথা বলার অধিকার এবং অনুমতি প্রদান করবেন, কেবল তারাই শাফাআত করতে পারবে এবং কথা বলার অধিকারী হবে, এটা অগণিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উল্লিখিত আয়াতে শাফাআত করতে পারবে না– এ কথাটি কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্‌সির কুরতুবী বলেন,

لا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خطابًا . اى لا يملكون ان يطالبوه الا فيما اذن له .

অর্থাৎ, কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলা সম্ভব হবে না, তবে যে বিষয়ে কথা বলার অনুমতি প্রমাণ করা হবে সে বিষয়ে বলতে সক্ষম হবে। (কুরতুবী– ১৮৬/১৩)

যারা কুরতুবীর এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মুফাস্‌সির কাসায়ী ও অধিকাংশ মুফাস্‌সির। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও এই মতটি সমর্থিত হয়।

অর্থাৎ, যেদিন অতি ভয়াবহ সেদিন কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলতেও সক্ষম হবে না, তবে যাকে আল্লাহ পাক অনুমতি দান করবেন। (সূরা হূদ : ১০৫)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَه قَوْلًا .

অর্থাৎ, সেদিন কারও সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যাকে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করবেন। (সূরা ত্বাহা : ১০৯)

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা.)-এর মতে 'সক্ষম হবে না' ঘোষণাটি মুশরিকীন এবং বিদ্রোহীদের জন্য প্রযোজ্য। (রহুল মাআনী– ২০/৩০) কেউ কেউ বলেছেন যে, এই ঘোষণাটি ফেরেশতাদের জন্য প্রযোজ্য। (তাফ্‌সীরে কাবীর– ৩১৩/৮)

আসলে বাক্যটিকে ব্যাপক অর্থেও যদি ব্যবহার করা যায়, তাতেও কোন ভুলের অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সিদ্ধান্তের উপরে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার কারও হবে না, এমনকি আম্বিয়া (আ.) দেরও হবে না। যখন আম্বিয়া (আ.) দের হবে না, তখন ফেরেশতা অথবা কাফেরদের হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

www.maktabatulabrar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি সক্ষম হবেন না? রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, 'না', তবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন– 'আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার না থাকা ইত্যাদি'– এ হবে বিচারের মুহূর্তে। বিচারের পর যারা জান্নাতী হবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় দর্শন এবং কথোপকথনের সুযোগ দান করবেন।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا (যেদিন রূহ এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।)

মুমিন এবং কাফেরদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং ফল ঘোষণা করা হবে যেদিন, এই আয়াতে সে ভয়াবহ দিনটি সম্পর্কেই বলা হয়েছে। ভয়াবহ এই দিনটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং অগণিত হাদীছে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। এখানে বলা হয়েছে, ঐ দিনটি এত ভয়াবহ হবে যে, রূহ দাঁড়িয়ে থাকবে, ফেরেশতাগণ কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কথা বলতেও সক্ষম হবে না। যাকে অনুমতি দেয়া হবে সে অবশ্যই কথা বলবে, কিন্তু তাও সঠিক কথা বলবে, বাজে কথা বা মিথ্যা কথা বলবে না। রূহ এবং ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে থাকবে– এর দ্বারা অবস্থার ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, ফেরেশতাগণ বে-গোনাহ মাসূম, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানী করে না, তারা করে তা-ই যা তাদেরকে নির্দেশ করা হয়। (সূরা তাহরীম: ৬)

রূহ এবং ফেরেশতার বিচারের 'কোন ভয় নেই' শাস্তির কোন আশঙ্কা নেই। তা সত্ত্বেও তাদের প্রাণে যখন এ ধরনের ভয় সঞ্চারিত হবে, তখন অন্যদের অবস্থা কতটুকু মারাত্মক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

'সারিবদ্ধভাবে' শব্দটি দ্বারা সূক্ষ্মভাবে অবস্থার অধিক গুরুতর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, সারিবদ্ধভাবে বা কাতার বেঁধে মালিকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অধীনস্থদের সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তাই বুঝায়।

এমনিভাবে কথা বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও 'কোন কিছু বলতে সক্ষম না হওয়া, বলার অনুমতি পেলেও যথার্থ এবং সঠিক বলতে বাধ্য থাকা'–এর প্রত্যেকটি বিষয়ই পরিস্থিতির গুরুতর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

رُوْح (রূহ)-এর অর্থ

উল্লিখিত আয়াতের "রূহ" শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কুরআনে পাকে এবং হাদীছ শরীফে রূহ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা– আত্মা, কুরআনে পাক, জিবরাঈল ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ প্রশ্নে মুফাস্‌সিরীনগণের মতামত নিম্নরূপ:–

(১) যায়েদ ইবনে আসলামের মতে (দ্র. ইবনে কাছীর- ৪৬৫/৪) আলোচ্য আয়াতে রূহ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনেই রূহ দ্বারা কুরআনকে উদ্দেশ্য করার নযীর বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَكَذٰلِكَ اَوْ حَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا .

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি 'রূহ' তথা আমার নির্দেশ। (সূরা শূরা : ৫২)

কিন্তু এই মতটি অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে 'দাঁড়ানো' কথাটি পবিত্র কুরআনের বেলায় খাপ খায় না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হলেও কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি এ মতটি বিশুদ্ধ মেনে নিয়ে হাকীকত-মাজায অর্থাৎ একই শব্দকে একই সময় মূল অর্থ এবং রূপক অর্থে ব্যবহার করায় তাফসীরের মূল ধারার পরিপন্থী হবে। মন্তব্যটি করেছেন আল্লামা মাহমূদ আলূসী এবং ইমাম রাযী। (রূহুল মা'আনী- ২০/২৯ ও তাফসীরে কাবীর- ৩১৩/৮)

(২) কারও কারও মতে রূহ শব্দটি এখানে ফেরেশতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য ফেরেশতার তুলনায় এই ফেরেশতার বিশেষত্ব রয়েছে বলেই ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রূহ নামক ফেরেশতার বিশেষত্ব বর্ণনা করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

ما خلق الله مخلوقا بعد العرش اعظم منه .

অর্থাৎ, আরশ ব্যতীত এত বৃহৎ আল্লাহর আর কোন সৃষ্টি নেই।

সর্ববৃহৎ এই ফেরেশতাই সেদিন ভীত-সন্ত্রস্তাবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

فاذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا يكون عظم خلقه مثل صفوفهما .

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন রূহ নামক ফেরেশতা একাই এককাতার হয়ে দাঁড়াবে আর অন্যান্য ফেরেশতাকুল ভিন্ন কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে, বৃহতের প্রশ্নে উভয় কাতার সমান সমান হবে। (কুরতুবী- ১৮৬/১৯)

উক্ত ফেরেশতার বর্ণনা দিয়ে হযরত ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেন,

الروح ملك اعظم من السماوات السبع ومن الارضين السبع ومن الجبال وهو حيال السماء الرابعة يسبح الله كل يوم اثنى عشرة الف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكا فيجئ يوم القيامة وحده صفا وسائر الملائكة صفا .

অর্থাৎ, রূহ একজন ফেরেশতা সাত আসমান সাত যমীন এবং পাহাড়-পর্বত থেকেও অধিক বৃহৎ। চতুর্থ আসমানে বিদ্যমান। সে প্রত্যহ বারো হাজার বার আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। কেয়ামতের দিন এই ফেরেশতা একাই এককাতার হয়ে দাঁড়াবে আর সকল ফেরেশতা এককাতার হয়ে দাঁড়াবে। (মাজহারী-১৮২)

মুফাস্সির জাহ্হাক বলেন,

لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة .

অর্থাৎ, রূহ নামক ফেরেশতা যদি মুখ খোলে, তবে সমস্ত ফেরেশতা তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

www.maktabatulabrar.com

হযরত আলী (রা.) বলেন,

الروح ملك له سبعون الف وجهة لكل وجهة سبعون الف السن لكل لسان سبعون لغة يسبح الله بتلك اللغات كلها .

অর্থাৎ, রূহ একটি ফেরেশতা। তার সত্তর হাজার মুখ। প্রত্যেক মুখের সত্তর হাজার যবান রয়েছে। প্রত্যেক যবানে সত্তরটি ভাষা। সকল ভাষায় সে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে।

হযরত আবু তালহা, হযরত উম্মে হানী, হযরত কাতাদা, হযরত মুজাহিদ এবং হযরত হাসান (রা.) হতেও এ ধরনের মতামত বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বর্ণনার সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়।

(৩) মুজাহিদ ইবনে জাব্রের মতে রূহ দ্বারা আল্লাহর এক আশ্চর্য ধরনের সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। সেই সৃষ্টি মানুষও নয় ফেরেশতাও নয়। অবশ্যই তারা পানাহার করে থাকে। তারা আল্লাহর বিশেষ সৈনিক। এর সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই, তদুপরি এর বর্ণনাসূত্রে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

(৪) হযরত হাসান এবং হযরত কাতাদার মতে রূহ দ্বারা বনী আদমকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাস্সির ইবনে কাছীর এই মতটিকে পছন্দ করেছেন, কিন্তু তিনি এর কোন প্রমাণ পেশ করেন-নি।

(৫) মুফাস্সির আতিয়ার মতে রূহ দ্বারা আদম সন্তানের রূহসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তার মতে কেয়ামত কায়েমের জন্যে প্রথম ফুৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকারের পূর্বে বনী আদমের রূহসমূহকে শরীরে প্রবিষ্ট করানোর পূর্ব মুহূর্তে সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করানো হবে; কিন্তু এই মতটির সমর্থনেও কোন প্রমাণ নেই।

(৬) মুকাতিল ইবনে হাইয়ানের মতে রূহ দ্বারা শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(৭) অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের মতে রূহ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইমাম রাযী এই মতটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (তাফসীরে কাবীর- ৩১৩/৮)। নিম্নের আয়াতসমূহের দ্বারাও এই মতটি যথার্থ বলে সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ .

অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল পবিত্র কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা শুআরা: ১৯৩)

সূরা কাদরে ইরশাদ হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ .

অর্থাৎ, সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। (সূরা কদর: ৪)

আলোচ্য আয়াতে রূহ দ্বারা হযরত জিবরাঈলকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলে একদিকে যেমন

আয়াতের বর্ণনা হাদীছের অনুরূপ হয়, অন্যদিকে আয়াতের চাহিদাও পূরণ হয়। কারণ, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ানের মতের মর্মও এটাই। হযরত ইবনে আব্বাছ (রা.)-এর অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও এই মতটির সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। (মাজহারী- ১৮২)

صف (কাতার)-এর সংখ্যা

সারিবদ্ধ কাতারের সংখ্যা কত হবে এ সম্পর্কে এক, দুই এবং দুয়ের অধিক– এ তিনটি মত পাওয়া যায়। যদি জাত অথবা অপরাধ ভিত্তিক কাতার হয়, তাহলে একাধিক কাতার হওয়ার মতটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়।

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক এবং ফেরেশতাগণ কাতারে কাতারে উপস্থিত হবেন। (সূরা ফাজ্‌র: ২২)

মুফাসসির কুরতুবী এই আয়াতের উদ্ধৃতি করে বলেন,

يدل على الصفوف.

অর্থাৎ, উপর্যুক্ত আয়াতটি একাধিক কাতার হওয়াকেই প্রমাণ করে। (কুরতুবী- ১৮৭/১৯)

لا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا (কেউ কথা বলতে সক্ষম হবে না, তবে যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন এবং যে সঠিক বলবে।)

আয়াতে বলা হয়েছে, (সেদিন সকলে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং) কোন প্রকার কথা বলার হিম্মত হবে না। যাদেরকে আল্লাহ পাক কথা বলার অনুমতি দান করবেন, কেবল তারাই সেদিন বলবে এবং বলতে সক্ষম হবে। এখন জানার বিষয় হল যারা কথা বলতে সক্ষম হবেন তারা কারা?

যারা কথা বলতে সক্ষম হবেন তারা কারা?

এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। মুফাস্‌সির তানতাবী বলেন,

ومعلوم ان احوال الناس بعد الموت تبع احوالهم فى الدنيا. فأذن ليس يوذن لاحد فى الكلام إلا من اذن له فى الدنيا والمأذون فى الدنيا هم الذين اشرقت الأرض بعلومهم وأنوارهم وحكمهم وأدابهم. فأهل القول الصواب فى الدنيا هو اهله فى الاخرة الخ

অর্থাৎ, এটা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের মৃত্যুর পরের অবস্থা মৃত্যুর পূর্বাবস্থা অর্থাৎ, পৃথিবীতে থাকাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হবে। অতএব কথা বলার অনুমতি শুধু তাকে দেয়া হবে যাকে পৃথিবীতে অনুমতি দেয়া হয়। আর পৃথিবীতে কথা বলার অনুমতি কেবল তাদেরেই দেয়া হয়েছে যাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, নূর, প্রজ্ঞা এবং আদব-আখলাকের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়। সুতরাং যারা এই ধরনীতে

www.maktabatulabrar.com

সঠিক কথার অধিকারী, কেবল তারাই আখেরাতের জীবনেও সঠিক কথা বলার অধিকারী হবে। (তানতাবী-১১/২৫)

আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত আহকাম

উক্ত আয়াত থেকে নিম্নোক্ত আহকাম উদগত হয়।

(১) অপরাধীকে বিচারক তার সম্মুখে দাঁড় করাতে পারে।

(২) অভিজ্ঞ বিচারক অপরাধীর মিথ্যা বক্তব্য না শোনেও বিচার করতে পারে।

(৩) মুয়াক্কেলের অনুমতিক্রমে উকীল মুয়াক্কেলের সঠিক বক্তব্য বিচারকের সম্মুখে পেশ করতে পারে।

সাকরাতুল মউত

এখানে দুইটি প্রশ্নের বিষয় আলোচনাযোগ্য। প্রশ্ন হতে পারে, (এক) অনেক মুমিনের অত্মা বের হবার সময় তাদের মুখমণ্ডলে কষ্টের আলামত পরিলক্ষিত হয়, মুখমণ্ডল ক্লিষ্টতা ও মলিনতার ছাপ পাওয়া যায়। আবার কাফের বেদ্বীনের চেহারায় স্বস্থি, প্রশান্তি এবং প্রফুল্লতার ছাপ পরিস্ফুট হয়। অথচ কাফেরের প্রতি আযাবের কথা হাদীছে বর্ণিত আছে। (দুই) 'সাকরাতুল মউত' বা মৃত্যু-যন্ত্রণা সকলেই স্পর্শ করে– নেক মুমিনকেও এবং অপরাধী মুমিনকেও; যেমন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) জান্নাতী সাহাবী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণা তাঁকেও ভুগতে হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর উম্মতদের উদ্দেশে প্রায়শই বলতেন,

يا معشر الحواريين ادعوا الله ان يهون عليكم مد السكرة.

অর্থাৎ, হে হাওয়ারীদের জামাত! তোমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণাকে সহজ করে দেন।

এমনকি হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও ওফাতের সময় কষ্ট হয়েছে। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন,

كانت بين يديه ركوة او علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله! ان للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول فى الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده.

অর্থাৎ, ওফাতপূর্ব মুহূর্তে রসূলে পাকের সম্মুখে পানি ভর্তি বরতন ছিল। তিনি হস্ত মুবারক পানির বর্তনে প্রবিষ্ট করে শীতলতা লাভের জন্য ভিজা হাতদ্বয় বার বার মুখমণ্ডলে মুছতে লাগলেন আর কেবল বলতে থাকলেন– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'! মৃত্যুর যন্ত্রণা নিদারুণ! অতঃপর হস্ত মুবারক উত্তোলন করত একই অভিব্যক্তি... এখন তো বন্ধুর কাছেই...। এই করুণ অবস্থা চলতেই থাকল। অবশেষে রূহ্ মুবারক বদন থেকে ছিন্ন হল আর হাতখানা ঢলে পড়ল।

এ ঘটনায় নেকবান্দার ক্ষেত্রেও মৃত্যু যন্ত্রণা প্রতীয়মান হয়।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেন,

ان العبد الصالح ليعالج الموت و سكراته وان مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقنى وافارقك الى يوم القيامة.

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে নেক বান্দারাও মউতের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাদের শরীরের জোড়াগুলো একটি আরেকটিকে সালাম করে আর বলে, তুমি আমার হতে পৃথক হচ্ছো, আমিও তোমার থেকে পৃথক হচ্ছি কেয়ামত তক কালের জন্য।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নেক-সালেহ্ মুমিনের আত্মা বহির্গত হওয়ার সময় শুধু যে প্রশান্তিই লাভ হয়, কিংবা খুব আরামের সঙ্গেই বহিরাগত হয়– এ মন্তব্য বা ধারণাটি সাকুল্যে সত্য নয়। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, মৃত্যুর পূর্বে মানুষের শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট তার শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, কিন্তু মৃত্যু ও তৎপরবর্তীকালে এর সম্পর্ক মৌলিকভাবে এই শরীরের সাথে সম্পর্কিত থাকে না, বরং থাকে রূহের সাথে। তাই মুখমণ্ডল অথবা শরীরের অবস্থা দৃষ্টে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত কাফের-বেদ্বীনরা মৃত্যুকালে কঠোর আযাবে আক্রান্ত হয় এবং মুমিনগণ আল্লাহর বিশেষ রহমতে অফুরন্ত স্বস্থি ও প্রশান্তি উপভোগ করেন।

দ্বিতীয় জবাব হলো, সাকরাতুল মউত বা মৃত্যু-যাতনা মুমিনগণকেও ভোগ করতে হয় বটে; কিন্তু তা শাস্তি হিসাবে নয়, বরং তা হচ্ছে রূহ স্থানান্তরিত হওয়া জনিত অস্বস্থি ও ক্লেশ মাত্র। সুতরাং মৃত্যুকালে 'মুমিনের মৃত্যু-যন্ত্রণা হওয়া' এবং 'যন্ত্রণা না হয়ে সুখ-শান্তি লাভ হওয়া' বিষয়ক বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীছগুলোর মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। যেহেতু সুখ এক অর্থে আর যন্ত্রণা আরেক অর্থে। সুখ রূহের ব্যাপার আর যন্ত্রণা রূহের বিচ্ছিন্নতা জনিত অপরিহার্য কারণে, যা শুধু শরীরের ব্যাপার।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾	(৩৯) এটা সুনিশ্চিত দিন, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল করে রাখুক।
اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾	(৪০) নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আযাবের বিষয়ে সতর্ক করলাম, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সে সকল কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে। আর কাফের বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি মাটি হতাম!

শব্দার্থ

ذٰلِكَ এটা, اَلْيَوْمُ দিন, اَلْحَقُّ সুনিশ্চিত, فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা, اِتَّخَذَ সে করে রাখুক, اِلٰى رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের নিকট, مَاٰبًا আশ্রয়স্থল, اِنَّا আমি, اَنْذَرْنٰكُمْ তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলাম, عَذَابًا এক আযাবের, قَرِيْبًا আসন্ন, يَوْمَ যেদিন, يَنْظُرُ প্রত্যক্ষ করবে, اَلْمَرْءُ প্রত্যেক ব্যক্তি, مَا সে সকল কৃতকর্ম, قَدَّمَتْ يَدٰهُ যা সে স্বহস্তে করেছে, وَيَقُوْلُ আর বলবে, اَلْكٰفِرُ কাফের, يٰلَيْتَنِىْ হায় আফসোস, كُنْتُ আমি যদি হতাম, تُرٰبًا মাটি।

তাফসীর

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ (যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সে সকল কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে।)

অর্থাৎ, হাশরে প্রত্যেকে তার আমলসমূহ স্বচক্ষে দেখতে পাবে হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে, কিংবা কাজকর্ম সব স্বশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا (আর কাফের বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি মাটি হতাম!)

এ বাক্যের ব্যাখ্যা দুভাবে করা হয়েছে।

এক. কাফের বলবে, আমি যদি প্রথম থেকেই মাটি থাকতাম। মানুষ হিসেবে আমার সৃষ্টিই না হত, তাহলে আজকের এ হিসাব-কিতাবের বিপদে পড়তে হত না।

দুই. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্যজন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমনকি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংহীন ছাগলকে গুতা মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কর্ম শেষ হওয়ার পর সব জন্তুকে আদেশ করা হবে, 'মাটি হয়ে যাও'। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এদৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে– হায়, আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭৯) সূরা নাযি'আত, মক্কী
৪৬ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾	(১) শপথ সে ফেরেশতাদের যারা নির্মমভাবে (কাফেরদের) প্রাণ উৎপাটন করে,
وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾	(২) এবং যারা (মু'মিনদের) বন্ধন খুলে দেয়,
وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾	(৩) এবং যারা তীব্র গতিতে সাঁতরে চলে,
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾	(৪) অতঃপর দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾	(৫) অতঃপর কর্ম নির্বাহ করে, (এসবের শপথ করে আল্লাহ বলছেন কিয়ামত নিশ্চয় আসবে।)

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

وَالنّٰزِعٰتِ শপথ সে ফেরেশতাদের যারা (কাফেরদের) প্রাণ উৎপাটন করে, زَرْعًا নির্মমভাবে, وَالنّٰشِطٰتِ যারা খুলে দেয় (মু'মিনদের) বন্ধন, وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا যারা তীব্র গতিতে সাঁতরে চলে, السّٰبِقٰتِ سَبْقًا দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, اَلْمُدَبِّرٰتِ নির্বাহ করে, اَمْرًا কর্ম।

সূরার সারমর্ম

এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। শুরুতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করেছেন। সুতরাং এ স্থলে ফেরেশতাদের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এ আলোচনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত।

(১) ফেরেশতাদের প্রথম বিশেষণ হল কঠোরভাবে টেনে প্রাণ নির্গতকারী। এখানে আযাবের সেসব ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কাফেরদের আত্মা নির্মমভাবে টেনে হেঁচড়ে বের করে। আর এ নির্মমতা যেহেতু আত্মিক হয়ে, থাকে তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা আবশ্যক নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল সহজে বন্ধন মুক্তকারী। অর্থাৎ মু'মিনদের রূহ কবজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ যারা সহজে তাঁদের রূহ কবজ করে। পানি কিংবা বাতাস ভর্তি কোন কিছুর বাঁধন খুলে দিলে যেমন সে বাতাস বা পানি সহজে বের হয়ে যায়, তেমনি মু'মিনের আত্মা অনায়াসে দেহ থেকে বের হয়ে আসে। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফিরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়, এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়, তখন ফেরেশতা জোরে-জবরে টানাহেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরযখের ছওয়াব, নিয়া'মত ও সুসংবাদ ভেসে ওঠে, ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) তৃতীয় বিশেষণ হল সাঁতরে গমনকারী। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুত বেগে চলা। এ বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, যারা মানুষের রূহ কবজ করার পর দ্রুত গতিতে আসমানের দিকে নিয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) চতুর্থ বিশেষণ হল দ্রুত বেগে অগ্রসরমান। অর্থাৎ, রূহ নিয়ে পৌছার পর তারা এ রূহ সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) পঞ্চম বিশেষণ, যারা কর্ম নির্বাহ করে। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ হল, যে আত্মাকে ছওয়াব ও আরাম দেয়ার আদেশ হয়; তারা তার জন্য ছওয়ার ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয় তার জন্য আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

উক্ত শপথসমূহের জবাব উহ্য রাখা হয়েছে, তা হল কেয়ামত ও হাশর-নাশর নিশ্চয় সংঘটিত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦	(৬) যেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে।
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧	(৭) তার পশ্চাতে আসবে এক পশ্চাদগামী।
قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨	(৮) সেদিন অনেক অন্তর ধড়ফড় করতে থাকবে।
اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩	(৯) তাদের দৃষ্টিসমূহ (লজ্জায়) অবনত হবে।
يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠	(১০) তারা বলে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবই।
ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١	(১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?
قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢	(১২) তারা বলে, তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে!

শব্দার্থ

تَرْجُفُ কেঁপে উঠবে, رَادِفَةٌ অনুগামী, এখানে দ্বিতীয় ধ্বনি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। قُلُوْبٌ (শব্দটি قَلْبٌ -এর বহুবচন) দিলসমূহ, وَاجِفَةٌ ভীতসন্ত্রস্ত, اَبْصَار (শব্দটি بَصَر -এর বহুবচন) চোখসমূহ, خَاشِعَةٌ (লজ্জায়) অবনত, يَقُوْلُوْنَ তারা বলে, ءَاِنَّا আমরা কি, لَمَرْدُوْدُوْنَ ফিরে আসবই, فِى الْحَافِرَةِ পূর্বাবস্থায়, عِظَامًا অস্থি, نَخِرَةً গলিত, كَرَّةٌ প্রত্যাবর্তন, خَاسِرَةٌ সর্বনাশ।

তাফসীর

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (যেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে।)

এর দ্বারা সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেয়া বুঝানো হয়েছে। কেননা এ ফুৎকারের সাথে সাথে ভয়ানক ভূকম্পন আরম্ভ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (তার পশ্চাতে আসবে এক পশ্চাদগামী।)

এখানে 'পশ্চাদগামী' দ্বারা সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনি বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ 'اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (সেদিন অনেক অন্তর ধড়ফড় করতে থাকবে। তাদের দৃষ্টিসমূহ [লজ্জায়] অবনত হবে।)

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন অনেক অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং লজ্জা ও অপমানে অনেক চোখ অবনমিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ (তারা বলে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবই?)

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (তারা বলে, তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশ হবে !)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং তা অসম্ভব মনে করে বলে, কবরের গর্তে উপনীত হওয়ার পরও কি আমরা মৃত্যুর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব? ء إذا كنا عظامًا ما نخرة (অর্থাৎ, গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও।) অস্থি বিগলিত হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও কি এতে পুনরায় প্রাণ ফিরে আসবে? অর্থাৎ আসবে না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

অর্থাৎ, কেয়ামত অস্বীকারকারীরা বলে, মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি পুনরুত্থান সংগটিত হয় তবে তা হবে আমাদের জন্য সর্বনাশ। কেননা আমরা এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। তাদের এ উক্তি ছিল বিদ্রূপমূলক। অর্থাৎ, মুসলমানগণ আমাদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে থাকে, অথচ মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোন জীবন আসবেই না। সুতরাং কোনরূপ ক্ষতি বা সর্বনাশের প্রশ্নই আসে না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

মুফাস্‌সির আবু মুসলিম ইস্পাহানীর মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুশরিকদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধাবস্থা, অশ্বারোহী এবং সৈনিকদের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে, এর সমর্থনে ইমাম রাযী বলেন,

واللفظ محتمل له وان كان له خلاف قول الجمهور .

অর্থাৎ, শব্দে এর অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে, যদিও এটা হয় জুমহুরের মতবিরোধী। (কাবীর– ৩২০/)

কারণ 'কেয়ামতের অবস্থায়' অর্থে উল্লিখিত আয়াতের অর্থ রূপক মেনে নেয়া হয়েছে, তেমনি উপরিউক্ত অংশ রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইমাম রাযীর এ বক্তব্য নিম্নেযুক্ত চারটি কারণে বোধগম্য নয়।

(১) সূরার বর্ণিত শানে নুযুল পরিপন্থি।

(২) প্রসঙ্গত আয়াতসমূহের বিষয়াদির সাথে সমন্বয়হীনতা।

(৩) এ প্রঙ্গে বর্ণিত হাদীছসমূহের সাথে অসঙ্গতি।

(৪) জুমহুরে মুফাসসিরদের অসমর্থন।

সুতরাং শাব্দিক অবকাশ এখানে পরিত্যাজ্য এবং উল্লিখিত কারণেই এখানে 'কেয়ামতের অবস্থা' শুরু হয়েছে, বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই এই কারণেই راجفة -এর অর্থ 'মৃত্যু' গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মুফাস্‌সির ইবনে জায়েদ এ মত পোষণ করেছেন। তবে راجفة -এর অর্থ 'মৃত্যু' বলে গ্রহণ করলে পরবর্তী শব্দ رادفة -এর অর্থ 'কেয়ামতের অবস্থা' অবশ্যই নিতে হবে।

কেয়ামতের আংশিক অবস্থা

এখানে কেয়ামতের দুইটি আংশিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) সেদিন নিখিল বিশ্বকেঁপে উঠবে। কেঁপে উঠবে কেন? এবং কী অবস্থা হবে তখন? কেঁপে উঠার কারণ হল ইসরাফীল ফেরেশ্‌তা আল্লাহর নির্দেশক্রমে শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। শিঙ্গার আওয়াজে পৃথিবীর সর্বত্র যাল্‌যালা তথা প্রকম্পন দেখা দিবে, কেঁপে উঠবে এবং ভূপৃষ্ঠের ও সৌরজগতের সব কিছুই ধূলি-কণার মত টুকরো টুকরো, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, কায়েম হবে এক মহাপ্রলয়। এ হবে প্রথম ফুৎকার। এ অবস্থায় কতদিন থাকবে? এ সম্পর্কে চল্লিশ বৎসরের কথা হযরত আবূ হুরাইরা কর্তৃক আবূ

দাউদের হাদীছে বর্ণিত হলেও বোখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ হুরাইরার হাদীছে এ সংখ্যার উল্লেখ নেই, ফলে ইমাম কুরতুবীসহ অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও হাদীছ বিশারদ উল্লেখিত সংখ্যাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেননি। (সুতরাং চল্লিশ বৎসরের বিষয়ে ঐকমত্য থাকা সম্পর্কিত মুফাস্‌সির হালিমীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।) তবে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এটা অকাট্য, তা সে যত দিনই হোক। এক্ষেত্রে বস্তু জগতের সময় হিসেবে দিন গণনা নয়, বরং তাফ্‌সীরে মাজহারীর বর্ণনা অনুসারে–

مقدار ذلك اليوم خمسين الف سنة .

অর্থাৎ, সেই দিনের সময়ের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর সময়ের সমান। (মাজহারী– ১৮৭)

অবশ্য এ সময়ের পরিমাণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে পাকে অগণিতবার বর্ণিত হয়েছে।

পরক্ষণেই দ্বিতীয় আরেকটি কম্পন আসবে। এই দ্বিতীয় কম্পন দ্বারা ইসরাফীলের দ্বিতীয় ফুৎকারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ফুৎকারের সাথে সাথেই সকল জীবাত্মা পুনর্জীবিত হবে এবং হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুতবেগে রওনা হবে। সেখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে তা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। নবী, ওলী, গাউছ-কুতুব, যত লোক এবং অপরাধী সকলেই থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত এবং অসংখ্য দিল সেদিন থর থর করে কাঁপবে। কোন্ দিলসমূহ প্রকম্পিত হবে? যারা অপরাধী, যারা ইহজগতে বিলাসিতায় মাতাল, অন্যায় অবিচারে অত্যাচারে নিজেও ধ্বংসের পথে চলছে, উপরন্ত অধীনস্থ সমাজকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যারা ক্ষণস্থায়ী জীবনের মরীচিকার পিছনে সময় কাটিয়ে আখেরাতের স্থায়ী জীবন এবং প্রকৃত শান্তি-সামগ্রীকে ভুলে গিয়েছিল। যারা কুফর, শিরক, কুপ্রথা, কুসংস্কারসহ জাহেরী-বাতেনী হৃদয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং ইন্দ্রিয়াদির গোনাহে নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। যারা কাফের, যারা খ্রীষ্টান, যারা কাদিয়ানী, যারা বিধর্মী, যারা ইসলাম বিরোধী, যারা সাহাবা বিদ্বেষী, যারা মুমিন নয়, এই সব লোকের দিল প্রকম্পিত হবে। পক্ষান্তরে যারা নেককার, যারা ওলী, গাউছ, কুতুব, যারা শহীদ, যারা মুজাহিদ, ছিদ্দিক, যারা জান্নাতী তাদের অবস্থা কী হবে? তাদের অবস্থা হবে, তাদের অপরাধের ভয় নেই। তাদের শাস্তির ভয় নেই। তাদের দিল স্থির ও প্রশান্ত থাকবে। তারা আনন্দ উল্লাসে বিভোর থাকবে। ইমাম রাযীর মতামত এখানে এটাই। তিনি বলেন,

ثبت بالدليل ان اهل الايمان لا يخافون بل المراد منه قلوب الكفار .

অর্থাৎ, দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যারা ঈমানদার তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হবে না, এ আয়াতে প্রকম্পিত হবে বলে যে দিলসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা হল কাফেরদের দিল। (কাবীর– ৩২০/৮)

কিন্তু তিনি স্বীয় বক্তব্যে উল্লেখিত সেই দলীল কি তা পেশ করেননি। তদুপরি কেয়ামতের ময়দানে নেককার-বদকার সকলেরই ভীত বিহ্বল হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্তভাবেই সাব্যস্ত রয়েছে। এমনকি বুখারী মুসলিমসহ বহুসংখ্যক হাদীছের কিতাবে নবীদের অস্থির হওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এমনকি উম্মত-গণের আম্বিয়াদের নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করা বিষয়ক বুখারী শরীফের হাদীছটি সুপ্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ বটে। সুতরাং ইমাম রাযীর উপরিউক্ত বক্তব্য বোধগম্য নয়। তবে এটা সত্য যে, তাদের ভয়ের কারণ অপরাধপ্রবণতা নয়, বরং বিপদ যখন আসে, তখন অনেক সময় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে যে অপরাধী এবং যে অপরাধী নয় সকলকেই বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। এরূপ মুহূর্তে যে অপরাধী নয় তাকেও ভয়

www.maktabatulabrar.com

করতে হয়। কোন ঘরে আগুন লাগলে বদকারের সম্পদ জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হবে আর নেককারের মাল রক্ষিত থাকবে তা হয় না; তবে ব্যক্তি বিশেষের কারামত বা মুজিযা হল ভিন্ন কথা। আল্লাহ অবশ্য জালিম নন, তাই বলে বান্দার জন্য সাহসিকতার স্পর্ধার ভাব প্রদর্শন করা, অথবা অপরের ভয়ের সময় আতঙ্কিত না হওয়া শরীয়ত এবং স্বভাব উভয়টিরই বিরোধী। অতএব যে সকল যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে, সৎপরায়ণ লোকেরা সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে না– এর অর্থ হবে তারা তাদের অপরাধের ভয়ে ভীত হবে না। এ আয়াতে 'দিলসমূহের' দ্বারা কাফেরদের দিলসমূহকে এ অর্থে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মেনে নিলে আগত আয়াত–

يَقُوْلُوْنَ اَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ .

অর্থাৎ, তারা বলে আমরা উল্টো পায়ে প্রবর্তিত হবই? (সূরা নাযিআত : ১০)

-এর সাথে অর্থের সংগতি দেখা দেয়। কারণ, এ আয়াতে "তারা" দ্বারা তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দিল কেয়ামতের দিন প্রকম্পিত থাকবে। এ ব্যাখ্যার ফলে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত আয়াতের দ্বারা শুধু কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে ইমাম রাযীর মতটি যুক্তিযুক্ত নয়।

(২) কেয়ামতের দ্বিতীয় যে আংশিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হল তাদের চোখসমূহ নত থাকবে। কেন নত থাকবে? যখন অপরাধীর অপরাধ ধরা পড়ে, যখন গোপন করার অথবা প্রতিবাদ করার কোন পথ থাকে না, তখন অপরাধী লজ্জা ও ভয়ে নতশির হয়, চক্ষু বন্ধ করে রাখে এবং পরিণামের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্রূপ কেয়ামতের দিন কাফেরদের সকল গোপন কার্যকলাপ, সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তির পরিণাম নিশ্চিত হয়ে সামনে আসবে। তখন তাদের যে ভয়ানক অবস্থা হবে তারই কিঞ্চিৎ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু মানবদেহের সর্বপ্রকার কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল এবং সকল উপলব্ধি ও অনুভূতির উৎসস্থল হচ্ছে একমাত্র কলব, আর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মানুষের চক্ষুর ভূমিকা থাকে, তাই বর্ণিত আয়াতে এ দুটিকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হবে না এ কথার এখানে মোটেই অবকাশ নেই। এরূপ অবকাশ নেই তা আলোচ্য আয়াতের জাহের দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি অগণিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। আর এটাই হচ্ছে উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য।

(১৩) বলা বাহুল্য তাতো একটি হুংকার মাত্র।	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
(১৪) অমনি তারা এক উন্মুক্ত সমতল ময়দানে আসতে থাকবে।	فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

শব্দার্থ

فَاِنَّمَا বলা বাহুল্য, هِىَ তাতো, (এখানে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) زَجْرَةٌ হুংকার, বিকট আওয়াজ, (এখানে দ্বিতীয়বার শিঙ্গার ফুৎকারের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।) وَاحِدَةٌ একটি, فَاِذَا অচম্বিৎ, হঠাৎ, هُمْ তারা, অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফের, হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং কাদিয়ানী ও ইয়াহুদী ইত্যাদি। بِالسَّاهِرَةِ হাশরের ময়দান।

www.maktabatulabrar.com

সারমর্ম

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন একটি বাস্তব সত্য। সৃষ্টির জন্য এটা কঠিনতর কাজ হলেও মহান আল্লাহর মহান সৃষ্টি নন, তিনি স্রষ্টা। সুতরাং স্রষ্টার জন্য এটা কঠিন কাজ নয়। এ তো মাত্র একটি হুংকারের দ্বারাই ঘটে যাবে, আর অধিক কোন কিছু করার প্রয়োজন হবে না। যখন দ্বিতীয়বার আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল ফেরেশতা হুংকার দিবেন অর্থাৎ, শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, তখন অবিলম্বে তারা বিরতিহীনভাবে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। কোন অবহেলাও দেখা দিবে না। অপারগতারও প্রশ্ন থাকবে না। সকলকেই বাধ্যতামূলক উপস্থিত হতেই হবে এবং হবেও।

তাফসীর

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (বলাবাহুল্য তা তো একটি হুংকার মাত্র। হঠাৎ তারা হাশরের ময়দানে আসতে থাকবে।)

আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মৌলিকভাবে দুটি বিষয় ব্যক্ত করেছেন।

(১) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা মহান আল্লাহর পক্ষে অতীব সহজ কাজ। হ্যাঁ কোন সৃষ্টির পক্ষে এটা অতি কঠিন কাজই বটে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোকপাত করেছি। এ ধরনের বিষয় কঠিন উপলব্ধি হওয়ার মূলে রয়েছে কাফেরদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। আরবীতে প্রবাদ আছে– المرء يقيس على نفسه - মানুষ অপরকে নিজের অনুপাতেই উপলব্ধি করে। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্রষ্টা। তাঁকে সৃষ্টির শক্তির আদলে উপলব্ধি করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

(২) একটি মাত্র ফুৎকারের সাথে সাথেই তারা হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াবে। অনুপস্থিত থাকতে পারবে না, পলায়ন করা সম্ভব হবে না।

কাফেরসমাজ মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করে তা অস্বীকার করত। এর প্রতিবাদে উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাজটি অতি কঠোর এবং অসম্ভব বটে, কিন্তু তা সৃষ্টির পক্ষে, স্রষ্টার পক্ষে নয়। স্রষ্টার অসীম কুদরতের সামনে এটা অত্যন্ত সহজ বিষয়।

এখানে زجرة (যাজ্‌রাতুন) তথা হুংকার/ধ্বনী দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, زجرة من الغضب অর্থাৎ, আল্লাহর গজবের ধ্বনি। (ইবনে কাছীর ৪৬৭/৪)

প্রকৃতপক্ষে যাজ্‌রাতুনের দ্বারা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (কাবীর– ৩৩২২/৮) তখন যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে, সেই মুহূর্তে আল্লাহর গজবের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। এজন্যই হযরত হাসান বসরী (রহ.) উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছেন। এখানে যাজ্‌রাতুনের দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মন্তব্যটি করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-সহ (ইবনে কাছীর) সকল মুফাস্‌সিরগণই। এই হুংকার অথবা ধ্বনির সাথে সাথেই সময়ের পার্থক্য ছাড়াই (রূহুল মানী ২৮/৩০) সকল শ্রেণির মানুষের শরীর প্রস্তুত হয়ে যাবে। মানুষের ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাটিতে মিশ্রিত রক্ত, গোশত, হাড়গোড় জমায়েত হবে এবং তারই ভিতর আত্মা পরিবেশিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে। কারও পক্ষেই ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ থাকবে না।

তাফসীরে কাশ্‌শাফে 'যাজ্‌রাতুন' দ্বারা প্রথম ফুৎকারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলেই মন্তব্য করা হয়েছে। (কাশশাফ ২১৩/৪) কিন্তু কোন প্রকার প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এ কথা চূড়ান্তভাবে

স্বীকৃত যে, প্রথম ফুৎকারের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে প্রলয় সাধিত হবে। আর এখানে ফুৎকার দ্বারা প্রলয় সংঘটিত হবে বলে কোন ইশারাও নেই; বরং হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাশরের দিকে দৌড়ানোর বিষয়টা ঘটবে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে, প্রথম ফুৎকারের পরে নয়। সুতরাং তাফসীরে কাশ্শাফের ভাষ্য বোধগম্য নয়।

তাফসীরে মুরাদিয়ার বর্ণনা মতে দ্বিতীয় ফুৎকারের ধ্বনি নেককারদের জন্য হবে অতি মধুর, হৃদয়গ্রাহী।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (হঠাৎ তারা হাশরের ময়দানে আসতে থাকবে।)

শুধু পুনর্জীবিত হবে তাই নয়; বরং হাশরের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং সমস্ত কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে, কোন কিছু গোপন করাও সম্ভব হবে না অথবা ধোঁকা দিয়ে নিজের ছাফাই পেশ করাও সম্ভব হবে না। কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ করেও আজাবের সিদ্ধান্ত হলে তা থেকে মুক্তির অবকাশ বের করা যাবে না। উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের ময়দানের বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

بِالسَّاهِرَةِ (বিস্সাহিরা) দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

এ সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবসমূহে কম-বেশি ১৫/১৬ টি মতামত বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্সির ইবনে কাছীর কুরাশী (মৃত্যু ৭৭৪ হি :) বলেন,

وهذه الاقوال كلها غريبة .

অর্থাৎ, এ মতামতসমূহ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মতামত নয়।

অবশ্য ইবনে কাছীরের মতে 'সাহিরা' অর্থ যমীনের উপরিভাগ। এ মতটি বর্ণিত অন্য সব মতের তুলনায় উত্তম। তিনি বলেন,

والصحيح انها الارض وجهها الا على .

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মত হল সাহিরা অর্থ যমীনের উপরিভাগ।

কিন্তু তিনি অন্যান্য কোন মতামতকে গুরুত্ব দেননি এবং কেনইবা যমীনের উপরিভাগ হওয়ার অর্থকে প্রাধান্য ও বিশুদ্ধ বলে মত পোষণ করলেন সে সম্পর্কেও কোন কিছু বলেননি। না বলারও এক কারণ এই হতে পারে যে, এ ধরনের বিষয়ে মতানৈক্য মূল বিষয়ের পক্ষে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটায় না। কারণ, আমল-আকীদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে এতটুকুই যথেষ্ট যে, পুনর্জীবন ধ্রুবসত্য এবং হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া, হিশাব-নিকাশ পেশ করা একটি বাস্তব বিষয়, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এখন হাশরের ময়দান কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, হাশরের দিকে মানুষ কীভাবে যাবে, ইত্যাদি বিষয় কোন মৌলিক বিষয় নয়; তবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সাহিরা সম্পর্কে যতগুলো মতামত তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, সকলেই 'যমীন' হওয়ার অর্থে একমত। অবশ্য কেউ বলেছেন, সাহিরা দ্বারা আখেরাতের যমীনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় ফুৎকারের পর এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এই পৃথিবীর সেখানে কোন

www.maktabatulabrar.com

প্রশ্নই উঠে না। মুফাস্সির ইমাম রাযী এই মতটিকেই অধিক গ্রহণীয় বলে মন্তব্য করেছেন, যারা সাহিরাকে আখেরাতের যমীনের অর্থে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, هى ارض القيامة কেয়ামতের স্থল। কেউ বলেছেন জাহান্নাম। মুফাস্সির কাতাদা এই মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, জাহান্নামের কিনারায় একটি বিরাট ময়দান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

ارض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط يخلقها عز وجل حينئذ .

অর্থাৎ, রূপার যমীন, যেখানে কখনও আল্লাহর নাফরমানী করা হয়নি, আল্লাহ সেটা তখনই সৃষ্টি করবেন।

তাফসীরে মুরাদিয়ার বর্ণনা মতে সেই ময়দান পৃথিবীর যমীনের তুলনায় অধিক হবে। অনেকের মতে "সাহিরা"-এর দ্বারা মক্কা অথবা শাম দেশ কিংবা বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মুফাস্সির উসমান ইবনে আবি-আতিকার মতে "আরীহা" এবং "হাস্সান" পর্বতের উপরি অংশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাফসীরে তানতাবীতে সমতল ভূমির অর্থে নেয়া হয়েছে। আসলে এই দুইয়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বিরোধ নেই। মূলত স্থানগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যও নেই। আর মহাপ্রলয় সংঘটিত হলে সমস্ত ভূমিই সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। প্রশ্ন থেকে যায় শুধু আখেরাতের যমীন না কি পৃথিবীর যমীন? মূলত এ দুয়ের মধ্যেও কোন মতবিরোধ নেই। কারণ, পৃথিবীর এই যমীনই সেদিন আখেরাতের যমীনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .

অর্থাৎ, তোমরা ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও। আর মানুষ পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। (সূরা ইবরাহীম: ৪৮)

অন্য একআয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا

অর্থাৎ, তারা তোমাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, আমার পালনকর্তা পর্বতসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তাকে সমতল মসৃণ ভূমি করে ছাড়বেন। তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (সূরা তাহা: ১০৫–১০৭)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً

অর্থাৎ, আর যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালিত করব এবং তুমি পৃথিবীতে দেখবে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। (সূরা কাহ্ফ : ৪৭)

তবে এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে–

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে সেই যমীন রূপার হবে এবং নতুন সৃষ্ট হবে, যার উপর কোন দিন আল্লাহর কোন নাফরমানী হয়নি।

(২) মুফাস্‌সির ইবনে কাছীর বলেন,

وهى لا تعد من هذه الارض وهى ارض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليهادم .

অর্থাৎ, ঐ যমীন পৃথিবীর যমীন পরিগণিত হয় না। সে তো এমন যমীন যেখানে কোন প্রকার গোনাহের কাজ হয় নি এবং কারও রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

এতে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর যমীন এবং আখেরাতের যমীন– এই দুই মতের বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উপর্যুক্ত প্রশ্ন সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ পাক ঐ যমীনকে ঐদিন সৃষ্টি করবেন। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বের যমীনের পরিবর্তন সাধন করবেন। ঐ পরিবর্তন সাধনের পর সেই যমীনের উপর কোন গোনাহ হবে না। কারণ, তখন এই পৃথিবীও থাকবে না, এই মানুষ-জন দ্বারা গোনাহের প্রশ্নও নেই। সেই পরিবর্তনের পর যমীনের স্থলতা রূপা বিশিষ্ট হতে পারে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হয়ত এদিকেই ইশারা করেছেন। রূপার রং সাদা পরিষ্কার হয়, এজন্য অনেকেই ঐ যমীনকে সাদা ও পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আরও দুইটি বিষয় আলোচনারযোগ্য।

(১) যদি زَجْرَة (যাজরাতুন) দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ .

অর্থাৎ, অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান থাকবে। (সূরা যুমার: ৬৮)

এতে বোঝা যায়, দ্বিতীয় ফুৎকারের পর তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকবে। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, তারা হাশরের ময়দানের দিকে যাবে এবং 'সাহিরা'য় অবস্থান করবে।

(২) রব্বুল আলামীন কর্তৃক এই ময়দানকে সাহিরা বলার রহস্য কী? কারণ আরববাসী সাহিরা ঐ ময়দানকে বলে, যেখানে বন্য পশু-জানোয়ারের আক্রমনের আতঙ্ক বিরাজ করে এবং নিরাপদে নিদ্রা ও রাত্রি যাপন অসম্ভব হয়। প্রসিদ্ধ আভিধানিক ফাররা বলেন,

والعرب تسمى الفلاة ووجه الارض ساهرة يعنى ذات سهر لانه يسهر فيها خوفا منها .

অর্থাৎ, আরববাসীরা চাটিয়াল ময়দানকে সাহিরা বলে। কেননা, সেখানে জানোয়ারের আক্রমণের ভয়ে অনিদ্রায় থাকতে হয়। (আর সাহিরা শব্দের ধাতুগত অর্থে জাগরণের অর্থ রয়েছে।)

আভিধানিকগণ সাহ্‌রুনের অর্থ 'জাগ্রত' করেছেন। তাফসীরে হাক্কানীতে এই অর্থের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে সাহিরা অর্থ জাগ্রত করা হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে "দ্বিতীয় ফুৎকারের পর তারা তখন জেগে উঠবে, কিন্তু প্রশ্ন হল এর পূর্বে কি তারা নিদ্রায় ছিল? হাদীছের মধ্যে বর্ণিত আছে , কবরের সোয়াল জওয়াবের পর জান্নাতীদেরকে ফেরেশতাগণ বলবেন,

نم كنومة العروس .

অর্থাৎ, বিবাহের প্রথম রাতের আরামের নিদ্রা উপভোগ কর।

এখানে ওই নিদ্রার অর্থ হচ্ছে আযাবমুক্ত অবস্থায় প্রশান্তির জীবনযাপন করা। সুতরাং বরযখী

www.maktabatulabrar.com

যিন্দেগীতে ঘুম-নিদ্রার তো প্রশ্নই উঠে না। এর উত্তরে বলা যায়, এখানে নিদ্রাকে উপমাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা স্বপ্নের সাথে বহুদিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন: একজন জীবিত মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তার শরীর, তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ পরিপূর্ণ ছহীহ-সালেম থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রয় থাকে। সে না চলাফেরা করতে পারে, না কথাবার্তা বলতে পারে, না কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়, না পানাহার করতে সমর্থ হয়। সে কোন কিছুর বিন্দুমাত্রও সংবাদ রাখে না। মৃত্যুর কারণেও মানুষের একই অবস্থা হয়। সেই শরীরই এখনও বিদ্যমান, কিন্তু না সন্তান-সন্ততির খবর আছে, না আত্মীয় স্বজনের। যে অর্থ-সম্পদের লোভে রাতদিন মেহনত-পরিশ্রম করে আরামকে হারাম করে রাখত, তার প্রতিও তার কোন আকর্ষণ থাকে না। সারকথা, মৃত শরীরে ইচ্ছা অনিচ্ছা সব কিছুই নিষ্ক্রয় থাকে। স্বপ্নে কত বাগ-বাগিচায় ভ্রমণ করে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, কখনও আক্রমণ হয়, কখনও সাপের দংশনে আক্রান্ত হয়, দুঃখ কষ্ট পায়, ক্রন্দন করে, অথচ জাগ্রত ব্যক্তিদের কেউ শুনতে পায় না, বুঝতে পারে না। জাগ্রত হওয়ার পর সেই শান্তি অথবা কষ্টের কোন কিছুই শরীরে বিদ্যমান থাকে না।

স্বপ্নে কেউ ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করছে, কেউ শান্তি ও আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে, কেউ হুর-পরীদের সাথে মধুর মিলনে রত, কেউ সুসজ্জিত প্রশস্ত জান্নাতের বাগানের সর্বপ্রকার ভোগ-সামগ্রী উপভোগ করছে। আবার কেউ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন, কেউ তিমিরাচ্ছন্ন সংকীর্ণ কবরে চাপের বেদনায় চিৎকার করে উঠছে, কেউ জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় দগ্ধ হচ্ছে। স্বপ্ন হতে জাগ্রত হয়ে সে মনে করে ইতিপূর্বে স্বপ্নে অন্য এক জগতে বিরাজ করছিল। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তি এককঠোর হুংকারে জাগ্রত হয়ে নতুন আর এক জগতকে দেখতে পায় এবং বলে উঠে,

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا .

অর্থাৎ, কে আমাদেরকে ঘুম হতে জাগ্রত করে দিয়েছে? (সূরা ইয়াছীন: ৫২)

এমনিভাবে গভীর চিন্তা করলে দেখা যায় মৃত্যুর সাথে নিদ্রার একবিরাট সাদৃশ্য রয়েছে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾	(১৫) তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত এসেছে?
اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾	(১৬) যখন তাকে তার প্রতিপালক পবিত্র তুওয়া ময়দানে ডেকে বলেছিলেন
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾	(১৭) যাও তুমি ফিরআউনের নিকটে, সে তো সীমালংঘন করেছে।
فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾	(১৮) এবং তাকে বল, শোধরাবার আগ্রহ তোমার আছে কি?
وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾	(১৯) এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে করে তুমি তাঁকে ভয় পাও।

শব্দার্থ

هَلْ এই শব্দটি প্রশ্নবোধক, প্রশ্নের মাধ্যমে কখনো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, আবার কখনো স্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে স্বীকৃতি অথবা স্বীকৃতি জ্ঞাপনের দ্বারা বিষয়-বস্তুর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, اَتٰكَ তোমার নিকট এসেছে, حَدِيْثُ কথা, খবর বৃত্তান্ত, اِذْ যখন, نَادٰهُ তাঁকে ডেকে, رَبُّهٗ তাঁর প্রতিপালক, بِالْوَادِ ময়দান, উপত্যকা, الْمُقَدَّسِ পবিত্র, طُوًى স্থানের নাম, اِذْهَبْ যাও তুমি, اِلٰى নিকটে, কাছে, اِنَّهٗ নিশ্চয়ই সে, طَغٰى সীমালঙ্ঘন করেছে, تَزَكّٰى মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, اَهْدِيَكَ পবিত্র হও, শোধরে যাও। আমি তোমাকে পথ দেখাব?, فَتَخْشٰى যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।

সারমর্ম

হে বিশ্বনবী, কাফেরদের তিরস্কার এবং নির্যাতনে তুমি দুঃখিত হয়ো না। তিরস্কার শুধু তোমার সাথেই নয়, তোমার পূর্বে বিগত নবীদের সাথেও এ ধরনের আচরণ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই ছবর এবং ধৈর্যের সাথে স্বীয় দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। তাদের ইতিহাস এবং ইতিবৃত্তান্ত শোন এবং ধৈর্যধারণ কর, প্রশান্ত হও। হযরত মূসাও আমার প্রেরিত রসূল ছিলেন। আমি তাকে তুওয়া নামক ময়দানে ডেকে ফিরআউনের মত স্বেচ্ছাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যে, বড়ত্ব-অহমিকায় আমার বিদ্রোহিতায় প্রকাশ্যে নেমে এসেছিল, তাকে হেদায়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। মূসা আমার নির্দেশে কোন কিছুর পরওয়া না করে ফিরআউনের নিকট গিয়ে হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে সত্যের দাওয়াত পেশ করেছিল। মূসা স্পষ্ট ভাষায় ফিরআউনকে বলেছিল, হে ফিরআউন, আমি তোমাকে হুশিয়ার করছি এবং তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করে তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য করার জন্য এসেছি। তুমি কি সঠিক পথে ফিরে আসতে আগ্রহ রাখ? অবশ্যই রাখা উচিৎ এবং হৃদয়ে আল্লাহর সঠিক ভয় সৃষ্টি কর, তবেই তুমি নাজাত পাবে, নাজাত পাবে এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও।

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতের অর্থ ও মর্মের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর খবর সম্বলিত আলোচ্য আয়াতের তথ্য ও মর্মের সাথে নিম্নোক্তভাবে যোগসূত্র কায়েম হয়।

(ক) মক্কায় বেদুঈনদেরকে দ্বীনের দাওয়াত এবং ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার পরেও তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতে সাড়া দেয়নি বরং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে নির্যাতন করে যাচ্ছিল। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসিক কষ্ট এবং অস্থিরতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ পাক একজন বিশিষ্ট নবী হযরত মূসা (আ.)-এর খবরাখবরের প্রতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। (রূহুল মাআনী ২৮/৩০ কাবীর ৩২২/৮)

(খ) পূর্বের আয়াতসমূহে অস্বীকারকারীদের যুক্তি-তর্কের অসারতা সাব্যস্ত করে মৃত্যুর পর কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। যারা অস্বীকারকারী তাদের উপর আল্লাহর আযাব-গজব এই

www.maktabatulabrar.com

পৃথিবীতেও নাযেল হয়ে যেতে পারে, আর আল্লাহর আযাব-গযব নাযেল হলে রুখে দাঁড়াবার মত কোন শক্তিও কারও থাকে না। এর একটি বাস্তব প্রমাণ হল হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা এবং ফিরআউনসহ তার সৈন্য-সামন্তদের মর্মান্তিক ইতিহাস। সুতরাং এখান থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিৎ। (ইবনে কাসীর ৪৬৮/৪)

(গ) পূর্বের আয়াতসমূহে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের বাস্তবমুখী যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনর্জীবন লাভের সম্ভাব্যতার বিষয়ে কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির সাহায্যে যা কিছু ঘটেছে, তাতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বহু কিছুই উপলব্ধি করা যায়। লাঠির মধ্যে আত্মা পরিবেশিত হয়ে সর্পে পরিণত হওয়াও এ বিষয়ে একটি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। একটি গাভীর শরীর নিহত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করা মাত্র লোকটি যিন্দা হয়ে যাওয়া এবং হত্যাকারীর নাম পরিচয় বলে দেয়াও পুনর্জীবন লাভের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ.)-এর যে সকল সাথি মৃত্যু বরণ করেছিল অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর দুআয় আল্লাহ পাক তাদেরকে পুনরায় জীবন দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে এই যোগসূত্রসমূহের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। এর সাথে সাথে মুমিনদের শুভ পরিণাম এবং কাফেরদের মুকাবেলায় মুমিনদের বিজয়ের সুসংবাদও বিদ্যমান রয়েছে। (তানতাবী ৩৩/২৫) কিন্তু এটাকে যোগসূত্র হিসেবে পেশ করার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি এখানে নেই। হ্যাঁ, হেকমত এবং গভীর তথ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

তাফসীর

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى (মূসার খবর কি তোমার নিকট আসেনি?)

হযরত মূসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের অনেক ঘটনাই পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

(১) একটি হল, পবিত্র কুরআন ঘটনাসমূহের আবৃতি করে থাকে শিক্ষাস্বরূপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং বিষয়বস্তুর উদাহরণ হিসেবে। নিরেট ঘটনা বর্ণনা করা কখনও মাকসূদ বা উদ্দেশ্য হয় না। এই নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে ইশারা করেই প্রায় ঘটনা বর্ণনার পর মুহূর্তেই এই ইরশাদ বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। عبرة للاولى الابصار 'যারা গভীর দৃষ্টির অধিকারী তাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।' عبرة لمن يخشي 'যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশ' ইত্যাদি। এজন্যই ঘটনার ঐ অংশটুকুই আবৃত হয় যেটুকু প্রয়োজন, পরিপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা হয় না।

(২) একই ঘটনার অংশ পবিত্র কুরআনে একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে বলে অনেকের মতে এটা تكرار (তাকরার) তথা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট। কারণ, একই কথা পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হওয়া আরবী সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের বিচারে আপত্তিকর। এই প্রশ্ন অনেক মুলহিদগণও করেছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে কিন্তু যারা তত্ত্বজ্ঞানী, কুরআনের মূল বর্ণনা পদ্ধতি ও বর্ণনার ধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাদের কাছে এটা আপত্তিকর বোধ হয় না। বরং এই পুনঃপুনঃ উদ্ধৃতির কারণে তাদের কাছে অনেক গভীর তত্ত্ব উদঘাটিত হয় এবং তাদের কাছে অনেক সূক্ষ্ম তাৎপর্য প্রকাশ পায়। পুনঃপুনঃ উক্তি তাদের নিকট অহেতুক বা আপত্তিকর নয়।

(৩) একই ঘটনার অংশ বিশেষ বিভিন্নস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু শব্দ এবং বাক্যের পার্থক্য ঘটেছে। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থ এবং উদ্দেশ্য নিখুঁত এবং বহাল রেখে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তনে কোন কিছু আসে যায় না। মুফাস্‌সিরীন এবং তাফসীরশাস্ত্রে যারা পারদর্শী তাদের বক্তব্য হল–

العبرة لعموم المعنى لا لخصوص اللفظ .

অর্থাৎ, অর্থের ব্যাপকতাই লক্ষ্যণীয়, বিশেষ শব্দ লক্ষ্যণীয় নয়।

এ কারণেই মুহাদ্দিছীনে কেরাম 'রেওয়ায়েত বিল মা'না' (অর্থকে ঠিক রেখে শব্দ পাল্টে দিয়ে বর্ণনা করা) কে জায়েয বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে যে শব্দের কোন মূল্য নেই তা নয়। শব্দ থেকেই অর্থ সৃষ্টি হয়। এ কারণে হাদীছ এবং পবিত্র কুরআনের শব্দের বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়ই বটে। হ্যাঁ, যদি বর্ণনার সময় বর্ণনাভঙ্গির তাগিদে, বোঝানোর উদ্দেশ্যে অথবা মাসালা-মাসায়েলের অনুসন্ধানের সময়ে ইস্তিম্বাতের (মাসালা-মাসায়েল উদঘাটন করা) বিধান অনুসারে অর্থের ব্যাপকতার কারণে শব্দের বিশেষ অর্থে অথবা সীমিত অর্থে ব্যাপকতা সাধিত হয়, তবে তা সকলের নিকটেই গ্রহণীয় ও যুক্তিযুক্ত।

হযরত মূসা (আ.)-এর খবর

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমার নিকট মূসার সংবাদ এসেছে কি? এখানে যদিও কেবলমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূলত এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হযরত হারুন (আ.) এবং উভয়ের অনুসারী বনী ইসরাঈলগণও, এমনিভাবে ফিরআউন, হামান এবং তাদের প্রজা ও অনুসারী সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) কে ছিলেন

হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তৃত জীবনী বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। তাঁর মোটামুটি পরিচয় এই যে, তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল ইমরান এবং মাতার নাম ছিল ইউখান্দ। হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আপন ভাই ছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বেই মিসরের বাদশাহ ফিরআউন বুঝতে পারল যে, বনী ইসরাঈলদের মাধ্যমে তার রাজ্য-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। তাই বাদশাহ বনী ইসরাঈলদের প্রতি কড়া প্রহরী নিযুক্ত করে এবং বনী ইসরাঈলে কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহর মহিমা কে বোঝে? হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শিশু মূসাকে সিন্দুকে আবদ্ধ করে পানিতে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং কল্পনাতীতভাবে হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। যখন হযরত মূসা (আ.) বয়স্ক হলেন, তখন এক বনী ইসরাঈলী এবং এক কিবতির ঝগড়াকে নিরসন করতে গিয়ে তিনি বিপদের সম্মুখীন হলেন। ফলে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করে দেয়ার। হযরত মূসা (আ.) এক ব্যক্তি মারফত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে মিসর ত্যাগ করেন এবং মাদায়েনে পৌছেন। সেখানে আল্লাহর রহমতে এক অভিনব পন্থায় তৎকালীন নবী হযরত শুআইব (আ.)-এর কন্যাকে বিবাহ করে মিসরের দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে অতিমাত্রায় শীতগ্রস্ত হয়ে আগুনের তালাশে বের হন। তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন

www.maktabatulabrar.com

ততই আগুন পিছনের দিকে যাচ্ছিল। তাই তিনি বিমুখ হয়ে ফিরতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাক কর্তৃক ডাক শোনলেন। হযরত মূসা (আ.) উপস্থিত হয়ে আল্লাহর সাথে কথাবার্তায় নিমগ্ন হলেন। আল্লাহর পরিচয়ে সরাসরি পরিচিত হলেন। কয়েকটি মুজিযা প্রদর্শিত হলো এবং সেখান থেকেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে ফিরআউনকে হেদায়াতের দাওয়াত পেশ করতে এবং বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের নির্যাতন ও গোলামী থেকে মুক্ত করতে আদিষ্ট হলেন। হযরত মূসা (আ.) নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফিরআউন এবং বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে যে ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর আলোকপাত রয়েছে। প্রয়োজন মোতাবেক আমরাও তার বর্ণনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (যখন তাকে তার প্রতিপালক পবিত্র তুওয়া ময়দানে ডেকে বলেছিলেন।)

হযরত মূসা (আ.) মাদায়েনে হযরত শুআয়েব (আ.)-এর বকরী দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি 'ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে' তথা পবিত্র ময়দানে উপস্থিত হলেন কী করে? ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাস কোথায় অবস্থিত? এই ওয়াদি (ময়দান)কে মুকাদ্দাস তথা পবিত্র বলা হয় কেন? এই কয়টি বিষয় অত্র আয়াতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

ওয়াদিয়ে তুয়া

'ওয়াদী' বলা হয় ময়দানকে। 'তুয়া' সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। যথা:–

(১) ইবরানী ভাষায় ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে সেই তুয়া বা ব্যক্তি দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ হে ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে (কুরতুবী, ১৭৫/১১); কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বরং এর পূর্বে বর্ণিত 'ওয়াদী' অর্থাৎ, ময়দান শব্দটি এই ব্যাখ্যার পরিপন্থি মনে হয়।

(২) তুয়া শব্দটি এখানে রাতের সামান্য অংশ অতিক্রম হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, হযরত মূসা (আ.) সেখানে রাতের সামান্য অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর পৌছেছিলেন (ফুতুহাতে ইলাহিয়াহ, ৪৮০/৪)। কিন্তু এ অর্থও প্রমাণ ভিত্তিক নয় এবং বোধগম্যও নয়।

(৩) হযরত হাসানের মতে 'তুয়া' বরকতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) আল্লামা উজাইলীর (মৃত্যু ১২০৪ হি :) মতে। هو واد بالطور بين ايلة ومصر

অর্থাৎ, তুরের একটি উপত্যকা, যা আইলা এবং মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। (কুরতুবী ১৫৭/১১)

(৫) প্রসিদ্ধ আভিধানিক জাওহারীর মতে اسم موضع بالشام "অর্থাৎ, শাম দেশে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।"(হক্কানী– ২৫)

(৬) শাম এবং লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম বলেও অনেকেই মত পোষণ করেছেন। (কাছাছুল কুরআন ৩৬০/১)

(৭) সীনাই পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিত একটি স্থান বলেও মন্তব্য রয়েছে। ইবনে কাছীর এবং

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত এটাই।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে 'তুয়া' একটি স্থানের নাম এবং এই নামের স্থানের যথাস্থলে অবস্থিত থাকার কথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন। সুতরাং 'তুয়া' একটি স্থান হিসেবে মেনে নেয়ায় কোন অসংগতি নেই। আর তুর এবং সীনা একই পাহাড়ের দুই নাম। আইলা এবং কুলযুম একটি অপরটির নিকটবর্তী স্থান। স্থান দুটি আকাবা উপসাগরের কূলে অবস্থিত। ফলে এই পার্থক্যের কারণে কোন কিছু আসে যায় না এবং আয়াতের মূল বিষয়েও তাতে ব্যতিক্রম কোন কিছু ঘটে না।

নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর উপস্থিতির স্থান সম্পর্কে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিরোধ দেখা যায় তাও আর থাকে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ نَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ

অর্থাৎ, তাকে তূর পর্বতের ডানদিক থেকে ডেকেছিলাম। (সূরা মারইয়াম: ৫২)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, মূসা যখন আগুনের নিকট পৌঁছল, তখন ময়দানের ডানপার্শ্বে মুবারক ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (সূরা কাসাস: ৩০)

প্রথম আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 'তুরে আইমান' তথা তূর পর্বতের ডানদিকে থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে ডাকা হয়েছিল। এ ছিল হযরত মূসা (আ.) এবং আল্লাহ পাকের পরস্পরের কথোপকথনের স্থান। আর দ্বিতীয় আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, "ওয়াদিয়ে আইমানের" তথা মুবারক ময়দানের একপার্শ্বে অবস্থিত কোন বৃক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে ডাকা হয়েছিল এবং সেখানেই কথাবার্তার মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু এতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, 'তুরে আইমান'-কেই 'ওয়াদিয়ে আইমান' বলা হয়েছে।

'তুয়া' মুকাদ্দাস কেন?

'তুয়া' কে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সির কুরতুবী বলেন,

سميت بذلك لان الله تعالى اخرج منها الكافرين وعمرها بالمومنين.

অর্থাৎ, এই স্থানকে পবিত্র নগরী আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ পাক এই নগরী হতে কাফেরদেরকে বিতাড়িত করেছেন এবং মুমিনদের দ্বারা সেটাকে আবাদ করেছেন।

কোন স্থান থেকে কাফের এবং বেদ্বীনদের বহিষ্কার ও মুমিনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যই সে স্থানটি "পবিত্র নগরী" হিসেবে ঘোষিত হওয়ার জন্য কারণ হতে পারে। কিন্তু এই কারণ কোন একস্থানের জন্য বোধগম্য নয়। যেখান থেকেই কাফের-বেদ্বীনগণ বহির্ভূত হবে এবং মুমিনগণ

www.maktabatulabrar.com

দ্বারা সেটি আবাদ হবে, সেখানেই এই কারণ বিদ্যমান হেতু তারও এরূপ মর্যাদায় আখ্যায়িত হওয়ার কথা। কিন্তু সেরূপ হতে দেখা যায় না। তাই 'তুয়া' স্থানের মর্যাদার জন্য এই কারণ যথেষ্ট মনে হয় না, বরং নিম্নোক্ত তিনটি কারণে 'তুয়া' কে পবিত্র স্থান বলা হয়েছে বলে বিবেচিত হলে অধিক গ্রহণীয় মনে হয়।

(১) হযরত মূসা (আ.) এখানে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন।

(২) হযরত মূসা (আ.) এখানে আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করেছেন।

(৩) বনী ইসরাঈলদেরকে মিসর থেকে এবং ফিরআউনের নির্যাতন থেকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন।

হযরত হাসান এবং ইমাম বাকীসহ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের বক্তব্যের দ্বারাও এই কারণটির যৌক্তিকতা সাব্যস্ত হয়।

হযরত মূসা (আ.) তুয়ায় কেন?

হযরত মূসা (আ.) তুয়ায় এসেছিলেন কেন? পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى.

অর্থাৎ, আমি অগ্নি দেখেছি। হয়ত আমি সেখান থেকে তোমাদের নিকট জ্বলন্ত আগুনের কিছু হল্‌কা আনতে সক্ষম হবে। অথবা সেখানে আগুনের নিকটে পৌঁছে পথের সন্ধান পাবো। (সূরা ত্বহা : ১০)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের তালাশে মাকামে তুয়ায় গমন করেছিলেন। আগুনের প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল? এদিকে আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে, لعلكم تصطلون "যাতে তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পার।"

তাপ গ্রহণের প্রয়োজন হলো কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে বলা হয়েছে, الزمن زمان السرد মৌসুম শীতের ছিল। পাথরের সাহায্যে দিয়াশলাইয়ের কাজ নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ বরফ বর্ষিত হচ্ছিল।

হযরত মূসা (আ.) "তুয়া" এলাকায় কীভাবে পৌঁছলেন? মুফাস্‌সিরীনদের মতে হযরত মূসা (আ.) রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিভিন্ন হাদীছেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত রহস্য এটাই যে, এইভাবে তিনি এখানে পৌঁছবেন। এটাই ছিল আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত, যাতে করে সময় মুতাবিক যথাস্থালে পৌঁছেন এবং নবুওত প্রাপ্ত হন।

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি

মাকামে তুয়ায় হযরত মূসা (আ.) নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে সর্বপ্রথম ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়কে হকের দাওয়াত প্রদানে আদিষ্ট হলেন। ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল বনী ইসরাঈল। অথচ হযরত মূসা (আ.) কেবল বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এই- মতটিই সাধারণত প্রসিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে- الى قومه অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের প্রতি, অন্যত্র বলা হয়েছে- الى بنى اسرائيل অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

পবিত্র হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة .

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী কেবল তাঁর জাতির প্রতি প্রেরিত হতেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র জাতির প্রতি।

হযরত মূসা (আ.) নবুয়ত প্রাপ্তির পরপরই মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন কি না? আলোচ্য ১৭নং আয়াতে এতদসংক্রান্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচ্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের উদ্দেশ্য

এ যুগের একজন মুফাস্‌সিরের মতে "হযরত মূসা (আ.) কে নবয়তের দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য দুটি। যথা:-

(১) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়কে হকের দাওয়াত পেশ করা।

(২) যদি হকের দাওয়াত গ্রহণ করায় ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায় বাধা না হয়, তাহলে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসা। আর এজন্যই ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায় হেদায়াত কবূল করবে না– একথা জেনেশুনেও হযরত মূসা (আ.) দাওয়াত দিলেন। ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায় অবাধ্য হলে আল্লাহ পাক তাকে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। অথচ হযরত ইউনুস (আ.) এমতাবস্থায় স্বীয় কওমের এলাকা বর্জনের কারণে বিপদগ্রস্ত হলেন। আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল এবং হযরত ইউনুস (আ.) দায়িত্ব পালনে ত্রুটির গোনাহে দুষী সাব্যস্ত হলেন। এ হল এ যুগের একজন মুফাস্‌সির সাহেবের বক্তব্য।

যদি হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় দায়িত্ব কেবল বনী ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করা হত, তাহলে বনী ইসরাঈলের মুক্তির পরও তিনি নবুয়তী দায়িত্বে বহাল রইলেন কী করে? আর বহাল রইলেন বলেই হযরত মূসা (আ.)-এর উপর 'তাওরাত' অবতীর্ণ হল এবং তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালু রাখলেন। এতে বোঝা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের মূল উদ্দেশ্য বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করা নয়। বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ। আর বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার নির্দেশ এবং প্রচেষ্টা হচ্ছে একধরনের পলিসি মাত্র।

নবুয়তের মাকসাদ

বস্তুত নবুয়ত আল্লাহ পাকের একটি খাছ নেয়ামত। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ নেয়ামত প্রদত্ত হয়। মেহনত মুজাহাদা করে তা অর্জন করা যায় না। (হুজ্জাতুল্লাহ)

নবীগণ (আ.) এই নেয়ামত মুজাহাদা এবং মেহনত করে লাভ করেননি, বরং আল্লাহ পাকই তাঁদেরকে স্বেচ্ছায় প্রদান করেছেন এবং সর্বশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এই নেয়ামত প্রদত্ত হয়ে চিরদিনের জন্য নবুয়তের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ .

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কারও পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। (সূরা আহযাব: ৪০)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

انا خاتم النبيين لا نبى بعدى .

অর্থাৎ, আমি শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।

বস্তুত নবুয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের নিকট হকের দাওয়াত পেশ করা, রেছালাত পৌঁছে দেয়া। এ মর্মে কুরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ .

অর্থাৎ, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে হকের তাবলীগ করা। (সূরা ইয়াছীন: ১৭)

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّه طَغٰى (যাও তুমি ফিরআউনের নিকট; সে তো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।)

হযরত মূসা (আ.)ও এই একই উদ্দেশ্যে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি মূলত এই দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্য কোন কিছু নয়। এই দায়িত্ব পালনের তাগিদে তিনি বারংবার ফিরআউন ও তার কওমকে এবং বনী ইসরাঈলকে হকের দাওয়াত দিয়েছেন এবং দ্বীনে হকের তাবলীগ করেছেন। অবশ্য তিনি ফিরআউন, তার সহচরবর্গ ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। আর হয়েছেন বলেই আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে ফিরআউনের নির্যাতন এবং বাধা থেকে মুক্ত হয়ে নবুয়তী দায়িত্ব পালনে তথা হেদায়াত ও তাবলীগ কর্মে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বনী ইসরাঈলসহ মিসর হতে হিজরত করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই মুক্তি লাভ ও হিজরত তার নবুয়তের কোন ভিন্ন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মোটেই নয়, বরং এটা ছিল দাওয়াতে হকের সঠিক পথ অবারিত করা ও দ্বীনে হকের বাস্তবায়নে একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ মাত্র।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের নির্যাতন মুক্ত হয়ে দাওয়াতের কাজকে অধিক জোরদার করণের লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের নির্দেশে মদীনা মুনাওওয়ারায় হিজরত করেছিলেন। এই হিজরত এবং মুক্তিই কি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়? মোটেই না, সুতরাং হযরত মূসা (আ.)-এর বেলায়ও বিষয়টি এভাবেই বিবেচিত হবে, অন্যভাবে নয়।

ফিরআউনের পরিচয়

ফিরআউন কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়। মিসরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফিরআউন। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে মিসরের বাদশাহ কে ছিল, তার নাম কী ছিল এবং তা কোন যুগে ছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল ওলীদ ইবনে মুছআব, আবার কারও মতে মুছআব ইবনে রাইয়ান তার নাম ছিল। আরব বিশেষজ্ঞগণের মতে রাইয়ান অথবা রিয়ান নাম হওয়াই অধিক গ্রহণযোগ্য (কাছাছুল কুরআন ৩২৯/১); তবে তার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু মুররাহ– এতে কোন দ্বিমত নেই (ইবনে কাছীর); আরব ঐতিহাসিকগণের মতে আরব নসলের আমালিকা এলাকার নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিল এই ফিরআউন। কিন্তু পরবর্তী যুগের মিসরী

www.maktabatulabrar.com

ঐতিহাসিকগণ এতে ঐক্যমত পোষণ করেননি। তাদের মতে রেমেছিছ দ্বিতীয়-এর পুত্র মানফাতাহ ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফিরআউন। ঐতিহাসিক আহ্মান ইউসাফ আফেন্দী, ঐতিহাসিক নাজ্জার (কাছাছুল কুরআন) এবং মুহাম্মদ আহ্মাদ আদবীর মতও এই মনে হয়। (দাওয়াতুর রসূল)

শ্বেতরোগে আক্রান্ত খাঁটো ধরনের অধিক বয়সপ্রাপ্ত এই লোকটি মিসরের ক্ষমতাশীন বাদশাহর মৃত্যুর পর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয় বলে আল্লামা সূয়ূতী তার রচিত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কিতাবে উল্লেখ করেছেন (হুছনুল মুহাজারাহ্ ১৮)। হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইসরাঈলের সাথে তাঁর জুলুম নির্যাতনের বর্ণনা এবং খোদাদ্রোহীতার জঘন্যতম অপরাধপ্রবণতার বৃত্তান্ত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের প্রতি

উপর্যুক্ত কারণে একথা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি স্বীয় কওমকেই দাওয়াতে হকের জন্য তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি কেবল তাদেরকেই হকের বাণী শুনাতে থাকেন। তিনি অন্য কোন কওমের হেদায়াতের মেহনতে সক্রিয় হননি। যদি তিনি অন্য কোন কওম অথবা ফিরআউন ও তার কওমকে দাওয়াতে হক পৌছানোর জন্যই মূলত প্রেরিত হতেন, তবে বাধাপ্রাপ্ত ও নির্যাতিত হয়ে হিজরত করা হত ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দায়িত্ব পালনে বিরত থাকা মোটেই ন্যায়সঙ্গত হত না– যেমনঃ হযরত ইউনুস (আ.)-এর এলাকা বর্জন করাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেননি, তেমনি হযরত মূসা (আ.)-এর বিষয়টিও অগ্রহণীয় হত, কিন্তু এখানে তা হয়নি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, পবিত্র কুরআনে পাকে অকাট্য এবং সুস্পষ্ট ইরশাদ বিদ্যমান রয়েছে–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّه طَغٰى .

অর্থাৎ, যাও ফিরআউনের নিকট, সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করেছে। (সূরা নাযিআত : ১৭)

শুধু তাই নয়, বরং তাকে হেদায়াত এবং আত্মশুদ্ধির দাওয়াত প্রদান করো, যাতে তার ভিতর আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়– এ ধরনের খোদায়ী নির্দেশ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, হযরত মূসা (আ.) শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হননি, বরং ফিরআউনের প্রতি হেদায়াতের দাওয়াত প্রদান করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ফিরআউন অবশ্যই বনী ইসরাঈলের কোন লোক ছিল না। যারা কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রেরণকে মেনে নিতে আপত্তি বোধ করে, হয়তো তাদের সম্মুখে এটাই হচ্ছে আপত্তির বিশেষ কারণ। কিন্তু আপত্তির এই কারণ নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়–

(ক) হযরত মূসা (আ.) অন্য কোন কওমকে দাওয়াতের কাজ করেননি কেন?

(খ) ফিরআউন এবং তার কওমকে অবশ্যই দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল একটি বিশেষ হুকুম। আর এই হুকুমের পিছনে রয়েছে বনী ইসরাঈলের মর্মান্তিক ইতিহাস। তাওহীদ এবং একত্ববাদ সম্পর্কে ফিরআউনের কোন কিছুই অজানা ছিল না, কিন্তু সে ইতিপূর্বে এসব কিছুকে পশ্চাতে ফেলে নিজেকেই খোদা বলে দাবি করে বসেছিল এবং সে, انا ربكم الاعلى (অর্থাৎ, 'আমিই তোমাদের বৃহত্তম রব।') ঘোষণা করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। শুধু তাই নয়, যারা তাকে রব বলে স্বীকার করে নিতে

www.maktabatulabrar.com

পারেনি, তাদের প্রতি তার জুলুম নির্যাতন ছিল অবর্ণনীয়, অসহনীয়। এই মজলুম জনগোষ্ঠীর আর্তনাদে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। মুক্তির সন্ধানে এই মজলুম জনতার আহাজারী যথাযথ অথরিটির নিকট পৌছেছে এবং এক সময়ে সেই অথরিটি আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের হেদায়াতের জন্য এবং বনী ইসরাঈলদেরকে তাবলীগ ও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এখানে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরণ করাই ছিল মূলতভাবে এবং ফিরআউনের দিকে প্রেরণ করা ছিল প্রাসঙ্গিকভাবে। এই পার্থক্যটুকু উপরোক্ত উদাহরণে অধিকভাবে সুস্পষ্ট হয়।

নবীগণের গোত্রবিশেষে প্রেরিত হওয়া প্রসঙ্গ

সকল নবীই তাদের নিজ নিজ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কেবল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .

অর্থাৎ, হে নবী, তুমি বলে দাও, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতিই রসূল। (সূরা আ'রাফ: ১৫৮)

এ মর্মে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة .

অর্থাৎ, নবীগণ কেবল তাঁদের গোত্রের প্রতিই প্রেরিত হতেন, আর আমি সকল বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

এ বিষয়ে অবশ্য বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর এবং মতামত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ এবং জুমহুরের চূড়ান্ত মত হলো, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে এবং হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহেও এই একই মত বিধৃত হয়েছে। হাফেজ ইব্নে হাজার আসকালানী, আল্লামা আইনী, ইবনে দাকীকুল ঈদ, শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমাদ উছমানী, শাইখুল ইসলাম ফখ্রুদ্দীন (র.)-সহ সকল নির্ভরযোগ্য হাদীছ বিশারদ এবং মুফাস্সিরগণও এই মত পোষণ করেছেন।

সুতরাং এর পরিপন্থি মতটি একদিকে যেমন উপরোক্ত হাদীছের পরিপন্থি, তেমনি জুমহুরের মতেরও বিরোধী। ভিন্নমত অবলম্বনকারী এই যুগের সেই মুফাস্সিরের জন্য উপরোক্ত হাদীছের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করার পূর্বেই বর্ণিত হাদীছের বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করা উচিৎ ছিল, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, তিনি তা করেননি।

انه طغى (সে তো সীমা অতিক্রম করেছে।)

ফিরআউনের সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গ

انه طغى ফিরআউন সীমা অতিক্রম করেছে। ফিরআউন সে যুগের আসমানী বিধান তো উপেক্ষা করেছিলই এবং হর কিসিমের অন্যায় জুলুমে লিপ্ত ছিল, তদুপরি আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে বসেছিল। শুধু তাই নয়, নিজকে বৃহত্তম রব-এর আসনে সমাসীন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। সে

এ ঘোষণা নির্দ্বিধায় করে থাকত انا ربكم الاعلى 'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব'। যারা তার এ ঘোষণাকে মেনে নেয়নি, নিতে পারেনি, তাদের প্রতি তার জল্লাদী তলোয়ার সর্বদাই উত্তোলিত থাকত। তার প্রজাদের মধ্যে যারা তাকে 'রব' হিসেবে স্বীকার করতে পারেনি, তাদের অন্যতম ছিল বনী ইসরাঈল। ফিরআউন বনী ইসরাঈলীদের প্রতি যে অমানুষিক নির্যাতন চালাত, তার কিঞ্চিত নমুনা পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থাৎ, অবশ্যই ফিরআউন যমীনে অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং দেশের মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের এক দলকে দুর্বল করে রেখেছিল– সে তাদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত এবং নারীগণকে জীবিত রাখত। অবশ্যই সে সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। (সূরা কাসাস: ৪)

নারীদেরকে সে জীবিত রেখে নিরাপদে থাকতে দিত না, সর্বপ্রকারের অসভ্য আচরণ নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে রাখত। বস্তুত কোন দেশের অধিনায়ক যদি এ ধরনের অসভ্য প্রকৃতির হয়, তাহলে সে দেশের অসৎ বখাটেদের কী চরিত্র হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এদের সম্মিলিত পাপ প্রবণতায় সে যুগের আকাশ-পাতাল ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাক তাঁর বিধান অনুসারে তাকে এবং তার সহচরদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করলেন। মহান আল্লাহ পাক ফিরআউনকে, তার সহচরদেরকে এবং তাদের রাজ্যকে ধ্বংস সাধন করে শিক্ষণীয় নিদর্শন স্থাপন করেন এবং মজলুমদেরকে সহ্য-ধৈর্যের উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে সম্মানের ও নিরাপদের জীবন দান করেন। কিন্তু আল্লাহ পাক কাউকে এবং কোন জাতিকে সতর্ক না করে ধ্বংস করেন না। তিনি সত্যের এবং ন্যায়ের দাওয়াত পেশ না করে কাউকে শাস্তি প্রদান করেন না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ, আমি কোন জাতিকে শাস্তি দিই না, যতক্ষণ না তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করি। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫)

তাই প্রমাণ স্থাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের নিকট পাঠালেন। পাঠালেন ফিরআউনকে সতর্কসংকেত দেয়ার জন্য এবং নিরীহ বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে হেদায়াতের শুভ পরিণামে উদ্ভাসিত করার জন্য। অতঃপর যে শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে, তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেটা এমন এক শিক্ষণীয় ইতিহাস, যা আজও জালিম, অত্যাচারী এবং খোদাদ্রোহীদের ভয়াবহ পরিণামের নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

এখান থেকে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট হয়।

(১) ফিরআউন এবং তার সহচরদের ধ্বংসের খোদায়ী ফায়ছালা চূড়ান্ত ছিল। হযরত মূসা (আ.) শুধু সতর্কসংকেত পেশ করতেই এসেছিলেন। সুতরাং ফিরআউনের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর আগমন এবং হকের দাওয়াত পেশ করা এই উদ্দেশ্যই হয়েছিল, ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে নয়।

(২) দাওয়াতে হক পেশ করার জন্য মাদউদের (যাদেরকে দাওয়াত প্রদান করা হয়, তাদের) কাছে

www.maktabatulabrar.com

তা "গ্রহণীয়" হওয়ার কোন শর্ত নেই। কোন কওমের হেদায়াত গ্রহণ করার প্রয়াস না থাকলেও দায়িত্বশীলদেরকে অবশ্যই দাওয়াত পেশ করতে হবে; বিরত থাকা আদৌ সঠিক হবে না।

(৩) যারা সমাজের অধিনায়ক ও নেতৃত্বের অধিকারী, তাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব হলো সমাজের আরাজকতা, জুলুম, নির্যাতন এবং বাতুলতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (এবং তাকে বল, শোধরাবার আগ্রহ তোমার আছে কি? এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে করে তুমি তাঁকে ভয় পাও।)

দাওয়াতের মূলনীতি

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)কে বললেন, তুমি যাও এবং ফিরআউনকে এই বলে একত্ববাদের দাওয়াত পেশ কর– 'আপনার ইচ্ছা আছে কি, আপনি শিরক মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যান এমন আদর্শ গ্রহণের?

এখানে চারটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন–

(১) কোন মানুষকে হকের প্রতি দাওয়াত পেশ করতে হলে কতগুলো উসূল তথা মূলনীতি এবং বিধান অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যদি সেই উসূল এবং বিধান সম্পর্কে জানা ও অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। যারা দাওয়াতের কাজের ব্যবস্থাপক তাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করা দরকার। অনেক সময় উসূলবিরোধী দাওয়াতের কারণে অধিক ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ পাক প্রশিক্ষণ দিয়েই ফিরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যা উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে যদি বিদ্রোহী এবং কঠোর প্রকৃতির লোক হয় অথবা সম্মানী এবং নেতৃত্বের অধিকারী লোক হয়, তবে সেখানে তো অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(২) সর্বসাধারণের বেলায় সরাসরি দাওয়াত পেশ করতে কোন বাধা নেই। যেখানে বিদ্রোহের অবকাশ থাকে, অথবা বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত পেশ করতে হয়, সেখানে অনুমতি গ্রহণের সুরে দাওয়াত পেশ করা অধিক ফলদায়ক হয়। কারণ, এতে দাওয়াতকারীর বড়ত্বের প্রকাশ ঘটে না, তার প্রভাব বিস্তারের ভাব সৃষ্টি হয় না, বরং নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। দাওয়াতের এই তরীকাই হলো অধিক ফলপ্রসূ। এজন্যেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে অনুমতি গ্রহণের সুরে অল্প কথায় মূল দাওয়াত পেশ করতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.)ও তা-ই করেছিলেন।

(৩) যিনি দাওয়াতের কাজ করেন তিনি অবশ্যই এতে উপকৃত হন এবং ছওয়াবের ভাগী হন। কিন্তু এটা তার মূল লক্ষ্যবস্তু হবে না। বরং মূল লক্ষ্য হবে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার উপকারিতা এবং তার হেদায়াত। এজন্যেই হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে ফিরআউনের উপকারিতা এবং স্বার্থের উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর উপকার এবং স্বার্থের কথা নয়। কারণ, দাওয়াতকারীর স্বার্থ প্রকাশ পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দাওয়াত স্বার্থ উদ্ধারের ইস্যু বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। তাই প্রত্যেক নবী তার কওমের প্রতি দাওয়াত পেশ করেই দাওয়াতকর্মে তার কোন স্বার্থ না থাকার কথা ঘোষণা করেছেন।

(৪) যাকে অথবা যে সম্প্রদায়কে হকের দাওয়াত দেয়া হবে, তাকে দাওয়াত গ্রহণের উপকারিতার

কথা অবহিত করা চাই এবং তার অথবা তাদের মন-মস্তিষ্কে উপকারিতার বিষয়টি বসানোর প্রচেষ্টা করা চাই। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবেই উপকারের প্রত্যাশী। সুতরাং এভাবে দাওয়াতের ফল বেশি আশা করা যায়। এজন্যেই হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে "তাযকিয়ার" কথা অতি আকর্ষণীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাযকিয়ার অর্থ

আয়াতে বর্ণিত 'তাযকিয়া'-র অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অধিক সম্পর্ক অন্তরের সাথে হলেও বাহ্যিক এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সাথেও সম্পর্ক রয়েছে। তাযকিয়া হাসিল করার প্রতি আহ্বান জানিয়েই আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের এক স্থানে ইরশাদ করেন,

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَه .

অর্থাৎ, তোমারা জাহেরী এবং বাতেনী উভয় প্রকার গোনাহ বর্জন কর। (সূরা আনআম: ১২০)

সুতরাং জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার গোনাহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেই পরিপূর্ণ তাযকিয়া লাভ হতে পারে, অন্যথায় পরিপূর্ণ লাভ হতে পারে না এবং তাযকিয়ার যথাযোগ্য উপকারিতা এবং সফলতা অর্জন করা যায় না। কিন্তু তাযকিয়ার মূল কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মানুষের অন্তর। অন্তরকে কুফর ও শিরকমুক্ত করে ঈমানের নূরে আলোকিত না করতে পারলে জাহেরী পবিত্রতার স্থায়িত্ব আসে না এবং উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না; অবশ্য জাহেরী পবিত্রতা বাতেনী পবিত্রতার জন্য সহায়ক হয় এবং সাময়িক ফায়দাও পাওয়া যায়। যারা বেদ্বীন, কাফের এবং মুশরিক, তাদের বেলায় অন্তরের তাযকিয়াই হল মূলবস্তু। কারণ, অন্তরের কুফর এবং শিরক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জাহেরী পবিত্রতা এবং তাযকিয়ার দাওয়াত পরিকল্পনা হিসেবে ফলদায়ক হতে পারে, নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। বস্তুত আলোচ্য আয়াতে ফিরআউনের বেলায় তাযকিয়া দ্বারা নাস্তিকতা, শিরক ও কুফরী বর্জন এবং ঈমানের দাওয়াতকে মূলতভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলেই বুঝে নিতে হবে। এ ব্যাপারে হযরত ইব্নে আব্বাছ (রা.)-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তাযকিয়ার অর্থ এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, اشهد ان لا اله الا الله অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।

তাযকিয়া লাভের উপায়

হযরত মূসা (আ.) অনুমতির সুরে ফিরআউনকে 'তাযকিয়ার' দাওয়াত পেশ করেই বললেন, 'আমি কি তোমাকে তোমার রবের প্রতি পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর?' এই আয়াতে বিশেষভাবে দুটি বিষয় ব্যক্ত হয়েছে, (১) তাযকিয়া লাভের উপায়, (২) তাযকিয়ায় স্থায়িত্ব লাভের উপায়,

আয়াতে তাযকিয়ার উল্লেখের পর আল্লাহর ভয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত তাযকিয়া লাভ করতে হলে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যখন অন্তরে আল্লাহর প্রকৃত ভয় সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ জাহেরী এবং বাতেনী গোনাহ বর্জন করে এবং গোনাহ বর্জন করা সহজ হয়। আর জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ বর্জন করলেই তাযকিয়া হাসিলের পথ সুগম হয়। কেননা, আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হলে মানুষ তার চলার পথে চিন্তা করবে যে, কোন্ গুলো পাপের কাজ এবং কোন্ গুলো নেকের কাজ,

www.maktabatulabrar.com

কী কী কর্মের দ্বারা আল্লাহ নারাজ হন এবং কি কি আমলের দ্বারা আল্লাহ পাক খুশি হন। তখনই মানুষের ভিতর আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের স্পৃহা জন্মাবে এবং সে অনুপাতে নিজকে পরিচালনার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর বিধি-নিষেধ এবং হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের নামই শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, আর সে অনুপাতে পরিচালিত হওয়াকে শরীয়তের অনুসরণ করা বলে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়তের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গভীর এবং তত্ত্ববহ। কেবল অভিধান এবং নিজের বুদ্ধির সাহায্যে শরীয়তের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না, বরং এর জন্য প্রয়োজন একজন মুখলিছ এবং এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করা এবং তার সাহচর্যে থেকে তরবিয়ত হাসিল করা। এই তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

سورة التوبة

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদিকীনের সংশ্রব অবলম্বন কর। (তওবা: ১১৯)

বস্তুত তাযকিয়া লাভ করা এবং তার স্থায়িত্বের জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। যথা-

১. অন্তরে আল্লাহর সঠিক ভয় সৃষ্টি করা।
২. শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।
৩. শরীয়তের অভিজ্ঞ উসতাদের সংশ্রবে থাকা।

উপর্যুক্ত আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনকে তাযকিয়ার দাওয়াত পেশ করেই তাযকিয়া লাভের এবং তাযকিয়ার স্থায়িত্বের উপায় কী তা বর্ণনা করেছেন।

(২০) সে তাকে বৃহৎ নিদর্শন দেখাল,	فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
(২১) তবুও সে (ফেরআউন) মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল,	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
(২২) অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রতিবিধানে স্বচেষ্ট হল।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾

শব্দার্থ

فَاَرٰهُ অতঃপর দেখাল, اَلْاٰيَةَ নিদর্শন, اَلْكُبْرٰى বিরাট, فَكَذَّبَ সে মিথ্যা বলল, عَصٰى অমান্য করল, ثُمَّ অতঃপর, اَدْبَرَ বিমুখ হয়ে গেল, يَسْعٰى স্বচেষ্ট হল।

সারমর্ম

হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনকে বিরাট নিদর্শন দেখালেন, যাতে ফিরআউন নিদর্শন দেখে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হেদায়াত গ্রহণ করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ফিরআউন হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যুক বলে দোষারোপ করল এবং নাফরমানিতে মেতে উঠল। শুধু তাই নয় বরং হযরত মূসা (আ.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিহিংসায় তৎপর হয়ে উঠল।

তাফসীর

فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى (সে তাকে বৃহৎ নিদর্শন দেখাল।)

আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.) ফিরআউনের নিকট পৌঁছে অতি নম্রতা এবং ভদ্রতার সাথে হেদায়াতের দাওয়াত পেশ করলেন। কিন্তু ফিরআউন তা গ্রহণ না করে উভয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। ফিরআউন এ উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে কৃত দাবীর স্বপক্ষে মু'জিযা এবং দলীল-প্রমাণ পেশ করতে বলল। হযরত মূসা (আ.) তা পেশ করলেন। কিন্তু আফসূস যে, তবুও ফিরআউনের ভাগ্যে ঈমান জুটল না, বরং সে চরম নাফরমানী এবং শত্রুতায় তৎপর হয়ে উঠল।

হামানের পরামর্শ

মুফাস্সিরগণ লিখছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তব্যে প্রথমত ফিরআউন কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু দুষ্ট হামানের পরামর্শে সে বিভ্রান্ত হয়ে অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখান করে। হামান নেহায়েত ধরনের দুষ্ট এবং কপট প্রকৃতির লোক ছিল; তবে ফিরআউনের অত্যন্ত নিকটস্থ এবং বিশ্বস্ত লোক ছিল। ফিরআউন সর্বক্ষেত্রেই তার পরামর্শের গুরুত্ব দিয়ে থাকত। সেমতে হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতের বিষয়েও সে হামানের মতামত গ্রহণ করেছিল। হামান ফিরআউনকে বলেছিল,

اتصير عبدا بعد ما كنت ربا .

অর্থাৎ, তুমি কি রব হওয়া সত্ত্বেও একটা গোলামকে সহ্য করবে?

বস্তুত দুষ্টলোকের সাহচর্য এবং পরামর্শ যে মানুষকে কীভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে হামান এবং ফিরআউনের এই ঘটনা।

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনকে বড় ধরনের একটি নিদর্শন (মুজিযাহ) দেখালেন। এই বড় নিদর্শন কী ছিল?

الاية الكبرى (বড় নিদর্শন) কী ছিল?

'আয়াত' শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে অবশ্য 'মুজিযাহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (মাজহারী ১৯০/১০০)। হযরত মূসা (আ.) ফিরআউন এবং তার কওমকে একাধিক 'মুজিযাহ' দেখিয়েছেন। সেই মুজিযাগুলোর মধ্যে এখানে কোনটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ নিয়ে মুফাসসিরগণের কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে তার কয়েকটি মতামত তুলে ধরা হল।

১। তাফসীরে তানতাবীতে বলা হয়েছে,

وهى جميع المعجزات والايات .

অর্থাৎ, এখানে মূসা (আ.) প্রদর্শিত সমস্ত 'মু'জিযাহ' কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে (তানতাবী ৩৪/২৫)। কিন্তু এই মতটি বোধগম্য নয়। কারণ, হযরত মূসা (আ.) সর্বপ্রথম দুটি মুজিযাহ প্রদর্শন

www.maktabatulabrar.com

করেন। তখনও অন্যান্য মুজিযাহসমূহ সংঘটিত হয়নি, বরং অন্যান্য মুজিযাহ সম্পর্কে মুফাস্সির মাহমূদ আলূসী (মৃ. ১২৭০ হি.) বলেন,

فانه ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة بعد فى نحو من عشرين سنة .

অর্থাৎ, অন্যান্য মুজিযাহ হযরত মূসার (আ.) হাতে প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী সময়ে যাদুকরদের উপর বিজয় সাধনের পরে প্রায় বিশ বছর পর (রূহুল মানী ২৯/৩০)। অথচ আয়াতে পাকে প্রথমবারের মুজিযাহর কথা বলা হয়েছে।

২। মুফাস্সির কাল্‌বী এবং মুকাতিলের মতে এখানে 'শুভ্র হাত'-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কিন্তু এর স্বপক্ষে বর্ণিত প্রমাণাদি মতটিকে প্রমাণ করায় যথেষ্ট নয় বলে এই মতটিও বোধগম্য নয়। (কাবীর ৩২৪/৮)

৩। কারও কারও মতে এখানে সমুদ্রে 'পথ' সৃষ্টি হওয়াকে বৃহত্তম 'মুজিযাহ' বলা হয়েছে (কুরতুবী ২০২/২০)। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই এই মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। মুফাস্সির আতার মতে এখানে 'লাঠি'-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, হাতের মধ্যে রঙ্গের পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন কিছুই ঘটেনি। আর রঙ্গের পরিবর্তন 'লাঠির' মধ্যে ঘটেছে, তদুপরী লাঠি অজগরে পরিণত হয়ে যাওয়া জীবনধারণ করা, লাঠিতে শরীর সৃষ্টি হওয়া, শক্তি সঞ্চারিত হওয়া, যাদুকরদের সমস্ত সর্পগুলোকে গিলে ফেলা, অতঃপর পুনরায় লাঠিতে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি হাতের তুলনায় অধিক বৃহত্তম মুজিযা হওয়ার অকাট্য প্রমাণ বৈ কি। যারা বলেছেন, 'হাতের রঙ্গের পরিবর্তন হওয়া 'মুজিযাহ' হিসেবে নয়, বরং হযরত মূসার (আ.)-এর অন্তর থেকে স্বভাবগত ভয়কে দূরীকরণার্থে এই পরিবর্তন ঘটেছে (কাছাছুল কুরআন ৩৭৬/১)। তাদের বক্তব্যের দ্বারাও মুফাস্সির আতার মতটি সাব্যস্ত হয়। অনেকেই এই মতটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (হক্কানী- ২৭)।

৫। মুফাস্সির মুজাহিদ ইব্‌নে জাবরের মতে এখানে 'শুভ্র হাত' এবং 'লাঠি' উভয়টিকেই বৃহত্তম নিদর্শন বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (আবূস সুউদ ১০০/৯) এই মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কারণ, যখন হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনকে হকের দাওয়াত পেশ করেন, তখন ফিরআউন এই বলে হযরত মূসা (আ.) কে সম্বোধন করল–

اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

অর্থাৎ, যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি তা পেশ কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক (সূরা আ'রাফ : ১০৬)।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে একটি নয় দুটি মুজিযা দেখালেন। পবিত্র কুরআনে ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. وَّ نَزَعَ يَدَه فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ .

অর্থাৎ, সে (মূসা) তার লাঠি ফেলে দিল। লাঠি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হল, অতঃপর সে তার হাত বের করল, আর তৎক্ষণাত হাত দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। (সূরা শু'আরা : ৩২-৩৩)।

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, 'শুভ্র হাত' মু'জিযারই অন্তর্ভুক্ত এবং সূরায়ে ত্বাহা-য় লাঠির মু'জিযা ও হাতের মু'জিযা– উভয়টির উল্লেখের পর উভয়ের গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে,

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى.

অর্থাৎ, এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার বৃহৎ কিছু নিদর্শন দেখাব। (সূরা ত্বাহা: ২৩)

এতে প্রমাণিত হয়, উভয়টিই বৃহত্তম মুজিযার অন্তর্ভুক্ত। সূরায়ে ত্বহা-য় শুভ্র হাতের উল্লেখের পর বলা হয়েছে– 'অপর আরেকটি নিদর্শন'। এতেও সুস্পষ্ট হয়, 'শুভ্র হাত'ও মু'জিযারই অন্তর্ভুক্ত। তাফসীরে আবূস সুউদে বর্ণিত হয়েছে– 'লাঠির মুজিযাহ' প্রদর্শনের পর ফিরআউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল,

فهل لك غير ها ؟

অর্থাৎ, তোমার নিকটে অন্য 'মু'জিযাহ' আছে কি?"

তখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় হাত বের করে বললেন এটা কী? ফিরআউন বলল, এটা তোমার হাত।

فادخلها فى ابطه فاذا هى بيضاء.

অর্থাৎ, তখন হযরত মূসা (আ.) তার হাতমুবারক বগলের নিচে প্রবেশ করালেন (আবূস্ সুউদ ২৪১/৬)। অতঃপর যখন বের করলেন, তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বের হল (আবূস্ সাউদ ২৫৮/৩)।

বস্তুত 'শুভ্র হাত'-কে মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত মনে না করা একান্ত অযৌক্তিক।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى (ফিরআউন হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যুক আখ্যায়িত করল।)

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল, বরং হযরত মূসা (আ.)কে যাদুকর এবং মু'জিযাহ-কে নিরেট যাদু বলে আখ্যায়িত করল। এভাবে সে হযরত মূসা (আ.) এবং আল্লাহর নাফরমানীতে তৎপর হয়ে উঠল।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ফিরআউনের এই নাফরমানী জ্ঞাত অবস্থায় ছিল নাকি অজ্ঞাত অবস্থায়? এ সম্পর্কে সহীহ ইল্ম একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের রয়েছে। তবে হযরত মূসা (আ.-এর মু'জিযাহ দেখার পর সত্যের উপলব্ধি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাফসীরে দুররুল-মানছুরের বরাতে আমরা বর্ণনা করেছি যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ফিরআউন আলোচনা করে কিছুটা আকর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু হামানের ভ্রান্ত পরামর্শে সে পুনরায় পুরাপুরী তৎপর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী ফিরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার মুহূর্তে এ–ও বলেছিল,

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ.

অর্থাৎ, যে এক মাবুদের প্রতি প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম। (সূরা ইউনুস: ৯০)

ফিরআউনের এই মুহূর্তে ঈমান গ্রহণ করা যদিও কোন প্রকার উপকারে আসেনি, তবুও এখান থেকেও তার অবস্থার কিছুটা নমনীয়তা প্রতিভাত হয়। সুতরাং মু'জিযা প্রদর্শিত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থা ছিল পরবর্তী সময়ে হযরত মূসা (আ.)-এর রিসালতের ন্যায্যতা সম্পর্কে সে হয়ত উপলব্ধি করেছিল। মুফাস্সিরদের অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করে মুফাস্সির মাহমূদ আলূসী বলেন,

عصى الله تعالى بالتمرد بعد ما علم صحة الامر ووجوب الطاعة.

অর্থাৎ, দাওয়াতের সততা এবং ইতাআত করা ওয়াজিব জেনেশুনে বিদ্রোহ মানসিকতার বশীভূত হয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে তৎপর হয়ে উঠল।

এই মতটিকে সমর্থন করেই আল্লামা যামাখশারী (মৃ: ৫৩৮) বলেন,

عصى الله ما علم صحة الامر وان الطاعة قد وجبت عليه.

অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর সততা এবং ইতাআত করা ওয়াজিব বুঝেশুনেই ফিরআউন আল্লাহর নাফরমানী করল। (কাশ্শাফ ২১/৪)

এখান থেকে দুটি জিনিস বুঝে আসে।

(১) সত্যের জ্ঞান ঈমান নয়

ফিরআউন বুঝতে পেরেছিল যে, হযরত মূসা (আ.) যাদুকর নন এবং তিনি মিথ্যুকও নন; বরং তিনি আল্লাহর মনোনীত নবীই বটে; কিন্তু সে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রকাশ্যে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেনি এবং একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়নি, ফলে তাকে মুমিন বলা চলে না। এতে স্পষ্ট হয়, সত্যের ইলম হাসিল হওয়া এক জিনিস, ঈমান লাভ হওয়া অন্য জিনিস। যদি ইল্ম মুতাবেক অন্তরের এবং শরীরের আমল না হয়, তাহলে তাকে সাধারণ মুমিন বলাও সঠিক নয়। সুতরাং কামিল মুমিন বলে আখ্যায়িত করার কোন উপায় তো মোটেই নেই। এদিকে আলোকপাত করেই ইমাদুদ্দীন ইব্নে কাছীর (মৃ : ৭৭৪ হি:) বলেন,

وعلمه بان ماجاء به الحق لايلزم انه مؤمن به لان المعرفة به لان المعرفة علم القلب والايمان علمه وهو الا نقياد للحق والخضوع له.

হযরত মূসার (আ.)-এর দাওয়াত সত্য– ফিরআউনের এই জ্ঞান ছিল, কিন্তু এই জ্ঞানের কারণে তাকে মুমিন বলার আবশ্যকতা দাঁড় হয় না। কারণ, অন্তরের জ্ঞান হাসিল হওয়া এবং ঈমান লাভ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত অন্তরের ইল্মকে মারিফত বলে, আর অন্তরের আমলকে ঈমান বলে। অন্তরের আমল বলতে হকের অনুসরণ এবং অনুকরণ বোঝায় (ইবনে কাছীর ৪৬৮/৪)।

ফিরআউনের মধ্যে অনুকরণ এবং অনুসরণ ছিল না, ফলে তার জ্ঞানকে ঈমান সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন সম্রাট হেরাক্ল এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাজান আবূ তালিবকে মুমিন বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। যদিও তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর নবী, কিন্তু বাহ্যত তারা তাদের বিশ্বাসকে আমলে পরিণত করেনি, দিলে তার প্রতি ঈমান স্থাপন করেনি, ফলে তাদেরকে মুমিন বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

www.maktabatulabrar.com

(২) অহংকারের পরিণাম

ফিরআউন বুঝতে পেরেছিল, হযরত মূসার 'দাওয়াত' চূড়ান্ত সত্য, কিন্তু হামানের ভ্রান্ত পরামর্শের কারণে তার ভিতর পদমর্যাদা এবং বড়ত্বের মোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই অহংকার তাকে পরিণাম সম্পর্কে নির্ভীক করে তুলল। সে শুধুমাত্র হযরত মূসার দাওয়াতকে অস্বীকার করে বসে থাকলো না, বরং তাকে প্রতিহত এবং উৎখাত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠল। একজন ক্ষমতাশীন ও ক্ষমতালোভী যেভাবে তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার নিমিত্তে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফিরআউন তা-ই করতে শুরু করল। কিন্তু ফিরআউনের পরিণাম যে কতো দুঃখজনক হয়েছিল, ইতিহাস আজও তার উজ্জ্বল প্রমাণ হয়ে আছে। ক্ষমতার লোভ, অহংকার এবং সত্যের বিরুদ্ধে অপচেষ্টার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা এখান থেকেই বোঝা যায়।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى (অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে প্রতিবিধানে স্বচেষ্ট হল।)

এখানে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে– এ সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখপূর্বক সঠিক মত কোন্‌টি তা নির্ণয় করা চেষ্টা করা হয়েছে।

পৃষ্ঠপ্রদর্শনের দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

হযরত মূসা (আ.)-এর 'সর্প মু'জিযাহ' ছিল ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের জন্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তাফসীরের কিতাবসমূহেও অনেক বিস্তৃত আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিযার সর্প বিরাট আকার ধারণ করে বিস্তৃত ছোবল পেতে (রূহুল মাআনী– ৩০/৩০, মাজহারী–১৯০) প্রথমবারেই যাদুকরদের সব কয়টি সর্পকে নিমিশের মধ্যে গিলে ফেলল। তারপর যখন ফিরআউন এবং তার সহচরদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন যে কত ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতি সহজেই অনুমেয়। মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন, ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে সেদিন শুধু যে অসংখ্য মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়েছিল তাই নয়; বরং ন্যূনতম পঁচিশ হাজার লোক মৃত্যু বরণ করেছিল। আর যাদুকরদের সকলেই হযরত মূসা (আ.)-এর সমর্থনে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঈমান স্থাপনের ঘোষণাও করেছিল। এমতাবস্থায় সমবেত জনতার যারা সুস্থ্য এবং বেঁচে ছিল, প্রাণ রক্ষার তাগিদে এবং আত্মগোপনের লক্ষ্যে সেস্থান থেকে দ্রুত দৌড়ে পালিয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' দ্বারা এই পরিস্থিতিতে বেসামাল হয়ে ফিরআউনের দৌড়ে পলায়নকেই বোঝানো হয়েছে (কুরতুবী– ২০২/২০)। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! তবুও ফিরআউনের অন্তরে সু-চেতনার উদয় হল না, বরং পরিণাম সম্পর্কে অচেতন সহচরদের আশ্রয়ে ও পরামর্শে সে তার বিদ্রোহী ভূমিকা পুনরায় জোরদার করল, বরং আল্লাহর প্রভুত্বের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পরিবর্তে নিজেকেই প্রভুত্বের আসনে সমাসীন বলে ঘোষণা করে বসল। অবস্থা এবং পরিস্থিতির সাথে 'ফিরআউনের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের' উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাহলে ২২ নং আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ– ফিরআউন ভীষণ আকৃতির ওঁৎপাতা সাপকে অগ্রসর হতে দেখে দৌড়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে এই অর্থ বোধগম্য নয়। তাদের মতে 'পৃষ্ঠ প্রদর্শনে স্বচেষ্ট হয়' দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান স্থাপন না করা, হযরত মূসা (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া না দেয়া,

www.maktabatulabrar.com

হযরত মূসা (আ.) কে অপমানিত করা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত করে স্বীয় প্রভুত্ব ঘোষণা করা, ইত্যাদি প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়েছে। (দুররে মানছুর ৩১৩/৬)

আমাদের মতে নিম্নোক্ত কারণে এই অর্থ অধিক গ্রহণযোগ্য।

(ক) ২২নং আয়াতের প্রারম্ভে ছুম্মা, শব্দের আসল অর্থের সাথে শেষোক্ত অর্থের মিল হয়, প্রথমোক্ত অর্থের সাথে কোন প্রকার মিল হয় না, অবশ্য ছুম্মার রূপক অর্থের সাথে প্রথমোক্ত অর্থের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কারণ ছুম্মা শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) তরিৎ পরবর্তীকাল বোঝাবার জন্য। কিন্তু এ হল এ শব্দের রূপক অর্থ। প্রথমোক্ত অর্থের সাথে রূপক এই অর্থের যথেষ্ট মিল আছে। কেননা, বৃহৎ আকারে ছোবলধরা সর্পকে গিলে ফেলার জন্য অগ্রসর হতে দেখে দিশেহারা হয়ে তরিৎ দৌড়ে পলায়ন করা একান্ত স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কোন কিছু নয়। (২) দূর পরবর্তীকাল বোঝাবার জন্য। ছুম্মা শব্দের এ হচ্ছে আসল অর্থ। আর আসল অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হলে রূপক অর্থ গ্রহণ করা তাফসীরের মূলধারা বিরোধী। আর ২২নং আয়াতে এর আসল অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নেই। কারণ, তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হবে– ফিরআউন মু'জিযাহ দেখে হতভম্ব হল এবং তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার তাগিতে যা কিছু করার ছিল তা করল, কিন্তু হতভাগা ফিরআউন অবশেষে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করতে অসম্মতি প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতেও সাড়া দিল না, বরং আল্লাহর এবং হযরত হযরত মূসা (আ.)-এর বিদ্রোহিতায় আরো অধিক মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠল। এমনকি জনসমাবেশ করে স্বীয় প্রভুত্ব ঘোষণা করতেও কুণ্ঠাবোধ করল না। বস্তুত এর জন্য অবশ্যই কিছু সময় দরকার। ছুম্মা দ্বারা এই দূর পরবর্তী সময় বোঝানো হয়েছে।

(খ) পরবর্তী আয়াতে ফিরআউনের বিদ্রোহিতার যে চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও শেষোক্ত অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন থেকে বিরত থাকা এবং পরবর্তী সময়ে নিজকেই প্রভু হিসেবে ঘোষণা করে দেয়ার মধ্যে যে মিল বিদ্যমান রয়েছে, 'পৃষ্ঠ প্রদর্শনের' প্রথমোক্ত অর্থের সাথে ঐ ধরনের মিল বিদ্যমান নেই। কেননা, সর্পের ভয়াবহ মু'জিযা দেখার পর ফিরআউনের যে মুমূর্ষ অবস্থা হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুফাস্‌সির মাহমূদ আলূসী (মৃত্যু ১২৭০ হিজরী) লিখেছেন যে,

انما انقلبت حية وارتفعت فى السماء قد رميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول يا موسى مرنى بما شئت ويقول فرعون انشدك بالذى ارسلك الا خذته فاخذه فعاد عصا.

অর্থাৎ, লাঠি একটি বৃহৎ সর্পের আকার ধারণ করল। আকাশের দিকে এক মাইল উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর আবার নীচু হয়ে এই বলে ফিরআউনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল যে, হে মূসা, আপনার যা করার ইচ্ছা, তা আমাকে নির্দেশ করুন। ফিরআউন (কোন গত্যন্তর না দেখে এদিক সেদিক না দৌড়ে) হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এই প্রার্থনা করে করে অগ্রসর হল যে, হে মূসা, আপনাকে যিনি প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি, আপনি মেহেরবানী পূর্বক সর্পকে বিরত রাখুন, হযরত মূসা (আ.) সর্পের উপর স্বীয় হস্ত মুবারক স্থাপন করলেন। ফলে সর্প যথারীতি লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল (রূহুল মাআনী)। এখান থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

১. ফিরআউন ভাবতে পেরেছিল যে, দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না, একমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সাহায্যেই আত্মরক্ষা সম্ভব হতে পারে। তাই ফিরআউন পালাতে অথবা অন্যত্র আশ্রয়

নিতে চেষ্টা না করে হযরত মূসা (আ.)-এর দিকেই অগ্রসর হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত মূসা (আ.) একজন নবী হিসেবে উদারতা এবং ক্ষমার যে আদর্শের অধিকারী ছিলেন সে আদর্শকে যথাযথভাবেই প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি সর্পের উপর হস্ত মুবারক স্থাপন করলেন আর ফিরআউনের প্রাণনাশকারী সর্প লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। ফলে ফিরআউনের আর এ কারণে পলায়নের প্রয়োজন হল না।

২. সুতরাং 'পৃষ্ঠ প্রদর্শনের' অর্থ সর্প দেখে দৌড়ে পলায়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়, বরং পরবর্তী সময় আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন না করা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে সঙ্গবদ্ধভাবে তৎপর হয়ে উঠার অর্থই অধিক যুক্তিযুক্ত। বস্তুত 'ছুম্মা'-র আসল অর্থের সাথে এই অর্থের যে গভীর মিল রয়েছে তা খুবই সুস্পষ্ট।

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾	(২৩) অনন্তর সে সকলকে সমবেত করে এবং ঘোষণা দেয়।
فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾	(২৪) সে ঘোষণায় বলে, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু।
فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾	(২৫) এ কারণে আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন।
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾	(২৬) নিশ্চয়ই যে ভয় করে এতে রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ।

শব্দার্থ

حَشَرَ সমবেত করে, نَادٰى ঘোষণা দেয়, اَنَا আমি, رَبُّكُمْ তোমাদের প্রভু, الْاَعْلٰى শ্রেষ্ঠ, মহান, فَاَخَذَهُ তাকে পাকড়াও করেন, نَكَالَ শাস্তি, الْاُوْلٰى দুনিয়াতে, الْاٰخِرَةِ আখেরাতে, لَعِبْرَةً শিক্ষণীয় উপদেশ, يَخْشٰى যে ভয় করে।

সারমর্ম

ফিরআউন মু'জিযাহ দেখেও আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিতে সম্মত হল না, বরং বিমুখ হয়ে নানা প্রকারের ফাসাদে লিপ্ত হল এবং হযরত মূসা (আ.)কে পরাস্ত ও অপদস্ত করণে স্বচেষ্ট হল। শুধু তাই নয়, অহংকারে মাতাল এই ফিরআউন আল্লাহকে সর্বশক্তিমান প্রভু হিসেবে মনে স্থাপন করার স্থলে সমবেত জনতার সম্মুখে নিজকেই প্রভু বলে ঘোষণা দেয়। তাই আল্লাহ্ পাক তাকে কঠোর আয়াবে নিক্ষেপ করেন। দুনিয়াতে সমুদ্রে ডুবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল, আর পরকালেও কঠোর আযাব ভুগতে হচ্ছে। লোমহর্ষক এ ঘটনায় সকল শ্রেণির লোকদের জন্য অনেক কিছুই শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

তাফসীর

فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (অনন্তর সে সকলকে সমবেত করে এবং ঘোষণা দেয়। যে ঘোষণায় বলে, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু)

ফিরআউনের প্রভুত্যের দাবি

হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবেলা করার জন্য ফিরআউন যে সমস্ত যাদুকরকে জমায়েত করেছিল, তারা অবশ্যই দেশের এবং সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরই ছিল। কারণ, সরকারি তত্বাবধানে রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর এটা ছিল মুজিযাহ, যাদু নয়। তাই খোদায়ী শক্তির মোকাবেলায় যাদু নিয়ে টিকে থাকা কী করে সম্ভব হতে পারে? যাদুর প্রকৃতি হল ভেলকি আর ধোঁকা। যদি হযরত মূসা (আ.) প্রদর্শিত মু'জিযাহ যাদু হত, তাহলে যাদুকরদের এ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা অবশ্যই হত না। যাদুকরগণ একথা নিঃসন্দেহে বুঝতে সমর্থ হল এবং তাই তারা ফিরআউনের কঠোর শাস্তির হুমকি উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করে সৌভাগ্যশীল হয়ে গেল। ফিরআউনের জন্য প্রদর্শিত মু'জিযাহ যাদুকরসহ অসংখ্য লোকের ঈমান গ্রহণের কারণ হয়ে গেল, কিন্তু অভিশপ্ত ফিরআউনের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণ করার সফলতা জুটল না। তার কপটতার কারণে তাওফীক হয়নি, আল্লাহ পাক তাকে তাওফীক দেননি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক যাকে তাওফীক দেন কেবলমাত্র তারই তাওফীক হয়। (সূরা হূদ: ৮৮)

তবে হ্যাঁ, তাওফীক তাকেই দেওয়া হয়, যে আল্লাহকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর নিকট তাওফীক চায়। শুধু তাই নয়, বরং ফিরআউন অপরাধে আরও উন্নতি করে অহংকার ও ক্ষমতার মোহে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে কদম বাড়াল। সে ভাবল, মানুষের অন্তর থেকে অন্য কোন প্রভুত্বের বিশ্বাসকে সমূলে শেষ করা ছাড়া এই প্রচণ্ড বিপ্লবকে ঠেকানো সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মূসাকে প্রতিহত করা। তাই বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বীয় ঘোষণার মাধ্যমে যেভাবে নিজেকে রাষ্ট্রের অধিনায়কের আসনে সমাসীন করে ছিল এবং সে সময়ের প্রচণ্ড বিপ্লব সামলাতে সক্ষম হয়েছিল, এখানেও তা সম্ভব হবে বলে ধারণা পোষণ করে সমবেত জনতার সম্মুখে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিল انا ربكم الاعلى অর্থাৎ, মূসার দাবি একজন সর্বমহান প্রভু রয়েছে, একথা সত্য, কিন্তু সে যে অদৃশ্য প্রভুর কথা বলে বেড়াচ্ছে তা মোটেই সত্য নয়, বরং সেই মহান প্রভু স্বয়ং আমিই। সুতরাং তোমরা আমার প্রভুত্বের প্রতি ঈমান স্থাপন কর, অন্য কারও প্রতি নয়। ইতিপূর্বে সে তার গৌরব এবং হযরত মূসা (আ.)-এর তুলনায় তার অধিক গুরুত্বের কথাও ঘোষণা করেছিল। পবিত্র কুরআনে ঐদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে,

وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ . اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ . فَلَوْ لَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ .

অর্থাৎ, ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে ঘোষণা দিয়েছিল, হে আমার সম্প্রদায়, মিসররাজ্য কি আমার নয়? এবং এই নদীসমূহ আমার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে– একি তোমরা দেখো না? এই ব্যক্তি (মূসা) থেকে তো আমিই অধিক শ্রেষ্ঠ। সে তো অতি হীন, সম্বলহীন এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না, (সে আবার নবী হলো কী করে?) কেন মূসাকে স্বর্ণবলয় দেয়া হল না? অথবা তার সাথে ফেরেশতাগণ কেন দলবদ্ধভাবে আসল না?

এতে বোঝা যায়, ফিরআউন পূর্ব হতেই নিজের সর্বাধিকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের মোহে আত্মভোলা হয়ে উঠেছিল, আর অবশেষে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত স্তর 'প্রভুত্বের' স্তরে উপবিষ্ট হতে উদ্ধত হল। এভাবেই মানুষ প্রথমে ছোট গোনাহে লিপ্ত হয়, অতঃপর সাহস বৃদ্ধি পায়, তাই কবীরা গোনাহ করতেও দ্বিধাগ্রস্থ হয় না, পরিণামে কাফের এবং নাস্তিক হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় অথচ নিজেও সংশোধন হয় না এবং কারও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও রাজী হয় না। তা-ই হল ফিরআউনের অবস্থা, যে কারণে খোদায়ী গজবে আক্রান্ত হয়ে সে নিজেও ধ্বংস হল এবং সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে কলংকের ইতিহাস রচনা করল।

পূর্বের ২১ নং আয়াত (তবে সে মিথ্যা বলল এবং অমান্য করল) দ্বারাও সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফিরআউন 'প্রভুত্যের' দাবি করেছিল। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটাই মুসলিম মনীষীদের অভিন্ন অভিমত।

ফিরআউন মুশরিক ছিল কি?

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) এবং ফিরআউন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে–

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَه لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ .

অর্থাৎ, ফিরআউনী সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আপনি কি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ও আপনাকে এবং তার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দিবেন? ফিরআউন বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং নারীদেরকে জীবিত রাখব এবং আমরা নিশ্চয়ই তাদের উপর অত্যন্ত প্রবল। (সূরা আরাফ : ১২৭)

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফিরআউন নিজেকে খোদার অর্থে প্রভু মনে করতো না, বরং সে মুশরিক ছিল এবং দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। এ কারণেই আধুনিক যুগের একজন মুফাস্সির ফিরআউনের প্রভুত্বের বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। প্রশ্ন হয় তাহলে–

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

অর্থাৎ, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু– এর কী অর্থ হবে?

এর উত্তরে উক্ত মুফাস্সির বলেন, এখানে 'প্রভুত্বের অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিনায়ক' অর্থাৎ, ফিরআউন এই দাবী করেছিল যে, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপ্রধান।

www.maktabatulabrar.com

এই মতটির পিছনে আরও দুটি যুক্তি রয়েছে। যথা:

(১) পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِه قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ .

অর্থাৎ, ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা দিলো, হে আমার সম্প্রদায়, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নহরসমূহ আমার অধীনে প্রবাহিত হয়। (সূরা যুখরুফ: ৫১)

এখানে ফিরআউন নিজেকে কেবল মিসরের অধিবাসী বলে দাবী করেছিল– উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ফিরআউনের প্রভুত্বের দাবি ধর্মীয় অর্থে হত, তাহলে শুধু মিসর নয় সমগ্র বিশ্বের মালিকানা এবং অধিকারী বলে উল্লেখ করা হত। এতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ফিরআউনের প্রভুত্বের ঘোষণা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়, ধর্মীয় আকীদার সাথে এর কোন সংঘাত নেই। এতে ফিরআউন 'প্রভুত্বের দাবি' করেছিল মতামতটি বোধগম্য নয়।

(২) অভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলেও এটাই সাব্যস্ত হয়। কারণ, ربكم শব্দের মধ্যে 'রব' শব্দের মূল অর্থ প্রতিপালন করা। যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন, তিনি প্রজাদের প্রতিপালন করে থাকেন, এজন্য করে থাকেন যে, এটা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ফিরআউন যেহেতু মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান ছিল এবং সে রাষ্ট্রের প্রজাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করত, তাই এদিক থেকে তার এই দাবি ন্যায়সঙ্গতই ছিল, অন্যায় কোন কিছু নয়।

কিন্তু আধুনিক যুগের মুফাস্সির সাহেবের এই উক্তি নিম্নোক্ত ৪টি কারণে বোধগম্য নয়।

(১) হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনকে আল্লাহর প্রভুত্বের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। কিন্তু ফিরআউন এর স্বীকৃতি দেয়নি; বরং এর বিরোধিতা করে অবশেষে 'আমিই বৃহত্তর প্রভু' বলে দাবি করেছে। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফিরআউন খোদার অর্থেই প্রভুত্বের দাবী করেছিল, রাষ্ট্রের অধিনায়ক অর্থে নয়। আর রাষ্ট্রঅধিনায়কের অর্থে প্রভুত্বের দাবি বিষয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে কোন অস্বীকৃতি ছিল না এবং হতেও পারে না।

(২) হযরত মূসা (আ.) যখন ফিরআউনকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রভুত্বের প্রতি দাওয়াত পেশ করেছিলেন, তখন ফিরআউন বলেছিল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى হে মূসা! তোমাদের দুজনের (মূসা-হারূনের) 'রব' কে? তখন হযরত মূসা (আ.) 'রব'-এর পরিচয়ে যা বলেছিলেন তা নিম্নরূপ–

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَه ثُمَّ هَدٰى .

অর্থাৎ, আমার রব হলেন ঐ সত্তা, যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন অনন্তর দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। (সূরা ত্বাহা: ৫০)

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর এই দাওয়াত ও বক্তব্যের প্রতি ফিরআউন আস্থা স্থাপন করেনি, বরং প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত কোন ধরনের প্রভুত্বের ছিল তা সুস্পষ্ট যে, তার দাওয়াত খোদার অর্থে প্রভুত্বের ছিল, ফিরআউন তা মানেনি।

(৩) ফিরআউন অন্য এক সময় হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন করেছিল– وما رب العالمين অর্থাৎ, রব্বুল আলামীন কে? হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ .

অর্থাৎ, যিনি আসমান, যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা সত্যিকারের বিশ্বাসী হও। (সূরা শু'আরা : ২৪)

হযরত মূসা (আ.) আরও বলেছিলেন, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বসূরিদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি পূর্ব-পশ্চিম দিকসমূহের 'রব' তিনিই হলেন প্রকৃত অর্থে 'প্রভুত্বের অধিকারী' আমি তোমাকে তারই 'প্রভুত্বের' প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি।

এখানে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত খোদার অর্থে 'প্রভুত্বের' দাওয়াত ছিল, কিন্তু ফিরআউন তা স্বীকার করে নিতে পারেনি, বরং সে হযরত মূসা (আ.)-এর তিরস্কার করে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল,

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ .

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূল একেবারেই পাগল। (সূরা শু'আরা: ২৭)

শুধু পাগল বলেই ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং হযরত মূসা (আ.) কে সতর্ক করে ফিরআউন এ-ও বলেছিল,

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ .

অর্থাৎ, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে 'ইলাহ' রূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব। (সূরা শু'আরা : ২৯)

এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফিরআউন 'ইলাহের' অর্থেই প্রভুত্বের দাবি করেছিল।

(৪) হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরআউন তার দরবারী গণ্যমান্যদেরকে এই বলে ঘোষণা দিয়েছিল–

يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ .

অর্থাৎ, হে আমার পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন 'ইলাহ' আছে বলে আমার জানা নেই। (সূরা ক্বাসাস: ৩৮)

এ আয়াত দ্বারাও সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ফিরআউন রাষ্ট্রের অধিনায়কের অর্থে নয়, খোদার অর্থে প্রভুত্বের দাবি করেছিল।

ভ্রান্তির অবসান

আধুনিক যুগের মুফাস্‌সির সাহেব যেসব কারণের আশ্রয় গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতের বিরোধিতা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এর কোনটিই যথার্থ কোন কারণ নয়; বরং বিরাট বিভ্রান্তি এবং পবিত্র কুরআনের আরবী ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের প্রতিফল এবং তা নিম্নের পর্যালোচনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

এক নং ভ্রান্তি

(ক) এই ভ্রান্তির একটি কারণ হচ্ছে الهتك (তোমার দেবতাসমূহ) শব্দটি। শব্দটি বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ হতে পারে ফিরআউন প্রথমে একাধিক খোদায় বিশ্বাসী ছিল, অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রভুত্বের দাবিতে উপনীত হয়েছে। বাতিলপন্থিরা এভাবেই স্বীয় উদ্দেশ্যে উপনীত হয়ে থাকে। তারা প্রথমেই মূল উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে না, বরং পর্যায়ক্রমে তাদের দাবির দিকে অগ্রসর হয়। যেমন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রথমবারই নবুয়তের দাবী করেনি, বরং প্রথমে নিজেকে একজন মুহাদ্দেছ, অতঃপর মুজাদ্দেদ ও ঈসা মাসীহ বলে ঘোষণা করে। অবশেষে নিজেকে 'শ্রেষ্ঠ নবী' বলে দাবি করে। তদ্রূপ ফিরআউন শেষ নাগাদ প্রভুত্বের দাবি করেছিল। একাধিক খোদার স্বীকৃতি ছিল অতি প্রথম দিকের ব্যাপার।

আয়াতের যে বাক্যটির উপর মুফাস্‌সির সাহেব স্বীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সিরদের মতামত নিম্নরূপ:

(খ) হতে পারে ফিরআউন 'আলিহা' (দেবতাসমূহ) বিশ্বাসী প্রজাদের স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রভুত্বের দাবির সাথে সাথে আলেহারও পূজা পাঠ করত। বস্তুত যারা ক্ষমতালোভী, তাদের এ ধরনের স্বভাব থাকা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বর্তমান বিশ্বের অধিনায়কদের অবস্থা থেকে বিচার করলে এর বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদেরকে বিধর্মীদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মের প্রশংসায় মুখর দেখা যায়, তাদের পূজা পাঠে যোগদান এবং তাদের দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করতে দেখা যায়। তাই খোদাদ্রোহী ফিরআউন যদি বাতিলপন্থিদের ন্যায় লক্ষ্য অর্জনের এই মোনাফেকী নীতি অবলম্বন করে থাকে, তবে এটা তার জন্য স্বাভাবিক, মোটেই অস্বাভাবিক কোন কিছু নয়।

(গ) ফিরআউন নিজেকে বড় 'রব' বলে ঘোষণা করেছিল এবং ছোট ছোট কিছু দেবতা প্রস্তুত করে তার সম্প্রদায়কে সেগুলোর উপাসনায় নিমগ্ন রাখার উদ্দেশ্যে এই বলেছিল যে, আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই দেবতাসমূহের পূজা পাঠ কর। যেমন বর্ণিত আছে–

كان له اصنام صغار يعبدها قومه تقربا اليه ولذلك قال انا ربكم الاعلى .

অর্থাৎ, ফিরআউনের ছোট ছোট দেবতা ছিল। ফিরআউনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার সম্প্রদায় সেই দেবতাসমূহের পূজা করত। এজন্যই ফিরআউন নিজকে 'বড় রব' বলে আখ্যায়িত করত।

যদি মুফাস্‌সির সাহের স্বীয় মতের মোহে আত্মাহারা না হয়ে মুফাস্‌সিরদের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতেন, তাহলেও এই ভ্রান্তির অবসান সহজ হত।

দুই নং ভ্রান্তি

ফিরআউন এক স্থানে তার কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ الخ অর্থাৎ, আমি কি মিসর রাজ্যের মালিক নই? এতেও বোঝা যায়, ফিরআউন সারা বিশ্বের খোদা বলে দাবি করেনি; বরং অধিনায়কের অর্থে প্রভুত্বের দাবি করেছিল। আধুনিক মুফাস্‌সির সাহেব এই আয়াতের আশ্রয় নিয়েও স্বীয় ভ্রান্তি পাকাপোক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। অথচ ভেবে দেখার বিষয় হল– ফিরআউনের

এই কথাবার্তা তার কওমের সাথে কখন হয়েছিল? প্রথম দিকে, নাকি পরবর্তী সময়ে? প্রথম দিকে এই কথাবার্তা হয়ে থাকলে পরবর্তী সময়ে এর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং কীভাবে তার পরিবর্তন হয়েছিল, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধু-'আমি কী মিসর রাজ্যের মালিক নই?' ফিরআউনের এই বাক্যের ভিতর গবেষণা করেও আমাদেরকে ঐ তথ্য বোঝা সম্ভব হচ্ছে না, যা মুফাস্‌সির সাহেব বুঝতে পেরেছেন। কারণ, মিসরের উল্লেখ করেছে বলে শুধুমাত্র এতটুকুই তার দাবী ছিল বলে মেনে নিতে হবে- এই ধারা অনুপাতে বলতে হয় যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত 'এই পৃথিবীর' মালিক নন। কারণ, তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, مالك يوم الدين অর্থাৎ 'তিনি কেয়ামত দিবসের মালিক।' অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, وهو رب العرش العظيم অর্থাৎ, আল্লাহ পাক 'আরশে আজীমের রব'। তাহলে তিনি কেবল 'আরশে আজীমের রব' অন্য কিছুর রব নন। প্রকৃতপক্ষে কুরআনী পরিভাষা এবং ব্যবহারপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তিনি এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

তিন নং ভ্রান্তি

'রব' শব্দের আভিধানিক অর্থের আশ্রয় নিয়েও মুফাস্‌সির সাহেব এই ভুল অর্থের অবতারণা করেছেন। অথচ যখন কোন শব্দের শরীয়তগত অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় তখন আর সেই শব্দের অভিধানগত অর্থ গ্রহণযোগ্য হয় না। এই নিয়মের অধীনেই কোন সময় সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, তালাক, নিকাহ্ ইত্যাদি শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং শরীয়ত এই শব্দগুলোকে যে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছে, কেবল সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ঠিক এমনিভাবে আরবী ভাষায় 'রব' শব্দের আভিধানিক যে কোন অর্থই থাকুক না কেন পবিত্র কুরআনে 'রব' শব্দটি পরিভাষা হিসেবে প্রতিপালকের অর্থে আল্লাহ পাকের জাতকেই বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তিকে 'রব' তথা অধিনায়ক অর্থে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি প্রয়োগ করতে হলে তার পক্ষে শরীয়তের নিকট গ্রহণযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ থাকা আবশ্যক। আর এখানে এ ধরনের কোন প্রমাণ বা যুক্তি বিদ্যমান নেই। ফিরআউনের সার্বিক অবস্থা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফিরআউনের তৎপরতা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ফিরআউন মারাত্মকভাবে আল্লাহ পাকের প্রভুত্বের বিরোধী ছিল। আর তার এই বিরোধিতার পরিণামে যখন সে বিপদগ্রস্থ হল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হয়েছিল তখন সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, আমার প্রভুত্বের দাবি ঠিক নয়, বরং হযরত মূসা (আ.) যাকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিতে দাওয়াত পেশ করেছিলেন সে-ই প্রকৃত প্রভু। ফিরআউন এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল বলেই সে তখন বলেছিল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِیْلَ অর্থাৎ, ঐ সত্তার প্রতি ঈমান আনলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈলগণ ঈমান এনেছে। (সূরা ইউনুস: ৯০)

ফিরআউন কি নাস্তিক ছিল?

মুফাস্‌সির ফখরুদ্দীন রাযী রহ. বলেন,

الا يجوز ان يعتقد الانسان فى نفسه كونه خالقا للسموات والارض ولاجبال والنبات والحيوان والانسان

فان العلم بفساد ذلك ضرورى فمن تشكك فيه كان مجنونا ولو كان مجنونا لما جاز من الله بعثه الانبياء والرسل اليه بل الرجل كان دهريا منكرا للصانع والحشر والنشر وكان يقول ليس الاحد عليكم امر والا نهى الالى.

অর্থাৎ, মানুষের পক্ষে বৈধ নয় নিজেকে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং মানুষের স্রষ্টা বলে মনে ধারণা পোষণ করা। কারণ, এ ধারণা যে মূলত অযৌক্তিক তা মানুষ মাত্রই বুঝতে সক্ষম। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী একজন পাগলই হতে পারে। আর যে পাগল হয় তার প্রতি আল্লাহ নবী রসূল প্রেরণ করবেন তা হয় না। ফিরআউন যদি পাগল হত, তবে তার প্রতি হযরত মূসা প্রেরিত হতেন না। (সুতরাং বোঝা গেল ফিরআউন খোদার অর্থে প্রভুত্বের দাবিদার ছিল না বরং) ফিরআউন একজন নাস্তিক ছিল। সে স্রষ্টা এবং হাশর-নাশরে অবিশ্বাসী ছিল। তার বক্তব্য এতটুকু ছিল যে, তোমাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপকারী আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই।

তাহলে انا ربكم 'আমি তোমাদের প্রভু'-এর অর্থ কি হবে? এর উত্তরে মুফাস্‌সির রাযী বলেন,

معنى مربيكم والمحسن اليكم وليس للعالم اله حتى يكون له عليكم امر ونهى او يبعث اليكم رسولا.

অর্থাৎ, আমিই তোমাদের মুরব্বী এবং মুহসিন (অনুগ্রহকারী), বিশ্বে এমন কোন ইলাহ নেই, যিনি তোমাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের অধিকার রাখেন অথবা তোমাদের প্রতি নবী রসূল পাঠিয়েছেন।

কিন্তু মুফাস্‌সির রাযীর এই বিশেষণ আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। ফিরআউন খোদার অর্থেই প্রভত্বের দাবি করেছিল- একথা ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মনে করি, একজন নাস্তিক মুনাফেক প্রশাসকের জন্য দেবতা বিশ্বাসী প্রজাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে খোদার অর্থে প্রভুত্বের দাবি অসম্ভব কোন কিছু নয়। এই ফিরআউনই প্রজাদের খাতিরে দেবতার পূজাপাটেও লিপ্ত হত বলে মুফাস্‌সিরগণ মত পোষণ করেছেন। বস্তুত ফিরআউনের পক্ষে নাস্তিকতার আড়ালে খোদার অর্থে প্রভুত্বের দাবি করা কোন কঠিন বিষয় নয়। নাস্তিক নমরূদের প্রভুত্বের দাবির বিষয়টি এখানে সম্মুখে রাখলে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা আরও অধিকভাবে সুস্পষ্ট হয়।

ফিরআউন কি মুমিন ছিল?

ফিরআউন পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণের সময় স্পষ্টভাবেই আল্লাহর প্রতি স্বীয় ঈমানের স্বীকৃতি ঘোষণা করেছিল। ফিরআউন বলেছিল,

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ.

অর্থাৎ, আমি ঈমান স্থাপন করলাম ঐ সত্তার প্রতি, বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান স্থাপন করেছে। তিনি ছাড়া অন্য কোন 'ইলাহ' নেই এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত একজন। (সূরা ইউনুস: ৯০)

www.maktabatulabrar.com

প্রশ্ন হল- ফিরআউনের এই স্বীকারোক্তি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণীয় বিবেচিত হতে পারে কি না?

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে পাকে আল্লাহর করুণা, ক্ষমা, খুব বেশি তওবা কবূল করা এবং বাহানা করে বান্দাকে মুক্তি দানের অগণিত সুসংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর দরবারে ফিরআউনের এই নিবেদন ও স্বীকৃতি অবশ্যই গ্রহণীয় হতে পারে। আর হতে পারে বলেই আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী 'ফুতূহাত' গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি যথেষ্ট দলীল প্রমাণের অবতারণা করেছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন-হাদীছের গভীর তথ্যে মনোনিবেশ করলে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর করুণা, ক্ষমা এবং তওবা কবূলের জন্যও কিছু নীতিমালা অবশ্যই রয়েছে। কালামে পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ .

অর্থাৎ, তওবা তাদের জন্য অবশ্যই নয়, যারা অসৎ কাজে অবিরাম লিপ্ত রয়েছে, অতঃপর যখন মৃত্যু তাদের কারও নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তওবা করছি। (সূরা নিছা: ১৮)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . اى ما لم تبلغ روحه حلقومه .

অর্থাৎ, বান্দার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার (আত্মা বের হওয়ার) পূর্ব মুহূর্তের তওবাও আল্লাহ পাক কবূল করে থাকেন। (তিরমিযী)

উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময় ঈমান গ্রহণ করলে সেই ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর উপর ভিত্তি করে ফিরআউনের ঈমান গ্রহণীয় নয় বলে উম্মতে মুসলিমাহ রায় দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর যে সময়টুকুতে ঈমান আনলে গ্রহণযোগ্য হয় না সেই সময়ের সীমা এবং পরিমাণ কী? এই প্রশ্নও কম জটিল নয়, তাই এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে ঈমানের প্রকার সম্পর্কে সঠিক অবগতি লাভের প্রয়োজন।

ঈমানের প্রকার

আকীদা বিশেষজ্ঞগণের মতে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান দুই প্রকার। যথা:-

(১) ঈমান বিল ইখতিয়ার, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ঈমান গ্রহণ করা। এই ধরনের ঈমান যে গ্রহণীয় এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ ব্যাপারে কারও দ্বিমতও নেই।

(২) ঈমান বেলা ইখতিয়ার, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে নয়, বরং বাধ্য হয়ে ঈমান গ্রহণ করা। বাধ্য হয়ে ঈমান গ্রহণের বিভিন্ন দিক হতে পারে।

ক. হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) যুদ্ধের ময়দানে 'কালিমা' পাঠ করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে হযরত খালিদ বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, সে তো মৃত্যুর ভয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে নয়? এর উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, فهلا شققت قبله

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, তাকে হত্যা করার পূর্বে অন্তর খুলে দেখে নিলে না কেন? আর এক রেওয়ায়াতে আছে هل شققت قلبه অর্থাৎ, তুমি কি তার অন্তর খুলে দেখেছ?

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের তলোয়ারের আঘাতের ভয়েই সেই লোকটা ইসলামের স্বীকারোক্তি করেছিল, কিন্তু ভয়েও হোক না কোন এমতাবস্থায়ও ঈমান গ্রহণীয় হতে পারে- এই ঘটনার দ্বারা এটাই বোঝা যায়।

খ. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا .

অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় এবং বাধ্যগতভাবে আসমান এবং যমীনের সকলেই আল্লাহর সাজদা করে থাকে। (সূরা রা'দ: ১৫)

এতে প্রতীয়মান হয়, অনিচ্ছা এবং বাধ্যগত কারণে কৃত আল্লাহর ইবাদতও গ্রহণীয় হতে পরে।

গ. হযরত ইউনুস (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর কওম যখন তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব নাযেল হওয়ার উপক্রম দেখতে পেরেছিল, তখন তারা স্ব-স্ব নবীদের প্রতি ঈমান স্থাপন করেছিল। ফলে তারা সেই কঠোর আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। যদি তাদের এই অবস্থার ঈমান অগ্রহণীয় হত, তাহলে আযাবে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল।

ঘ. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে,

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ .

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, যিনি আর্তনাদকারীর ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করেন। (সূরা নামল: ৬২)

ঙ। হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের প্রতি দাওয়াত পেশ করার জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে এই বলেছিলেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى .

অর্থাৎ, তোমরা তাকে নরম সুরে কথা বলবে, সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ভয় করবে। (সূরা ত্বাহা: ৪৪)

এই আয়াতে (লাআল্লা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ যে,

لعل وعسى من الله تعالى واجبتان .

অর্থাৎ, রব্বুল আলামীনের পক্ষে 'লাআল্লা' এবং 'আসা' শব্দদ্বয় সন্দেহের অর্থে নয় বরং নিশ্চিতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। (রূহুল মাআনী- ৩৯৩/৩)

তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- 'হে মূসা ও হারুন, তোমরা ফিরআউনকে নরম সুরে হেদায়াতের দাওয়াত পেশ করবে। সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে এবং অন্তরে অন্তরে আল্লাহকে ভয় করবে।

সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা মিথ্যা হতে পারে না। অবশ্যই ফিরআউনের ঈমান আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে।

চ. হযরহ ইবনে আব্বাস, সাইদ ইবনে যুবায়ের এবং আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ফিরআউন পানিতে ডুবছিল এবং ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করছিল, তখন জিবরাঈল আমীন ফিরআউনের মুখে মাটি ভর্তি করে দিয়ে নিবারণ করেছিলেন। (দূররুল মানসূর- ৩১৬/৩) যদি এই সময় ফিরআউনের ঈমান গৃহীত হওয়ার সময় হত, তাহলে তার মুখে মাটি ভর্তি করে নিবারণের কি প্রয়োজন ছিল?

উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাধ্য হয়ে ঈমান গ্রহণ করলে তা গ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত হয় এবং ফিরআউন যে অবস্থায় ঈমান গ্রহণের স্বীকারোক্তি করেছিল, এ অবস্থায় তার ঈমান মহান কৃপাময় আল্লাহর দরবারে গৃহীত না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। মূলত আল্লামা ইবনুল আরাবী এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ফিরআউনের ঈমানের স্বীকারোক্তি গৃহীত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

আমাদের দৃষ্টিতে বাধ্য হয়ে আনিত ঈমান গৃহীত হওয়ার পক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। বরং আলোচ্য আয়াত ও ঘটনাকে বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রমাণসমূহে স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণের পক্ষেই দলীল সাব্যস্ত হয়। শুধু একটু গভীর চিন্তার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিম্নের বক্তব্যসমূহ লক্ষ্য করুন।

(ক) যে আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা বাধ্যবাধকতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিতেই স্বইচ্ছার যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা আল্লাহ কঠোর আযাব থেকে বাঁচার ইচ্ছায় তারা ঈমান স্থাপন করেছে, অনিচ্ছায় নয়।

(খ) সাজদার আয়াত দ্বারা প্রমাণ আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, আমলের ব্যাপারে যে পরিমাণ লিখিলতা গ্রহণীয়, ঈমানের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ গ্রহণীয় নয়।

(গ) হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর ঘটনায় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতামত সেই ব্যক্তির ঈমানের নিশ্চয়তার প্রতি নয়, বরং এমতাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

(ঘ) হযরত ইউনুস (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর কওমের প্রতি যে আযাব এসেছিল, সে আযাব তাদেরকে আক্রান্তকরণের জন্য ছিল না, বরং শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শন করাই ছিল মূলত উদ্দেশ্য, যাতে তারা আযাব দেখে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ধাবিত হয়। এ কারণেই ঈমান স্থাপনের পর মুহূর্তেই আযাব দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। ويكشف السوء বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই এই বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয়। আর ফিরআউনের প্রতি যে আযাব এসেছিল তা তাকে ঈমান গ্রহণের প্রতি ধাবিতকরণের জন্য নয়; বরং কঠোর আযাবে আক্রান্তকরণের জন্য এবং তাতে আক্রান্ত হয়েছেও বটে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আসমান যমীনের যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা তো সুস্পষ্ট।

(ঙ) لعل (লাআল্লাহ) শব্দের দ্বারা প্রমাণ পেশ করা নিছক আভিধানিক প্রমাণ। এ ধরনের প্রমাণ গ্রহণীয় বিবেচিত হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে-

১। জুমহুরের ঐক্যমতের বিরোধী না হওয়া, অথচ এইমত জুমহুরের ঐক্যমতের বিরোধী। আল্লামা আলূসী বলেন,

لا يلزمنا اتباعه فى ذلك والاخذ به لمخالفته ما دل عليه الكتاب والسنة وشهدت به ائمة الصحابة والتابعين فمن بعد هم من المجتهدين .

অর্থাৎ, এ বিষয়ে ইবনুল আরাবীর মতামতের অনুসরণ করা এবং তা গ্রহণ করা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। কারণ, এ মতটি এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহের দ্বারা প্রমাণিত মতামতের এবং যে যে মতামতের স্বীকৃতি-বিশিষ্ট সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামের কর্ণধার মুজতাহিদীনগণ দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধী। (রূহুল মাআনী- ১৮৮/১১)

২। لعل (লাআল্লা)-এর এই অর্থ কেবল مواعيد 'মাওয়ায়ীদ' অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি সমূহের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়, অন্যত্র নয়।

৩। لعل (লাআল্লা)-এর দ্বারা নিশ্চিতের অর্থ গ্রহণের বিষয়ে অভিধান বিশেষজ্ঞগণ একমত নন। অনেক ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রশ্নের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আখফাশ এবং কাসায়ী سبب অর্থাৎ, 'কারণ'এর অর্থে ব্যবহার করাকে আসল অর্থ বলে মন্তব্য করেছেন। আভিধানিক ফাররাও এইমত পোষণ করেছেন। (লিসানুল আরব- ৬০৭/১১)

কেউ কেউ শব্দটি طلب অর্থাৎ, সাধারণ চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেও মন্তব্য করেছেন এবং আলোচ্য ক্ষেত্রেও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মতামত পেশ করেছেন। (রূহুল মাআনী- ১৯৪/১৬)

আল্লামা বাগাবী, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী এবং আবূ মালেকের মতামতও ঐ ধরনেরই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'লাআল্লা' শব্দটি শুধু 'নিশ্চয়তা' অর্থ প্রদান করে ধরে নিয়ে ফিরআউনের ঈমানের বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

৪। লাআল্লা শব্দটি নিশ্চিত আশা-র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ধরে নিলেও ইবনুল আরাবীর মতামত সাব্যস্ত হয় না। আর হয় না বলেই মুফাস্সির আবূ সাঈদ (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী) তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন,

وهوراجع الى المخاطبين والجملة فى محل النصب حال من ضمير هما فى قولا اى فقولا له قولا لينا راجين ان يذكر او يخشى .

অর্থাৎ, নিশ্চিত আশা পোষণের বিষয়টি হযরত মূসা এবং হারূনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। আর সম্পূর্ণ বাক্য নছবের স্থলে। অর্থাৎ, বাক্য قولا 'কূলা'- এই দ্বিবাচক ক্রিয়ার যমীর থেকে হয়েছে অর্থাৎ, قولا এর যমীর দ্বারা যাদেরকে (হযরত মূসা এবং হযরত হারূনকে) উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে এই- 'তোমরা দুজন (মূসা ও হারুন) ফিরআউনকে নম্র স্বরে আহ্বান জানাও এই আশা পোষণ করে যে, সে হয়ত নছীহত কবূল করবে এবং ভয় করবে। (আবুস সূউদ) যখন মানুষ কাউকে দাওয়াত পেশ করে, তখন তার এ ধরনের আশা পোষণ করা উচিৎ। তোমরাও তাই কর। মুফাস্সিরগণও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। আল্লামা রাগিব ইসফাহানীর (মৃত্যু ৫০২ হিজরী) বক্তব্যের দ্বারাও এই অর্থ অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি পায়। তিনি বলেন,

لعل وان كان طمعا فان ذلك يقتضى فى كلامهم تارة طمع المخاطب وتارة طمع غيرهما .

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, 'লাআল্লা' শব্দ দ্বারা 'আশা পোষণ'-এর অর্থ গৃহীত হলেও আরবী পরিভাষায় যাকে সম্বোধন করা হয় তার আশা পোষণ বোঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়। (আলোচ্য আয়াতে তা-ই হয়েছে।) আর কখনো মুখাতাব এবং মুখাতিব (অর্থাৎ, যে সম্বোধন করে এবং যাকে সম্বোধন করা হয়) উভয়কে ছাড়া অন্যকে বোঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়। (আল মুফরাদাত– ৫৪)

৫। লাআল্লা শব্দের আভিধানিক যে অর্থ ধরে নিয়ে ইবনুল আরাবী ভিন্নমত পোষণ করেছেন, সেটা এজন্যেও গ্রহণীয় হতে পারে না যে, তাহলে নিম্নের আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে জটিলতা এবং বিরোধ সৃষ্টি হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ. وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۫ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ. فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ, আমি আদ এবং ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। তাদের ঘর-বাড়ি থেকেই তা তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শয়তান তাদের কর্মকাণ্ড তাদের জন্য শোভনীয় করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনে বাধা প্রদান করেছিল। অথচ এরা ছিল খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী। আর কারূন, ফিরআউন এবং হামানকেও ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের নিকট বাস্তব নিদর্শনাবলিসহ আগমন করেছিল। কিন্তু তারা দেশে অহংকার-ত্রাস সৃষ্টি করল। তবে তারা আমার কঠোর শাস্তি এড়াতে পারেনি। বস্তুত তাদের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অপরাধের পরিণামে আমি শাস্তি দিয়েছি। তাদের কারও প্রতি আমি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করেছি, কাউকে ধরেছি প্রলয়ময় মহানাদে, কাউকে ভূগর্ভে গেড়ে ফেলেছি, আর কাউকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। (সূরা আনকাবূত: ৩৮–৪০)

৬। উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ফিরআউনের ঈমান আল্লাহর নিকট গৃহীত নয়। মুফাস্সির আলূসী বলেন,

فانه هو فى استمرار فرعون على الكفر والمعاصى الموجبه لما حل به.

অর্থাৎ, ফিরআউন কুফরী এবং গোনাহের উপর (মৃত্যু পর্যন্ত একান্তভাবে) সর্বদা বিদ্যমান ছিল (এবং কুফরীর উপরই মৃত্যু হয়েছে, তার ঈমান মোটেই গৃহীত হয়নি।) আর এ কারণেই তাকে কঠোর শাস্তিতে আক্রান্ত হতে হয় (সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।)। [রূহুল মাআনী– ১৮৭/১১]

৭. আল্লাহ পাক কর্তৃক শিশু মূসাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার নির্দেশ প্রদান মর্মে কুরআনে কারীমের বর্ণনা নিম্নরূপ–

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ .

অর্থাৎ, (হে মূসার মাতা!) তুমি মূসাকে সিন্দুকে রেখে সমুদ্রে ছেড়ে দাও, সমুদ্র তাকে তীরে ঠেলে দিবে, যাতে আমার শত্রু এবং তার (মূসার) শত্রু তাকে নিয়ে যায়। (ত্বহা : ৩৯)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ফিরআউনকে হযরত মূসার এবং স্বয়ং নিজের শত্রু বলে

www.maktabatulabrar.com

আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহর শত্রু, সে মুমিন হতে পারে না। ফিরআউনের মৃত্যুর সময় তার ঈমান গৃহীত হয়নি। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে সে শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় হিসেবে নয়। আয়াতটি রহিতও হয়নি।

৮। আল্লাহ পাক ফিরআউনের অবস্থা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ, আমি ঈমান স্থাপন করলাম সেই সত্তার প্রতি, বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান স্থাপন করেছে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন 'ইলাহ' নেই এবং আমি মুসলামনদের অন্তর্ভুক্ত একজন। (সূরা ইউনুস: ৯০)

কিন্তু ফিরআউনের এই ঈমান দুই কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

(১) ফিরআউন আসলে অন্তর থেকে এই স্বীকৃতি দেয়নি এবং এ বিশ্বাস তার অন্তরেও ছিল না। শুধু বনী ইসরাঈলের অনুসরণে বিপদ মুক্তির জন্য সে এই ধরনের স্বীকারোক্তি করেছে, অথচ কেবল অনুকরণে ঈমান গ্রহণকারীকে প্রকৃতপক্ষে ঈমান গ্রহণ করেছে বলে আখ্যায়িত করা যায় না। বিশেষ করে খোদায়ীর দাবিদার ফিরআউনের বেলায় তো মোটেই না।

(২) ফিরআউনের ঈমান এজন্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়নি। আর রিসালাতের প্রতি নিরঙ্কুশ ঈমান স্থাপন করা ছাড়া আল্লাহর প্রতি যে ঈমানের প্রকাশ করা হয় তা গ্রহণযোগ্য হয় না। (রূহুল মাআনী : ১৮৭)

ফিরআউনের মুখে মাটি দেয়া হল কেন

একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কেন ফিরআউনের মুখে মাটি ভর্তি করে দিয়েছিলেন? এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ সময় ফিরআউনের ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত অবকাশ ছিল। গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত অবকাশ ছিল বলেই তার ঈমান যাতে গৃহীত না হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার মুখে মাটি ভর্তি করে দিয়েছেন। এখন কথা হল, কাউকে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা জায়েয কি না? না হয়ে থাকলে হযরত জিবরাঈল (আ.) কী করে ফিরআউনকে ঈমান থেকে বিরত রাখতে স্বচেষ্ট হলেন? এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

(ক) ফিরআউনের মত নির্যাতনকারী এবং যার ঈমান গৃহীত না হওয়াই আল্লাহর ইচ্ছা, যার মৃত্যু কুফরীর উপর হওয়া নির্ধারিত, তার মৃত্যু ঈমানের উপর না হয়– এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অথবা কামনা করা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং নবী এবং ফেরেশতাগণ এ বিষয়ে আল্লাহ কর্তৃক অবগত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা মোটেই আপত্তির কোন কিছু নয় (ফয়জুল বারী)। আর কোন প্রকার আপত্তির কারণ নেই বলেই হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কামনা করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে এই ধরনের ব্যবস্থা কামনার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন যথা হযরত মূসা (আ.) অতিষ্ঠ হয়ে এই কামনা এবং দোয়া করেছিলেন যে,

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

অর্থাৎ, হে প্রভু! এদের সহায়-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং এদের অন্তরে মোহর এঁটে দাও, যাতে

এরা ঈমান গ্রহণ করতে না পারে যতক্ষণ না কঠোর আযাবে আক্রান্ত হয়। (সূরা ইউনুস: ৮৮)

(খ) অন্তর দিয়ে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাকে ঈমান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা অথবা এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা মারাত্মক ধরনের অপরাধ, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ অপরাধ আযাব তুল্য কি না- এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে,

ان الرضا بكفر الغير كفر .

অর্থাৎ, অন্যের কুফ্‌রীর প্রতি রাজি থাকাও কুফ্‌রী।

কিন্তু হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এ মন্তব্য যে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা সুস্পষ্ট। কারণ, যাদের ঈমান গ্রহণ না করা আল্লাহর নিকট চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত, তাদের কুফরীর পক্ষে রাজি থাকা মোটেই দূষণীয় কোন কিছু নয়, কিন্তু যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে অথবা যারা ঈমান গ্রহণ করে সৌভাগ্যশীল হয়েছে, তাদের জন্য কুফ্‌রীর কামনা করা বা তার চেষ্টা করা অবশ্যই কুফ্‌র তুল্য অপরাধ বৈ কি? ইমাম আবূ মানসুর মাতুরিদী রহ. থেকেও এধরনের মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

অতএব জিবরাঈল (আ.) যেহেতু ফিরআউনের কুফ্‌রীর উপর মৃত্যু হওয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন, তাই আল্লাহ কর্তৃক শাস্তিস্বরূপ তার মুখে মাটি ভর্তি করেছিলেন। এ হচ্ছে ফিরআউনের মুখে মাটি ভরা সম্পর্কিত হাদীছটি যদি বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়। পক্ষান্তরে অনেকেই এ হাদীছটি বিশুদ্ধ নয় বলেও মন্তব্য করেছেন।

মোট কথা, ফিরআউনের ঈমান গ্রহণীয় বলে যারা মন্তব্য করেছেন এবং তারা যে সকল দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন তার কোনটিই গ্রহণযোগ নয়। আর গ্রহণযোগ্য নয় বলেই উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতকে এ ধরনের প্রমাণাদির কারণে অবজ্ঞা করা কোন মতেই সমীচীন নয়।

ইবনুল আরাবীর প্রকৃত মতামত

ফিরআউনের ঈমান গৃহীত হয়েছে কি না? এ সম্পর্কে ইবনুল আরাবীর প্রসিদ্ধ মত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ফিরআউনের ঈমান গৃহীত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তার এই মত উম্মতে মুসলিমার একান্ত বিরোধী।

কিন্তু ইবনুল আরাবীর এটাই কি চূড়ান্ত মত? একথা নিঃসন্দেহে বলা মুশকিল। কারণ, ইবনুল আরাবীর প্রসিদ্ধ দুটি কিতাবের তিন জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। সে আলোচনা পরস্পর বিরুদ্ধ এবং একধরনের নয়। যেমন তিনি ফুতূহাতের একস্থানে জাহান্নামীদের চার প্রকার বর্ণনা করে বলেন,

وهو اربع طوائف كلهم فى النار لا يخرجون منها .

অর্থাৎ, জাহান্নামীদের চারটি দল এরকম হবে, যাদের প্রত্যেকটি দলই জাহান্নামী হবে এবং তারা সদাসর্বদা জাহান্নামেই থাকবে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না মোটেই।

অতঃপর এই চার দলের প্রথম দলের উল্লেখ করে ইবনুল আরাবী বলেন,

الطائفة الاولى المتحيرون على الله تعالى كفرعون واشباهه ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله تعالى فقال ما علمت لكم من اله غيرى وقال انا ربكم الاعلى يريد به ما فى السماء غيرى وكذلك نمرود وغيره .

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, প্রথম প্রকারের লোক হল তারা, যারা আল্লাহর উপর বড়ত্বের অহমিকা প্রদর্শন করেছে, যেমন ফিরআউন এবং তার মতই যারা নিজের জন্য প্রভুত্বের দাবি করেছে এবং আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করেছে আর বলেছে, আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই। আরও বলেছে, 'অমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু। এ কথা দ্বারা ফিরআউন বোঝাতে চেয়েছে যে, আসমানেও আমি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই। নমরূদ এবং আরও অনেকেই এ ধরনের দাবি করেছে।

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইবনুল আরাবী ফিরআউনকে চির-জাহান্নামী বলেই বিশ্বাস করেন। আর যেহেতু কোন মুমিন চির জাহান্নামী হয় না, তাই বোঝা বোঝা যায়, ইবনুল আরাবী ফিরআউনকে মুমিন মনে করতেন না। কারণ, তিনি ফিরআউনকে চির-জাহান্নামী বলে মন্তব্য করেছেন। ফুতূহাতের নির্ভরযোগ্য 'ইবনুস সাওয়াকীনের' সংকলনেও ইবনুল আরাবীর উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এজন্যই আল্লামা শা'রানী এই মতটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত পোষণ করেছেন এবং এর বিরোধী মতটিকে পরবর্তী সময়ে কারও পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিন্তু ফুতূহাতের শেষের দিকে ইবনুল আরাবী ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বস্তুত একই কিতাবে দুই ধরনের মন্তব্য রয়েছে। অবশ্য ইবনুল আরাবীর আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ফুছুছুল আহকামে' তিনি নিশ্চিতভাবে 'ফিরআউনের ঈমান গৃহীত, বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনুল আরাবী তার শেষের এই মতের স্বপক্ষ্যে যেমন প্রমাণ পেশ করেছেন, ইতিপূর্বে সেগুলোর অসারতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। ইবনুল আরাবীর পক্ষ সমর্থন করে আল্লামা জালালুদ্দীন দাওয়ানী একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। (তারিখে হালাবীর মতে এই গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা দাওয়ানী নয়, বরং মুহাম্মদ ইবনে হেলাল নামক এক আরবী ব্যাকরণ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ব্যক্তি এই গ্রন্থের মূল প্রণেতা। মূলত এই অভিমত ইবনে হাজার আসকালানীর।) কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা কাজবিনী এর কঠোর প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছেন। আল্লামা বাহরুল উলূম মছনবীর শরাহগ্রন্থে ইবনুল আরাবীর মতের সঠিক মূল্যায়নের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

হুসসামী ও খাইরুল জারীর লেখক এবং মুল্লা মাহমূদ জৌনপুরী প্রমুখ লেখকগণও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু সত্য বলতে কি, তারা এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ. বলেন, ফিরআউনের ঈমান গৃহীত বলে ইবনুল আরাবীর যে মত বর্ণিত হয়েছে, এটাই আসলে তার শেষ মত ছিল বলে আমার ধারণা। কারণ, এর স্বপক্ষে যে ধরনের সূক্ষ্ম ও গভীর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা কেবল ইবনুল আরাবীর মতো ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ইবনুল আরাবীর এই মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতেরও বিরোধী বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে,

اذا اختلف كلام امام يؤخذ منه بما يوافق ادلة ويعرض عما خالفها .

অর্থাৎ, যখন কোন ইমাম থেকে একই বিষয় দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়, তখন যে মতটি অকাট্য প্রমাণের মোতাবেক হয়, সেই মতটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং যে মতটি অকাট্য প্রমাণের বিরোধী সে মতটি বর্জনীয় বলে গণ্য হবে।

এই মূলধারা অনুপাতে আমরা ইবনুল আরাবীর ঐ মতামতকেই প্রাধান্য দিতে চাই, যে মতটি উম্মতে মুসলিমার সমর্থনে ফুতূহাতে বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, ফিরআউনের ঈমান গৃহীত হয়নি।

একান্তই যদি বাস্তবে ইবনুল আরাবীর মত এই না হয়ে থাকে, তবে তার ভিন্ন মতটি উম্মতে মুসলিমার বিরোধী বলে অগ্রহণীয় হবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হযরত ইবনুল আরাবীর মর্যাদা এবং গভীর জ্ঞানের পরিপূর্ণ স্বীকৃতির পরও তার সমস্ত মত গ্রহণ করা এবং সেই মোতাবেক বিশ্বাস স্থাপন করা মোটেই জরুরী নয়। বস্তুত এ বিষয়ে তার ভ্রান্তি ঘটেছে, এটা মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর মানুষমাত্র তার ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। হযরত ঈমাম মালিক রহ. বলেছেন,

ما من احد الاماخوذ من قوله ومردود عليه الاصاحب هذا القبر يعنى النبى صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, প্রত্যেকের কথায় কিছু গ্রহণীয় আর কিছু অগ্রহণীয় হতে পারে; তবে যিনি এই কবরে শুয়ে আছেন তাঁর প্রত্যেকটি কথাই গ্রহণীয়, বর্জনীয় একটিও নেই। অর্থাৎ, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আলী (রা.) বলেন,

لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال.

অর্থাৎ, কে বলেছে সেদিকে লক্ষ্য করো না, কী বলেছে সেদিকে লক্ষ্য কর।

ফিরআউন জাহান্নামী

ফিরআউন সম্পর্কে ইবনুল আরাবীর মতের বাতুলতা এবং অসারতা আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফিরআউনের ঈমান গৃহীত হয়নি। আর গৃহীত হয়নি বলেই তার মৃত্যু কুফরীর উপর হয়েছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এজন্যে ফিরআউনকে মৃত্যুর পর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে নিম্ন আয়াতে প্রকাশ্যে ঘোষণা রয়েছে। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى.

অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে (ফিরআউনকে) ইহকাল ও পরকালের আযাবে পাকড়াও করেন। (সূরা নাযিআত : ২৫)

الاولى (আল উলা) শব্দের দ্বারা দুনিয়াকে এবং الاخرة (আল আখিরাতি) শব্দ দ্বারা 'আখেরাত' কে বোঝানো হয়েছে (মাজহারী- ১৯০)। অর্থাৎ, আমি ফিরআউনকে পৃথিবীর বুকে এই শাস্তি দিয়েছি যে, তাকে সমুদ্রে ডুবিয়েছি এবং আখেরাতে কাফের হিসেবে যে ধরনের শাস্তি দেয়ার তা যদি দেয়া না হত, তাহলে আখেরাতের শাস্তির এ ঘোষণা অবশ্যই দেয়া হত না। আল্লামা আলূসীসহ সকল মুফাস্সির উল্লিখিত আয়াতে আখেরাত এবং পৃথিবী উভয় জগতের কথা বলা হয়েছে বলেই মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং الاولى (আল উলা) দ্বারা ফিরআউনের প্রথম উক্তি مالكم من اله غيرى 'আমি ব্যতীত ইলাহ নেই' এবং الاخرة (আল আখিরাতি) দ্বারা ফিরআউনের দ্বিতীয় উক্তি انا ربكم الاعلى 'আমি তোমাদের বড় প্রভু'

উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে যারা মন্তব্য করেছেন- এ মন্তব্য যে মোটেই বোধগম্য নয়, এটাই প্রমাণিত হয়। এ মন্তব্য বোধগম্য নয় তা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যথা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى.

অর্থাৎ, এবং পরকাল ও ইহকাল উভয়টিই আমার। (সূরা: আল-লাইল)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى.

অর্থাৎ, আর পরকাল তোমার জন্য ইহকাল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। (সূরা : দুহা)

অন্য একস্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى.

অর্থাৎ, বস্তুত ইহকাল এবং পরকালের মালিক আল্লাহই। (সূরা নাজম : ২৫)

এই আয়াতসমূহে শব্দ দুইটির ঐ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও ঐ একই অর্থ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসংগত। প্রকারান্তরে এ অর্থ আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথেও অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা ভয় করে এতে রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ।

এই উপদেশসমূহ পার্থিব জগতের জন্যও এবং পরকালের জন্যও। এই উপদেশসমূহ দ্বারা যেমন একদিকে তারা পার্থিব জগতে সঠিক পথের সন্ধান নিতে পারে, অন্য দিকে নিতে পারে পরকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

(নিশ্চয়ই যারা ভয় করে এতে রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ।)

উপদেশসমূহ

হযরত মূসা এবং ফিরআউনের হৃদয়স্পর্শী এই ঘটনায় বিশ্ব-মানবের জন্য কী এবং কোন ধরনের উপদেশ রয়েছে, যে ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম অনেক কিছুই বলেছেন। সেগুলো সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। দাওয়াতের ক্ষেত্রে : দ্বীনের দাওয়াত কাফেরকেও পৌঁছাতে হবে, নির্যাতনের ভয়ে পিছপা হওয়া যাবে না, কাফের দাওয়াত কবুল করুক অথবা না করুক। হযরত মূসা (আ.) তা-ই করেছেন। সুতরাং হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার উম্মত, তোমাদেরকেও মূসা (আ.)-এর এই আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।

২। সত্যের সফলতা সুনিশ্চিত: দ্বীনের দাওয়াতের ময়দানে বাতিলের সাথে মোকাবেলা অবশ্যই

www.maktabatulabrar.com

হবে এবং আহলে হকের উপর বিভিন্ন ধরনের অসহনীয় নির্যাতন, উপহাস চলবে, কিন্তু শেষ পরিণামে সফলতা কেবল আহলে হকেরই হবে, হযরত মূসা (আ.)-এর সফলতা এবং ফিরআউনের ধ্বংস হওয়া থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

৩। বাতিলের ধ্বংস আবশ্যম্ভাবী: হকের সম্মুখে বাতিল যত শক্তিশালী হয়েই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, বাতিল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের মোকাবেলায় যেভাবে বিজয়ী করেছেন এবং হযরত মূসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে যেভাবে সবকিছুর অধিকারী করেছেন, এতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বস্তুশক্তি দ্বারা বাতিলের মোকাবেলা সম্ভব না হলে হকের পক্ষে খোদায়ী সাহায্য অবতীর্ণ হবে এবং আল্লাহ পাক স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে হলেও পরিণামে হককে বিজয়ী ও প্রবল করে দিবেন।

৪। হযরত মূসা (আ.) এবং ফিরআউনের এই ঘটনায় রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের দাবীদারদের জন্য শান্তির বাণী।

৫। যারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নির্যাতনমুখী হয়ে উঠবে, তাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হবে না এবং তার দাওয়াতেরও কোন ক্ষতি হবে না; তবে যারা এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবে তারা পরিশেষে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেমন ফিরআউন এবং তার সহচররা হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবেলায় ধ্বংস হয়েছে।

৬। যারা নবীদের সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়, নবীদের সাথে বেয়াদবী করে, তাদেরকে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে, কথা-বার্তা ও কাজে কর্মে তাদের বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তাদের সমালোচনা করে, তাদের জন্য ইহকাল এবং পরকাল উভয়টি দুঃখজনক, ভয়াবহ।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন,

ان يدع التمرد على الله تعالى والتكذيب لانبيائه خوفا من ان ينزل به ما نزل بفرعون وعلما بان الله ينصر انبيائه ورسله.

অর্থাৎ, ফিরআউনের ঘটনা থেকে এই শিক্ষা হাসিল করা যায় যে, আল্লাহর সম্মুখে অহংকার করা এবং নবীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে এই ভয়ে যে, তার উপর আযাব নাযেল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাক তাঁর নবী-রসূলগণকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿۲۷﴾	(২৭) আচ্ছা তোমাদেরকে (দ্বিতীয়বার) সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না কি আসমান? আল্লাহ যেটা সৃষ্টি করেছেন।
رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾	(২৮) তিনি তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তা সঠিক ও সুবিন্যস্ত বানিয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿۲۹﴾	(২৯) এবং তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার সূর্যালোক (দিন)-কে প্রকাশ করেছেন।
وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۰﴾	(৩০) এবং এরপর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।
اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿۳۱﴾	(৩১) তিনি জমিন থেকে তার পানি ও তৃণ বহির্গত করেছেন।
وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿۳۲﴾	(৩২) এবং তিনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾	(৩৩) তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর উপকার সাধনের জন্য।

শব্দার্থ

اَشَدُّ অধিক কঠিন, بَنٰىهَا আসমান নির্মাণ-তৈরি করেছেন, رَفَعَ উচ্চ করেছেন, سَمْكَ উচ্চতা, ছাদ, فَسَوّٰهَا সমান করেছেন, পরিস্কার করেছেন, সুবিন্নস্ত করেছেন, اَغْطَشَ অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন, اَخْرَجَ প্রকাশ করেছেন, বের করেছেন, ضُحٰىهَا তার আলো, সূর্য, দিন, دَحٰىهَا বিস্তৃত, প্রসারিত করেছেন, সমতলভাবে, مَآءَهَا তার পানি, مَرْعٰىهَا চারা, তরুলতা, উদ্ভিদ খাদ্য, اَلْجِبَالَ পাহাড়- পর্বতকে, اَرْسٰىهَا সংস্থাপন করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, مَتَاعًا উপকরণ ও ভোগ্য সামগ্রী, اَنْعَام চতুষ্পদ জন্তু।

তাফসীর

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ . (আচ্ছা তোমাদেরকে (দ্বিতীয়বার) সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, নাকি আসমান?)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা (তাও একবার সৃষ্টি করার পর) আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করা থেকে অধিক কঠিন তো নয়। যখন এত বড় বড় সৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার কর, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে কেন দ্বিধা পোষণ করছ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا . (তিনি তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তাকে সঠিক ও সুবিন্যস্ত বানিয়েছেন।)

আসমানের প্রতি লক্ষ্য কর, কত সুউচ্চ, মজবূত, কত স্বচ্ছ, সমতল। কেমন সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত। কি অপূর্ব নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় আবর্তিত হচ্ছে রাতের পর দিন, দিনের পর রাত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا (এবং এরপর যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আসমান সৃষ্টির পর যমিনকে বর্তমান রূপে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং আসমান সৃষ্টির পূর্বে যমীনের মৌল পদার্থ সৃষ্টি করেছিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰهَا (তিনি যমীন হতে তার পানি ও তৃণ বহির্গত করেছেন।)

অর্থাৎ, তিনি নদ-নদী ও নহর প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর পানি দ্বারা তৃণলতা, শাক-সবজি সৃষ্টি করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ (তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলির উপকার সাধনের জন্য।)

অর্থাৎ, যা কিছু করা হয়েছে তা সব তোমাদেরই উপকারের জন্য। এসব না হলে তোমাদের জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়ত। সুতরাং তোমাদের উচিৎ আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা, তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলা এবং তাঁর অপার কুদরতের নিদর্শনাবলি অবলোকন করে পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হওয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে।)

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾	(৩৪) অতঃপর যখন সেই মহা আচ্ছন্নতার দিবস সমাগত হবে,
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾	(৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে
وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾	(৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য।
فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾	(৩৭) এতএব যে কেউ সীমালঙ্ঘন করেছে,
وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾	(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে,
فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾	(৩৯) নিশ্চয়ই জাহান্নামই তার অবস্থিতি স্থান।
وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾	(৪০) আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং স্বীয় আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি থেকে সংযত রেখেছে।
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾	(৪১) নিশ্চয়ই হবে জান্নাতই তার ঠিকানা।

শব্দার্থ

فَاِذَا অতঃপর যখন, جَآءَتْ সমাগত হবে, সংঘটিত হবে, উপস্থিত হবে, الطَّآمَّةُ হাঙ্গামা, বিপদ সংকট, দুর্ঘটনা, الْكُبْرٰى বিরাট, يَتَذَكَّرُ স্মরণ করবে, لِمَنْ يَّرٰى দর্শকদের জন্য فَاَمَّا অতএব, مَنْ যে কেউ, طَغٰى সীমালঙ্ঘন করবে, দৌরাত্ম্য করবে, اٰثَرَ প্রাধান্য দিবে, অগ্রাধিকার দিবে, الْحَيٰوةَ পার্থিব জীবন, الْمَاْوٰى বাসস্থান, আবাস, ঠাই, ঠিকানা, خَافَ ভয় করেছে, مَقَامَ সম্মুখে দাঁড়ানোকে, رَبِّهٖ তাঁর প্রভুর, তার প্রতিপালকের, نَهَى বিরত রেখেছে, সংযত রেখেছে, النفس মন, আত্মা, الهوى কুপ্রবৃত্তি।

www.maktabatulabrar.com

যোগসূত্র

(ক) আল্লামা আলূসী বলেন: شروع بيان معادهم اثر بيان معاشهم অর্থাৎ, ইহকালের আলোচনার পর এখান থেকে পরকালের আলোচনার আরম্ভ। (রূহুল মাআনী- ৩৫/৩০)

আল্লামা রাযী বলেন,

انه تعالى ذكر كيفية خلق السماء والارض ليستدل بها على توفه قادرا على الحشر والنشر فلما قرر ذلك وبين امكان الحشر والنشر عقلا اخبر بعد ذلك عن وقوعه.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক আসমান এবং যমীন সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করার মাধ্যমে এ কথা সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিতকরণে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। সুতরাং যখন জ্ঞানের দৃষ্টিতেও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্ভব বলে সাব্যস্ত হল, তখন পরক্ষণেই এর বাস্তবতার আলোচনা করেছেন। (কাবীর- ৩২৯/৮)

মূলত উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং বিশ্লেষণ এভাবে করা যায় যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আসমান এবং যমীন সৃষ্টির আলোচনার মাধ্যমে একদিকে একথা মানুষকে জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই তিনি পুন-র্জীবনে সক্ষম। অপরদিকে পরোক্ষভাবে একথাও সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ পাকই সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র লা-শরীক স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা। তিনি সৃষ্টির উপকারের জন্য এ ভূমণ্ডলকে বিছানা হিসেবে প্রস্তুত করেছেন এবং আসমানকে ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার উভয় থেকে সৃষ্টির সার্বিক উন্নতি ও সফলতার সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা করেছেন। অতএব উপাস্য মাত্র তিনিই, অন্য কেউ নয়। সর্বক্ষেত্রে তিনিই সাহায্যকারী। সুতরাং তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিৎ, অন্যত্র নয়। এই স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে বান্দার কৃতজ্ঞশীল হওয়ার প্রমাণ। অন্যথায় বান্দা অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে, যা খুবই মারাত্মক। প্রকারান্তরে এই বিশ্বাস ও একীনকেই তাওহীদ অথবা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি অবিচল বিশ্বাস বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক পূর্বের আয়াতসমূহ দ্বারা এ বিষয় সাব্যস্ত করার পর আলোচ্য আয়াতে বলছেন, বস্তুজগত এবং এই সবকিছু শেষ হওয়ার সময় নিশ্চয়ই আসবে, যে সময় সমস্ত মানুষকে অবশ্যই এই জগৎ এবং সমস্ত ভোগ-সামগ্রী ছেড়ে দিয়ে অন্য এক জগতে চলে যেতে হবে। সে জায়গাকে বলা হয় পরকালের জগৎ। সেখানে নিজ কর্মকাণ্ডের ভাল-মন্দ ফলাফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। শুধু প্রত্যক্ষই করবে না; বরং পৃথিবীতে যে মানুষ অপরাধপ্রবণ, অসৎপরায়ণ এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে মাতাল ছিল, তারা সেখানে কঠোর পরিণামে আক্রান্ত হবে। আর যারা প্রবৃত্তির সাথে মোকাবেলা করে আমল করতে সমর্থ হয়েছিল, তারা সেদিন অতুলনীয় প্রতিদানে পুরস্কৃত হবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিকারী হয়ে জান্নাতবাসী হবে। এই উভয় প্রকার প্রতিদান কখন হবে? এরই বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যখন মহা বিপদ সমাগত হবে অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং হাশরের ময়দানের কৃতকর্মের বিচার-আদালত বসবে।

তাফসীর

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (অতঃপর যখন সেই মহা বিপদ সমাগত হবে,)

এ আয়াত দ্বারা হাশর-নাশরের বাস্তবতা সাব্যস্ত হয়েছে। এ আয়াতের মধ্যে হাশর-নাশর হবে সেদিক ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ত্বাম্মাহ) মহা বিপদকে বলা হয়, যে বিপদের মোকাবেলা করা অসম্ভব এবং সমস্ত মহা বিপদের তুলনায় অধিক মহা বিপদ। (অবুস সুউদ- ৮৭/৯) মহা বিপদ দ্বারা এখানে কী বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি মতামত তুলে ধরা হল।

(১) মুফাস্‌সির সুফইয়ান ছাওরী বলেন,

هى الساعة التى يسلم فيها اهل النار الى الزبانية .

অর্থাৎ, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের প্রহরীদের নিকট হাওয়ালা করে দেবার সময়কে বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী- ২০৭/১৩)

(২) মুফাস্‌সির মুজাহিদ এবং কাসিম হামদানী বলেন,

حين يساق اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار .

অর্থাৎ, জান্নাতীদেরকে জান্নাতের দিকে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময়কে বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী- ২০৭/১৩)

(৩) তাফসীরে আবুস সুউদে বলা হয়েছে,

هى الساعة التى يساق الخلائق الى محشرهم .

অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টিকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার সময়কে বুঝানো হয়েছে। (আবুস সুউদ)

(৪) তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, هى النفخة الثانية দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের সময়কে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৫) আল্লামা মাহমূদ আলূসী বলেন,

ان الطامة الكبرى صارت كالعلم للقيامة

অর্থাৎ, 'তাম্মাতুল কুবরা' কেয়ামতের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

মূলত এই মতামতসমূহের মধ্যে উপস্থাপনার পার্থক্য ছাড়া আসলে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ একে কেয়ামতের নামকরণ করা অধিক শ্রেয় উপস্থাপন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার পেছনে দুটি যুক্তিও রয়েছে।

(১) একটি হল, কেয়ামতের সময় বর্ণিত সকল অবস্থারই প্রকাশ ঘটবে, অবশ্য পূর্ব পরের প্রশ্ন আছে, কিন্তু ঘটবে সবটাই।

(২) দ্বিতীয় হল, এর স্বপক্ষে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও মত প্রদান করেছেন। মুনযিরী এবং ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত এভাবে বর্ণনা করেছেন,

الطامة من اسماء يوم القيامة .

অর্থাৎ, 'ত্বাম্মাহ' কেয়ামতের নামসমূহ হতে একটি নাম। (দুররুল মানসূর)

www.maktabatulabrar.com

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও এর যৌক্তিকতা বোঝা যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

والساعة ادهى وامر .

অর্থাৎ, কেয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও তিক্তকর।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (সে দিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে।)

হাশরের দিন অত্যন্ত ভয়াবহ দিন। সেদিন মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম সব কিছুই প্রকাশ হয়ে যাবে এবং মানুষ তার কৃত ভাল-মন্দ স্বয়ং স্মরণ করবে। গাফলত এবং উদাসীনতার কারণে পৃথিবীর বুকে যা আসলেই ভুলে গিয়েছিল অথবা ভুলে ছিল না, তবে ভুলের ভান ধরেছিল কিংবা গুরুত্ব আরোপ না করার কারণে ভুলে যাওয়ার পর্যায়ে ছিল, হাশরের ময়দানের এসব ভুলের অবসান ঘটবে এবং সব কিছুই মনে হবে আর বিচারের সম্মুখীন হবে। স্মরণ হবে দুইভাবে।

এক. সেদিন মানুষের চতুর্মুখী খেয়াল-ধারণা থাকবে না, কেবলমাত্র অতীতের আমল আখলাকের কথাই চিন্তা হবে, ফলে অন্তঃইন্দ্রিয় এ বিষয়কে অধিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।

দুই. মহান আল্লাহ সেদিন তাদের অন্তঃইন্দ্রিয় শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন।

মানুষের উপলব্ধির তিনটি স্তর রয়েছে।

১। যখন মানুষ পৃথিবীর বুকে বসবাস করে এবং পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা অবগতি লাভ করে।

২। এর চেয়ে অবগত হওয়ার এবং উপলব্ধির উন্নত স্তর হচ্ছে মানুষের ঘুমন্তাবস্থার উপলব্ধি এবং অবগতি। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ এমন অনেক কিছুই জানতে এবং উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, যা জাগ্রত অবস্থায় জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

৩। অবগতি এবং উপলব্ধির সব চেয়ে উন্নত স্তর হল মানুষের সম্মুখে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছুই প্রকাশ পেয়ে যাওয়া। হাশরের ময়দানে এমনটিই হবে। মানুষ তখন সব কিছুই নিজের সম্মুখে উপস্থিত পাবে। উপস্থিত পাবে দু'ভাবে।

এক. মানুষের সমস্ত আমল আকৃতি লাভ করবে, ভাল আমলেরও আকৃতি হবে এবং খারাপ আমলেরও।

দুই. সমস্ত আমল তথা ভাল-মন্দ সবকিছু লিখিতভাবে রাখা হয়েছে। যে রেজিস্টার বই তার সম্মুখে খুলে দেয়া হবে। ফলে সে নিজেই তার সমস্ত কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে আর ভুলে যাওয়া সমস্ত কিছুই মনে হবে। যথা: মুফাস্‌সির রাযী আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন,

يعنى اذا راى اعماله مدونة فى كتابه تذكرها وكان قد نسيها .

অর্থাৎ, যখন তার আমলসমূহ তার রেজিস্টার বইতে দেখবে তখন সব কিছুই তার মনে পড়বে, অথচ পূর্বে সে এসব কিছু ভুলে বসেছিল। (কাবীর- ৩২৯/৮)

وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى (এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য।)

হাশরের ময়দানে মানুষ তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে তার অন্তরে একদিকে অনুতাপ ও দুঃখ আসবে, অপরদিকে আল্লাহর ন্যায়বিচার ও শাস্তির ভীতি সঞ্চারিত হবে,

চিন্তায় সে ভারাক্রান্ত হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সম্মুখে জাহান্নামকে প্রকাশ করে দেয়া হবে। সে তখন জাহান্নামের ভয়াবহ যাতনার কথা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হয়, জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য প্রকাশ করা হবে, দর্শক কারা হবে? এ সম্পর্কে তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে,

قيل المراد الكافر لانه الذى يرى النار بما فيها من اصناف العذاب .

অর্থাৎ, কারও কারও মতে 'দর্শক' দ্বারা কেবল কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকারের আযাব তারাই প্রত্যক্ষ করবে। (কুরতুবী) আর যেহেতু জাহান্নামের বিভিন্ন আযাব প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের ও জাহান্নামীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা, সুতরাং তাদেরকে উদ্দেশ্য করাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত। মুমিনদেরকে যেহেতু ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হবে না, বরং পুরস্কৃত করা হবে, অতএব তাদেরকে জাহান্নাম দর্শন করানোর কোন উপকারিতা নেই। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এ বক্তব্য আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ .

অর্থাৎ, জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং জাহান্নামকে পথভ্রষ্টদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। (সূরা শুআরা: ৯০-৯১)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, জাহান্নামকে শুধুমাত্র জাহান্নামীদের জন্য প্রকাশ করা হবে, জান্নাতীদের জন্য নয়।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে জাহান্নাম মুত্তাকী এবং জাহান্নামী উভয়ের জন্যই প্রকাশ করা হবে। প্রখ্যাত মুফাস্সির সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

يكشفها ليراها تتلظى كل ذى بصر .

অর্থাৎ, জাহান্নাম উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। দৃষ্টির অধিকারী প্রত্যেকেই জাহান্নামকে অগ্নিস্ফুটিত অবস্থায় দেখতে পাবে। (কুরতুবী- ২০৭/১৩)

এ সম্পর্কে মুফাস্সির রাযী বলেন,

انما برزت ليراها كل من له عين وبصر وهذا يفيد ان كل الناس يرونها من المؤمنين والكفار .

অর্থাৎ, জাহান্নামকে প্রকাশ করে দেয়া হবে, যাতে দৃষ্টির অধিকারী প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, মুমিন এবং কাফের সকলেই জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। (কাবীর- ৩২৯/৮)

মুফাস্সির আলূসী এ সম্পর্কে আলোচনা করে স্পষ্টভাবে বলেন,

وخص بعض من الكافرين وليس بشئ .

অর্থাৎ, কেউ কেউ দর্শক হিসেবে কেবল কাফেরদেরকে বিবেচনা করেছে। তাদের কথা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। (রূহুল মাআনী- ৩৫/৩০)

www.maktabatulabrar.com

যারা কাফের এবং মুমিন উভয়কেই এ আয়াতের লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছেন, তাদের মতে মুমিনদের সম্মুখে জাহান্নামকে প্রকাশ করার বিশেষ উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। এই উপকারিতার বর্ণনা দিয়ে কুরতুবীতে বলা হয়েছে,

يراها المؤمن ليعرف من النعمة .

অর্থাৎ, মুমিনগণ জাহান্নামকে এজন্য প্রত্যক্ষ করবে, যাতে নেয়ামতের কদর বুঝে। (কুরতুবী ২০৭/১৩)

জাহান্নামকে দেখে তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার বিষয় চিন্তা করে তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত করুণার উপলব্ধি জন্মাবে। এতে তারা বিশেষ প্রশান্তি বোধ করবে। অবশ্য জাহান্নাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ করা হবে না, তাদের জন্য তো জান্নাতকেই প্রকাশ করা হবে এবং তারা জান্নাতকে প্রত্যক্ষ করেই আসলে তৃপ্তি লাভ করবে। তবে যেহেতু সেখানে কাফেরদের জন্য জাহান্নামকেও প্রকাশ করা হবে, তাই তারা জাহান্নামকেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। বস্তুত উপরেল্লিখিত দুই আয়াতের মধ্যে মূলত কোন বিরোধও নেই। এ অর্থে নিম্নের আয়াতের অর্থও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا .

অর্থাৎ, তোমরা সকলে অবশ্যই জাহান্নাম হয়ে অতিক্রম করবে, এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে মুক্তি প্রদান করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু করে রেখে দেব। (সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২)

মোটকথা, আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ও নবী-রসূলগণ যা উপলব্ধি করে থাকেন, একীনের চোখে যা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তার প্রতি বাহ্যিক চোখে দেখার মত বিশ্বাস স্থাপন করত আমল করে থাকে। কাফের এবং যারা পথভ্রষ্ট তারা পৃথিবীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে তা প্রত্যক্ষ করতে এবং বুঝেশুনে একীন লাভ করতে অক্ষম হয়। তার দুনিয়ার ধন সম্পদ ও বস্তু সামগ্রীর লোভ-লালসায় আক্রান্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, আখেরাতকে ভুলে যায়, জাহান্নামের কঠোর শাস্তির কথা বুঝলেও বোঝে না, স্মরণ করালেও স্মরণ করে না। কিন্তু যেদিন এসব কিছুর স্বপ্নজাল ছিন্ন হবে, সেদিন সব কিছুই দেখবে বুঝবে এবং বিশ্বাস আসবে, কিন্তু কোন লাভ হবে না, উপকারেও আসবে না, আফসোস এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে চির জাহান্নামী হয়ে থাকবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى. وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى (এতএব যে কেউ সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, নিশ্চয়ই জাহান্নামই তার অবস্থিতি স্থান।)

উল্লিখিত ৩৭, ৩৮ ও ৩৯- এই তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকারের লোকদের সমাগম হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। সেখানে যারা আল্লাহর বিচারে সীমালঙ্ঘনকারী এবং অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। আর যারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এবং রসূল প্রদর্শিত বিধি-নিষেধ অনুসরণকারী সাব্যস্ত হবে, তারা পুরস্কৃত হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতবাসী হবে। ৩৭ নং আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারী এবং

অপরাধীদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, নিম্নে শব্দ দুটির বিশ্লেষণ প্রদত্ত হল।

(১) من طغى অর্থাৎ, যে সীমালঙ্ঘন করছে। এই সীমালংঘকারী বলে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ সম্বন্ধে মুফাস্‌সির আলূসী বলেন,

فاما من عتا وتمرد من الطاعة وجاوز الحد فى العصيان حتى كفر .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে, অনুসরণ ও অনুকরণে অহংকারী হয় এবং অপরাধে সীমালঙ্ঘন করে কাফের হয়ে যায়।

এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে সীমালঙ্ঘনকারী বলে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাজহারীতেও এই মত পোষণ করা হয়েছে। মুফাস্‌সির রাযী বলেন,

قوله طغى اشارة الى فساد حال القوة النظرية لان كل من عرف الله عرف حقارة نفسه وعرف استيلاء قدرة الله عليه فلا يكون له طغيان وتكبر .

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক 'সীমালঙ্ঘন করে' কথাটি দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি ও অসরাতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করতে সমর্থ হয়, সে নিজেকে অতি নগণ্য ভাবে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহকে সর্বাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম বলে মনে করে। সেমতে তার মধ্যে সীমালঙ্ঘন ও অহংকার দেখা দেয় না।

নিজ গোনাহে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে যারা তওবার রাস্তা অবলম্বন করে না, প্রকৃতপক্ষে তারা কাফেরই বটে। ফলে মুফাস্‌সির আলূসী এবং মুফাস্‌সির রাযীর বক্তব্যের সারাংশ মূলত একই কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের লোকের জন্যই জাহান্নাম।

(২) اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।)

অর্থাৎ, যারা সীমালঙ্ঘনকারী ও অহংকারী হয়, তারা বস্তুসামগ্রী ও পার্থিব জীবনকে আখেরাত এবং আখেরাতের স্থায়ী সামগ্রীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মূলত এ কারণেই তারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং অহংকারী হয়। এ ধরনের লোকদের জন্য জাহান্নাম। আয়াতের এই অংশের বিশ্লেষণ করে তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে, 'আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে' অর্থাৎ, যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং কাম তৃপ্তির অনুসরণে পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

মুফাস্‌সির আলূসী বলেন,

ولا يستعد للحياة الاخرة الابدية بالايمان والطاعة .

অর্থাৎ, যারা ঈমান এবং আনুগত্যের মাধ্যমে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

মুফাস্‌সির ইমাম রাযী বলেন,

اشارة الى فساد حال القوة العملية .

অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের এই বাণীতে আমলী শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

উপর্যুক্ত দুই অর্থে যাদের মধ্যে আপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়, প্রকৃতপক্ষে তারা কাফের, তাদের জন্যই জাহান্নাম চিরস্থায়ী বাসস্থান।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, অনেক কাফের-বেদ্বীনকে এমনও দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, কিন্তু তারা কোন না কোন মতবাদের অনুসরণ করে, অথবা বস্তু সামগ্রীর প্রতি তাদের কোন লোভ-লালসা নেই। তারা সফলতার বাসনা নিয়ে বৈরাগ্য, তপস্যা প্রভৃতি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয়। তাদের মধ্যে জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ-বস্তুর লালসা পাওয়া যায় না; তবে কি তারা জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে? কারণ আলোচ্য আয়াতে দুই ধরনের অপরাধীকে জাহান্নামী বলা হয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারী ও পার্থিব বস্তু সামগ্রীর লালসায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দানকারী। আর এ ধরনের কাফেরদের মধ্যে এই দুই কারণের কোনটি বিদ্যমান নেই।

এর উত্তরে বলা যায়, আসলে জাহান্নামী হওয়ার জন্য প্রথম কারণই যথেষ্ট। তবে যারা এ কারণে দোষী হয়, তারা সাধারণত দ্বিতীয় কারণেও জড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ সময় মানুষ প্রথম কারণের দোষেই দ্বিতীয় কারণে জড়িয়ে পড়ে। হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حب الدنيا راس كل خطيئة .

অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বতই সমস্ত গোনাহের মূল কারণ।

এ কারণে বিষয়বস্তুর প্রকৃত অবস্থা বোঝাবার জন্য দ্বিতীয় কারণকেও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

মুমিনগণ জাহান্নামী নয়

যেহেতু মুমিনগণ ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘনকারী হয় না, কোন মানবিক কারণে উপর্যুক্ত গুনাহের কাজ হয়ে গেলে, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে নেয়, এজন্য তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। সুতরাং এই আয়াতে মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। মুফাস্‌সির রাযী বলেন,

متى كان الانسان موصوفا بهذين الامرين كان بالغا فى الفساد الى اقصى الغايات وهو الكافر الذى يكون عقابة مخلدا وتخصيصة بهذه الحالة يدل على ان الفاسق الذى لايكون كذلك لا يكون الجحيم ماوى له .

অর্থাৎ, যখন মানুষ এই দুই দোষে দোষী হয়, তখন সে অপরাধের চরমে পৌঁছে যায়। আর সে হল কাফের, যে চিরস্থায়ীভাবে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। অপরাধের এই বিশেষ স্তরের সাথে বিশিষ্ট-করণ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ফাসেক, যে এ ধরনের দোষে দোষী নয়, সে চিরজাহান্নামী হবে না।

মুমিনদের প্রতি সর্তক বাণী

মুসলিম শরীফের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন ফিৎনার যুগ আসবে যে,

يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا .

অর্থাৎ, মানুষ সকালে মুমিন হবে তো সেই মানুষই বিকালে কাফের হয়ে যাবে।

মানুষের মধ্যে হর কিসিমের ফিৎনা প্রকট হয়ে দেখা দিবে, যে ফিৎনার মুকাবিলা করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিভিন্ন হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী তখনকার অবস্থা হবে– 'জ্বলন্ত অংগারের উপর পা রাখা যেমন কঠিন, তার চেয়ে অধিক কঠিন হবে হকের উপর এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর কায়েম থাকা।' 'আর সবচেয়ে প্রকট হয়ে দাঁড়াবে অর্থ-সম্পদের ফিৎনা। প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বরং প্রতিযোগিতামূলকভাবে অর্থ-সম্পদ অর্জনের পিছনে এমনভাবে লাগবে যেমন ইয়াহুদীগণ লেগেছিল এবং এ কারণে তারা হালাকও হয়েছে। এভাবে আমার উম্মতগণও হালাক হবে।' 'তাদের আখেরাতের চিন্তা বলতে কিছুই থাকবে না, বস্তুজগতের চিন্তা-ভাবনায় তারা দিশেহারা হয়ে যাবে'। এরা যেথায়-সেথায় অবশ্যই ধ্বংসের কবলে ঢলে পড়বে। এতে আমার কোন আসে যায় না, আমি লা-পরওয়া।'

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ ধরনের অসংখ্য সতর্কবাণী রয়েছে এবং বাস্তবেও এর জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মুমিনদেরকে আর বিশেষ করে ফাসেক গোনাহগার মুমিনদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

'গোনাহগার মুমিন চির জাহান্নামী নয়।'– এই বক্তব্যকে ভুল বুঝে যারা নিজেদেরকে অসর্তকভাবে পরিচালনা করবে, পরিণামে তাদের চরম অধঃপতন ঘটার যে কত অধিক সম্ভাবনা রয়েছে তা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া আমাদের আলোচ্য আয়াত وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (যারা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়।) বাক্যটিও প্রণিধানযোগ্য। এতে বোঝা যায়, যারা পার্থিব জগতের পিছে পড়ে অথবা পার্থিব মায়া-মমতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে, তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা বর্তমানে কাফের না হলেও এ বিষয়ে কাফেরদের আমল-আখলাক এবং কাজকর্মের সাথে তাদের সমতা ও মিল রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের অপরাধপ্রবণতা বাস্তবে না থাকলেও দ্বিতীয় প্রকার অপরাধ প্রবণতা ন্যূনতম মানের হলেও বিদ্যমান আছে। তারা এতটুকুর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। বস্তুত এ উদ্দেশ্যেই এই বাক্যটিকে এখানে সংযোজন করা হয়েছে এবং যথার্থই করা হয়েছে।

সুতরাং যারা কাফের নয়, কিন্তু ফাসেক গোনাহগার এবং সেমতে আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে চলছে, মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তারাও আযাবে আক্রান্ত হবে। অবশ্য তারা তাদের ন্যূনতম ঈমানের কারণে হলেও একদিন নিশ্চয়ই মুক্তি পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তাদের তওবার কারণে আল্লাহ পাক করুণা করে প্রথমেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে তা হবে তাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আর যারা উল্লিখিত বর্ণনা অনুপাতে কাফের সাব্যস্ত হবে, তারা কঠোর আযাবে আক্রান্ত হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে।

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى (আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং স্বীয় আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি থেকে সংযত রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাতই তার বাসস্থান।)

www.maktabatulabrar.com

যোগসূত্র ও আয়াতের সারমর্ম

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা রীতি হল– একদিকে যেমন কঠোর শাস্তি এবং আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়, অপরদিকে সাথে সাথে তওবাকারীর প্রতি ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়। জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করার সাথে সাথে জান্নাতের সু-সংবাদও প্রদান করা হয় এবং জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে সার্বিক নিরাপত্তা লাভের নিয়ামাবলি তথা আমলের কথাও বর্ণনা করা হয়, যাতে শুধু জাহান্নামের কথা শোনে বান্দা নিরাশ হয়ে না যায়, ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে। সেই নিয়মেই পূর্বের আয়াতে যে কঠোর শাস্তি এবং আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বান্দার মনে যে বেদনা ও ভীতি সঞ্চারিত হতে পারে, সেই বেদনা এবং ভীতিকে লাঘবকরণের উদ্দেশ্যে এবং বান্দাকে তার কল্যাণ ও সার্বিক নিরাপত্তা লাভের পন্থার দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াতে ন্যায়পরায়ণ এবং নেককারদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এমন দুটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে দুটি আমলের দ্বারা মানুষ চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে সমর্থ হয়। সে দুটি আমল হল– আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় ও কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা। নিম্নে এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ বিবরণ প্রদান করা হল।

১. আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয়

জান্নাত লাভের প্রথম আমলটি হল আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় অর্থাৎ, বান্দার মনে এই ভয়ের সঞ্চার হওয়া যে, আমার সমস্ত কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহর সম্মুখে আমাকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। যদি অপরাধী সাব্যস্ত হই, তাহলে কেবল লজ্জা আর অনুতাপই নয়; বরং কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, কোন প্রকার সাহায্য সেদিন কাজে আসবে না, আর কোন সাহায্যকারীও জুটবে না। অপরপক্ষে যদি সত্যবাদী এবং নেককার সাব্যস্ত হই, তাহলে আল্লাহর রহমতে অফুরন্ত শান্তি এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হব। এই আশা এবং ভয় যার অন্তরে সঞ্চার হবে এবং ইয়াকীনের সাথে হবে, সে ব্যক্তি অপরাধ থেকে নিজেকে অবশ্যই রক্ষা করবে। তার জন্য মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ মোতাবেক স্বীয় অস্থায়ী জীবনকে পরিচালনা করা সহজ হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে মুফাস্সিরদের বিভিন্ন ধরনের মতামত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন,

هو خوفة فى الدنيا من الله عزوجل وقعة الذنب.

ইহকালে গোনাহ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হওয়া আর সে ভয়ের কারণে গোনাহ বর্জন করা। আল্লাহ পাক প্রকৃতপক্ষে ইহকালের জীবনেও বান্দার একবারেই নিকটে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

আমি বান্দার গর্দানের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। (সূরা ক্বাফ : ১৬)

واهيه وفى الاخرة الى الهاوية.

অর্থাৎ, 'হাওয়ার' আসল অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়া, আকর্ষিত হওয়া। অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নার প্রতি আকর্ষিত হওয়া-র অর্থেই এর ব্যবহার ব্যাপকতা পেয়েছে। الهوى (হাওয়া) (প্রবৃত্তি)কে এজন্য হাওয়া বলা হয় যে, হাওয়া অর্থাৎ, প্রবৃত্তির তাড়না ব্যক্তিকে পার্থিব জগতের তাবৎ অপকর্মের প্রতি আকর্ষিত করে আর আখেরাতে 'হাবিয়া' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

বস্তুত এজন্যে প্রবৃত্তি অনুসারীর ভর্ৎসনা করা হয় এবং প্রবৃত্তির সাথে বিরুদ্ধবাদীর প্রশংসা করা হয়। আধ্যাত্মিক জগতের কোন কোন মনীষী এজন্যই বলেছেন যে,

اذا اردت الصواب فانظر هواك فخالفه.

যদি সঠিক বিষয় নির্ণয় করতে চাও, তাহলে প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তার বিরোধিতা কর।

সুফী সাহাল তাস্তুরী বলেন,

لا يسلم من الهوى الا الانبياء عليهم الصلوة والسلام وبعض الصديقين فطوبى لمن سلم منه.

প্রবৃত্তির তাড়না থেকে কেবল নবীগণ এবং কতক ছিদ্দীকগণই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পেতে পারেন। আর যারা রক্ষা পান সত্যিই তারা ধন্য।

তিনি আরও বলেন, প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জন করা জান্নাতের চাবিকাঠি। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

انتم فى زمان يقود الحق الهوى ويساتى زمان يقود الهوى الحق.

তোমরা এমন যমানায় বসবাস করছ যে, যমানায় হক প্রবৃত্তিকে পরিচালনা করে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির উপর হকের প্রবলতা বিদ্যমান রয়েছে। আর অতিসত্বর এমন যমানা আসছে, যে যমানায় প্রবৃত্তি হককে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রতিষ্ঠিত হবে। (কুরতুবী ৯৩/২০৮)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾	(৪২) তারা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন ঘটবে?
فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾	(৪৩) তোমার কী প্রয়োজন যে, তুমি কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করবে?
اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾	(৪৪) কেয়ামতের শেষ খবর তোমার 'রব'-এর নিকট রয়েছে।
اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾	(৪৫) যে কেয়ামতকে ভয় করে তুমি কেবল তাকেই সতর্ককারী।
كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾	(৪৬) যেদিন তারা কেয়ামতকে দেখতে পাবে, সেদিন মনে করবে, যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থানই করেনি, তবে এক সন্ধ্যা বা এক সকাল।

সুতরাং মহান আল্লাহর সম্মুখে বান্দা সর্বদাই দাঁড়ানো আছে এবং আখেরাতে আর বিশেষত হাশরের ময়দানেও বান্দা আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে। তবে পার্থক্য এই যে,

(ক) পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাক বান্দার দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান রয়েছে আর সেদিন বান্দা সব কিছু নিজেই দেখবে।

(খ) পৃথিবীতে আল্লাহ পাক সময় দান করেন আর সেদিন বান্দা সময় পাবে না। এখানে গোনাহর সময় আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠা ও গোনাহ বর্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কেবল তার পক্ষেই সম্ভব হয় যার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে এবং যার আধ্যাত্মিক জগতে অত্যন্ত উঁচু মকাম ও মর্যাদা লাভ হয়েছে। বস্তুত আল্লাহকে সবসময় হাজের নাজের পাওয়া বিরাট সফলতার লক্ষণ। আর ওলীদের এটিই সর্বোচ্চ স্তর।

মুফাস্‌সির মুজাহিদের এই মতের সমর্থনের যে দিকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে, এই অর্থ গ্রহণ করলে এর পূর্ববর্তী আয়াত فَاَمَّا مَنْ طَغٰى এর সাথে যথেষ্ট সমন্বয় ঘটে। কেননা, فاما من خاف পূর্ববর্তী আয়াতেরই মোকাবেলায় এসেছে। আর طغى দ্বারা যে অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই অপরাধের স্থান এই পৃথিবীই। অতএব এর মোকাবেলায় যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে, তা পৃথিবী বিষয়ক হলেই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সি 'দাড়ানোর' দ্বারা হাশরের ময়দানে দাঁড়ানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। আসলে উভয়টিকে আয়াতের যথাযথ বিষয়বস্তু মেনে নিলেও কোন বাধা নেই। কারণ, যারা আল্লাহকে সর্বদা হাজের নাজের রূপে অবলোকন করতে পারে না এবং বস্তুজগতে আল্লাহ পাকের অদৃশ্য থাকার কারণে অন্তরে তাকে হাজের নাজের রূপে অবলোকন করতে পারে না, আর বস্তুজগতে আল্লাহ পাক অদৃশ্য থাকার কারণে অন্তরে তার উপযুক্ত ভয় সঞ্চার করতে পারে না, তারা যদি অন্তত আখেরাতের এবং হাশরের ময়দানের বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং সেখানে আল্লাহ পাকের সম্মুখীন হতে হবে–এই ভয় অন্তরে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তাহলে এটাও তার জন্য গোনাহ বর্জনের কারণ এবং উছীলা হতে পারে। আর এই দ্বিতীয় স্তরের ভয়ে ভীত হয়েও যদি গোনাহ বর্জন করে, তবুও সে অবশ্যই নাজাত পাবে এবং জান্নাত লাভে ধন্য হবে। সুতরাং এতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, উভয়টিই আয়াতের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২. কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা

জান্নাত লাভের দ্বিতীয় আমলটি হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى (এবং মনকে ক-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে)-এর দ্বারা প্রবৃত্তির বিরোধিতার কথাই বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মুফাস্‌সির আলূসী বলেন, وهو الميل الى الشهوات অর্থাৎ, هوى বলা হয় প্রবৃত্তির তাড়নায় ঝুঁকে পড়া, আর এর বিরোধিতার অর্থ হল ضبطها بالصبر والتوطين على ايقار الخيرات অর্থাৎ, ধৈর্যের সাথে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, সৎকর্মে অভ্যস্ত হওয়া, পার্থিব সামগ্রী এবং চাকচিক্যে প্রলুব্ধ না হওয়া এবং পার্থিব সৌন্দর্য ও শোভায় ধোঁকা না খাওয়া। এর ভয়াবহ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লামা রাগিব বলেন,

واصل الهوى مطلق الميل وشاع فى الميل الى الشهوات وسمى بذلك لانه يهوى بصاحبه فى الدنيا الى

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

يَسْئَلُوْنَكَ তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, اَلسَّاعَةِ মুহূর্ত, সময়, কোন, اَيَّانَ কখন, مُرْسٰهَا সংঘটিত, ذِكْرٰهَا তার আলোচনা, اِلٰى رَبِّكَ তোমার রব এর নিকট, مُنْتَهٰهَا শেষ খবর, مُنْذِرُ সতর্ককারী, مَنْ يَّخْشٰهَا যে ভয় করে, كَاَنَّهُمْ যেন তারা, يَرَوْنَهَا তা দেখতে পাবে, لَمْ يَلْبَثُوْا তারা অবস্থান করেনি, اِلَّا তবে, عَشِيَّةً বিকাল, সন্ধ্যা, اَوْ অথবা, ضُحٰهَا প্রভাত, সকাল।

সারমর্ম

কাফেররা তোমাকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করে থাকে, অথচ এ বিষয়ে তোমাকে কোন কিছু বলার নেই। কারণ, কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে এ বিষয়ে আমি তোমাকে অবগত করিনি। সুতরাং এ বিষয়ে তোমাকে ইল্‌ম্ নেই, এর ইলম শুধু আমারই আছে। তোমাকে আমি কেয়ামত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে অবগত করার জন্য এবং কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগতির জন্য নির্দেশ দিয়েছি, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে ঈমান গ্রহণে সমর্থ হয়। কিন্তু, কাফের মুশরিকরা প্রকৃত বিষয়বস্তুকে বুঝতে চেষ্টা না করে নানা ধরনের অনর্থক কথাবার্তা বলছে। অতএব, তুমি তাদেরকে বলে দাও, যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন তারা নিজেরাই তা দেখতে পাবে। এখন তো তাদের নিকট বিলম্বিত মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে, আমরা পৃথিবীতে অতি সামান্যকাল অবস্থান করেছি, আযাবের সময় অতি তাড়াতাড়ি এসে গেছে।

যোগসূত্র

কাফেরগণ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান ছিল। তাদের সন্দেহের মূল কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার কারণে তারা মনে করত, মৃত্যুর পর যখন মানুষের শরীরের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, বরং সবকিছুই মাটির সাথে মিশে বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাহলে এর পর পুনর্জীবন তথা বরযখের যিন্দেগী, কেয়ামত সংঘটন, হাশরের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে হিসাব-নিকাশ, বিচার-আদালত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আকীদা পোষণের কথা কী করে বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে? বর্ণিত আয়াতসমূহে তাদের ঐ সমস্ত ধারণা ও বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের বক্তব্যের বাতুলতা প্রমাণ করছেন, তখন তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল- আচ্ছা যদি তা-ই হয় এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সত্যই হয়, তবে সে কেয়ামত কবে হবে? বস্তুত তাদের জিজ্ঞাসা ও অস্বীকার ছিল বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে, তাই তাদের জিজ্ঞাসার জবাবও একইভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। তাদের এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উদাহরণ হল- যেমন: কোন ডাক্তার রোগীকে ঔষধ সেবনের কথা শুনালে এবং ঔষধ সেবন না করলে মৃত্যু অনিবার্য বলে জ্ঞাত করলে রোগী বলে, ডাক্তার সাহেব, বলুন তো, যদি আমি ঔষধ সেবন না করি, তবে কি আমি মারা যাব? বাহ্যত এ ধরনের জিজ্ঞাসা যেমন রোগীর অজ্ঞাতাই প্রমাণ করে তেমনি কাফেরদের 'কেয়ামত কবে হবে' জিজ্ঞাসাও তাদের মূর্খতারই প্রমাণ বহন করে, অন্য কিছু নয়। (তাফসীরে হাক্কানী- ৩১)

www.maktabatulabrar.com

শানে নুযুল

মুস্তাদরাক, সুনানে-নাসায়ী ও তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং তারিক ইবনে শিহাবের হাদীছের বর্ণনা মতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত কবে হবে এ সম্পর্কে কিছু অবগতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করেছিলেন। আল্লাহ পাক এ বিষয়ে অধিক কোন কিছু জানার প্রয়োজন নেই হেতু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে অবগতির কামনা থেকে নিবৃত্ত করেছেন। (মাযহারী- ১৯৫)

তাফসীর

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا.فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا (তারা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন ঘটবে? তোমার কী প্রয়োজন যে, তুমি কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করবে?)

এখানে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের সন-তারিখ জানার ব্যাপারে অবগতি লাভের কামনা থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিবৃত্ত করেছেন।

এই নিবৃত্ত করার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা:

১. নিবৃত্ত এজন্য করেছেন যে, ঈমান এবং আমলের জন্য কেয়ামতের সন-তারিখ সংক্রান্ত জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই, সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কেয়ামতের ভয়াবহতার আকীদাই যথেষ্ট। গর্তে সাপের সন্ধান পেলে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সাপ কোন মৌসুমে দংশন করে তা জানার প্রয়োজন হয় না, এ গর্তে সাপ রয়েছে- এতটুকু জানাই যথেষ্ট।

২. নিবৃত্ত এজন্যও করেছেন যে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন-তারিখ গোপন রাখার মধ্যেই বান্দার আমলের আগ্রহ এবং আকর্ষণের রহস্য নিহিত রয়েছে। অন্যথায় মহান আল্লাহর পরীক্ষাগার এ পৃথিবীর মূল উদ্দেশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে। একই কারণে মানুষকে তার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে অবগত করানো হয় না। যেমনি লাইলাতুল কদর সম্পর্কেও অবহিত করা হয়নি, তা ঠিক কোন্ তারিখে।

৩. নিবৃত্ত এজন্যও করেছেন যে, হাদীছে জিবরীলে একথাও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের সন-তারিখ ইল্‌মে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর জন্য খাস; অন্য কারও সে সম্পর্কিত জ্ঞান নেই। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে। যদি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ওহীর অপেক্ষা না করে গায়েবের খবর সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলে অবশ্যই কাফেরদের জিজ্ঞাসার মুখে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই কেয়ামতের সন-তারিখ বলে দিতে পারতেন, কিন্তু আসলে তিনি গায়েবের ইল্‌ম রাখতেন না, তবে যা আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে জানাতেন, তা অবশ্যই তিনি জানতেন। এ মর্মেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ .

আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম। (সূরা আ'রাফ: ১৮৮)

এজন্যই মদীনায় এক ব্যক্তি যখন বলেছিল, فينا نبى يعلم ما فى غد অর্থাৎ, 'আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের কথা জানেন' তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী শরীফ)

এখানে একটি প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, কেয়ামতের সন-তারিখ গায়েবী ইল্‌মের অন্তর্ভুক্ত, কেবল আল্লাহ পাকই সে জ্ঞান রাখেন, কোন সৃষ্টিই সে জ্ঞান রাখে না, তাহলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল (আ.)-এর প্রশ্নের জবাবে সে কথার উল্লেখ করলেন না কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে–

ক. হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় পর্যান্ত কেয়ামতের সন-তারিখ যে ইল্‌মে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত– একথা জানতে পারেননি। কিন্তু এ উত্তর তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

খ. অনেক গায়েবী খবর ওহীর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে থাকতেন। তাই এক্ষেত্রেও হয়ত তিনি আশা পোষণ করেছিলেন। আর এর পেছনে রহস্য এই ছিল যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কাফেরগণ বারংবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তারা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাজেহাল করতে চাচ্ছিল। এরকম মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী খবর সম্পর্কে ওহীযোগে অবগতি দানের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছিল। তাই এক্ষেত্রেও তিনি গায়েবী খবর লাভ করার আশা পোষণ করছিলেন এটাই স্বাভাবিক বটে।

গ. অনেক সময় মানুষ প্রেমানুরাগে আপ্লুত সুরে প্রেমাস্পদের নিকট অনেক কিছুই আশা করে থাকে। লাভবান হবে না জেনেও তা করে থাকে। এ আশা পোষণেও তার বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়। প্রেমাস্পদের নিকট হতে অস্বীকৃতি পেয়েও প্রেমিকের প্রশান্তি লাভ হয়। সুতরাং সর্বসেরা প্রেমিক হিসেবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর নিকট এ ধরনের আশা পোষণ করা প্রকৃতপক্ষে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আল্লাহর প্রতি সুগভীর প্রেমেরই নিদর্শন বহন করে। এক্ষেত্রে আল্লাহর দীদার লাভের অফুরন্ত আশা নিয়ে আল্লাহর নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনের কথাটি স্মরণ করলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

ঘ. উপরোক্ত হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকে শানে নুযূলের এ মর্মের স্থলে يَسْئَلُوْنَكَ বাক্যটির অর্থ 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে'– ভবিষ্যতের অর্থে নেয়া হয়, আর আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে এতে কোন বাধাও নেই। তাহলে যে প্রশ্নের এতক্ষণ উত্তর প্রদান করা হল ঐ প্রশ্নই হয় না। কেননা, তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হবে যে, হে নবী, তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করবে, কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? যখন তারা তোমাকে এ প্রশ্ন করবে তখন তুমি এ উত্তর দিবে। তখন আয়াতের মর্ম হবে– আল্লাহ পাক রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগত প্রশ্নের জবাব শিক্ষা দিচ্ছেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট কোন প্রকার মুনাজাত বা দরখাস্ত পেশ করেননি। পবিত্র কুরআনে এরকম আগাম শিক্ষা প্রদানের যথেষ্ট নজীর বিদ্যমান রয়েছে।

ঙ. আর যদি يَسْئَلُوْنَكَ বক্যের অর্থ বর্তমান জিজ্ঞাসার অর্থেও নেয়া হয়, যেমন ব্যাকরণের দৃষ্টিতে অবকাশ রয়েছে, তাহলে 'খ'-এ বর্ণিত এ নিয়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরক্ত

www.maktabatulabrar.com

ও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল! এবং সে কারণে আল্লাহ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাদের প্রশ্নের উত্তরে অতিষ্ঠ ও দুঃখিত দেখছিলেন, তখন আল্লাহ পাক এ মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ ধরনেরও যথেষ্ট উপমা রয়েছে।

আয়াতের বিশেষ ফায়দা

কাফেররা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লজ্জা দেয়ার লক্ষ্যে ঠাট্টা-মশকারি করে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকতো। আল্লাহ পাক তা পছন্দ করেননি। এ থেকে বোঝা যায়, অসত্য লক্ষ্যে প্রশ্ন করা মোটেই সমীচীন নয়। তবে হ্যাঁ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে বৈ কি। যেমন:

(ক) কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রশ্ন করা বৈধ। কেবল বৈধই নয়, বরং প্রশংসনীয়ও বটে। পবিত্র কুরআনে এবং হাদীছে পাকে এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অন্যকে শিক্ষা দেয়ার জন্যও প্রশ্ন করার অনুমতি আছে। যেমন: হযরত জিবরাঈল আমীন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান, ইসলাম, এহসান ও কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। অথচ এ প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর জিবরাঈল (আ.)-এর জানা ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাতে করে সাহাবাগণ এ বিষয়ে অধিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই যখন হযরত জিবরীল আমীন চলে গেলে, তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন– এ লোকটি কে তা তোমরা বলতে পার? সাহাবাগণ আরজ করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই অধিক জানেন। তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, লোকটি ছিলেন জিবরীল। তিনি আরও বললেন,

اتاكم يعلمكم دينكم.

তিনি তোমাদের নিকট তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। (বোখারী শরীফ)

৪৩ নং আয়াতের অর্থে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

ক. এই আয়াতে কেয়ামতের সময় তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ন্যায়সংগত নয় বলে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আয়াতে বোঝানো হয়েছে হে নবী, তোমাকে এর ইল্‌ম দেয়া হয়নি। সুতরাং তুমিও এ বিষয়ে অস্থির হবে না। (রূহুল মাআনী– ৩৭/৩০)

খ. আয়াতের অংশ فيم (তোমার কী প্রয়োজন, ...) এতে কাফের মুশরিকদের জিজ্ঞাসার নেতিবাচক জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বোঝানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে তোমার কোন গরজ নেই এবং প্রয়োজনও নেই। অতঃপর اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰها ইতিবাচক বাক্য, এর অর্থ হচ্ছে, তুমি স্বয়ং কেয়ামতের আলামতস্বরূপ। কারণ, তুমি শেষ নবী, তোমার পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। তাওরাত সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনকে কেয়ামতের আলামতস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যেও একথা প্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

গ. অনেকের মতে ৪৩ নং আয়াতটিও কাফেরদের জিজ্ঞাসার অংশ বিশেষ। অর্থাৎ, হে নবী! আপনি কি কেয়ামতের তারিখ সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করতে পারেন। এ বিষয়ে আপনার নিকট সুস্পষ্ট কিছু আছে কি? (মাযহারী– ১৯৬) কিন্তু মুফাস্‌সিরগণ এ অর্থ দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। এখান থেকে বোঝা যায়,

ক. যে বিষয়ে যার ইল্‌ম নেই তাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়।

খ. যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তার পক্ষেও না জেনে না বুঝে উত্তর দেয়া সমীচীন নয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' আর হাদীছে কাউকে না-জানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে 'জানি না' বলে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। আর যারা না জেনে উত্তর দেয় কুরআনে কারীমে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا .

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পিছে পড়ো না। অবশ্যই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়– এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

কেয়ামত কখন হবে তা যে কোন মানুষের নির্দিষ্ট করে জানা নেই, এ ব্যাপারে হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) আশা পোষণ করেছিলেন তার মৃত্যু যেন মদীনা পাকে হয়, যাতে তার কবর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেশ মদীনা পাকে হয়। কিন্তু হজ পালনের তাগিদে মানসিকভাবে অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন মহান আল্লাহ যদি আমাকে আমার মৃত্যুর সময়সীমা সম্পর্কে কোনভাবে অবগত করে দিতেন, তাহলে সময় পেলে হজ করে আসতাম। এক রাতে পাক-পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারত নছিব হল। হযরত ইমাম মালিক (রহ.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মনের কামনার কথা ব্যক্ত করলেন এবং জানতে চাইলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার হায়াত কতদিন রয়েছে? তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম মালেককে হাতের পাঁচটি আংগুল দ্বারা ইশারা করলেন। ঘুম ভাঙ্গলে ইমাম মালেক অত্যন্ত পেরেশান হলেন যে, পাঁচটি আংগুল দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে– পাঁচ বৎসর, না পাঁচ দিন না পাঁচ ঘন্টা? ইমাম মালেক (রহ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য একজন শাগরেদকে ইবনে সিরীন (রহ.)-এর নিকট পাঠালেন। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনে ইবনে সীরীন (রহ.) বললেন, এ স্বপ্ন কে দেখেছেন তার নাম বলতে হবে। আমি তাঁকে জানতে চাই। কারণ, তিনি অবশ্যই মদীনা পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হবেন। শাগরেদ ফিরে এসে ইমাম মালিক (রহ.) কে ইবনে সীরীনের বক্তব্য শুনালেন। ইমাম মালিকের অনুমতি নিয়ে পুনরায় ইবনে সীরীনের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নাম উল্লেখ করলেন। তখন ইবনে সীরীন রহ. বললেন, পবিত্র কুরআনে পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, ঐ পাঁচটি বিষয়ে কাউকে জ্ঞান দেওয়া হবে না। যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য। সেই পাঁচটি এই– কেয়ামত কবে হবে, বৃষ্টি কখন হবে, মাতৃগর্ভের সন্তান কী? আগামীকালের রুজি কী হবে এবং কার মৃত্যু কোথায়

www.maktabatulabrar.com

হবে। ইমাম মালিক এই পাঁচটিরই একটি জানতে চেয়েছিলেন। তাই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি যা জানতে চেয়েছ, তা ঐ পাঁচটির অন্তর্ভুক্ত। তাই তোমাকে তা অবগত করানো হবে না। সুবহানাল্লাহ! বস্তুত কেয়ামতের সময় সীমার ইল্‌ম ঐ পাঁচটির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেয়ামতের ইল্‌ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই।

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰٮهَا (কেয়ামতের শেষ খবর তোমার 'রব'-এর নিকট রয়েছে,)

এই ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখের ইলম একমাত্র আল্লাহরই আছে, অন্য কারও নেই, আপনারও নেই। সুতরাং আপনি তাদেরকে জ্ঞাত করবেন? জ্ঞাত করার আরেক সুরত আমি আপনাকে জানিয়ে দিব আর আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণার্থেই আমি তা আপনাকে না জানাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে রেখেছি। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ অবগত হতে পারে না বলে যেমন তারা সর্বদা আমলের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তেমনি কেয়ামতের সময় তারিখ সম্পর্কে অনবগত থাকায় তাদের আমলের প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকার সুযোগ হয়। সময় তারিখ জানা থাকলে উদাসীনতার অবকাশ দেখা দিবে।

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰٮهَا (যে কেয়ামতকে ভয় করে তুমি কেবলমাত্র তাকেই সতর্ককারী,)

হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি কেবল মুনযির তথা কেয়ামত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী, কেয়ামতের আলামত বর্ণনাকারী। কেননা, আপনিও কেয়ামতের বৃহত্তম আলামতস্বরূপ। কেয়ামতের সময়সীমা বর্ণনা করা আপনার দায়িত্বের বহির্ভূত। আপনাকে পাঠানোর মোটেই এ উদ্দেশ্য নয়। তাই তাদের জন্য উদ্দেশ্যের বহির্ভূত প্রশ্ন করা ন্যায়সঙ্গত নয়। এ বিষয় নিয়ে চিন্তার কোন কিছু নেই, আপনিও এ নিয়ে অস্থির হবেন না। কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কোন কিছু করা যায় না। করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সফল হয় না। আপনাকে প্রেরণের লক্ষ্য হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন। এ লক্ষ্য কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় না জানা থাকলেই অধিক ফলপ্রসূ হবে। তাই আপনাকে জানানো হয়নি।

এখানে তিনটি প্রশ্ন হয়। প্রথম প্রশ্ন হয়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি 'বাশীর' (সু-সংবাদদাতা) ও 'নাযীর' (সতর্ককারী) হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও বহু হাদীছে একথা সুস্পষ্টভাবেই রয়েছে। অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল তাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারী ,যারা আল্লাহকে ভয় করে? অতএব অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের বক্তব্যের সাথে এ আয়াতের বক্তব্য সাংঘর্ষিক মনে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন বা সতর্ক করার প্রয়োজনই বা কি? তাদের মধ্যে তো ভীতি এসেছেই, তারা তো সতর্ক হয়েছেই। তৃতীয় প্রশ্ন হয় এই যে, মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে কেন? তিনি তো মানুষের প্রভু, প্রতিপালক এবং দয়ালু ও পরম করুণাময়। দয়ালু ও করুণাময়ের প্রতি তো কোন ভয় থাকে না। অতএব তাকে তো ভয় করার প্রয়োজন নেই। নিম্নে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্বের প্রতি সতর্ককারী

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুফস্সির রাযী বলেন,

انه عليه الصلوة والسلام منذر للكل الا انه خص بمن يخشى لانه الذى ينتفع بذلك الانذار .

অর্থাৎ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের জন্য মুনযির তথা সতর্ককারী। তবে এ আয়াতে বিশেষভাবে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের প্রতি সতর্ককারীরূপে প্রেরণের কথা বলার কারণ হচ্ছে, নবী আলাইহিস সালাম-এর ভীতি প্রদর্শনে কেবল তারাই উপকৃত হয়ে থাকে।

যারা উপকৃত হয় তাদের কথা বিবেচনায় রেখে বক্তব্যকে বিশিষ্টকরণের নজীর পবিত্র কুরআনে আরও অনেক রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন মুত্তাকী-নদের জন্য হেদায়াত। এখানেও উপরোক্ত ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে এর একটা উদাহরণ, যেমন: কোন শিক্ষক তার বক্তব্য যথাযথভাবে গ্রহণ, সংরক্ষণ ও সঠিক মূল্যায়নের ফলে কোন ছাত্রের প্রতি খুশি হয়ে বলে থাকে, আমি তো কেবল মাত্র তোমারই উদ্দেশ্যে ক্লাসে বক্তব্য রেখে থাকি। এখানে এর অর্থ এই নয় যে, ক্লাসের অন্য ছাত্রদের জন্য শিক্ষকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়; বরং উপকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষকের এ বক্তব্য বিবেচিত হয়। আমাদের আলোচ্য আয়াতের বিষয়টি এরূপই।

ভীতি প্রদর্শন কাদের প্রতি

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী। কাফের বেদ্বীনের প্রতি এজন্য, যাতে তারা ঈমান গ্রহণ করে। আর মুমিনদের প্রতি এজন্য, যাতে তারা তাদের ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে এবং আরও অগ্রসর হতে পারে। বস্তুত আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন এবং নবী আলাইহিস্ সালামের ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা যেমন কাফেররা উপকৃত হয়, তেমনি আল্লাহর খাছ বান্দাগণও উপকৃত হন। বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য ঘটনাবলি রয়েছে যেগুলোর দ্বারা তাদের আল্লাহ-ভীতির গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করা যায়। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا .

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

انا اتقاكم بالله واعلمكم .

আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং আমি তোমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী। (বুখারী শরীফ)

এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الايمان بين الخوف والرجاء .

অর্থাৎ, ঈমান ভয় এবং আশার মধ্যস্থলে বিদ্যমান।

ওলীদের আল্লাহ-ভীতির যে অবস্থা কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, এর আসল রহস্য হল, আরবী শব্দ انذار (ইনযার) ইছলাহ ও পরিশোধনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে লক্ষ্যবস্তু হয় কল্যাণ ও মঙ্গল। শত্রুতা, বিদ্বেষের ক্ষেত্রে এ শব্দ প্রয়োগ হয় না, ধ্বংস সাধনের জন্য ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও হয় না।

দয়া ও করুণা ভয়ের পরিপন্থি নয়

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ পাক খুবই করুণাময়, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি ন্যায় বিচারকও বটে। জালিম, পাপী এবং অপরাধীদের জন্য জাব্বার ও কাহ্হারও বটে। সুতরাং আল্লাহর দয়া-মায়া এবং করুণা দেখে আশান্বিত হলেও তার ন্যায়বিচার এবং গযব দেখে ভীত-প্রকম্পিত হওয়া জরুরী; বরং দয়াময়ের সম্মুখে অধিকতর ভীত থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যাতে তিনি কখনও নারাজ না হন। সন্তান-সন্ততিকে সকলেই মায়া করে, ভালবাসে, করুণা করে, কিন্তু তারা মাতা-পিতাকে ভয়ও করে। অতএব ভয় এবং মায়া-মমতা একে অপরের পরিপন্থি নয়।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا (যেদিন তারা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন মনে করবে, যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থানই করেনি, তবে এক সন্ধ্যা বা এক সকাল।)

হাশরের ময়দানে ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে কাফের মুশরিকদের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়ে পড়বে, তাদের মনে হবে আমরা পৃথিবীর বুকে সামান্য সময়ই অতিবাহিত করেছি। মুফাস্সির কুরতুবী বলেন,

والمراد تقليل مدة الدنيا .

عشية এবং ضحاها এর দ্বারা পৃথিবীর বুকে সামান্য সময় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। (কুরতুবী-২১০/১৯) তাফসীরে ইব্নে জারীরেও এই অর্থই করা হয়েছে। (তাবারী- ৫০/৩০)

এ মর্মে কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ. قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ.قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

(আল্লাহ বলবেন,) তোমরা বছরের গণনায় পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। অতএব আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আল্লাহ বলবেন, তোমরা অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মুমিনূন: ১১২-১১৫)

এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, দুনিয়ায় অবস্থানের মেয়াদ খুবই অল্প।

www.maktabatulabrar.com

(৮০) সূরা আবাসা, মক্কী
৪২ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١	(১) সে মুখ ভার করে ফেলল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।
اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢	(২) কেননা তাঁর নিকট এসেছিল একজন অন্ধ লোক।
وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣	(৩) তুমি জান কি? সে হয়ত পরিশুদ্ধ হয়ে যেত।
اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤	(৪) অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।

শব্দার্থ

عَبَسَ মুখ ভার করল, বেজার হল, تَوَلّٰى বিমুখ হল, মুখ ফিরিয়ে নিল, اَلْاَعْمٰى অন্ধ, وَمَا يُدْرِيْكَ (তুমি কি জান? لَعَلَّهٗ হয়ত সে, يَزَّكّٰى পরিশুদ্ধ হত, اَوْ অথবা, يَذَّكَّرُ উপদেশ গ্রহণ করত, فَتَنْفَعَهُ তার উপকারে আসত, اَلذِّكْرٰى উপদেশ।

সারমর্ম

তোমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করার জন্য একজন অন্ধলোক এসেছিল এবং তোমার নিকট প্রশ্ন করছিল, কিন্তু তুমি তার প্রশ্নের উত্তর দাওনি, বরং মুখ ভার করে, বিরক্তিভাব প্রকাশ করত মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে, অথচ তাকে নছীহত করলে তার উপকারে আসত!

সূরার নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ 'আবাসা'-কেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এ সূরাটিকে 'আস্সাফ-রা' এবং 'আ'মা' নামেও অভিহিত করা হয়। এর কারণ যথাস্থলে বর্ণনা করা হবে। (রূহুল মাআনী- ৩৯/৩০)

সূরার অবতরণকাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কায় নাযেল হয়েছে। আল্লামা আলূসী বলেন, এতে কারও দ্বিমত নেই। (দুররুল মানছুর- ৩১৪/৬)

আয়াতের সংখ্যা

এক রুকূ বিশিষ্ট এ সূরাটিতে সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা হেজাজী এবং কূফীদের মতে ৪২টি। বিছরীদের মতে ৪১টি, এবং শামী ও মদনীদের মতে ৪০টি।

শানে নুযূল

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক জামাতকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তূম (রা.) উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা না করেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন সাহাবী মনে করে, কুরাইশদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের দিকে কর্ণপাত করলেন না। ইবনে উম্মে মাকতুম যেহেতু অন্ধ ছিলেন, এজন্য অবস্থা পুরাপুরি উপলব্ধি করতে না পেরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন। এতেও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং অনাগ্রহের ভাব চেহারায় ফুটে উঠল। মানবিক কারণে ঘটিত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারার এই সামান্য মলিন ভাবকেও আল্লাহ পাক অপছন্দ করেছেন এবং সতর্ক করে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন (কুরতুবী- ২১১/১৯)। হযরত আয়েশা, হযরত আনাস, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত উমামাহ্ এবং কাআব ইবনে উজ্‌রাহ্ সহ অন্যান্য সাহাবা থেকে শানে নুযূল সম্পর্কে এ ঘটনা তাবারী, বাইহাকী, মুস্তাদরাক, তিরমিযী, মুআত্তা এবং তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতসমূহ নাযেল হওয়ার পর থেকে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) যখনই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসতেন, তখনই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই বলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতেন,

مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى .

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির প্রতি 'মারহাবা' যার খাতিরে আমার 'রব' আমাকে তিরস্কার করেছেন। (কুরতুবী- ২১৩/১৯)

হযরত সুফইয়ান ছাওরী রহ. রেওয়ায়াত করেছেন যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বসার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং দুইবার রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (তাবারী- ৫২/৩০)

ইবনে উম্মে মাকতুম

ইবনে উম্মে মাকতূম কে ছিলেন? এ সম্পর্কে সমস্ত মুফাস্সির একমত যে, তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর ফুফাতো ভাই এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি জন্মান্ধ অথবা পরবর্তীকালে অন্ধ হয়ে যান (রূহুল মাআনী- ৩৯/৩০)। ঐতিহাসিকগণ তার নাম আবদুল্লাহ বলে মন্তব্য করেছেন; কিন্তু ইবনুল আছীর জাযরীর মতে তার নাম ছিল আম্‌র (উসদুল গাবা- ২৬৩/৩)। তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম

www.maktabatulabrar.com

গ্রহণ করেন। (তাহযীব) হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে মাদায়েন বিজয়ের দিন কাদিছিয়ার যুদ্ধে অথবা মদীনা পাকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন (আল-ইসাবা)। মুফাস্‌সির রাযী এবং যামাখশারীর মতে তার দাদীকে উম্মে মাকতূম বলা হত (কাবীর- ৩৩১/৮ কাশ্‌শাফ- ৭১৭/৪)। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মতে তার জননীকে উম্মে মাকতূম বলে ডাকা হত।

তাফসীর

عَبَسَ وَ تَوَلّٰى (সে মুখ ভার করে ফেলল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেজার মুখ হয়ে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) থেকে বিমুখ হলেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ক করেছেন। প্রশ্ন হল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন? কেন তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যদের দিকে আকৃষ্ট হলেন? এর কারণ এ হতে পারে যে,

ক. সে অন্ধ ছিল আর অন্ধ বলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছেন। আয়াতে পাকে الاعمى শব্দটি দ্বারা হয়ত এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যারা বসা ছিলেন, তারা ইবনে মাকতূমকে দেখে হয়ত ভাববে যে,

انما اتباعه العميان والعبيد السفلة فعبس وجهه واعرض عنه واقبل على القوم.

কেবলমাত্র অন্ধ, গোলাম এবং নীচু প্রকৃতির লোকেরা তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-মর) অনুসরণ করে। তাই তিনি মুখভার করে ফেললেন এবং ইবনে উম্মে মাকতূম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উপস্থিতদের দিকে লক্ষ্য করে দাওয়াতের কাজে মশগুল রইলেন। (মাযহারী- ১৯৭)

গ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, সে তো আমার আপন লোক, তার প্রশ্নের জবাব পরেও দেয়া সম্ভব হবে, তাই তিনি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করলেন। কারণ, তাদেরকে দাওয়াত দেয়াই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমাদের দৃষ্টিতে শেষোক্ত কারণই চূড়ান্ত এবং একান্তভাবে যুক্তিযুক্ত। প্রথম কারণ এজন্য যুক্তিযুক্ত নয় যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিন মানুষকে বৈষয়িক কারণে ঘৃণা করতেন না। তাঁর নিকট কালো, সাদা, ধনী, গরীব এবং সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা বলতে কোন কিছু ছিল না। তাঁর নিকট ঘৃণা এবং মহব্বতের মাপকাঠি ছিল তাকওয়া ও ইসলাম। তাঁর কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে ও চলাফেরায় এর বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। অসংখ্য হাদীছে এর প্রমাণ বিদ্যমান। মসজিদে নববীর এক খাদেম মৃত্যুবরণ করলে সাহাবিগণ রাতের অন্ধকারে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে অবগত না করে দাফন-কাফনের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত হয়ে সাহাবিদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং খাদেমের কবরে উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায আদায়ান্তে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন এবং সাহাবিদেরকে এই বলে সতর্ক করেন যে, তোমরা খাদেম মনে করে তাকে ঘৃণা পোষণ করেছ? (বুখারী শরীফ) পবিত্র কুরআনে

আল্লাহ পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উন্নত চরিত্রের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর পবিত্র ও ঘৃণামুক্ত হৃদয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতূম অন্ধ ছিল বলে তিনি তাঁর প্রতি মুখভার করেছেন এবং বেজার মুখ হয়ে উত্তর দেননি- এ ধারণা যেমন পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের পরিপন্থি তেমনি বাস্তব বিরোধীও বটে। কোন কোন মুফাস্‌সির রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তরে মানবিক কারণে এ ধরনের ভাব উদিত হয়েছিল বলে যে মন্তব্য করেছেন, (দ্রঃ কাবীর- ৩৩২/৮) আমাদের দৃষ্টিতে সেটাও বোধগম্য নয়। কারণ, যে হৃদয়কে আল্লাহ পাক পবিত্র ওহীর জন্য নির্বাচন করেছেন সে হৃদয়ে এ ধরনের বক্রতা বিদ্যমান থাকতে পারে বলে আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তবে اعمى শব্দ কেন উল্লেখ করা হল? এর উত্তরে যদি বলা হয়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অন্ধ বলে ঘৃণা পোষণ করেছিলেন, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ বাস্তব বিরোধী; বরং তিনি মূলত অন্ধ ছিল, তাই তার পরিচিতি হিসেবেই আল্লাহ পাক এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। ইবনে উম্মে মাকতূম অন্ধ ছিলেন, আর বেলাল হাবশী গোলাম ছিলেন বিধায় যদি কাফেরদের উপরোক্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে এর প্রতিরোধের জন্য অথবা এর অসারতা প্রমাণ করার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার বিষয়টিই যথেষ্ট ছিল।

নবীগণ মাসূম

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রকার গোনাহ করেননি যে, সে কারণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুশিয়ার করা হয়েছে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য নবীদেরকে মাসূম তথা নিষ্পাপ না মানার পক্ষে আলোচ্য আয়াত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, অসংখ্য আয়াত দ্বারা নবীদের 'মাসূম' হওয়া চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সেজন্যই এটা উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য। মুফাস্‌সির রাযী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে বলেন,

القائلون بصدور الذنب عن الانبياء عليهم السلام تمسكوا بهذه الاية وقالوا لماعاتبه الله فى ذلك الفعل دل على ان ذلك الفعل كان معصية وهذا بعيد فانا قد بينا ان ذلك كان هو الواجب المتعين.

অর্থাৎ, 'নবীগণ গোনাহমুক্ত নন' বলে যারা আকীদা পোষণ করে, তারা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। তাদের মতে 'বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ ভার করার কারণে আল্লাহ কর্তৃক অসন্তুষ্টি প্রকাশ একথাই প্রমাণ করে যে, এ কাজ গোনাহের কাজ ছিল'- এ ধরনের প্রমাণ গ্রহণ করা আদৌ বোধগম্য নয়। কারণ, আমরা আমাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় যা করেছেন এটাই ন্যায়সঙ্গত ছিল, এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

নবীজী কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের যথার্থতা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কাফেরদের প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকলেন- এর পেছনে যথার্থ কারণ রয়েছে। আমরা কয়েকভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের

www.maktabatulabrar.com

যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

ক. কারণ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথে কথা-বার্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এমতাবস্থায় অন্যদিকে মনোনিবেশ না করাই ছিল নীতিগত বিষয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই করেছেন।

খ. কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিক মনে করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর কোন বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ অধিকার ছিল। তাই তিনি আপন অধিকার অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

গ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন, আর মধ্যখানে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম কথা বলছিলেন, তাই কথা ভঙ্গ করে তার কথার উত্তর দেয়া আইনগত প্রয়োজনীয় নয়। কারণ, পবিত্র হাদীছে এমতাবস্থায় প্রশ্ন করাকে অবাঞ্ছিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঘ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সময়ে-অসময়ে ডাকা-ডাকি করা পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ .

যারা ঘরের আড়াল থেকে তোমাকে (নবী [সাঃ]কে) ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (সূরা হুজুরাত: ৪)

এ আয়াতে অসময়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করতে বারণ করা হয়েছে। ইবনে উম্মে মাকতূমের আহ্বান অথবা প্রশ্নও উপযুক্ত সময়ে হয়নি। কারণ, তিনি কফেরদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সঠিক হয়নি।

অতএব এ আয়াত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হবে, হযরত ইবনে মাকতূম (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী হয়েও এ মুহূর্তে কেমন করে প্রশ্ন করেছিলেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে,

ক. হযরত ইবনে মাকতূম (রা.) একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে যারা উপস্থিত ছিল, অন্ধ হওয়ার কারণে তিনি তাদের সম্পর্কে পুরাপুরি ধারণা নিতে পারেননি। আওয়াজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে কোন কিছু বুঝে ফেলা অনেক সময় দুষ্কর হয়। তাই তিনি এরূপ প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন।

খ. তদুপরি বলা যায়, হযরত ইবনে মাকতূম (রা.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মব্যস্ততা এবং তাঁর কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি, অথচ দ্বীন সম্পর্কে অবগতি লাভের অফুরন্ত আবেগ নিয়ে তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তাই এমতাবস্থায় প্রশ্ন করা স্বাভাবিক বটে, অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অন্ধকে অন্ধ বলে ডাকা

পবিত্র কুরআনে এবং হাদীছে পাকে এ ধরনের সম্বোধন করা থেকে বারণ করা হয়েছে। কারণ, এ ধরনের সম্বোধন দ্বারা ঘৃণা এবং তিরস্কার প্রকাশ পায়, এতে সম্বোধনকৃতের দুঃখ হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

হে মুমিনগণ, কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম থেকে যারা তাওবা না করে, আসলে তারাই জালিম। (সূরা হুজুরাত: ১১)

বোখারী শরীফের হাদীছে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে ভর্ৎসনা করেছেন, انك امرء فيك جاهلية অর্থাৎ, এখন পর্যন্ত তোমার মধ্যে কিছু জাহেলী ভাব বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, তিনি তার এক গোলামকে يا ابن السوداء অর্থাৎ, 'হে কাইল্যার পুত' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এ ধরনের সম্বোধন ভদ্রতার পরিপন্থিও বটে। কিন্তু অলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে তার ভাল নাম ধরে সম্বোধন না করে অন্ধ বলে সম্বোধন করেছেন। আর মহান আল্লাহ পাক যা করে থাকেন তাই হয় সঠিক এবং রহস্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং বোঝা গেল, কোন বিশেষ কারণে বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ প্রয়োজনে এ ধরনের অনুমতি আছে।

আল্লাহ পাক হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে কোন্ হেকমতের তাগিদে 'আ'মা' তথা অন্ধ বলে সম্বোধন করেছেন, তা কেবল তিনিই জানেন। আমাদের সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে যা বুঝে আসে তা হচ্ছে, 'আ'মা' শব্দটিকে পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার প্রতি নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়সঙ্গত আচরণের কারণে অনুভূত অনুতাপের অবসানকল্পে সে দয়ার পাত্র বলে অভিহিত করাই 'আ'মা' শব্দ ব্যবহারের অন্যতম লক্ষ্য। মুফাস্সির রাযী বলেন,

ان ذكره بلفظ الاعمى ليس لتحقير شانه بل كانه قيل انه بسبب عماه استحق مزيد الرفق والرأفة .

অর্থাৎ, 'আ'মা' শব্দটি তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখানোর জন্য বলা হয়নি, বরং এজন্য বলা হয়েছে যে, সে অন্ধ হেতু অধিক কমনীয়তা ও করুণা পাওয়ার যোগ্য।

সমালোচনার নিয়ম

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সহিষ্ণুতা, মায়া–মমতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার ভিত্তিতে একটি প্রশান্তিময় ও নিরাপদ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী। এজন্যই ইসলামে গীবত, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ঝগড়া, কলহ, মুনাফেকী, পরস্পর একে অপরের দোষ তালাশ করে বেড়ানো ইত্যাদি বহুবিধ পাপকাজ হারাম এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেসব কারণে ইসলামের আকাঙ্ক্ষিত শীতল-শান্ত পরিবেশ তিক্ত ও বিষাক্ত হয়, তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে সমালোচনা।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় সমালোচনার দরকার হয়। প্রয়োজনের তাগিদে সমালোচনা করতে হলে তার জন্য ইসলাম কিছু শর্ত আরোপ করেছে। অবশ্যই সেই শর্তসমূহকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নে সমালোচনার শর্তাবলি উল্লেখ করে দেয়া হল।

সমালোচনার শর্তাবলি

ক. যে বিষয়ে সমালোচনা করা হবে, সে বিষয়ে সঠিক ইল্‌ম থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, অজানা বিষয়ে সমালোচনা করে বসলে অনেক সময় ভিত্তিহীন বা ভুল সমালোচনার কারণে আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়। পবিত্র কুরআনে এ শর্তের প্রতি গুরুত্বারোপ করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের কোন সংবাদ দেয়, তাহলে তা তোমরা ভাল করে পরীক্ষা করে নিবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না বস, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হবে। (সূরা হুজুরাত: ৬)

খ. বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সমালোচনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই বৃহত্তম স্বার্থ সাব্যস্ত হবে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ, শরীয়তের দৃষ্টিতে সেই স্বার্থ বৃহত্তম বলে বিবেচিত হতে হবে।

এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় হাদীছের রাবীদের সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গ। হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর ইসলামের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল নির্ভরশীল; বরং দ্বীনের সঠিক মূল্যায়ন এবং ইসলামের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হাদীছের উপর নির্ভরশীল। তাই রাবী অর্থাৎ, হাদীছের সূত্রসমূহের সততা, সরলতা, ঈমানদারী, আমানতদারী ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য রাবীদের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়, করা হয়েছে এবং হতে থাকবে। ইসলাম বৃহত্তম এই স্বার্থের খাতিরে রাবীদের সম্পর্কে সমালোচনা ও পর্যালোচনার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু এ অনুমতি সকলের জন্য নয়, নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলির মাধ্যমে এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রচিত কিতাবসমূহের পড়াশুনা দ্বারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে।

গ. সমালোচনাকারীকে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বড়ত্বের অহমিকা ইত্যাদি ধরনের চরিত্র মুক্ত হতে হবে।

ঘ. সমালোচনাকারীকে মিথ্যা, খেয়ানত, স্বার্থপরতা ও স্বীয় চিন্তাধারায় স্বপক্ষ অবলম্বনের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হতে হবে।

ঙ. সমালোচনাকারীকে স্থান-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনাকারী হতে হবে।

সুতরাং যারা এ সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ নয়, তাদের সমালোচনার অধিকার নেই এবং তাদের সমালোচনা গ্রহণযোগ্যও নয়। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন শিক্ষক তার ছাত্রের শিক্ষা-দীক্ষার লক্ষ্যে অথবা একজন মুরুব্বী তার ভক্তদের তরবিয়তের লক্ষ্যে তাকে বহুবিধ কথা বলতে পারে, কিন্তু তাই বলে অন্যদের তা করার অধিকার স্বীকৃতি পাবে না। বস্তুত মহান আল্লাহ তা'লীম-তরবিয়তের লক্ষ্যে স্বীয় নবীদেরকে ধমক দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কোন উম্মতের জন্যে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে নবীদের সমালোচনা করার আদৌ অনুমতি হতে পারে না। এমনিভাবে কোন নবী

www.maktabatulabrar.com

যদি তাঁর কোন সাহাবীকে সংশোধন ও সতর্ক করে থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য সেই সূত্র ধরে সমালোচনার অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কারণ, হতে পারে নবী তাকে অত্যন্ত মহব্বত করা হেতু কোন শক্ত কথা বলেছেন, অথচ তার অন্তরে সেই সাহাবীর স্থান অনেক উর্দ্ধে। এ মর্মেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان لاصل الرجل وغيره احب الى منه مخافة ان يكبه الله فى النار على وجهه .

আমি কারও প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করে থাকি এ অবস্থায় যে, তখন অন্য কেউ আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়। সেটা করি এই ভয়ে, যাতে সে (যাকে দেই সে) অধঃমুখী অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়। (বোখারী শরীফ)

আমাদের অলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ পাক তালীম-তরবিয়তের প্রশ্নে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হয়তবা সতর্ক করেছেন। এই সতর্কতার পেছনে অনেক হেকমত নিহিত থাকতে পারে, যাতে অন্ধ গরীবদের মনে সংশয় সৃষ্টি না হয় যে, নবীগণ ধনী এবং প্রভাবশালীদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যদিও এ ধরনের বিষয় থেকে নবীগণ পাক-পবিত্র হন। এ মহান লক্ষ্যে আল্লাহ পাক অনেক সময় নবীদেরকে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংশোধন করেছেন। কিন্তু এ সূত্র ধরে উম্মতের কারও পক্ষে নবীদের সমালোচনা করা নিছক বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى **(কেননা, তাঁর নিকট এসেছিল একজন অন্ধ লোক।)**

এ আয়াতে الاعمى (অন্ধ) শব্দের মাধ্যমে হযরত ইব্‌নে উম্মে মাকতূমকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কেন এসেছিলেন এবং তার কী বিষয়ে প্রশ্ন ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যথা:

ক. তাফসীরে দুররুল মানছুরে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্‌নে উম্মে মাকতূম বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি বৃদ্ধ, কমজোর এবং অন্ধ লোক, আমার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে জামাতে শরীক হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং আমার জন্য নিজ ঘরেই নামায আদায় করার অনুমতি আছে কি? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, هل تسمع المؤذن অর্থাৎ, তুমি কি মুয়াযযিনের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, فلم اجد لك من رخصة অর্থাৎ, আমি তোমার জন্য অনুমতির কোন উপায় দেখছি না। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহু, আযান অবশ্যই শুনি, কিন্তু যদি আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মত লোক না পাই? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان اسمعت النداء فاجب داعى الله .

যখন আযান শোন তখন আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে।

সামান্য পার্থক্যের সাথেই এই হাদীছ বুখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মূলত আয়াতের ঘটনা এটা নয়। তার কারণ রয়েছে কয়েকটি। যথা:

১. এটা মদীনার ঘটনা, আর আয়াতের ঘটনা মক্কায় ঘটেছে।

২. এখানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন, আর আলোচ্য আয়াতে প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার কারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ক

করা হয়েছে।

৩. আয়াতের ঘটনার কোন কোন সূত্রে উল্লেখ আছে যে, ইবনে উম্মে মাকতূমকে যে ব্যক্তি সাথে নিয়ে এসেছিল সে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে ইবনে উম্মে মাকতূমকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনায় তা নেই। এজন্য এটা আরেকটি ভিন্ন ঘটনা, আলোচ্য আয়াতের ঘটনা নয়।

খ. হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে উম্মে মাকতূম রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বাগাবী বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হতে আমাকে শিক্ষা দিন। হযরত আয়েশা এবং হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন ছিল না। হযরত আনাস, হযরত মুআয, হযরত আবূ উমামাহ্, হযরত কাতাদাহ, হযরত কা'আব ইবনে উজ্‌রা প্রমুখ সাহাবী থেকেই মুস্তাদরাকে হাকিম-সহ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে এভাবেই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত হাদীছের কোন কোন বর্ণনায় আরেকটি শব্দ এরূপ পাওয়া যায়–

فجلع عبد الله يستفتى النبى صلى الله عليه وسلام اية من القران .

আব্দুল্লাহ (ইবনে উম্মে মাকতূম) একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। এ ে ত বোঝা যায়, ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রশ্ন কুরআনের কোন আয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল, কিন্তু কোন্ আয়াত সম্পর্কে তা এখনও অস্পষ্টই রয়েছে।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يزكي .

(তুমি জান কি, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হয়ে যেত।)

يزكي -এর অর্থ সম্বন্ধে ইবনে যায়েদ বলেন, এর অর্থ হল– يسلم অর্থাৎ, মুসলিম হয়ে যেত। ইবনে যায়েদের এ অর্থ লক্ষ্য করে এক লেখক লিখেছেন, এতে বুঝে আসে, ইবনে উম্মে মাকতূম তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন না। জনৈক লেখক এই সম্ভাবনার পক্ষে তিন নং আয়াতকেও প্রমাণ হিসেবে ধরেছেন। (তাফহীমুল কুরআন-২৫০/৬) অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা ঠিক নয়। কারণ,

ক. ঐতিহাসিকগণ আলোচ্য ঘটনার পূর্বেই ইবনে উম্মে মাকতূম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

খ. ইবনে উম্মে মাকতূম রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়া রসূলাল্লাহ বলে সম্বোধন করেছেন, যদি তখন তিনি অমুসলিম হতেন, তাহলে এ সম্বোধন বোধগম্য নয়।

গ. তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে বুঝতে চেয়েছিলেন বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এতেও সুস্পষ্ট হয়, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ. যদি ইবনে উম্মে মাকতূম তখন কাফের হতেন, তাহলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিরত না করে যে সমস্ত কাফেরদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন, তাদের সাথে

www.maktabatulabrar.com

বসতে বলতে পারতেন। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্যও দ্বীন সম্পর্কেই ছিল, যেমন আল্লাহর বাণী- يزكى (সে হয়ত পরিশুদ্ধ হয়ে যেত।) দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য কাফেরদেরকেও দ্বীনের কথাই শোনাচ্ছিলেন। আর ইবনে যায়েদের অর্থের দ্বারা যে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা দুই কারণে যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত তার এ অর্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে উদ্ধৃত হাদীছসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলেও এর অসারতাই প্রমাণ হয়। এ কারণেই বিশেষজ্ঞ ও বিশারদগণ এই সম্ভাবনাকে ভাবতেও পারেননি এবং উল্লেখও করেননি। দ্বিতীয়ত يسلم অর্থ জনৈক লেখক যা বুঝেছেন, যদি তাই হত, তাহলে এর স্থলে □□□□ 'ইউ'মিনু' (ঈমান আনবে) শব্দ ব্যবহার করা হত। কারণ, তখন 'ঈমান' অর্থ করা নিশ্চিত হত। ইসলাম শব্দ কেবল ঈমানকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং ঈমানের পর আমলের জন্যও ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে এর যথেষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। যথা:– আল্লাহ পাক কুরআনের ভাষায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বললেন, اسلم অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ কর, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, اسلمت অর্থাৎ, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তবে কি এর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ) অমুসলিম ছিলেন? নিশ্চয়ই না। সুতরাং এখানে اسلم আত্মসমর্পণ এবং আমলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (রা.) এক ঘটনাস্থলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে বলেছিলেন,

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا .

'রব' হিসেবে আল্লাহ এবং দ্বীন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

তবে কি হযরত ওমর (রা.) এর পূর্বে মুসলিম ছিলেন না? সুতরাং ইবনে যায়েদের শব্দ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, এটাই যে তার উদ্দেশ্য ছিল, এর যথার্থতা প্রমাণ হয় না। তিন নং আয়াত দ্বারা কীভাবে ইবনে উম্মে মাকতূমের কাফের হওয়া প্রমাণিত হয়– এ সম্পর্কে জনৈক লেখক কোন কিছু বলেননি। লেখকের মতে ইবনে উম্মে মাকতূমের অন্তরে তখন ঈমানের আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। কিন্তু আয়াতে পাকের মধ্যে যে প্রেরণা এবং উদ্দীপনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, তা ঈমানের জন্য না হয়ে অধিক আমলের প্রশ্নে হলে তাতে কী বাধা রয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। লেখকও কোন কিছু উল্লেখ করেননি। আমাদের দৃষ্টিতে এ প্রেরণা ছিল ঈমান গ্রহণের পর আমলের জন্যই। পূর্বে বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়, বরং আয়াতের মধ্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে মনে হয়, এখানে ঈমানকে মোটেই উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আমলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী আয়াতের প্রারম্ভে او يذكر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, او অর্থ হচ্ছে 'অথবা'। পুরো আয়াতের অর্থ হবে (জনৈক লেখকের মতে) হয়ত সে ইসলাম গ্রহণ করে মুমিন হয়ে যেত, অথবা ঈমান গ্রহণ না করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নছীহত দ্বারা তার উপকার লাভ হত। ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য হয় কি? আর যদি ইয়াযযাক্কার অর্থ 'আমল' করা হয়, তবে আমলের যেহেতু বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সুতরাং বলা যাবে, হয়ত সে পরিপূর্ণ আমলের অধিকারী না হলেও আংশিকভাবে হলেও সে উপকৃত হয়ে যেত। এভাবে আয়াতের অর্থ যুক্তি যুক্ত সাব্যস্ত হয়। মূলত 'আও' শব্দ পরিভাষাগতভাবেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুফাস্‌সিরদের মত

সমস্ত মুফাস্‌সিরগণই يزكى এর অর্থ 'আমলের মাধ্যমে গোনাহ মুক্তির' কথা বলেছেন। মুফাস্‌সির ইবনে জারীর, (ইবনে জারীর– ৫২) আলূসী, (রূহুল মাআনী– ৪০/৩০) রাযী, (কাবীর– ৩৩২/৮) মাযহারী, (২১৮/৪) কুরতুবী, (২১৪/১০) ইবনে কাছীর, (তাফসীরে ইবনে কাছীর– ৪৭০/৪) যামাখশারী, (কাশ্‌শাফ– ২১৮/৪) সুয়ূতী, (জালালাইন) ইজাইলী, (জামাল– ৪৮৭/৩) তানতাবী, (তাফসীরে তানতাবী– ৪৩/২৫) আবুস সুউদ, (তাফসীরে আবিস সুউদ– ১০৮/৯) হাক্কানী, (তাফসীরে হাক্কানী– ৩৩) সকলেই একই মত পোষণ করেছেন। জনৈক লেখকের পক্ষে কেউ মত পেশ করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনা ছিল وما يدريك এর ما শব্দটিকে প্রশ্নবোধক হিসেবে গ্রহণ করে মুফাস্‌সিরগণ যা বলেছেন। এখানে 'মা' শব্দটিকে নফী অর্থাৎ, না জানার অর্থে গ্রহণেরও অবকাশ আছে। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে– তোমার জানা নেই যে, হয়তো সে তোমার নছীহত দ্বারা পাক পবিত্র হবে।" এতে বোঝা যায়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। কেননা, আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে বলছেন, হে নবী, ইবনে উম্মে মাকতূমকে নছীহত করলে যে কী উপকার তা তোমার জানা নেই। আর জানা থাকার কথাও নয়। আর জানা না থাকার কারণেই তুমি তার প্রশ্নের উত্তর দাওনি এবং অন্যদিকে মনোনিবেশ করেছ। কারণ, ইবনে উম্মে মাকতূম তোমার আপন লোক এবং মুমিনও বটে। আর যে বা যারা তোমার কাছে বসে আছে, সে বা তারা কাফের। তাই তুমি তাদের প্রতি দাওয়াত পেশ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছ। না,না, তোমার এ ভাবনা সঠিক নয়, বরং যারা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে, তাদের তালীম-তরবিয়তের প্রয়োজন কাফেরদেরকে দাওয়াত পেশ করার তুলনায় অনেক বেশি।

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ পাক রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদর্শনের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগেরে নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। তবে উভয় আয়াত দ্বারাই আল্লাহ পাকের নিকট হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের উচ্চমর্যাদা সাব্যস্ত হয়।

তাবলীগী জামাত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর

অজানার কারণে কোন কোন ভাইগণ বলে থাকেন, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ মুসলমানদের মধ্যে কেন? তারা তো মুসলমানই আছে? দাওয়াত বা তাবলীগের কাজ কাফেরদের মধ্যে করা উচিত। এ ধরনের প্রশ্নকারীদের অবগতির জন্য এবং তাদের ভুলের অবসানকল্পে বলা হচ্ছে, আমাদের আলোচ্য আয়াতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক কাফেরদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন মাত্র মুমিনের প্রশ্নের উত্তর দেননি বিধায় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধমক খেলেন। এতে বোঝা যায়, কাফেরদেরকে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের চেয়ে মুসলমানদেরকে তালীম-তরবিয়ত করার গুরুত্ব অনেক বেশি। কাফেরদেরকে অবশ্যই দাওয়াত পৌঁছাতে হবে, কিন্তু তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা না করা সন্দেহযুক্ত। পক্ষান্তরে যারা ঈমান গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে তালীম-তারবিয়ত করলে এর উপকারিতা নিশ্চিত। আর আমাদের তাবলীগী জামাত আল্লাহর রহমতে কাফেরদেরকে কী পরিমাণে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে, এতে কি পরিমাণ

www.maktabatulabrar.com

কাফের বেদ্বীন ইসলামের শীতল ছায়াতলে স্থান নিচ্ছে, তা আর বর্তমানে গোপন কিছু নয়, একটু খবর নিলেই বোঝা সম্ভব হবে।

ইসলামী শিক্ষাবিদদেরকে দিক-নির্দেশনা

অনেক ইসলামী মহলে দেখা যায় তারা অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহের অবসান করণের জন্য তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এমন এমন কর্মকাণ্ড করে বসেন, যা মুসলমানদের ঈমান-আমলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলামনদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট হয় যে, এমনটা করা সঠিক নয়; বরং মুসলমানদের ঈমান আকীদার সংরক্ষণ করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

তিন নং আয়াতের আরেকটি তাফসীর

তিন নং আয়াত সম্পর্কে উপরে কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এতে لعله (লাআল্লাহু) শব্দের যমীর তথা সর্বনাম দ্বারা ইবনে উম্মে মাকতূমকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্‌সির এই সর্বনাম দ্বারা কাফেরকে বুঝানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে– তুমি কি জান, কাফের তোমার দাওয়াত দ্বারা পরিপূর্ণ অথবা আংশিক উপকৃত হবে? হতেও পারে এবং নাও হতে পারে। এ ধরনের সন্দেহজনক উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি লক্ষ্য করাকে বর্জন করা কী করে সঠিক হতে পারে? অথচ ইবনে উম্মে মাকতূমকে নছীহত করলে অবশ্যই সে উপকৃত হত। বস্তুত ইবনে যায়েদের তাফসীর (যা জনৈক লেখক করেছেন অথবা বুঝেছেন) এ সূত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু তখন একথা মেনে নিতে হবে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একজন কাফের উপস্থিত ছিল। কেননা, আয়াতে একবচন যমীর উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, ইতিহাসের দৃষ্টিতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে তখন একাধিক কাফের উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে উতবা, শাইবা, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্যই অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(৫) পক্ষান্তরে যে লোকটি মোটেই পরোয়া করে না।	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥
(৬) তুমি তার প্রতিই মনোযোগ দিয়ে আছ।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦
(৭) অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই।	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧
(৮) আর যে লোকটি তোমার নিকট ছুটে আসল।	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨
(৯) এবং সে ভয়ও করে,	وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩
(১০) তুমি তার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করলে।	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠

শব্দার্থ

اِسْتَغْنٰى পরোয়া না করা, تَصَدّٰى মনোযোগ দেয়া, جَآءَكَ তোমার নিকট আসে, يَسْعٰى ছুটে আসা, দৌড়ে আসা, يَخْشٰى সে ভয়ও করে, تَلَهّٰى উদাসীনতা প্রকাশ করলে, অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে।

ভাবার্থ

হে নবী, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যে লোকটি তোমার দাওয়াতের পরোয়া করে না; বরং স্বীয় অহমিকায় লিপ্ত আছে, তোমার নিকট হেদায়াতের উদ্দেশ্যেও আসেনি, বরং অনর্থক তর্ক-বিতর্কের জন্য এসেছে, তুমি তাকে হেদায়াত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছ, তুমি ভাল করে বুঝে নাও, সে কিন্তু তোমার দাওয়াত গ্রহণ করবে না। আর সে দাওয়াত গ্রহণ না করলে তোমার প্রতি কোন অভিযোগ নেই। কারণ, তুমি দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছ। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি হেদায়াতের কামনায় এবং সত্যের পিপাসা নিয়ে তোমার খেদমতে হাজির হয়েছে, তাকে হেদায়াতের বাণী শোনালে শুভফল হবে এবং তাকে হেদায়াতের বাণী শোনানো তোমার কর্তব্যও বটে। তার অন্তরে হকের সন্ধান এবং আল্লাহর ভয়ও রয়েছে, তাই তাকে হেদায়াতের বাণী শোনালে অধিক ফলের আশা করা যায়, অথচ তুমি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে, এটা সমীচীন নয়।

তাফসীর

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى **(পক্ষান্তরে যে লোকটি মোটেই পরোয়া করে না। তুমি তার প্রতিই মনোযোগ দিয়ে আছ।)**

হযরত রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সংখ্যক কাফেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এমন সময় সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে কোন বিষয়ে জানতে চান। কিন্তু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়সংগত কারণে তার উত্তর না দিয়ে কাফেরদের সাথে আলোচনা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, হে নবী, তুমি কাফেরদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছ, যাদের অন্তরে আল্লাহর কোন প্রকার ভয় নেই এবং তোমার দাওয়াতের প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে এবং তোমার দাওয়াতের প্রতি পরিপূর্ণ আকর্ষণ রয়েছে এবং তোমার বাণী দ্বারা সে উপকৃতও হবে, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ না। অথচ তার দায়িত্বভার তোমার প্রতি ন্যস্ত রয়েছে। কাফেরদের কোন দায়িত্ব তোমার উপর বর্তায় না। এটা তোমার জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।

সতর্কবাণীর রহস্য

এখানে প্রশ্ন হয়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফের-মুমিন নির্বিশেষে সকলের প্রতি দাওয়াত প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন, আর এ তাগিদেই তিনি কাফেরদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অপরদিকে কাফেররা হযরত ইব্নে উম্মে মাকতূমের পূর্বেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিল। তাই নীতিগতভাবে তাদের সাথে আলোচনায় রত থাকাই ছিল ন্যায়সংগত। এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহ পাকের এ সতর্কবাণীর তাৎপর্য কী?

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কৃত আমাদের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মূলত আল্লাহ পাকের সতর্কবাণী এবং অসন্তুষ্টির প্রকাশ কাফেরদের প্রতিই ছিল, আর তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণের ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের উপস্থিতির পর কাফেরদেরকে হেদায়াতের বাণী শোনানো উচিত হয়নি, অথচ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেদায়াতের বাণী শোনাচ্ছিলেন, তাই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, এটা মোটেই সমীচীন নয়।

কাফেরদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাফেরদের প্রতি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার পেছনে মূলত দুটি কারণ ছিল। যথা:

ক. কাফেররা ইবনে উম্মে মাকতূমের পূর্বে থেকেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিল এবং তাদের সাথে প্রথম থেকেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের কাজে রত ছিলেন। সুতরাং যুক্তির প্রশ্নেও তাদের সাথে আলোচনায় রত থাকাই ছিল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য ন্যায়সঙ্গত।

খ. যেহেতু তারা কাফের ছিল, তাই তাদের বেলায় ঈমান ও আকীদার প্রশ্নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গি। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম ছিলেন একজন কামেল মুমিন, তার ক্ষেত্রে কুফ্রীর অবকাশ মোটেই ছিল না, পরবর্তী সময়েও তার প্রয়োজন মেটানোর অবকাশ বিদ্যমান ছিল। এ ধরনের চিন্তা করেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদেরকে দাওয়াত প্রদানে রত ছিলেন এবং সেরূপ থাকাই ছিল ন্যায়সঙ্গত। আর যা ন্যায়সঙ্গত ছিল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই করেছেন। সুতরাং এ কারণে সতর্কবাণী উচ্চারিত হতে পারে না।

উল্লিখিত বক্তব্যের পক্ষে একটি উপমা এরূপ পেশ করা যায় যে, যদি কোন ডাক্তারের সম্মুখে দুই জন রোগী থাকে– একজন কলেরার রোগী, আর অপরজন সর্দি-কাশির রোগী, তাহলে কলেরার রোগীকেই প্রধান্য দেয়া ডাক্তারের জন্য ন্যায়সঙ্গত। বিশেষ করে যদি কলেরার রোগী প্রথমে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হয়। বস্তুত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের কুফ্রীর কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ অন্তর্নিহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ

কিন্তু মহান আল্লাহ পাক কলেরার রোগী রূপী কাফেরদের অন্তর্নিহীত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে, কাফেররা হেদায়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেনি, হেদায়াতের প্রতি তাদের আকর্ষণ নেই; বরং তর্কবিতর্কের মাধ্যমে ডাক্তারের সময় নষ্ট করার মত রোগীদের ন্যায়ই

www.maktabatulabrar.com

তাদের অবস্থা। তাই তাদের পেছনে সময় ব্যয় করাতে কোন উপকারিতা নেই। তাই আল্লাহ তাআলা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরত করেছেন, তবে বিরত করেছেন সতর্কতার ভঙ্গিতে। আসলে এ সতর্কবাণী কাফেরদের প্রতিই উচ্চারিত হয়েছিল।

হেদায়াত গ্রহণ না করার কারণ

এখানে বিবেচনার বিষয় হল উপস্থিত কাফেরদের হেদায়াত গ্রহণ না করার কারণ কী ছিল? ৫নং আয়াতে استغنى (ইস্তাগ্না) শব্দটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে মুফাস্সিরদের মতামত নিম্নরূপ।

ক. কোন কোন মুফাস্সিরদের মতে من استغنى এর অর্থ হচ্ছে من كان ذا ثروه وغنى অর্থাৎ, যারা সম্পদওয়ালা। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে "হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা সম্পদশালী তুমি তাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছ। অর্থাৎ, কাফেরদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকর্ষণের কারণ ছিল তাদের অর্থ-সম্পদ (কুরতুবী- ২১৪/১৯)। কিন্তু এ অর্থ দুই কারণে বোধগম্য নয়। প্রথম কারণ হল, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থ সম্পদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ধনীদেরকে কখনও প্রাধান্য দিতেন না। কুরআন হাদীছ এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শে এর অগণিত প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল, তাহলে পরবর্তী আয়াতে ইবনে উম্মে মাকতূমের বেলায় বলা হত যে, তুমি কাফেরদের প্রতি তাদের সম্পদের কারণে আকর্ষিত হলে আর ইবনে উম্মে মাকতূমের দরিদ্রতার কারণে তার প্রতি অমনযোগী হলে। এভাবে দরিদ্রতার কারণে অনাকর্ষণের কথা আয়াতে উল্লেখ থাকাই ছিল উপযুক্ত, অথচ ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অমনোযোগী হওয়ার কারণ হিসেবে দরিদ্রতার কথা ইঙ্গিতেও বলা হয়নি। (কাবীর- ৩৩২/৮)

খ. মুফাস্সির তাবারীর মতে হেদায়াতের প্রতি কাফেরদের অমনোযোগী হওয়ার কারণ ছিল তাদের অর্থ সম্পদের অহমিকা। যথা: তিনি বলেন,

اما من استغنى بماله فانت له تتعرض رجاء ان يسلم .

যারা মালের কারণে বেপরোয়া, তুমি তাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছ এই আশায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। (তাবারী- ৫২/১৫)

পক্ষান্তরে মাল-সম্পদের অহমিকা মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়। এর বাস্তবতা ও জ্বলন্ত প্রমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান বিশ্বেও এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এ পর্যায়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীটিও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

حب الدنيا رأس كل خطيئة .

দুনিয়ার মহব্বত তথা মালের মহব্বত সকল প্রকার অপরাধের মূল কারণ।

অর্থ ও সম্পদশালীদের এ ধরনের হঠকারিতার কথা পবিত্র কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত অর্থের অভাব যেমন মানুষকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়, তেমনিভাবে অহমিকাও মানুষকে কুফরীর মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।

www.maktabatulabrar.com

গ. অনেকের মতে তাদের মধ্যে বিদ্যমান কুফরীই ছিল তাদের হেদায়াত গ্রহণ না করার মূল কারণ। (রূহুল মাআনী- ৪০/২৯)

বাস্তবে 'খ' য়ে উল্লেখিত কারণ আর শেষোক্ত কারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, অর্থ সম্পদ একদিকে যেমন কুফরীর কারণ হয়, অপরদিকে কুফরী মানুষকে ঈমান আকীদা হারা করে অর্থের পূজারী বানিয়ে দেয়। তাই উভয়টি একই সাথে হেদায়াত গ্রহণ না করার কারণ হতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের মধ্যে এক বৃহত্তম অংশ এমনও ছিল, যারা কুফরীর মধ্যেই সঠিক সফলতা নিহীত রয়েছে বলে বিশ্বাস করত। তারা কুফরীকেই মনে করত সঠিক পথ। তারা বলে থাকত,

وَانَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ .

আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণেই সঠিক পথের দিশারী।

ঘ. কারও কারও মতে কাফেরদের বৈরিতার কারণ ছিল অহংকার। এ কারণেই তারা ঈমান ও হেদায়াতের বাণী গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। অহংকার মানুষকে যে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা এখান থেকেই প্রতীয়মান হয়। মানবজাতির চির শত্রু ইবলীসের বিতাড়িত হওয়ার কারণটিও এখানে চিন্তায় আনা যায়।

'খ' ও 'গ' তে উল্লেখিত ব্যাখ্যার সাথে 'ঘ' য়ে উল্লেখিত বিষয়ের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। তবে 'খ' এবং 'ঘ' য়ে উল্লেখিত কারণে ইসলাম গ্রহণ না করে থাকলে তারা যে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সততা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত ছিল, কিন্তু অর্থ-সম্পদ এবং আত্মঅহংকার তাদেরকে সত্যের স্বীকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে- একথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পক্ষান্তরে 'গ' য়ে বর্ণিত কুফরীর কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ধরে নিলে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, বরং ধর্মান্ধতাই তখন হবে মূল কারণ।

অস্বীকারকারীদের প্রতি দাওয়াত-প্রসঙ্গ

৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে। "যারা হেদায়াত চায় না, তুমি তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছ।" এখানে প্রশ্ন হয় যে, যারা হেদায়াত না চায়, তাদেরকে হেদায়াতের বাণী শোনানো নিষেধ কি না? কুরআনে কারীমের আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যারা কুফরীতে নিমগ্ন রয়েছে এবং যাদের অন্তরে সিল মোহর করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, যাদের ঈমান গ্রহণের কোন আশা নেই, তাদের প্রতিও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের বাণী প্রচার করেছেন, অথচ আল্লাহ পাক নবীকে সেই দাওয়াত প্রদান থেকে বিরত করেননি। সূরায়ে বাকারায় ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

নিশ্চয়ই যারা কাফের, তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা সতর্ক না কর, তাদের জন্য উভয়টিই সমান- তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। (সূরা বাকারা: ৬)

উপরোক্ত আয়াতে ঐ শ্রেণির কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, যাদের অন্তরকে 'সীলড' করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কথা ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি পরকালের আযাবের ভয় প্রদর্শনকে নিষেধ করা হয়নি। অবশ্য এ ভয় প্রদর্শন দ্বারা কোন উপকার

সাধিত হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি দাওয়াত প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়নি। কেবল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই নন, সকল নবী রসূলগণই অস্বীকারকারীদের প্রতি দাওয়াত প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। এতএব এটা বোঝা অত্যন্ত সহজ যে, ছয় নং আয়াতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদেরকে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার কারণে সতর্ক করা হয়নি, বরং কারণ তা-ই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

উগ্রপন্থিদের প্রতি দাওয়াত প্রসঙ্গ

সাত নং আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, শ্রোতা দাওয়াত গ্রহণ না করলে দাওয়াত দানকারী দায়ী নয়। শ্রোতা দাওয়াত গ্রহণ না করলেও দাওয়াত দানকারী কামিয়াব বলে বিবেচিত হয় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সফল হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যদি কোন উগ্রপন্থি কাফেরদের সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের কে দাওয়াত দেয়ার কোন উপকারিতা নেই, বরং সময়ের অপচয় এবং ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই, অথচ অন্যত্র দাওয়াতের কাজে সময় ব্যয় করলে দাওয়াতের কাজে অধিক লাভবান হওয়া যায়, তবে এক্ষেত্রে উগ্রপন্থিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার অবকাশ আছে বলে সাত নং আয়াতে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, তাই তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত কাফেরদের উগ্রতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তিনি তাদের প্রতি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর জ্ঞান ও অবগতি অনুসারে তাদেরকে অগ্রধিকার দেয়া থেকে নিবারণ করেছেন।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কাফেরদের প্রতি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার এক কারণ হল উম্মতের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও মায়া-মমতা। আর এক কারণ হল আল্লাহ প্রদত্ত দাওয়াতের ন্যস্ত দায়িত্ব। (মাজহারী- ১১৯/১০)

وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى. وَ هُوَ يَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (আর যে লোকটি তোমার নিকট ছুটে আসল এবং সে ভয়ও করে, তুমি তার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করলে।)

তাফসীর

উপরোক্ত ৮-১০ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যে লোকটি ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তোমার নিকট হেদায়াতের বাণী শোনার আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর তার অন্তরে ভীতিও বিদ্যমান রয়েছে, তুমি সে লোকটির প্রতি মনোযোগী হওনি। এ আয়াতে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের বিশেষ গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার প্রচেষ্টা এবং আগ্রহের সাথে সাথে তদনুপাতে অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকাই ঈমানের পরিপূর্ণতার বিশেষ নিদর্শন, তা এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর এ কারণেই আল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) এই অধিকারী বিবেচিত হয়েছেন যে, তার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা হবে।

আয়াতে وهو يخشى 'সে ভয় করে' কীসের ভয়? এ নিয়ে মুফাস্সিরদের মতামত পরস্পর বিরোধী। যেমন:

ক. কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, এ ভয় হল اذية الكفار তথা কাফেরদের নির্যাতনের ভয়। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর অন্তরে কাফেরদের নির্যাতনের ভয় ছিল। (কাশ্শাফ- ২১৮/৪)

খ. কারও কারও মতে এ ভয় হল রাস্তায় পদস্খলনের ভয়। কারণ, তিনি অন্ধ ছিলেন এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে সদাসর্বদা নিয়ে আসার মত কোন সহযোগী ছিল না। (আবুস সুউদ-১০৮/৫) কিন্তু উভয় মতামত বাস্তবমুখী নয়।

গ. আল্লাহর ভয় এবং শরীয়তের আহকামসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার অক্ষমতার ভয়। (রূহুল মাআনী- ৪১/৩০)

আমাদের মতে সকল ভয়ের ঊর্ধ্বে এটাই ছিল আসল ভয়। কারণ, একদিকে তিনি ছিলেন অন্ধ, অপরদিকে অত্যন্ত খোদাভীরু। আর যাদের খোদাভীরুতা অধিক হয়, তাদের অন্তরে স্বীয় আমল সম্পর্কে অধিক ভয়-ভীতি বিদ্যমান থাকে। এ কারণেই হযরত ঈমাম গাযালী রহ. বলেছেন,

المخلصون على خطر عظيم.

যারা মুখলিছ হন তারা সর্বদা অধিক ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। (ইয়াহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন- ৩৫১/৪)

মাসলা-মাসায়েল

৫ নং থেকে ১০ নং আয়াতসমূহ দ্বারা নিম্নোক্ত মাসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়।

১. কুফ্রী, অহংকার এবং অর্থ-সম্পদ সত্য গ্রহণে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. কাফেরকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, তবে দাওয়াতের প্রশ্নে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, মুনিব-শ্রমিক এবং নারী-পুরুষ সকলেই সমান। হ্যাঁ, বিশেষ কারণে এর মধ্যে কারও অগ্রাধিকার লাভের অবকাশ অবশ্যই রয়েছে।

৩. দাওয়াত গৃহীত না হলে দাওয়াত প্রদানকারীকে অভিযুক্ত করা যায় না।

৪. যাদের অন্তরে ইল্মের অধিক আগ্রহ বিদ্যমান, তারা প্রশংসার পাত্র এবং অগ্রাধিকারের অধিকারী।

৫. অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি বিদ্যমান থাকা এবং এর বৃদ্ধির কামনায় ইল্ম হাসিল করা প্রকৃত সফলতার নিদর্শন।

(১১) এ ধরনের আচরণ মোটেই উচিত নয়, নিশ্চয়ই এটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
(১২) যার ইচ্ছা হয় সে এই উপদেশ স্মরণ রাখতে পারে।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾
(১৩) এই উপদেশ সম্মানিত লিপিসমূহে রয়েছে।	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
(১৪) যা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র পুণ্যবান।	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾

www.maktabatulabrar.com

(১৫) এমন সব লেখকদের হাতে লেখা,	بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
(১৬) যারা নিপুণ চরিত্রের অধিকারী পুণ্যবান।	كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
(১৭) নিপাত যাক মানুষ, কতইনা অকৃতজ্ঞ সে?	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾
(১৮) তিনি কী দিয়ে তাকে তৈরি করেছেন?	مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾
(১৯) শুক্রের এক ফোঁটা দিয়ে তৈরি করেছেন এবং সঠিক পরিমাপে রেখেছেন।	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾
(২০) অতঃপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করে দিয়েছেন।	ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾
(২১) এরপর তাকে মৃত্যু দিয়ে কবরে সমাধিস্থ করেন।	ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾
(২২) আবার যখন ইচ্ছা তাকে পুনর্জীবিত করেন।	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾
(২৩) কখনও না, তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন সে তা পালন করেনি।	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

শব্দার্থ

كَلَّا মোটেই না, اِنَّهَا নিশ্চয়ই এটা, تَذْكِرَةٌ উপদেশ, নছীহত, صُحُفٍ পাতা, লিপি, কিতাব, مُكَرَّمَةٍ সম্মানিত, مَّرْفُوْعَةٍ উঁচুতে রক্ষিত, مُّطَهَّرَةٍ পবিত্র পরিচ্ছন্ন, بِاَيْدِىْ এমন সব হাতে, سَفَرَةٍ পবিত্র লেখক, দূত, كِرَامٍ সম্মানিত, পূত, بَرَرَةٍ পুণ্যবান, قُتِلَ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক, اَلْاِنْسَانُ মানুষ, مَآ اَكْفَرَهٗ সে কতই না অকৃতজ্ঞ, مِنْ اَىِّ কোথা থেকে, কিসের থেকে, شَىْءٍ বস্তু, خَلَقَهٗ তাকে সৃষ্টি করেছেন, তৈরি করেছেন, نُّطْفَةٍ শুক্রবিন্দু, فَقَدَّرَهٗ এবং সঠিক পরিমাপে রেখেছেন, নির্দিষ্ট করেছেন, ثُمَّ অতঃপর, اَلسَّبِيْلَ পথ, يَسَّرَهٗ সুগম ও সহজ করে দিয়েছেন, اَمَاتَهٗ তার মৃত্যু ঘটান, فَاَقْبَرَهٗ কবরে সমাধিস্থ করেন, اِذَا شَآءَ যখন ইচ্ছা, اَنْشَرَهٗ উঠিয়ে দাঁড় করবেন, পুনর্জীবিত করেন, لَمَّا يَقْضِ পূরণ করেনি, مَآ اَمَرَهٗ যা তাকে নির্দেশ করা হয়েছিল।

সারমর্ম

হে নবী, তাদেরকে হেদায়াত করতে গিয়ে নিজেকে এভাবে নিমগ্ন করার প্রয়োজন নেই এবং ব্যস্ত হওয়ারও কোন আবশ্যকতা নেই। তোমার জিম্মা হচ্ছে উপদেশ দেয়া এবং দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, যা

www.maktabatulabrar.com

তুমি করেছ। যার ইচ্ছা হয় নছীহত গ্রহণ করে হেদায়াত পাবে, আর যার ইচ্ছা না হয় উপদেশ গ্রহণ না করে গোমরাহ থাকবে; তোমার নছীহত বৃথা যাবে না। প্রথমত তুমি আমার নির্বাচিত মহান নবী, দ্বিতীয়ত এই নছীহতসমূহ অতি মহান পবিত্র কিতাবের। সে কিতাব অতি সম্মানী, নির্ভুল, পাক পবিত্র লেখকদের হস্তে লিপিবদ্ধ হয়ে লওহে মাহফূজে সুসংরক্ষিত রয়েছে। তাই যদি কেউ এই নছীহতসমূহ গ্রহণ না করে, তাতে না তোমার কোন কিছু আসে যায়, না পবিত্র কুরআনের কোন প্রকার মর্যাদার ক্ষতি হবে। যারা এই নছীহতসমূহ গ্রহণ করেছে এবং করবে তোমার দাওয়াতের সফলতার জন্য তারাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যারা তোমার নছীহত গ্রহণ করে না এবং পবিত্র কুরআন থেকেও উপদেশ গ্রহণ করে না, এ ধরনের মানুষের ধ্বংস হওয়া সুনিশ্চিত। এরা পৃথিবীতেও অভিশপ্ত ধোঁকাগ্রস্থ এবং পরকালেও অস্বীকারের যাতনা ও গ্লানি ভুগবে। এদের না-শোকরী চরম পর্যায় পৌঁছেছে। এরা এতটুকুও অনুধাবন করতে পারে না যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তার বিধি-নিষেধ পালন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এদের এতটুকু বোধ শক্তি নেই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে একফোঁটা শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং অভাবনীয় সুন্দর আকৃতি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই তার সৃষ্টির সূত্র এবং সৃষ্টি পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা করে অহংকার বর্জন করা উচিত এবং আল্লাহর কুদরতের প্রতি নতশীর হওয়া বাঞ্ছণীয়। এই গণ্ডমূর্খ লোকগুলো অনুধাবন করে না যে, মহান রব্বুল আলামীন তাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং জীবনযাপনের কত উন্নত উপকরণসমূহ বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। তাদের শিক্ষা গ্রহণ করার যথেষ্ট বিষয় ছিল। কিন্তু তারা এদিকে মোটেই দৃষ্টি আরোপ করে না। তারা লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ পাক কীভাবে মানুষকে জীবন দান করেন এবং আবার নির্ধারিত সময় মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। মৃত্যুর পর আপনজনেরা কীভাবে তাকে দাফন-কাফন শেষে মাটির নীচে সমাধিস্থ করে দেয়। যতদিন পৃথিবীতে থাকে ততদিন কিঞ্চিত স্বাধিকার অবশ্যই থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক তার কুদরত দ্বারা আবার পুনর্জীবিত করেন এবং সে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরিণাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে থাকে। এই সব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, আর শিক্ষা গ্রহণ করলে আল্লাহর নির্দেশিত পথ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতের এবং পবিত্র কুরআনের পথ গ্রহণ করত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এরা এর কোনটিই বিবেচনা করে না এবং এ সম্পর্কে নছীহত করলে তাও কবুল করে না, ফলে হুকুম আহকাম সমূহ এভাবেই থেকে যায়, তারা তা পুরা করতে ব্যর্থ হয়।

তাফসীর

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (এ ধরনের আচরণ মোটেই উচিত নয়, নিশ্চয়ই এটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।)

এখানে (এ ধরনের আচরণ মোটেই উচিত নয়)-এর অর্থ প্রসঙ্গে মুফাস্সির কুরতুবী বলেন, এর অর্থ হল–

لا تفعل بعدها من اقبالك على الغنى واعراضك عن المؤمن الفقير .

অর্থাৎ, ধনীদের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং দরিদ্র মুমিন থেকে বিরত থাকার মত অনুচিৎ কর্ম ভবিষ্যতে তুমি আর কোন দিন করবে না।

ইমাম রাযী বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বর্ণনানুসারে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। যখন ১১নং আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্ত হলেন। কারণ, অতীত বিষয়টিকে আল্লাহ্ পাক মার্জনা করেছেন, তাই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মুবারকে প্রশান্তির ভাব ফুটে ওঠে। একজন স্বাভাবিক মুমিন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ পেলেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এটা ঈমানের চাহিদাও বটে। সেক্ষেত্রে একজন নবী, যিনি শুধু নবীই নন, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর জন্য এটা অবশ্যই খুশির কথাই বটে।

কিন্তু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনীদের প্রতি ধনের কারণে আকৃষ্ট হয়ে ইবনে উম্মে মাকতূমের মত গরীবের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিলেন– মুফাস্সির কুরতুবীর এই মতের সাথে আমরা একমত নই। কেন একমত নই, তা আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত লিখেছি। আমরা যা লিখেছি, তাতে করে মুফাস্সির রাযী এবং কুরতুবীর উত্তর হল– রসূলে পাক যা করেছিলেন তা না করলে ভাল হতো তবে করা জায়েয ছিল। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন তা ওহীর সূত্রেই করেছিলেন এবং ন্যায়সঙ্গতই করেছিলেন। তবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপদেশ যেহেতু তারা গ্রহণ করছিল না, তাই কাফেরদেরকে ভর্ৎসনা করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিবারণ করা হয়েছে। যদিও ধমকের প্রকাশ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হয়েছে, কিন্তু মূলত লক্ষ্য ছিল কাফেররা। পরবর্তী বর্ণনায় আমাদের এই বক্তব্যের অধিক যৌক্তিকতা প্রমাণ হয়। যথা আল্লাহ পাক পরক্ষণেই ইরশাদ করেছেন, انها تذكرة অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ নছীহতের কিতাব। এতে একথা বলা হয়নি যে, তুমি শুধু মুমিনদেরকেই নছীহত করবে, বরং এই নছীহত যেমন মুমিনদের জন্য, তেমনি কাফেরদের জন্যও। আর তুমি যেমন মুমিনদের জন্য নবী তেমনি কাফেরদের জন্যও নবী। সুতরাং তোমার কাজ ছিল নছীহত করা, আর তা তুমি করেছ। তুমি তোমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছ। তবে এ সকল লোকেরা তোমার নছীহতের কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, এতে তোমার মোটেই কোন কিছু আসে যায় না। পবিত্র কুরআন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নছীহতের কিতাব, কেউ তার নছীহত গ্রহণ না করলে পবিত্র কুরআনের কোন অবমাননা হয় না। কারণ, তুমিও আমার সম্মানিত এবং নির্বাচিত নবী, আর পবিত্র কুরআন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নছীহতের কিতাব। অতএব কেউ তার নছীহত গ্রহণ না করলে তার কোন অসম্মানী হয় না। আল্লাহর বাণী হওয়াই পবিত্র কুরআনের সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ **(সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে এই উপদেশ স্মরণ রাখতে পারে।)**

সুতরাং যদি কেউ কুরআনের নছীহত গ্রহণ করে, তবে তা হবে তার জন্য মঙ্গলের কারণ। আর যদি গ্রহণ না করে, তবে তা হবে তার জন্যই অমঙ্গলের কারণ। তাই যার মনে চায় গ্রহণ করুক আর যার মনে না চায় সে গ্রহণ না করুক। এ নিয়ে তোমার বিচলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি নছীহতের দায়িত্ব পালন করে যাও, কেউ তা গ্রহণ না করলে সেজন্য তুমি মোটেই দায়ী নও।

১১/১২নং আয়াতের এই নিগুঢ় সূত্র আমাদের বক্তব্যকে যথার্থ বলে প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গরীবদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করত ধনীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন– মুফাস্সির কুরতুবী এবং তার অনুসারীদের এহেন মন্তব্য কোনভাবেই বোধগম্য নয়।

www.maktabatulabrar.com

কুরআনে ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থিত নয়

১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'যার মনে চায় সে এই উপদেশ মনে রাখতে পারে ও গ্রহণ করতে পারে। (আর যার মনে চায়-সে গ্রহণ নাও করতে পারে) এখানে কুরআনকে গ্রহণ করা/না করার কোন প্রকার অধিকার দেয়া হয়নি, বরং যারা গ্রহণ করে না, তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ পাক 'যার মনে চায় গ্রহণ কর' বলে ক্ষান্ত হয়েছেন, 'যার মনে না চায় সে গ্রহণ না কর' কথাটি উহ্য রেখেছেন। এটা এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ .

যার ইচ্ছা হয় সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা না হয় সে অস্বীকার করুক। (সূরা কাহফ: ২৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ .

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের জন্যেই করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার থেকে) আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (সূরা লুকমান: ১২)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ .

তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমাদের জন্য আমার দ্বীন। (সূরা কাফিরূন : ৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যেমন সম্মতির সুরে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি আলোচ্য আয়াতেও তা-ই করা হয়েছে।

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (এই উপদেশ সম্মানিত লিপিসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।)

কুরআনের আজমত

পবিত্র কুরআন একটি সামগ্রিক জীবনবিধান, উপযুক্ত উপদেশ মণ্ডিত কিতাব, যে ইচ্ছা করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ ও তা কার্যত বাস্তবায়ন করতে পারে। যে কুরআনের তত্ত্ব বুঝতে চায়, আল্লাহ পাক তাকে ইলহাম করে থাকেন। এই কুরআন 'ছুহুফে' (লিপিসমূহে) সংরক্ষিত রয়েছে, সুতরাং এর আজমত ও সম্মান চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

صُحُفٌ -এর অর্থ

আয়াতে صحف (ছুহুফ) দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে– এ নিয়ে মুফাস্সিরদের মতপার্থক্য রয়েছে। যথা:

ক. 'ছুহুফ' দ্বারা মু'মিন এবং হাফেজদের অন্তর বুঝানো হয়েছে। এ মতে আয়াতের মর্ম হবে এরূপ– পবিত্র কুরআন মু'মিনদের অন্তরে হেফজের বদৌলতে অঙ্কিত হয়ে আছে। সুতরাং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। তাদের অন্তরে কারও অনাধিকার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও নেই। কারণ, এই অন্তরসমূহ আল্লাহর নিকট খুবই সম্মানিত, পাক-পবিত্র। কুফরী এবং বেদআতের মোটেই অবকাশ সেখানে নেই। সুতরাং কাফেররা এই কুরআনকে অস্বীকার করলে কোন কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ

অর্থ হেকমতের পর্যায় গ্রহণীয় হলেও আয়াতের জাহের এবং প্রকাশ্য বক্তব্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

খ. 'ছুহুফ' দ্বারা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবাদিকে বোঝানো হয়েছে। এ মতে আয়াতের মর্ম হবে এরূপ– পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লামদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব-সমূহে পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বর্ণিত রয়েছে। সেই যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের খাঁটি অনুসারীগণের অন্তরেও পবিত্র কুরআনের আজমত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং কাফেরদের উপেক্ষার কারণে মোটেই কোন কিছু আসে যায় না। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এই ব্যাখ্যার যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى.

এগুলো পূর্বের কিতাবসমূহেও বিদ্যমান, ইবরাহীম এবং মূসা-র কিতাবে। (সূরা আ'লা: ১৮-১৯)

আরেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَ اِنَّه لَفِىْ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ.

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর (অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের) উল্লেখ রয়েছে। (সূরা শু'আরা: ১৯৬)

পবিত্র কুরআনের কথা অবশ্যই ইতোপূর্বের কিতাবসমূহে উল্লেখ হয়েছে। তাওরাত, যাবূর এবং ইনজিলেও উল্লেখ হয়েছে।

গ. অনেকের মতে 'ছুহুফ' দ্বারা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে লিখিত এই পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। তাহলে আয়াতের মর্ম এই দাঁড়াবে যে, এই পবিত্র কুরআন উপদেশবাণী, অত্যন্ত সম্মানী, তা লিখিত রয়েছে আর লিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম, যাদের জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতার স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র কুরআনে প্রশংসা নাযেল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগেই পবিত্র কুরআন অবশ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছিল কি? সঠিক ইতিহাসের বিচারে প্রথমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআনকে লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে প্রস্তুত করার ধারণা সৃষ্টি হয়– এই তো আমাদের জানা।

ঘ. জুমহুরে মুফাস্সিরীনের মতে 'ছুহুফ' দ্বারা লওহে মাহফূজকে বুঝানো হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় 'ছুহুফ' দ্বারা লওহে মাহফূজকে বুঝানো হয়েছে– এই মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সেমতে আয়াতের মর্ম হলো, এই পবিত্র কুরআন লওহে মাহফূজে সুসংরক্ষিত রয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে প্রয়োজন মুতাবেক রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযেল হয়েছে। যদিও মুফাস্সির আলূসী এই মন্তব্যকে অস্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন, তবে আমাদের বিবেচনায় এ মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, এই মত অনুসারে পরবর্তী আয়াতসমূহের অর্থের সাথে এ আয়াতের অর্থের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। লওহে মাহফূজে সুসংরক্ষিত থাকা, সেখান থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে অবতীর্ণ হওয়া– কথা দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্তই বটে। ১৩ নং আয়াতে مكرمة (সম্মানিত) শব্দটি দ্বারা সম্মানের যে উচ্চস্তর বুঝানো হয়েছে, জুমহুরের মত অনুসারেই তা অধিক সুস্পষ্ট হয়।

www.maktabatulabrar.com

مُكَرَّمَة -এর অর্থ

পবিত্র কুরআন অত্যন্ত এবং অধিকতর সম্মানী কিতাব; এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ পাক এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুফাস্সিরগণ এর নিম্নোক্ত অর্থ করেছেন,

مكرمة فى الدين لما فيها من العلم والحكم.

দ্বীনের দিক দিয়ে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। কারণ, পবিত্র কুরআন তত্ত্বজ্ঞান এবং হেকমতের একটি বেনজীর কিতাব।

مكرمة لانها نزل بها كرام الحفظة.

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন খুবই সম্মানিত হিসেবে যে, এই কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হন সম্মানিত, সংরক্ষণকারী ফেরেশতা।

مكرمة عند الله.

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন সম্মানিত এই হিসেবে এই যে, এই কুরআন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত।

আসলে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত সম্মানিত সব হিসেবেই। مكرمة (সম্মানিত) শব্দটির ভিতর এর অবকাশও রয়েছে। মুফাস্সির ইবনে কাছীরের বর্ণনার দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়।

(যা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।)

مَرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ -এর অর্থ

পবিত্র কুরআনের প্রথম গুণ হচ্ছে সম্মানিত, আর দ্বিতীয় গুণের ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে مرفوعة এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যথা:

ক. পবিত্র কুরআন অত্যন্ত উঁচু তথা উপর জগতে (আকাশে) বিদ্যমান। অর্থাৎ, লওহে মাহফূজে এবং সপ্তম আকাশে বিদ্যমান। পবিত্র কুরআন সেখান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

খ. مرفوعة عن الشبه والتناقض অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তাতে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। এ অর্থে পবিত্র কুরআন অনেক উর্দ্ধে অর্থাৎ, সন্দেহ এবং অসংগতি থেকে উর্দ্ধে। পবিত্র কুরআনে কোথাও কোন অসংগতি নেই। পবিত্র কুরআনের এরূপ গুণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্যত্র ঘোষণা করেছেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ.

এটি সম্মানীত কিতাব, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (সূরা বাকরা: ২)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত। (সূরা নিছা: ৮২)

গ. مرفوعة القدر عند الله سبحانه অর্থাৎ, এই কুরআন মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে অধিক মর্যাদাশালী।

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরে মতে এই সব কটিরই অবকাশ রয়েছে। তাফসীরে তানতাবী, কাশ্‌শাফ এবং রূহুল মাআনীর বর্ণনাভঙ্গিতেও এটাই সুস্পষ্ট হয় এবং এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

مطهرة -এর অর্থ

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তৃতীয় গুণের উল্লেখ করে আল্লাহ পাক এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যথা:

ক. ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে,

مطهرة من الدنس والزيادة والنقص.

পবিত্র কুরআন নাপাকী এবং কম-বেশি হওয়া থেকে পবিত্র।

খ. আল্লামা তানতাবী বলেন,

مطهر عن مس غير الملائكة.

ফেরেশতা ব্যতীত অন্যদের স্পর্শ থেকে পাক/পবিত্র।

(গ) مطهرة عن الشبه والتناقض অর্থাৎ, সর্বপ্রকার সন্দেহ এবং পরস্পর অসংগতি থেকে পবিত্র।

(ঘ) হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

مطهرة من ان تنزل على المشركين.

কুরআন অত্যন্ত পাক-পবিত্র যা মুশরিকীনের উপর অবতীর্ণ হতে পারে না।

(ঙ) মুফাস্‌সির সূদ্দী বলেন,

مصونة عن ان تنزل على المشركين.

কাফেরদের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

منزهة عن مس الجنب والحائض والنساء والحدث.

নাপাক ব্যক্তি, হায়েয, নেফাসযুক্ত নারী এবং বে-উযূদের স্পর্শ থেকে পাক-পবিত্র।

(ছ) মুফাস্‌সির আমিদী বলেন,

منزهة عن مساس ايدى الشياطين.

শয়তানদের স্পর্শ থেকে পবিত্র।

উপরোক্ত অর্থসমূহ হযরত ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবা, তাবেয়ীন ও প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ থেকে তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এর কোনটিই অপরটির বিরোধী নয় বিধায় প্রত্যেকটিই গ্রহণযোগ্য এবং শব্দের মধ্যেও প্রত্যেকটির অবকাশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে কারীমে এই শব্দটিকে

www.maktabatulabrar.com

যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে, অধিকাংশ স্থানেই এ ধরনের ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে মেনে নেয়ায় কোন প্রকার বাধা নেই। আয়াতে পাকেও কোন নির্ধারিত অর্থে ব্যবহার করার নিদর্শন স্পষ্টভাবে নেই।

بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ **(এমন সব লেখকদের হাতে লেখা, যারা নিপুণ চরিত্রের অধিকারী পুণ্যবান।)**

سفرة (সাফারাতিন)-এর অর্থ

এই শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্যাদার চতুর্থ আর একটি দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যথা:

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও জাহ্‌হাক বলেন, هى الملائكة অর্থাৎ, 'সাফারাতিন' শব্দের দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে কোন্ ধরনের ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে– এ নিয়ে সামান্য মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুফাস্‌সির ইবনে যায়েদ বলেন,

الذين يحصون الاعمال.

যারা আমলসমূহ গণনা করেন এবং সংরক্ষণ করেন।

বস্তুত মানুষের আমলসমূহ গণনা করা, লিপিবদ্ধ করা এবং সংরক্ষণ করার জন্য, অতঃপর আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ.

তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে, যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, (তারা তোমাদের) আমল লিখে রাখে। (সূরা ইনফিত্বার: ১০-১১)

আরো আয়াতে বলা হয়েছে,

لَه مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْه وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُوْنَه مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

মানুষের জন্যে তার সম্মুখে এবং পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ ১১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

নিশ্চয়ই ফজরের নামাযে (ফেরেশতাদের) সমাগম হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৮)

বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবেও এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, জুমার খুতবা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জুমুআয় উপস্থিত হওয়া লোকদের নাম তালিকাবদ্ধ করার জন্য একদল ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। যিকিরের মজলিসে ফেরেশতাদের উপস্থিতির কথাও হাদীছে বর্ণিত রয়েছে।

২. তাফসীরে আবুস সুউদে বলা হয়েছে,

كتبة من الملائكة ينتسخون الكتاب من اللوح.

যে সকল ফেরেশতা লাওহে মাহ্ফূজ থেকে পবিত্র কুরআন কপি করেন "সাফারাতিন" দ্বারা সেই সব ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

هم الملائكة المتوسطون بين الله تعالى وانبيائه عليهم السلام.

যে সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহ্ পাক এবং তার নবীদের মাধ্যম হয়,'সাফারাতিন' দ্বারা সেই সব ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইবনে মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, القراء بالنبطيه অর্থাৎ, হাবশী ভাষায় 'সাফারা' শব্দ দ্বারা কারীদেরকে বুঝানো হয়। কিন্তু শুধু কারীদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেমন- এটা আলোচ্য আয়াতে বোধগম্য নয়, তেমনি 'সাফারা' শব্দটি আরবী হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে হাবশী ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে সীমিত অর্থে ব্যবহার করা ন্যায়সংগত নয়। আলোচ্য আয়াতে আরবী ভাষাগত অর্থকে পরিহার করে হাবশী অর্থ এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমন কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা সাব্যস্ত হয় না। অবশ্য মুফাস্সির কাতাদাহ্ থেকেও এই অর্থ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপর্যুক্ত কারণেই তার অর্থও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় অগ্রহণীয়।

৪. মুফাস্সির ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন,

انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

'সাফারাতিন' দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনুল আরাবী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই অত্যন্ত সম্মানী এবং মর্যাদার পাত্র ছিলেন, কিন্তু ليسوا هم را دين همده الاية অর্থাৎ, এ আয়াতে তাদেরকে (সাহাবায়ে কেরামকে) বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং যারা 'সাফারাতিন' ওহী লেখকগণ উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেছেন সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. অনেকের মতে 'সাফারাতিন' দ্বারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা,

لانهم سفراء بين الله تعالى والامة اولا نهم يكتبون الوحى.

কারণ, নবীগণ আল্লাহ এবং উম্মতের মধ্যে সফীর (দূত) স্বরূপ অথবা তাঁরা ওহী লেখেন, 'আর লেখককে সাফীর বলা হয়। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়-

নবীদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক ওহী লাভ করা, উম্মতকে হেদায়াত করা, শরীয়তের হুকুম আহকামের তালীম দেয়া এবং দাওয়াত পেশ করা, শুধু দূতের দায়িত্ব পালন করা মোটেই নয়।

ওহী লিপিবদ্ধ করা নবীদের দায়িত্ব নয়, আর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে লিখতেন না তা তো প্রসিদ্ধ ব্যাপার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِه. مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّه. بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

অর্থাৎ, তুমি এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং নিজ হস্তে কোন কিতাব লেখনি, যাতে মিথ্যাবাদীরা (তোমার প্রতি) সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা 'আনকাবূত: ২৮)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

نحن امة امية لانكتب ولانحسب.

আমরা উম্মী উম্মত- লেখাও জানি না, হিসাবও জানি না।

এ কারণেই আল্লামা আলূসী এবং মুফাস্সিরগণ এই অর্থকে গ্রহণ করেননি।

৬. তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে যে,

قلت وكذا كتبة الوحى وعلماء الامة فان كلامنهم سفير بين الرسول وبين الامة.

অর্থাৎ, ওহীর লেখকবৃন্দ এবং ওলামাগণও 'সাফারাতিন'-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা রসূল এবং উম্মতের মধ্যে দূতস্বরূপ। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الذى يقرا القران وهو ما هوبه مع السفرة الكرام الابرار والذى يقراء الخ. (رواه الشيخان عن عائشة رضـ)

অর্থাৎ, যারা বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী, তারা নেক এবং সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথি, আর যারা কষ্ট করে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে এবং কুরআন পাক দ্বারা উপকৃত হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করেন। (এই দ্বিগুণ ছওয়াব হল তেলাওয়াতের ছওয়াব এবং কষ্টের ছওয়াব। আর বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীদের ছওয়াব তো অগণিত।)

কিন্তু উপরোক্ত কারণেই এই অর্থও গ্রহণযোগ্য নয়।

৭. অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'সাফারাতিন' দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যে সমস্ত ফেরেশতা লওহে মাহফূজ থেকে কপি করেন এবং যারা আল্লাহ পাক ও নবীর মধ্যে দূত হিসেবে কাজ করেন, তারাই হলেন 'সাফারাতিন'" দ্বারা প্রধান উদ্দেশ্য।

كرام -এর অর্থ:

এ শব্দটিরও বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যথা:-

(ক) মুফাস্সির আলূসী বলেন,

اعزاء على الله تعالى معظمين عنده عزوجل.

অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহর দরবারে অতিব সম্মানিত এবং বড়ত্বের অধিকারী।

(খ) মুফাস্সির তান্তাবী বলেন,

انهم يتعطفون على المؤمنين ويستغفرون لهم.

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ মুমিনদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনকারী, মুমিনদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

www.maktabatulabrar.com

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যতক্ষণ মুসল্লীগণ নামাযের অপেক্ষায় উযূ অবস্থায় মসজিদে থাকেন, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করতে থাকেন,

اللهم ارحمه اللهم اغفره .

হে আল্লাহ, তার প্রতি আপনার করুণা অবতীর্ণ করুন, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন।

এ ধরনের আরও বহু হাদীছ রয়েছে।

(গ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন,

يتكرمون ان يكونوا مع ابن ادم اذا خلا بزوجته و لغائطه .

ফেরেশতাগণ বনী আদমের প্রতি সম্মানস্বরূপ, স্ত্রী সহবাস এবং এস্তেঞ্জার সময়েও তাদের সাথে (প্রহরী হিসেবে) থাকে।

(ঘ) হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

كرام عن المعاصى فهم يرفعون انفسهم عنها .

ফেরেশতাগণ গোনাহ থেকে সংরক্ষিত থাকেন, গোনাহ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন।

তাদের এই গুণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .

তারা আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানী করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে থাকে। (সূরা তাহ্রীম: ৬)

(ঙ) কোন কোন মুফাস্সির বলেন,

يُؤْثِرُوْنَ مَنَافِعَ غَيْرِهِمْ عَلٰى مَنَافِعِ اَنْفُسِهِمْ .

অর্থাৎ, তারা (ফেরেশতাগণ)নিজেদের উপকারিতার উপর অন্যদের উপকারিতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

(চ) মুফাস্সির ইবনে কাছীর বলেন,

خلقهم كريم حسن شريف .

ফেরেশতাদের চরিত্র অতি ভদ্র, সুন্দর এবং উত্তম।

(ছ) ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে ইল্হামের মাধ্যমে সৎ কাজের পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুত ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য সহায়তাকারী হিসেবে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনকারী। এটা ফেরেশতাদের বিশেষ গুণই বটে।

بررة (বারারাতিন)-এর অর্থ

এ শব্দটিরও বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যথা:

(ক) মুফাস্সির ইবনে কাছীর বলেন,

اخلاقهم وافعالهم بارة طاهرة كاملة .

ফেরেশতাদের চরিত্র এবং কাজ-কর্ম পাক-পবিত্র, পরিপূর্ণ।

(খ) 'বারারাতিন'-এর অর্থ অনেকে বলেছেন,

مطيعين لله

আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যকারী। (অভিধানগত অর্থে এর অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে।)

(গ) কেউ কেউ 'বারারাতিন'-এর অর্থ করেছেন,

صادقون لله فى اعمالهم .

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদনকারী

আসলে 'খ' য়ে বর্ণিত অর্থ এবং 'গ' য়ে বর্ণিত অর্থের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

সারমর্ম

'সাফারাতিন' দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে– মতটিকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি ,'বারারাতিন'-এর অর্থের দ্বারাও এর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। কারণ,

* মুফাস্সিরগণ 'বারারাতিন'-এর অর্থকে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে নিশ্চিত মেনে নিয়েছেন।

* পবিত্র কুরআনে 'বারারা' শব্দটি অন্যত্র ফেরেশতাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং হাদীছে পাকেও তাই হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও এটি ফেরেশতাদের গুণবাচক হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এখানে একটা প্রশ্ন হয়, ফেরেশতাদের জন্য برة 'বারারাহ' এবং মুমিনদের জন্য ابرار (আবরার) শব্দ ব্যবহারের মধ্যে কি রহস্য রয়েছে? এর উত্তরে আল্লামা আলূসী বলেন,

لان الابرار من صيغ القلة دون البررة ومتقو الملائكة اكثر من متقى الادمين فناسب استعمال صغية القلة .

অর্থাৎ, ابرار (আবরার) শব্দটি কম সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং 'বারারাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় অধিক সংখ্যার জন্য। আর যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যকার মুত্তাকীদের সংখ্যা মানুষের মধ্যকার মুত্তাকীদের তুলনায় অধিক, তাই মানুষের বেলায় কম সংখ্যাবাচক শব্দ (আবরার) ব্যবহার করাই সমীচীন হয়েছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ,

(ক) আরবী নিয়ম অনুসারে ابرار আবরার শব্দ দশের অধিক সংখ্যা বুঝায় না, তবে যদি রূপক অর্থ নেয়া হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। আর এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ নেই। কারণ, তাহলে বর্ণিত উপকারিতা বোধগম্য হয় না। সুতরাং আরবী নিয়ম মোতাবেক প্রকৃত অর্থ করা হলে দশের অধিক মুত্তাকী নেই– এ কথা বলতে হয়। আর এটা গ্রহণযোগ্য কথা নয়।

www.maktabatulabrar.com

(খ) ابرار শব্দটি আরবী নিয়ম অনুসারে দশের সংখ্যার জন্য অবশ্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর সাথে الف لام আলিফ লাম যুক্ত হলে দশের অধিক সংখ্যাও বুঝাতে পারে যেমন,

انما الاعمال بالنيات .

এ হাদীছে 'আমাল' শব্দটিও উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়, কিন্তু আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার কারণে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানোর নিয়ম পরিহারযোগ্য হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য 'আল আবরার' শব্দে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার কারণে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানোর নিয়ম পরিত্যাজ্য হয়ে দশের অধিক বুঝানো স্বীকৃত বিধায় আল্লামা আলূসীর বক্তব্য পরিহারযোগ্য।

● উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইমাম রাগিব বলেন,

خص البررة بهم من حيث انه ابلغ ابرار فانه جمع بر وابرار جمع بار وبر ابلغ من بار .

অর্থাৎ, برزة (বারারাহ) শব্দটিকে ফেরেশতাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, এ শব্দটি গুণের আধিক্য বোঝায়। কেননা, برزة (বারারাহ) بر (বাররুন)-এর বহুবচন এবং ابرار (আবরার) بار (বাররুন) - এর বহুবচন, আর بار (বাররুন)-এর উপর بر (বাররুন)-এর আধিক্য স্বীকৃত বিষয়।

কিন্তু ইমাম রাগিবের এই বক্তব্য এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, 'আবরার' কোন কোন আভিধানিকের মতে ابرار (আবরার) শব্দটিও برزة (বারারাহ)-এর ন্যায় بر (বাররুন)-এর বহুবচন, সুতরাং ইমাম রাগিবের উক্তি অনুসারে উভয় শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য গ্রহণীয় হতে পারে না।

আরবী অপর এক নিয়মানুসারে মূল ধাতুর মধ্যে হরফের সংখ্যা বেশি হলে অর্থের ক্ষেত্রেও আধিক্য বোঝায়। ইমাম রাগিবের বক্তব্য অনুসারে ابرار (আবরার) শব্দটি بار (বাররুন)-এর বহুবচন হলে بر (বাররুন)-এর তুলনায় অর্থের আধিক্য বুঝাবে। কারণ بار -এর মূল ধাতুতে চারটি হরফ রয়েছে, আর بار -এর মূল ধাতুতে মাত্র তিনটি হরফ। বাহ্যত এসব বিষয় কেবল অভিধান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়। যেমন এক হাদীছে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীকে যেসব ফেরেশতার সাথে তুলনা করা হয়েছে, সেসব ফেরেশতার গুণ হিসেবে "বারারাহ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, আর অলংকারশাস্ত্রের মতে উপমান (مشبه به/মুশাব্বাহ বিহী) উপমেয় (مشبه/মুশাব্বাহ)-এর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তাহলে এখন বলতে হয়, ঐসব তেলাওয়াতকারী মুমিনের তুলনায় ঐসব ফেরেশতার মরতবা বেশি। কারণ, তেলাওয়াতকারীগণ হলেন উপমেয় (মুশাব্বাহ) আর ফেরেশতাগণ হলেন উপমান (মুশাব্বাহ বিহী)। অথচ এরূপ মতামত সঠিক নয়। তদুপরি সবক্ষেত্রে উপমান উপমেয়-এর তুলনায় অধিক গুরুত্বের অধিকারী হয় না, কোথাও কোথাও বিপরীতও হয়ে থাকে।

প্রকৃত জবাব

● মানুষ ইচ্ছা পোষণ করলেই উত্তম গুণাবলিতে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট মুজাহাদা-মেহনত এবং ধৈর্য-সহ্য ও ত্যাগ তিতীক্ষার, কিন্তু এর কোনটির প্রয়োজন ফেরেশতাদের মোটেই নেই।

www.maktabatulabrar.com

● মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ভাল-মন্দ স্বভাবে বিজড়িত। ফেরেশতাদের এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে নিঃসন্দেহে। ফলে মানুষের পক্ষে উত্তম চরিত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করা অবশ্যই তাদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় বৈ কি? সুতরাং কামেল মুমিনদেরকে 'আবরার' বলে আখ্যায়িত করার অন্তরালে এই রহস্য বিদ্যমান থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর এদিকে ইঙ্গিত করেই 'বারারাহ'-এর স্থলে মুমিনে কামেলদের জন্য 'আবরার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ﴿٢٤﴾	(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করুক।
اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾	(২৫) প্রচুর পরিমাণ পানি আমিই তো বর্ষণ করেছি।
ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾	(২৬) অতঃপর আমিইতো যমীনকে উত্তম রূপে বিদীর্ণ করেছি।
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾	(২৭) আর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যাদি।
وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾	(২৮) এবং আংগুর ও তরিতরকারী।
وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾	(২৯) এবং যাইতুন তেল ও খেজুর।
وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾	(৩০) এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানসমূহ।
وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾	(৩১) এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা।
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾	(৩২) তোমাদের এবং তোমাদের পশু-জানোয়ারের উপকারের জন্য।

শব্দার্থ

فَلْيَنْظُرِ লক্ষ্য করুক, الْاِنْسَانُ মানুষ, اِلٰى প্রতি, طَعَامِهٖ তার খাদ্যের, আহার্যের, اَنَّا আমিই, صَبَبْنَا বর্ষণ করেছি, ঢেলেছি, صَبًّا প্রচুর পরিমাণে, الْمَآءَ পানি, ثُمَّ অতঃপর, شَقَقْنَا আমিই বিদীর্ণ করেছি, الْاَرْضَ যমীনকে, فَاَنْۢبَتْنَا অতঃপর আমিই উৎপন্ন করেছি, পয়দা করেছি, فِيْهَا যমিনে, حَبًّا দানা, শস্য, عِنَبًا আংগুর, قَضْبًا শাক-সবজী, তরিতরকারী, زَيْتُوْنًا যাইতুন তেল, نَخْلًا খেজুর, حَدَآئِقَ উদ্যানসমূহ, বাগান-সমূহ, غُلْبًا ঘন সন্নিবিশিষ্ট, فَاكِهَةً ফল মূল, اَبًّا ঘাস পাতা, গবাদিপশুর খাদ্য, مَّتَاعًا উপকারের বস্তু ভোগের বস্তু, لَّكُمْ তোমাদের জন্য, لِاَنْعَامِكُمْ তোমাদের পশু/জানোয়ারের জন্য।

তাফসীর

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ **(মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করুক।)**

মানুষ তার সৃষ্টিগত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুক। লক্ষ্য করুক সৃষ্টির পর তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোদায়ী ব্যবস্থাপনার প্রতি। লক্ষ্য করুক তার আহার্যের প্রতি। তার জন্য আহার্য প্রস্তুত করার

নিমিত্তে আমি পরিমাণ মোতাবেক পানি বর্ষণ করে থাকি। সেই পানি যাতে যমীনের ভিতর দেশে পৌঁছতে পারে, সেজন্য নিয়ম অনুপাতে যমীনকে বিদীর্ণ করে থাকি। যখন যমীন প্রস্তুত হয়, তাতে বীজ বপন করা হয়, তখন আমিই কুদরত এবং কৌশলের দ্বারা অদ্ভুতভাবে যমীন থেকে বিভিন্ন রকমের শস্যাদি, ফল-মূল খাদ্য-সামগ্রী, বৃক্ষলতা ও ঘাস-পাতা ইত্যাদি উৎপন্ন করে থাকি। এগুলো যেমন তোমাদের কাজে আসে, তেমনি তোমাদের জীব-জন্তুরও উপকারে আসে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এসব সীমাহীন কুদরত ও তার অসংখ্য নেয়ামত এবং এহসানের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু আফসোস যে, মানুষ তবুও কুফর, শিরক, মুনাফেকী, নাস্তিক্য এবং আল্লাহর নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে সুনিশ্চিত ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

যোগসূত্র

২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ তার সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ পাকের এহসান ও কুদরতের বিষয় সঠিক অনুধাবনের মাধ্যমে তার হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্যের স্থলে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। অসম্মতি প্রকাশ করেছে কলুষিত পরিবেশের প্রভাবের কারণে, অথবা বয়সের স্বল্পতার কারণে। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন একধরনের নেয়ামতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যে ধরনের নেয়ামতসমূহ একদিকে যেমন আল্লাহর অসীম কুদরতের জন্য অকাট্য প্রমাণ, অপর-দিকে বাস্তবমুখী। মানুষ যদি তার আহার সামগ্রী এবং পানীয় বস্তুসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে আশা করা যায়, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। (রূহুল মাআনী- ৪৫/৩০)

মহান আল্লাহ পাক চিন্তা-গবেষণার খোরাক হিসেবে পবিত্র কুরআনে দুই প্রকার দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। দলীলের প্রকারদ্বয় হল- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহে প্রথম প্রকার দলীল-প্রমাণের আলোচনা করাতে মুফাস্সিস হাক্কানী এটাকেই যোগসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যোগসূত্রের ক্ষেত্রে এটাও বলা যায় যে, সূরার প্রথমে তাওহীদের দাবী করা হয়েছে। আর এ দাবীর স্বপক্ষে সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে আল্লাহ পাকের একক ক্ষমতা এবং কুদরতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মানুষের জন্য বস্তুজগতে বসবাসের প্রধান উপকরণ খাদ্যের উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আল্লাহর একক ক্ষমতার বিষয়টিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবেও পূর্বের আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের গভীর সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়।

দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন নং- ১। ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকামের প্রতি মোটেই আনুগত্যের পরিচয় দেয়নি। অথচ এ ধরনের ভাষ্য ব্যাপকভাবে বোধগম্য নয়। কারণ, নবীগণ, বুযুর্গানে দ্বীন ও আওলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তারা আল্লাহর হুকুম-আহকামের সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

প্রশ্ন নং- ২। খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদির মধ্যে আল্লাহর কুদরত যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে আল্লাহর কুদরত বেশি প্রকাশ পেয়েছে মানুষের সৃষ্টির মধ্যে। মানুষের সৃষ্টি সাধিত না হলে খাদ্য সামগ্রীর কোন প্রয়োজন হত না। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহর যতসব এহসান ও নেয়ামত রয়েছে ,সৃষ্টি এবং জীবনের গুরুত্ব তার মধ্যে সর্বাধিক। যেখানে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়নে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে ও আল্লাহর সৃষ্টিগত কুদরতের অবমূল্যায়ন করেছে, সেখানে খাদ্য সামগ্রীর মত নেয়ামতের মানুষ কী গুরুত্ব উপলব্ধি করবে? এখানে আল্লাহর কুদরতের কী-ইবা উপলব্ধি লাভ করবে? সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত প্রমাণাদি অপ্রাসঙ্গিক অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুফাস্সির রাযী বলেন,

وليس المراد من الانسان ههنا جميع الناس بل الانسان الكافر .

এখানে الانسان (মানুষ) শব্দের দ্বারা সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং শুধু কাফেরদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মুফাস্সির রাযী প্রমাণ হিসাবে বলেন,

لما يقض الضمير عائد فيه الى المذكرور السابق وهو الانسان فى قوله قتل النسان ما اكفره .

অর্থাৎ, يقض لما-এর যমীর বা সর্বনামটি قتل الانسان-এর الانسان (মানুষ) শব্দের দিকে ফিরেছে। সুতরাং সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং শুধু কাফেরদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বস্তুত কাফেররাই স্বীয় অহমিকার কারণে সৃষ্টি রহস্যে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় ব্যর্থ হয়েছে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুফাস্সির রাযীর উত্তর অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক উস্তায আবূ বকর ইবনে ফারূক থেকেও উপরোক্ত ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনে জাবর সমস্ত মানুষকেই উদ্দেশ্য করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন। আর মুফাস্সির রাযী তার কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, এ মতটি একেবারেই বোধগম্য নয়। মুফাস্সির রাযীর এ প্রতিবাদের কারণ হল, কথাটি নবীদের বেলায় অন্তত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না; কিন্তু যখন একাধিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশ করা হয়, আর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সেই নির্দেশের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে এবং কার্যতভাবেও প্রতিপালন করে, আর কিছু সংখ্যক লোক সেই নির্দেশকে অমান্য করে, তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, নির্দেশটি যথাযথভাবে পালিত হয়নি। পরিভাষাগতভাবে এ অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। সম্ভবত এ দিকে লক্ষ্য করেই মুফাস্সির মুজাহিদ উপর্যুক্ত মতামত পেশ করেছেন। মুফাস্সির আবুস সুউদও এ মতামতটিকে প্রমাণ করেছেন। (আবুস সুউদ- ১১১/৫) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ .

মানুষ বড়ই জালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

আমাদের দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতে মুফাস্সির রাযীর মতামতটি অগ্রাধিকার রাখে। কেননা, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথেই আলোচনা করছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই উপর্যুক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য মানুষও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদির ভেতর গবেষণার দৃষ্টি আরোপিত হলে যেমন কাফেরদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনিভাবে মুমিনদের জন্য ঈমানের প্রশ্নে দৃঢ়তা লাভের সুযোগও রয়েছে। প্রকারান্তরে মুফাস্সিরগণ লিখেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যক্তি এবং ঘটনা বিশেষকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলেও অর্থের প্রশ্নে ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। (হক্কানী-৪০) আর যে আয়াতসমূহ শিক্ষণীয় হয়, সেক্ষেত্রে অর্থের ব্যাপকতা অবশ্যই সকলের জন্য উপকারী। সুতরাং এ আয়াতেও এমন ব্যাপকতা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মানুষের সৃষ্টি রহস্য এবং আল্লাহর সৃষ্টিগত কুদরত ও এহসান অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টিকালে এ রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। শিশু-কিশোরের জন্য এত গভীর বিষয়ে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। প্রাপ্তবয়সে সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা প্রকৃতপক্ষে অতীতের গবেষণা হয়। পারিপার্শ্বিকতার কারণেও মানুষের পক্ষে অতীত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হয় না। সুযোগ হলেও মধ্যবর্তী সময়ে ভ্রান্ত আকীদা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার কারণেই কুফরীর পরিধি এবং বেষ্টনী থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই প্রাপ্তবয়সের সময় বাস্তব এবং বর্তমান বিষয়ে যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করলে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তার মুক্তির পথ সুগম হতে পারে। সেজন্যেই মহান আল্লাহ পাক সৃষ্টিগত রহস্য এবং কুদরত ও এহসানের কথা উল্লেখ করে পরক্ষণেই খাদ্য সামগ্রীসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, এ বিষটি বর্তমান এবং বাস্তব। খাদ্যসমস্যাকে মানুষের জীবনে বড় সমস্যা এবং জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অসংখ্য রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যার সূত্রপাত এই খাদ্যসমস্যা থেকেই হয়ে থাকে। তাই মহান রব্বুল আলামীন প্রাপ্তবয়সের অসংখ্য এহসানকে উল্লেখ না করে খাদ্যসামগ্রীর বিষয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লেখ করে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের কুফরী বর্জনপূর্বক ঈমানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা। মানুষ স্বভাবগতভাবে এবং জ্ঞানগতভাবে একসমান নয়। অনেক মানুষ চাপের সম্মুখে মাথা নত করে, আবার অনেকেই বিগড়ে যায়। অনেক মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে নাস্তিক এবং বিধর্মী হয়ে যায়, আবার অনেকে কাফের বিধর্মী চিন্তা-গবেষণা করে ইসলাম গ্রহণ করে। অনেকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ পেলে সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, আবার অনেকেই সত্যকে গোপন করে ভ্রান্তির উপর অটল থাকে। দেখা যায়, সামান্য যুক্তির ভিত্তিতেই অনেককে সত্যের দিশারী বানানো যায়, আবার অনেকের সম্মুখে অকাট্য ও বিস্তর যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেও তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় না। মোটকথা, সত্য গ্রহণের প্রশ্নে ছোট বা বড় যুক্তি কিংবা ছোট অথবা বিরাট এহসানের কারণে কোন কিছু আসে যায় না। যে কোনটিই সত্য

www.maktabatulabrar.com

গ্রহণের পক্ষে উপাত্ত হতে পারে। তাই একাধিক প্রমাণ এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তির অবতারণা মানুষের স্বভাব সম্মত। এজন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি-তর্ক এবং প্রমাণাদি পেশ করেছেন, নবীদেরকে বিভিন্ন ধরনের মুজিযা প্রদান করেছেন, ওলীদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারামত দিয়েছেন। প্রতিযুগেই এর পরিপ্রেক্ষিতে অসংখ্য কাফের এবং বেদীনদের ইসলাম গ্রহণ ও মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ইতিহাসে এর প্রচুর নজীর রয়েছে। সুতরাং খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের অন্তরালে যে আল্লাহ পাকের গভীর রহস্য নিহিত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। নিম্নে আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা পেশ করতে চাই।

খাদ্য গবেষণার রহস্য

মানুষের জীবনধারণের সাথে খাদ্যসামগ্রীর যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এজন্যেই মানুষ তার অস্তিত্ব লাভের পরই সর্বাধিক ব্যস্ত হয় খাদ্যসামগ্রীর প্রতি। খাদ্যসামগ্রী উপার্জনের জন্য মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অপরাধে লিপ্ত করতে বাধ্য হয়। এমনকি খাদ্যের অভাবে মানুষ বিধর্মী পর্যন্ত হয়ে যায়। মানুষের সভ্যতা, মানবতা, তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচারে, ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে তার সার্বিক জীবনে খাদ্যের প্রভাব এবং গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই মানুষের আত্মার জন্য শরীরের গুরুত্ব এবং শরীরের জন্য আত্মার গুরুত্ব যেমন অত্যধিক বেশি, ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টি রহস্যের সঠিক মূল্যায়নের জন্য খাদ্যের গুরুত্বও অপরিসীম। তাই আল্লাহ পাক সৃষ্টির হেফাজতের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্য খাদ্য সরবরাহের খোদায়ী ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টা আরও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব খাদ্যসামগ্রী বা আহার জাতীয় নেয়ামতকে হীন করে দেখা সঠিক নয়, বরং সৃষ্টি রহস্যের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রীর রহস্য ও তৎসম্পর্কিত খোদায়ী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন খাদ্যসামগ্রীর ভিতর চিন্তা-গবেষণা করে তার প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা দ্বারা কোন্ দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে

আলোচ্য আয়াতে فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ বাক্যের অর্থ হচ্ছে 'মানুষের দৃষ্টি আরোপ করা উচিৎ তার খাদ্যের প্রতি।' এখানে কেবল দৃষ্টি আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন্ দৃষ্টি তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। বস্তুত মানুষকে আল্লাহ পাক দুই ধরনের চোখ বা দুই ধরনের দৃষ্টি দান করেছেন। চর্ম চোখ আর অন্তরের চোখ। উভয়ের সাহায্যেই সে আল্লাহর কুদরত দেখতে পারে অর্থাৎ, তা দেখতে ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে। যারা এরূপ করেছেন, তারা সফলকাম হয়েছেন, আর যারা করেনি তারা ব্যর্থ হয়েছে। এখানে দৃষ্টি আরোপ করা কথাটার মধ্যে উভয় ধরনের চোখ তথা উভয় ধরনের দৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। চর্ম চোখের অন্তর্ভুক্তি কুরআনে পাকের নিজস্ব পরিভাষার কারণে, আর অন্তর চোখের অন্তর্ভুক্তি হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত ইরশাদের ভিত্তিতে–

لكل اية ظهر وبطن .

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি আয়াতের একটি জাহেরী এবং একটি বাতেনী অর্থ রয়েছে।

বস্তুত 'অন্তর দৃষ্টি' হল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বাতেনী অর্থের উদঘাটক।

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে কী শিক্ষা লাভ হয়?

আলোচ্য আয়াতে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে শিক্ষা লাভ করতে বলা হয়েছে। খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে কী শিক্ষা লাভ হয়? আল্লাহর কুদরতের প্রতি দৃঢ় আস্থার শিক্ষা, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের শিক্ষা, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থার শিক্ষা, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের শিক্ষা ইত্যাদি লাভ করা যায়। খাদ্যসামগ্রীর তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি এবং খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে অন্য কারও ক্ষমতা না থাকা দেখেই এসব শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। খাদ্যের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও ভিটামিন ক্রিয়া ইত্যাদি থেকে, এমনিভাবে খাদ্যের প্রকার ভেদ এবং বাহ্যিক রং-আকৃতি থেকেও এসব শিক্ষা লাভ করা যায়। তবে এ শিক্ষা লাভ করার জন্য শুধু খাদ্যের বাহ্যিক দিক নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না, অন্তর্নিহিত বিষয় নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শুধু স্থূল দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না, অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। মুফাস্সির তান্তাবী বলেন,

وليس ذلك النظر ما يفهمه الجهال فان الحيوان ينظر النظر الظاهر السطحى . ولا يستفيد منه علما دينيا ولا دنيويا وانما يستفيد منه الغذأ .

অর্থাৎ, (আল্লাহ পাক খাদ্যসামগ্রীর প্রতি যে দৃষ্টি আরোপ করতে বলেছেন সেটা দ্বারা) স্থূল দৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়, কেননা জানোয়ারেরও এরূপ স্থূল দৃষ্টি রয়েছে। এরূপ দৃষ্টি আরোপ ও স্থূল চিন্তা দ্বারা খাদ্য অর্জন হয়, তাছাড়া দ্বীন দুনিয়ার কোন জ্ঞান অর্জিত হয় না। (তানতাবী– ৫১/২৫)

প্রাণী জগতের উপকারের উদ্দেশ্যে মহান রব্বুল আলামীন অসংখ্য ধরনের খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করে থাকেন, যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব হয়নি। পাঁচ লক্ষ প্রকার খাদ্যসামগ্রী গণনা সম্পন্ন হয়েছে, আরও অসংখ্য প্রকার এখনো গণনার বাইরে রয়েছে। (মাহাসিনুত তাবীয়াহ) কিন্তু এগুলোর উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা আজও সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। অনেক উৎপন্ন সামগ্রী এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করা তো দূরের কথা, সেগুলোর নাম সম্পর্কেই অবগত হওয়া এখনও সম্ভব হয়নি । এর সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে গবেষণা করলে অবাক হতে হয়, এগুলো নিয়ে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের উপকারের জন্য এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন। সুতরাং তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত এভাবেও বুঝে আসে যে, যত প্রকারের খাদ্য রয়েছে, প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অথচ সবগুলো একই যমীন থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর কোনটি সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কোনটি মৌসুমের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারযোগ্য, কোনটি ঔষধ হিসেবে সেব্য, কোনটি অন্যটির সমন্বয়ে ব্যবহৃত হয়। কোনটির ভিতরের অংশ মানুষের

www.maktabatulabrar.com

জন্য খাদ্য হয় আর বাইরের অংশ পশু-পাখির খাদ্য হয়ে যায়। কোনটির ভিতরের অংশ খাদ্য হয় এবং ভিতরের অংশ অন্য কাজে আসে। কোনটি রান্না করতে হয়, আবার কোনটি কাঁচাই ব্যবহার করা হয়। কোনটি সূর্যের তাপে খাদ্যশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, আবার কোনটি অন্যভাবে। কোনটি মিষ্টি জাতীয় হয়, আবার কোনটি লবণাক্ত, ঝাল, অথবা তিক্ত হয় আর প্রত্যেকটির ক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনটির দ্বারা চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোনটির দ্বারা শ্রবণশক্তি বর্ধিত হয়, কোনটির দ্বারা মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চারিত হয়, আবার কোনটি অন্তর জগতের জন্য শান্তিদায়ক হয় এবং সত্যের অনুসন্ধানের প্রেরণা যোগায়। যদি মানুষ এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে আল্লাহর প্রতি সম্মতি এবং আনুগত্যের প্রমাণাদি অনুধাবন করতে সমর্থ হবে, শুধু তাই নয়, এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে একদিকে যেমন মানুষ বস্তুজগতে জীবনধারনের খোদায়ী কুদরতের সন্ধান পাবে, তেমনি অপরদিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের যৌক্তিকতারও সন্ধান পাবে।

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের যৌক্তিকতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, যেমন অনুপযুক্ত যমীনে বীজ বপন করা হয়, অতঃপর তাতে পানি বর্ষিত হয়, আর সেই বীজ থেকে শস্যাদি জীবন লাভ করে। বীজগুলো মাটির সাথে মিশে নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করে নতুন অস্তিত্ব নিয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। যে মহান আল্লাহ যমীনে বপন করা বীজ-দানার ভিতর তার অসীম কুদরতের প্রকাশ করতে সক্ষম, সেই মহান রব্বুল আলামীনের জন্য মৃত্যু ব্যক্তি রূপ বীজ-দানা থেকে যা কবরের মাটিতে রোপিত হয়– পুনরায় জীবন দান করে স্বীয় দরবারে হাজির করতে সক্ষম। এটা তার পক্ষে একেবারেই সহজ, তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করার বিষয়টি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও প্রমাণিত। হযরত জাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কালবী বলেন, একদিন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে জাহহাক! ما طعامك অর্থাৎ, তুমি কি খাদ্য গহণ কর?' উত্তরে আমি বললাম, اللحم واللبن অর্থাৎ, গোশত এবং দুধ। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ثم يصير الى ماذا অর্থাৎ, তারপর এগুলোর পরিণাম কী হয়? আমি বললাম, الى ما قد علمت অর্থাৎ, পরিণামে যা হয় বলে আপনি অবগত আছেন তা-ই হয়। তখন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন,

فان الله ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا .

মানুষের পেট থেকে খাদ্য যে পরিণতিতে বের হয়, আল্লাহ পাক দুনিয়াকে তার সাথে তুলনা করেছেন। (কুরতুবী– ২১০/২০)

হযরত হাসান বছরী এবং মুজাহিদ ইবনে জাব্র থেকেও এরূপ মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন,

ياتيه الملك فيقول انظر ما بخلت به الى ما صار .

মল মূত্রের প্রতি ইশারা করে ফেরেশতা বলে, লক্ষ্য কর, যে খাদ্যের বিষয়ে তুমি কৃপণ ছিলে সে খাদ্যের কী পরিণাম হয়েছে? (দুররুল মানছুর– ৩১৬/৬)

তাওরাতেও এরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। (দুররুল মানছুর–২২০/৬)

কৃষি গবেষণার গুরুত্ব

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণার গুরুত্ব থেকে কৃষি গবেষণার গুরুত্বও অনুমিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বিষয়টির গুরুত্ব এভাবেও অনুমিত হয় যে, বাহ্যিক আমলের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। তাই আমলেরই স্বার্থে শরীরে পরিমিত শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন। আর শারীরিক শক্তি সঞ্চারের বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী এবং পানাহার। শুধু তাই নয়, মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক জীবনেও রয়েছে পানাহার ও খাদ্য সামগ্রীর বিরাট প্রভাব। তাই খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গবেষণা তথা কৃষি গবেষণা ও কৃষী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং এসব ব্যাপারে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু আফসোস! এ ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা করা অনেকের দৃষ্টিতে যেন শরীয়তসম্মত বলেই মনে হয় না। আর যাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসম্মত বলে মনে হয়, তাদের কাছে নিরবতা অবলম্বন করে থাকাতেই প্রশান্তি বোধ হয়। আবার অনেকেই এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় মনোনিবেশ করাকে হারাম বলে মতামত পেশ করেছেন এ কারণে যে, যারা এ ধরনের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় মগ্ন হয়, তাদের অধিকাংশই সঠিক লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না, বরং বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে ধর্মদ্রোহিতা এবং ধর্মহীনতার আবর্তে বিলীন হয়ে যায়। এ কারণে সর্তকতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ তারা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে হারাম বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তারা কি একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছেন যে, হারাম বলে মত পেশ করার পরেও তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এবং পানাহার করেই জীবনধারণ করতে হচ্ছে। আর করতে হচ্ছে কাফের-বেদ্বীনদের নেতৃত্বাধীনে। হারাম বলে মত না দিয়ে অন্য কোন ধরনের এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয় কি, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ ধর্মদ্রোহীতা এবং ধর্মহীনতা হতে মুক্ত থেকেও এ সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে? উল্লিখিত আয়াতেরই বা তারা উত্তর দিবেন কি? কারণ এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, কৃষি বিষয়ে তথা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা একান্তভাবেই শরীয়ত সম্মত। কেবল শরীয়ত সম্মতই নয়, বরং শরীয়াতের চাহিদাও বটে। সুতরাং কৃষি গবেষণাকে ফরযে আইন বলা না গেলেও ফরযে কেফায়ার গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। না দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে উম্মতের প্রতি ন্যস্ত একটি গুরুদায়িত্ব পালন করছেন, এজন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। উম্মতের প্রতি তাদের বিরাট অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবে একথাও সত্য যে, বর্তমান যুগে গবেষণার দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তারা যেমন লক্ষ্যবস্তু স্থিরকরণের বেলায় উদাসীন, তেমনিভাবে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে সমস্ত মূলধারার অনুকরণ অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল, তা না করে সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যমুখী বেদ্বীন-কাফেরদের নীতি অনুসরণ করেই তাদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে যে ধরনের দুঃখজনক পরিণামের অবকাশ ছিল, বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে।

www.maktabatulabrar.com

কৃষি গবেষণার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

কৃষি গবেষণাকারী মুসলিম মনীষীদেরকে অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। মুসলিম জাতির অধঃপতন থেকে উত্তরণের চিন্তা-ভাবনা সামনে রেখেই কাজ করতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্মুখে রেখে কাজ করতে হবে। এ পর্যায়ে নিম্নে আমরা কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি।

ক. আল্লাহর কুদরত অনুধাবন

একজন কৃষি গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে উৎপন্ন বস্তুর গভীরে দৃষ্টি আরোপ করত খোদায়ী কুদরতকে অনুভব করা এবং তার কুদরতের সম্মুখে নিজেকে অবনত করে দেয়া ও সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। কেবল মহান আল্লাহর কুদরতের কারণেই কৃষিপণ্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষের এক্ষেত্রে মৌল বা ফলপ্রসূ কোন ভূমিকা নেই। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত কুদরতেই তা সম্ভব হচ্ছে। একজন মুসলিম গবেষককে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এ আকীদা পোষণ করতে হবে। বস্তুত এটাই হবে একজন কৃষি গবেষকের জন্য তার চলার পথে সর্বাধিক উত্তম পাথেয়।

কৃষি উৎপাদনের মূল হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত যমীন। যমিন মানুষের সৃষ্ট নয়। যমীনে বীজ বপন এবং চারা রোপন করলেই তাতে ফল ধরে না, ফল ফলাবার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর রহস্যময় ব্যবস্থাপনা। মাটির নীচে বীজের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ, অতঃপর নিয়ম মোতাবেক আসমানী পানি সরবরাহকরণ, খাদ্যপণ্যে স্বাদ ও ভিটামিন পরিবেশন, প্রত্যেক উৎপন্ন সামগ্রীর স্বভাবে প্রকার ভেদ এবং স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি কেবল খোদায়ী কুদরতেরই অবদান, এতে অন্য কারও অবদান নেই– গবেষকের অন্তরে এ বিশ্বাস স্থাপিত করতে হবে।

খ. আল্লাহর এহসানের কৃতজ্ঞতা ও গোলামীর স্বীকৃতি প্রদান

কৃষি খাদ্যসামগ্রী আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতি এক বিরাট নেয়ামত এবং অতুলনীয় এহসান। আর এহসানের ধর্ম হচ্ছে– এহসানকারীর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা ও স্বীয় গোলামীর স্বীকৃতি দেয়া। তাকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করা।

গ. হালাল-হারাম-এর পার্থক্য করণ

খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে মানুষের দেহে শক্তি সঞ্চার হয়। রক্ত, গোশত সৃষ্টি হয়। যদি এ খাদ্য হারাম হয়, তাহলে মানবদেহ হারামের পুটলিতে পরিণত হবে। এরূপ হারাম খাদ্য দ্বারা পুষ্ট দেহ জাহান্নামের ইন্ধন হবে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لحم نبت سحتا النار احق به.

দেহের গোশতের যে অংশটি হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপালিত, তা জাহান্নামের উপযুক্ত।

কারণ, পঁচা খাদ্য যেমন মানুষের বাহ্যিক দেহকে ক্ষতি করে থাকে, পেটের পীড়া সৃষ্টি করে থাকে, শরীরকে দুর্গন্ধের ডিপোতে পরিণত করে ফেলে, তেমনি হারাম খাদ্য মানুষকে রূহানীভাবে পচনশীল করে তোলে, রূহের মধ্যে দুর্গন্ধ এবং আবর্জনা সৃষ্টি হয়। আর দুর্গন্ধযুক্ত পচনশীল দেহ জান্নাতের উপযোগী নয় এবং হতেও পারে না। তাই এ ধরনের দেহ জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবেই। তাই

মানুষকে খাদ্যসামগ্রী অর্জন এবং ব্যবহারের বেলায় শরীয়তের বিধি নিষেধের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। কৃষিবিদ ও কৃষি গবেষকদেরকে কৃষিকাজ ও কৃষি গবেষণা চালাতে হবে উপরে উক্ত বিষয়সমূহ সম্মুখে রেখে, তাহলেই সে গবেষণা হবে আমাদের জন্য ফলদায়ক, জাতির জন্য কল্যাণকর। এটাও পারলৌকিক কল্যাণের সেরা উপাদান এবং ইসলাম সম্মতও।

আল্লাহ আমাদের সুবোধ দান করুণ। আমীন!

আয়াতে পানীয় সামগ্রীর কথা বলা হয়নি কেন

আয়াতে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পানীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ কী? এ সম্পর্কে আল্লামা আলূসী বলেন,

واقتصر عليه ولم يذكر المشروب لان اثار القدرة فيه اكثر من اثار ها فى المشروب .

খাদ্যসামগ্রীর কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে, পানীয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, কারণ পানীয় বস্তুর তুলনায় খাদ্যসামগ্রীতে আল্লাহর কুদরতের নির্দেশনাবলি অধিক। (রূহুল মাআনী- ৪৫/৩০)

মুফাস্সির আলূসীর এই বক্তব্য আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। কারণ, পানীয় বস্তু নিয়ে গবেষণা করলেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, এতে আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, আর রয়েছে বলেই আল্লাহ পাক সমুদ্রের বিষয়ে গবেষণার জন্য বারবার আহ্বান করেছেন। তা ছাড়া এমন খাদ্যসামগ্রী খুব কমই আছে, যে খাদ্য গ্রহণের পূর্বে এবং পরে অথবা গ্রহণের সময় পানীয় বস্তুর প্রয়োজন দেখা না দেয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্য সামগ্রী ব্যবহারের যোগ্যই তখন হয়, যখন খাদ্যের সাথে পানীয় বস্তুর মিশ্রণ সাধিত হয়। আল্লাহ পাকের বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেন,

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ .

আমি প্রাণী জাতীয় সমস্ত কিছু পানি থেকেই সৃষ্টি করেছি, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া: ৩০)

আসলে আরবী ভাষায় 'তআম' শব্দটি অভিধানগতভাবে কেবল খাদ্যসামগ্রীর জন্য ব্যবহৃত হলেও পবিত্র কুরআনে শব্দটি খাদ্য এবং পানি উভয়টিকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

তালূত বললেন, 'আল্লাহ পাক একটি নদীর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যে সেই নদী থেকে পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে পানি পান করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। (সূরা বাকারাহ: ২৪৯)

উপরোক্ত আয়াতে يطعمه শব্দটি 'পান' করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে طعام শব্দের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী এবং পানীয় বস্তু উভয়টিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলা হলে কোন বাধার অবকাশ নেই। তাছাড়া খাদ্যের সাথে পানীয়ের গভীর যোগসূত্রের কারণে পানীয়ের কথা ভিন্নভাবে

উল্লেখ না করেও তাকে খাদ্যসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا .ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا .فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (আমিই প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমিই যমীন বিদীর্ণ করি, আর তাতে উৎপন্ন করি শস্যাদি।)

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তাওহীদ এবং আল্লাহর কুদরত ও বান্দার প্রতি আল্লাহর এহসানের বিষয়ে অবগতি লাভের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত-সমূহে চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তুর প্রতি দিক-নির্দেশনা করা হয়েছে।

চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু- পানি, যমিন ও খাদ্যের প্রকারাদি

খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় পানির। এই পানি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপার রয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ পানির দরকার, সে পরিমাণ পানি আল্লাহ পাক তাঁর কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং আশ্চর্য পদ্ধতিতে মেঘের আকারে আকাশে মওজুদ করেন। অতঃপর স্থান-কাল ভিত্তিক প্রয়োজন মোতাবেক বর্ষণ করেন, না অধিক না কম। নদ-নদী, খাল-বিল এবং সাগরে এই পানি তিনিই সংরক্ষিত করেন। তিনিই পানিকে যমীনের পরতে পরতে গচ্ছিত রাখেন এবং পরিমাণ অনুপাতে শস্যাদিতে তা পরিবেশিত হয়।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় যমীন। এই যমীন নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার রয়েছে। আল্লাহ পাক যমীন সৃষ্টি করেছেন, না পাথরের মত শক্ত না পানির মত তরল বা নরম। সূর্যের তাপে আল্লাহ পাক প্রয়োজন মোতাবেক যমীনকে শক্ত করে দেন, আবার বৃষ্টির পানিতে গলিয়ে নরম করে থাকেন। ফলে পানি যমীনকে বিদীর্ণ করে যমিনের ভিতরে যেয়ে তার সংরক্ষিত হওয়ার স্থানে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং শ্রম দ্বারা মানুষ যে যমীনে বীজ রোপন করে, সে বীজ বিলীন হয়ে বৃক্ষ সৃষ্টি হয়। যমীনের নীচ থেকে বৃক্ষ প্রকাশের জন্য আল্লাহ পাকই যমীনে ফাটল ধরান এবং বিদীর্ণ করে থাকেন। যমীনে ফাটল ধরে অবশ্যই, কিন্তু যমীনের নীচে বৃক্ষ পচে গলে যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে না, তাই আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরত দ্বারা যমীনের নীচে বৃক্ষকে হেফাজত করেন এবং উপযুক্ত সময়ে যমীনে ফাটল সৃষ্টি করে বৃক্ষকে যমীনের উপরে মাথা উঁচু করে উঠে আসার ব্যবস্থা করে দেন। অতঃপর উৎপাদিত খাদ্যকে মানুষ এবং প্রাণীজগতের জন্য উপযোগী করে তোলেন।

খাদ্যের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার। এ নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার রয়েছে। একই যমীন এবং পানি থেকে বীজ এবং দানার পার্থক্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন রকমের স্বাদ ও বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন যুক্ত খাদ্য তৈরী হয়। এর মধ্যেও খোদায়ী কুদরতের রহস্য নিহিত রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, মানুষ স্বভাব এবং মেজাযগতভাবে সমান নয়। ফলে প্রত্যেকের মধ্যে খাদ্যের প্রতি আকর্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মৌসুমের পার্থক্যের কারণেও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুস্থতার প্রশ্নে এবং রোগ-ব্যধির কারণেও খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শারীরিক প্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভিটামিনের আবশ্যকতা দেখা দিয়ে থাকে। তাই মহান আল্লাহ মানুষের সুবিধার্থে স্বীয় কুদরত দ্বারা রকমারি খাদ্য ও শস্যাদি সৃষ্টি করে থাকেন। এসব কিছুই মহান

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহর তাওহীদ এবং কুদরতের অকাট্য প্রমাণ নয় কি? মানুষ কি এসব কিছু করতে সক্ষম? সক্ষম নয়। আল্লাহ পাকই এসব কিছু করে থাকেন। বস্তুর ভিতর তিনিই বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসবকিছু বস্তুর ফলাফল নয়; বরং মহান আল্লাহর কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। যারা আল্লাহর কুদরতের প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে বস্তুকে প্রক্রিয়াশীল বলে মনে করে, তাদেরকে 'কাদরিয়াহ' বলা হয়। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের আকীদা পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে এ ধরনের আকীদা পোষণকারী সৃষ্টি হয়েছিল। মা'বাদ জুহানী, গাইলান দামেশকী এবং ছাআদ ইবনে দেরহাম সর্বপ্রথম এ ধরনের আকীদার ভিত্তি স্থাপন করে। হযরত ইবনে ওমর, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, আবূ হুরাইরাহ, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক, ইবনে আবি আউফা এবং উকবাহ ইবনে আমের (রা.) প্রমুখ ছাহাবিগণ এ ধরনের আকীদা পোষণকারীদেরকে সালাম করতে ও তাদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করেছেন। (আকায়েদে ইসলাম– ১৭১/১) অপর পক্ষে অনেকেই মত পোষণ করে থাকে যে, বস্তুর কোন প্রক্রিয়াই নেই, মানুষ কোন কিছুই করতে পারে না, পাথর এবং মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা বলে থাকে, কিছু থেকে কিছু হয় না, সবকিছুই আল্লাহ পাক করে থাকেন, মানুষ সম্পূর্ণভাবে মজবুর তথা অপারগ। এদেরকে জাবরিয়াহ বলা হয়। (মাওয়াকিফ– ৪২৮)

উপরোক্ত উভয় দলই সীমালঙ্ঘনকারী এবং গোমরাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হচ্ছে সব কিছুই মহান আল্লাহ পাকের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। বস্তুর ভিতর তিনিই বিভিন্ন স্বভাব এবং প্রক্রিয়া প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে বস্তু মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার জ্ঞান-শক্তি প্রদান করেছেন এবং ভাল-মন্দের প্রতিদান ও পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যেন বিবেচনা করে উভয়ের একটি গ্রহণ করতে পারে। মানুষ পাথর তুল্য মজবুর তথা অপারগ নয়। ২৫, ২৬, ২৭ নং আয়াত দ্বারাও এই মতটির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কেননা, খাদ্যদ্রব্যাদি সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ পাক যমীন এবং পনিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। একথা উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩৩) অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক ধ্বনি (কেয়ামত) উপস্থিত হবে।	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
(৩৪) সেদিন পালাবে মানুষ, তার ভাই থেকে।	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾
(৩৫) এবং তার মা ও তার পিতা থেকে।	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾
(৩৬) এবং তার সঙ্গিনী ও সন্তান থেকে।	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
(৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা অন্য থেকে বিমুখ করে দিবে।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
(৩৮) কত মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
(৩৯) হাসি-খুশি ভরা, প্রফুল।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

www.maktabatulabrar.com

(৩৯) এবং কত মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর।	وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
(৪০) তাকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
(৪১) এরাই কাফের-পাপাচারী।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

শব্দার্থ

اَلصَّاخَّةُ কর্ণ বিদারক ধ্বনি, (উদ্দেশ্য হচ্ছে কেয়ামত।) يَفِرُّ পলায়ন করবে, اَلْمَرْءُ মানুষ, اَخِيْهِ তার ভাই, থেকে, مِنْ তার মা, اُمِّهٖ তার পিতা, اَبِيْهِ তার স্ত্রী, صَاحِبِهٖ তার সংগিনী, بَنِيْهِ তার সন্তান, لِكُلِّ প্রত্যেকের, شَاْنٌ অবস্থা, وُجُوْهٌ চেহারাসমূহ, مُسْفِرَةٌ মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল, ঝকঝকে, ضَاحِكَةٌ হাসি-খুশি, مُسْتَبْشِرَةٌ প্রফুল্ল, غَبَرَةٌ ধুলিধূসর, মলিন, تَرْهَقُهَا আচ্ছন্ন করবে, قَتَرَةٌ কালিমা, اُوْلٰئِكَ এরাই, اَلْفَجَرَةُ পাপাচারী।

সারমর্ম

মানুষ এবং পশু-পাখি, জীব-জানোয়ার আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ উপভোগ করবে এবং নেয়ামতদাতার শুকরিয়া আদায় করবে। যতদিন কেয়ামত কায়েম না হবে ততদিন এই শুকরিয়া আদায় চলতে থাকবে। যখন কেয়ামত কায়েম হবে, তখন এক বিষণ্ন, ভয়াবহ এবং অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হবে। সে অবস্থায় প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠবে যে, অন্য কারও ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে না। আপনজন, ভাই-বোন, পিতা-মাতা এবং স্ত্রী সন্তানাদি সকলেই পরস্পর দূরে পালিয়ে থাকবে, কেউ কারও সাহায্য সহায়তায় এগিয়ে আসবে না। আল্লাহর আদালতে বিচার হবে। মু'মিন, মুসলমানদের মুখমণ্ডল হবে নূরান্বিত এবং উজ্জ্বল। হাসি-খুশিতে তারা হবে উদ্ভাসিত। আর কাফের মুনাফেকদের চেহারা হবে অতি বিষন্ন, মলিন, ধুলি ধূসর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন।

যোগসূত্র

ক. পূর্বের আয়াতসমূহে পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সামগ্রীর বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর পরপরই আলোচ্য অয়াতসমূহে পরকালের বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে মানুষ পরকালের অনন্ত জীবনের শান্তি প্রশান্তির লক্ষ্যে নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হয়। (কুরতুবী– ২২৪/২০)

খ. মানুষ পরিণামের প্রতি চিন্তা করে ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত। অশুভ পরিণাম থেকে নিজেকে রক্ষাকরণে ব্রতী হয়। তাই পূর্বের আয়াতসমূহে পার্থিব জীবনের বিষয়ে আলোচনা করে না-শোকর মানুষের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালের অনন্ত জীবনের গ্লানির কথা উল্লেখ করে আলোচ্য আয়াতসমূহে হুশিয়ার করা হচ্ছে, যাতে মানুষ পরকালের ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে অপরাধ প্রবণতা বর্জনে স্বচেষ্ট হয়। (কাবীর– ৩৩৬/৮)

গ. পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যমীনের অভ্যন্তর থেকে মাটিতে মিশে যাওয়া দানা হতে যেভাবে গাছপালা সৃষ্টি করা হয়, এমনিভাবে মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষকে মহান আল্লাহ পাক তার কুদরত দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আলোচ্য আয়াতে এরই প্রতি গভীর ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয়, মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষ কখন এবং কীভাবে পুনরায় সৃষ্টি হবে? তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে প্রদান করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় ধ্বনিতে সবমানুষ এবং জিনজাতি পুনরায় সক্রিয় হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

তাফসীর

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ **(অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক ধ্বনি [কেয়ামত] উপস্থিত হবে।)**

কেয়ামতের নামকরণ

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে পাকে কেয়ামতের বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা 'হাক্কাহ', 'তাম্মাতুল কুবরা', 'ক্বারিআহ', 'সাআহ', 'ওয়াক্বিয়াহ' ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই নামসমূহ কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতবহ। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের একটি বিশেষ অবস্থার প্রতি সংকেত স্বরূপ 'ছাখ্খাহ' নামকরণ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেছেন,

الصاخة اسم من اسماء القيامة.

অর্থাৎ, 'ছাখ্খাহ' কেয়ামতের একটি বিশেষ নাম। (ইবনে জারীর- ৬৯/১৫)

কেয়ামতকে 'ছাখখাহ' কী হিসেবে বলা হয়েছে? এর বিবরণে আভিধানিক এবং মুফাস্সিরগণ লিখেছেন যে, 'ছাখ্খাহ্'-এর অর্থ হচ্ছে কর্ণ বিদারক বিকট ধ্বনি। কেয়ামত কায়েমের জন্য শিঙ্গার ফুৎকারে এরূপ বিকট ধ্বনি হবে। এ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ কেয়ামতের 'ছাখ্খাহ্' নামকরণ করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী- ৪৮/৩০)

কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীছে পাকে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হল। এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ .

হে মানব, তোমরা তোমাদের 'রব' কে ভয় কর। নিশ্চয়ই কেয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা কেয়ামত প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন সমস্ত স্তন্যদানকারী ধাত্রী তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী নারীদের গর্ভ খালাস হয়ে যাবে, মানুষকে দেখাবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (সূরা হজ্জ: ১-২)

আর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُه وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ .

যেদিন আমি আসমানসমূহকে ভাঁজ করে ফেলব, যেভাবে ভাঁজ করা হয় লিখিত দফতর, যেভাবে আমি প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। এটাই আমার প্রতিশ্রুতি, আমি তা অবশ্যই পালন করব। (সূরা আম্বিয়া: ১০৪)

বোখারী (৯৬৫/২), মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, তাবারানী (দুররুল মনছুর- ৩১৮/৬), দারেমী (কিতাব নং- ২০/ বাব নং ৮২), মুসনাদে আহমদ (৪৯৫/৩), মুসনাদে তায়ালিসী (হাদীছ নং- ২৬৩৮), বাইহাকী (মাজহারী- ২০৩/১০), ইত্যাদি হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আয়েশা এবং হযরত সাওদাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض؟ قال يا عائشة ! الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض.

মানুষ খালি পা, বস্ত্রহীন, বে-খতনা অবস্থায় হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। (হযরত আয়েশা [রা.] বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, নারী-পুরুষ সকলেই একে অপরকে দেখতে থাকবে? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা, অবস্থা খুবই ভয়ংকর হবে, কারও প্রতি কারও দৃষ্টি আরোপের অবকাশ থাকবে না।

৩৫, ৩৬, ৩৭ নং আলোচ্য আয়াতসমূহেও কেয়ামতের অসহায় অবস্থার আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিপদের সময় মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হয় ভাই-বোন, মাতা-পিতা, স্ত্রী, সন্তান। যাদের মায়া-মমতা-প্রেম-ভালবাসায় মানুষের স্বীয় জান-মাল, ইজ্জত সম্মানের পর্যন্ত পরোয়া থাকে না, শরীয়তের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করায় পর্যন্ত লা পরোওয়া হয়ে যায়, এমনকি মানুষ তার স্রষ্টাকে পর্যন্ত ভুলে যায় এবং মানবতার দিশারী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোনীত সুন্নাত এবং উত্তম আদর্শকে বর্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারাও কেয়ামতের দিন পরস্পর থেকে দূরে পালাবে, ন্যূনতম সাহায্যেও এগিয়ে আসবে না; বরং একটি কথা বলতেও আগ্রহী হবে না। সুতরাং আর কাদের প্রতি আশা করা যেতে পারে? এরই বর্ণনা প্রদান করে বলা হয়েছে,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ. وَ أُمِّهِ وَ أَبِيْهِ. وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيْهِ (সেদিন পালাবে মানুষ, তার ভাই থেকে এবং তার মা ও তার পিতা থেকে এবং তার সঙ্গিনী ও সন্তান থেকে।)

পলায়নের বিশদ বিবরণ

একজন অপরজন থেকে পালাবে! এর দুইটি অর্থ হতে পারে।

ক. একজন অপরজনকে সাহায্য করতে আগ্রহী হবে না। কারণ, সাহায্য কোন কাজে লাগবে না, কোন একটি কথা বলার সাধ্য হবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا .

বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (সূরা মা'আরিজ: ১০)

www.maktabatulabrar.com

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا .

সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না। (সূরা দুখান: ৪১)

বরং সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে, যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ .

যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতা প্রকাশ করবে এবং তারা কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের পরস্পরের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর অনুসরণকারীগণ বলবে, হায়! একবার যদি আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্ম তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন, আর তারা মোটেই অগ্নি থেকে বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারাহ: ১৬৬-১৬৭)

বস্তুত এ অবস্থাকে বোঝাবার জন্য 'পলায়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এমতাবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত থাকা এবং না থাকা সমান।

খ. বাহ্যিকভাবেও একজন অপরজনের আড়ালে পালিয়ে থাকতে স্বচেষ্ট হবে। কারণ, মুফাস্সির কাতাদাহ বলেন, "সেদিন পরস্পরের নিকট নিজের হক এবং প্রাপ্য তলব করবে এবং একজন অপরজনকে স্বীয় অপরাধের জন্য দায়ী করতে উদ্যত হবে, যথা ভাই-বোন পরস্পরকে দায়ী করবে এবং একজন অপরজনের নিকট তার হক ও প্রাপ্য তলব করবে। মাতা-পিতা সন্তানাদিকে প্রাপ্যের জন্য দায়ী করবে, সন্তানগণ মাতাপিতাকে দ্বীনের শিক্ষা এবং দ্বীনের পথে পরিচালনা না করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করবে, স্বামী স্ত্রীকে দায়ী করবে এবং স্ত্রী স্বামীকে হারাম আহার করানোর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করবে। (রূহুল মাআনী- ৪৮/৩০)

হক এবং অধিকারের প্রকারভেদ

হাশরের ময়দানে প্রত্যেককেই অন্যের হক এবং প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে হবে। এই হক এবং অধিকার মূলত দুই প্রকার।

ক. আল্লাহর হক, যেমন: আল্লাহর প্রতি ঈমান, নামায আদায় করা, তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা, ইত্যাদি।

(খ) বান্দার হক। হাশরের ময়দানে হকের দাবী উত্থাপনকারী বান্দাগণের শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। যথা:

(১) মাতা, পিতা, উস্তাদ, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন।

(২) উস্তাদ ছাত্র, পীর-মুরীদ।

(৩) মুরব্বী, নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ এবং সর্বস্তরের পরিচালকমণ্ডলী এবং অনুসরণকারী ও

www.maktabatulabrar.com

অধীনস্তগণ প্রমুখ।

এই সকল শ্রেণীর দাবী এবং হক তথা অধিকার হবে বিভিন্ন ধরনের। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় শিক্ষাগত, চরিত্রগত, পারিবারিক, শরীর সংক্রান্ত, রূহ এবং অন্তর সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হক হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الاكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته .

শোন! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বোখারী শরীফ)

বস্তুত উল্লিখিত কারণেই একজন অপর জন থেকে পালাতে স্বচেষ্ট হবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ **(কতক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, হাসি- খুশি, প্রফুল্ল।)**

৩৮-৩৯ নং এই দুই আয়াতে হাশরের ময়দানে মু'মিনের মুখমণ্ডল কেমন হবে তা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মু'মিনের মুখমণ্ডল খুবই উজ্জ্বল হবে এবং তারা হাসি-খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, যাতে হাশরের ময়দানে তাদের মুখমণ্ডল মলিন এবং ভীত সন্ত্রস্ত না হয়, যাতে আল্লাহর আদালতে তারা সঠিক হিসাব প্রদানে সক্ষম হয় অথবা বিনা বিচারেই আল্লাহর করুণায় সৌভাগ্যশীল হতে পারে, সেজন্যে তারা ইহকালে আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং বিধি-নিষেধ মেনে চলেছে। এপথে চলার সময় তাদেরকে কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা এসব কিছু বুক পেতে গ্রহণ এবং সহ্য করেছে। তাদেরকে সীমাহীন গ্লানি, অপমান এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে। সদা-সর্বদা ভাবাতুর, ভারাক্রান্ত এবং মলিন মুখমণ্ডলি নিয়ে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। তাই এর প্রতিদানে কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল নূরে নূরান্বিত, উজ্জ্বল ও আনন্দে উদ্ভাসিত থাকবে। সেদিন তারা ভাবনামুক্ত, চিন্তামুক্ত, চির সম্মানের অধিকারী, চির শান্তির গৌরবে ধন্য। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হাশরের ময়দানে তাদের মুখমণ্ডলি পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ **(এবং কত মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি-ধূসর তাকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।)**

৪০-৪১ নং এই দুই আয়াতে হাশরের ময়দানে পাপাচারীদের চেহারা কেমন হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে তাদের চেহারা হবে ধূলি-ধূসর, ভারাক্রান্ত, ভয়ে আতঙ্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, কালো এবং মলিন। যে পথে চললে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হত, হাসি-খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, আল্লাহর আদালতে সঠিক হিসাব প্রদানে সক্ষম হত অথবা বিনা বিচারেই সৌভাগ্যশীল হতে পারত, সেপথে তারা চলেনি, চলার প্রয়োজনও উপলব্ধি করেনি। তাই আজ তাদের এই দশা হবে। তারা পার্থিব সুখ-শান্তি এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাই আজ তাদের এই অবস্থা হবে। তাই আজ তাদের দেহ দুর্গন্ধময়, মলিন, ধূলি-ধূসর, ভারাক্রান্ত, দুঃখিত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক

ছিল। সুতরাং যা স্বাভাবিক তা-ই রয়েছে।

أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (এরাই কাফের-পাপাচারী।)

এ আয়াতে হাশরের ময়দানে কাফেরদের চেহারা মলিন কেন হবে, তার কারণের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ 'কাফারাহ' এবং 'ফাজারাহ' দুটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাস্সির আলূসী এবং আবুস সুউদের মতে অন্তরে কুফ্রী এবং বাহ্যিক অপকর্ম দুটিই চেহারা মলিন হওয়ার অভিন্ন কারণ। অথচ যার অন্তরে কুফ্রী বিদ্যমান আর আমল আখলাক পরিশুদ্ধ অথবা অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আর বাহ্যিক আমল আখলাক ঈমান বিরোধী, হাশরের ময়দানে তার চেহারাও মলিন হওয়ার উল্লিখিত কারণ দুটি অভিন্ন নয়, বরং প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন কারণ। অতএব কুফ্রী এবং বাহ্যিক অপকর্ম উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন কারণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ। এ বিবরণ অনুযায়ী দুটি ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের যথার্থতা সুস্পষ্ট হয় এবং এর সাথে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ও যুক্তিযুক্ত হয়।

কেবল জাহেরী এবং বাতেনী উভয় প্রকার পাপকর্ম বর্জনকারীদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, অন্যদের নয়।

প্রত্যেক নবী রসূলের অনুসারী উম্মতের চেহারাই নূরান্বিত হবে। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

চেহারা উজ্জ্বল করার বিশেষ আমলসমূহ

সেহাছিত্তাসহ, তাবারানী, দাইলামী, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মুস্তাদরাক হাকিম, বাইহাকী, কানযুল উম্মাল, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবসমূহে হযরত আবূ হুরায়রাহ, আবুদ দারদাহ, আবূ উমামাহ, আবূ মূসা, আবূ সাঈদ খুদরী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, যায়েদ-ইবনে হারিছাহ, সাহ্ল ইবনে সাআদ, জাবির এবং আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবিদের বর্ণিত হাদীছসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে হাশরের ময়দানে বিশেষ নূর লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা এবং চেহারা উজ্জ্বল হওয়ার অন্যতম আমল এবং উপাদান নিম্নরূপ-

- পাবন্দির সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।
- পাবন্দির সাথে অধিক নফল ইবাদত, নামায আদায় করা।
- সঠিকভাবে উযূ করা।
- হজ্জের ওয়াজিব আদায়ের জন্য মাথা মুণ্ডানো।
- যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে জাম্রাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।
- রাতের আঁধারে মসজিদে গমন করা।
- জেহাদে আহত হওয়া।
- সুন্নাত মোতাবেক দাঁড়ি, চুল পেকে সাদা হয়ে যাওয়া।
- বাজারে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।
- কোন মুসলিমকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা।

www.maktabatulabrar.com

- নেক মুসলিমের অন্ধ হয়ে যাওয়া।
- সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা।
- সূরা আবাসা তেলাওয়াত করা।
- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা।

উপরোক্ত আমলসমূহের কয়েকটি ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত আমলে সকল নবী-রসূলগণের উম্মতই সমান। সুতরাং সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, অন্য সব নবী রসূলগণের উম্মতের চেহারাও নেক আমলের বদৌলতে উজ্জ্বল এবং নূরান্বিত হবে এবং তারাও হাশরের ময়দানে হাসি-খুশিতে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হবে।

নূরের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস

মহান আল্লাহর দরবারে আমলের মূল্যায়ন হয় ইখলাছ এবং খুণ্ড-খুজুর ভিত্তিতে। আর এক্ষেত্রে সকলের জন্য এক স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। আর সম্ভব হয় না বলেই হাশরের ময়দানে নূরের পরিমাণ অনুপাতে নূরের অধিকারীদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস ঘটবে। কারও নূর হবে অতিপ্রখর ও অতি উজ্জ্বল, কারও নূর হবে দুর্বল এবং ক্ষীণ, আবার অনেকের নূর বিকাশে হবে বিলম্ব।

ক. নূরের সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হবেন নবী রসূলগণ। তাদের সকলের সর্দার এবং নেতা হবেন শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

খ. দ্বিতীয় স্তরের অধিকারী হবেন সিদ্দীকিনগণ। তাদের সরদার এবং নেতা হবেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। এরপর যথাক্রমে মর্যাদার এবং নূরের অধিকারী হবেন হযরত উমর, হযরত উছমান এবং হযরত আলী।

গ. তৃতীয় স্তরের অধিকারী হবেন শহীদগণ। তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। এই স্তরে হযরত হামযা (রা.)-এর স্থান হবে অতি শীর্ষে।

ঘ. চতুর্থ স্তরের অধিকারী হবেন সালিহীন অর্থাৎ, সাধারণ নেককারগণ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর এবং শ্রেণি হবে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর নূর

সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর নূরের বিশেষত্ব থাকবে। এর প্রতি পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে পাকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন:

ক. মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَه ـ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ .

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তাঁর সাথিগণ কাফেরদের প্রতি খুবই কঠোর এবং পরস্পর খুবই সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদায় দেখতে পাবে। তাদের চেহারায় সাজদার চিহ্ন বিদ্যমান। (সূরা ফাতহ: ২৯)

খ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان امتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء .

আমার উম্মতকে কেয়ামতের দিন ডাকা হবে। তারা এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের উযূর স্থানসমূহ উযূর বরকতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এ হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য।

গ. পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ তেলাওয়াত এবং বিশেষ বিশেষ সূরার তেলাওয়াত ও বিশেষ বিশেষ বরকতেও বিশেষ নূর হাসিল হবে।

উপরোক্ত আয়াতে পাক এবং হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদী হাশরের ময়দানে বিশেষ নূরের অধিকারী হবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঈমান এবং তাওহীদের নূর

হাশরের ময়দানে নেক এবং সৎকর্মপরায়ণ তাওহীদবাদী মুমিনদের চেহারাও নূরান্বিত হবে এবং তাদের অনেকেই বিনা হিসেবে জান্নাতবাসী হয়ে যাবে। অপরদিকে বস্তুবাদী কাফের, মুশরিক এবং মুনাফেকরা এরূপ নূর থেকে সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত থাকবে এবং তারা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। সেদিন তারা মুমিনদের নিকট থেকে নূরের সামান্য অংশ লাভ করার জন্য নেহায়েত কাকুতি-মিনতি এবং দীনতা-হীনতার সাথে প্রার্থনা করে বলবে,

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۚ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .

তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মধ্যে প্রাচীর করে দেয়া হবে। যে প্রাচীরের দরজা হবে মাত্র একটা। দরজার ভিতর দিকে থাকবে রহমত এবং বর্হিভাগে থাকবে আযাব। (সূরা হাদীদ: ১৩)

মু'মিন পাপীদের নূর

মু'মিন পাপীদের ভাগ্যে নূর জুটবে কি না, জুটলে কীরূপ হবে? এটা অবশ্যই একটা জটিল প্রশ্ন। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ .

তাদের চেহারায় সাজদার চিহ্ন বিদ্যমান। (সূরা ফাতহ: ২৯)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাপীদের সমস্ত দেহ জাহান্নামের অগ্নি সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে ফেলবে, তবে সরিষা পরিমাণ ঈমান কালো বর্ণ হয়ে সংরক্ষিত থাকবে এবং সাজদার চিহ্ন হেতু সাজদার স্থানসমূহ অগ্নির প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে। মুফাস্সির ইবনে হাওশাব বলেন,

يعون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر .

অর্থাৎ, তাদের চেহারায় সাজদার স্থানসমূহ পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে।

অতঃপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নহরে হায়াত অর্থাৎ, জীবন দানকারী নদীতে ফেলে দেয়া হবে। ফলে স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তারাও তেমনিভাবে সতেজ হয়ে গজিয়ে উঠবে। উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে,

ক. মু'মিন পাপীদের ভাগ্যেও নূর জুটবে, তবে নূরের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে।

খ. ঈমানী শক্তি এবং সাজদার নূর জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য সহায়ক হবে।

নূর পরিদর্শনের স্থান এবং উপায়

হাশরের ময়দানে কাফের এবং মু'মিন সকলেই মু'মিনের নূর পরিদর্শনে সক্ষম হবে। কিন্তু বস্তু জগতেও এই নূর পরিদর্শন সম্ভব কি না, সম্ভব হলে এর উপায় কী? এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। তবে এতটুকু বিষয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, স্বাভাবিকভাবে নূর পরিদর্শন অসম্ভব হলেও আল্লাহর ওলীদের জন্য এটা মোটেই অসম্ভব নয়। আল্লাহ পাক যাদেরকে অন্তরদৃষ্টি দান করেছেন, আল্লাহ পাক যাদের বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারা তাঁদের উন্মুক্ত বক্ষে অবস্থিত অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে যেমন বস্তুজগতে পাপের সরু এবং সূক্ষ্ম দেহরাজিকে পরিপূর্ণভাবে পরিদর্শনে সুসক্ষম হন, তেমনিভাবে তারা বস্তুজগতেই আল্লাহ প্রদত্ত নূর পরিদর্শনেও সুসক্ষম হন। কারণ, অন্তরদৃষ্টি এবং উন্মুক্ত বক্ষে অবস্থিত খোদায়ী নূরের সম্মুখে কোন কিছুই অদৃশ্য থাকে না।

অন্তরদৃষ্টির হাকীকত

এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ .

আল্লাহ পাক যাকে হেদায়াত দান করতে ইচ্ছা পোষণ করেন, ইসলামের জন্য তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন। (সূরা আন'আম: ১২৫)

বক্ষ হচ্ছে অন্তরের আবরণস্বরূপ। তাই বক্ষ প্রশস্ত হয়ে গেলে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত তত্ত্ব এবং রহস্য সমান ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ, তখন অন্তরের সাথে সরাসরি খোদায়ী নূরের সংযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মু'মিনের অন্তর নূরে ইলাহীর অধিকারী হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ .

আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার প্রভু প্রদত্ত নূরের উপর বিদ্যমান হয়। (সূরা যুমার: ২২)

ফানা ফিল্লাহ-র হাকীকত

তাছাওউফের পরিভাষায় এই স্তরকে 'ফানা ফিল্লাহ' বলা হয়। সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংসশীল বিশ্বাস করে সমগ্র সৃষ্টি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করত অনাদি-অনন্ত আল্লাহতে পরিপূর্ণ বিলীন হয়ে চিরন্তন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে ফানা ফিল্লাহ।

এমতাবস্থায় বান্দা আল্লাহর একান্ত প্রিয় এবং মাহবূব হয়ে যায়। বস্তুত ফানাফিল্লাহর প্রতিফলই

www.maktabatulabrar.com

হচ্ছে 'মাকামে মাহবূবিয়ত'। এ মাকামের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করে আমার এত নিকটে উপনীত হতে সক্ষম হয় যে, তখন আমি স্বয়ং তাকে ভালবাসতে শুরু করি। হাদীছে কুদছীতে বর্ণিত হয়েছে,

فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع بى وبصره الذى يبصر به .

সে যখন আমার মাহবূব হয়ে পড়ে, তখন আমি তার জন্য শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই।

আল্লাহর প্রিয় যে বান্দা এই স্তরে উপবিষ্ট হতে সক্ষম হয়, তার অবস্থা হয় নিম্নরূপ-

ক. তার অন্তরের সাথে খোদায়ী নূরের সংযোগ স্থাপিত হয়।

খ. ইহকাল এবং পরকালের দৃশ্য অদৃশ্য তত্ত্ব ও রহস্যসমূহ তার সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত বক্ষের হাকীকত সম্পর্কে অবগতির উদ্দেশ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে উত্তরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

نور يقذفه الله فى قلب المؤمن .

এ'তো হচ্ছে নূর, আল্লাহ পাক স্বয়ং এ নূর মু'মিনের অন্তরে প্রবিষ্ট করে থাকেন।

এ কারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله .

মু'মিনের বিচক্ষণতার ব্যাপারে সংযত থাক। কেননা, সে আল্লাহর নূরের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

অন্তরদৃষ্টির উচ্চস্তর

সকলের অন্তরদৃষ্টি একসমান হয় না এবং হতে পারেও না। অন্তরদৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরের প্রথম সোপানে উপবিষ্ট হচ্ছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যই আল্লাহর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ .

হে আমার রব, আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন। (সূরা ত্বাহা: ২৫)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্তরে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। এটাই হল তার আগে পরের সকলের সমস্ত জ্ঞান লাভের গভীর রহস্য। এভাবে নূরে ইল্‌মের সাহায্যেই অদৃশ্য জগতের অগণিত সংবাদ উম্মতের সম্মুখে পরিবেশন করেছেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اوتيت علم الاولين والاخرين .

অর্থাৎ, আগে পরের সকলের সমস্ত জ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে পরের সকলের সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এটাই হল তার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ হওয়ার ঘোষণার গভীর রহস্য।

ওলীদের অন্তরদৃষ্টি

আল্লাহর ওলীগণ অন্তরদৃষ্টিতে নবী-রসূলগণের স্তরে উন্নীত হতে পারেন না। তাদের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে নবী-রসূলগণের প্রথম স্তর। এই স্তরে উম্মতের মধ্যে অন্তরদৃষ্টির ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে, আছে এবং থাকবে। নিম্নে উম্মতের অন্তরদৃষ্টির কিছু ঘটনা পেশ করা হল।

এক নং ঘটনা

হযরত উছমান গনী (রা.) এক লোকের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করে বলেন, কী ব্যাপার? তোমরা আমার নিকট এমতাবস্থায় কেন আস যে, তোমাদের চোখে যেনার চিহ্ন প্রস্ফুটিত থাকে? লোকটি তার অপরাধের কথা স্বীকার করে নিল।

দুই নং ঘটনা

সালেকীনদেরকে তরবিয়ত করার সময় এক খ্রিষ্টান হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত হাদীছের অর্থ জানতে চায়-

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله .

তোমরা মু'মিনের বিচক্ষণতার ব্যাপারে থাকবে, কেননা তারা আল্লাহর নূরের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. লোকটির চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে খ্রিষ্টান, তুমি ইসলাম কবূল কর। কারণ, তোমার ইসলাম গ্রহণের সময় হয়ে গিয়েছে। খ্রিষ্টান লোকটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবূল করল।

তিন নং ঘটনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. কুফার মসজিদে উযূ করার সময় কতিপয় যুবকের উযূর পানির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন,

يا ولدى تب عن عقوق الوالدين يا اخى من الزنا . يا اخى تب من شرب الخمر وشئل الات اللوم .

হে প্রিয় বৎস, মাতা-পিতার নাফরমানী করা থেকে তওবা কর। হে আমার ভাই, যেনা করা থেকে তওবা কর। হে আমার ভাই, মদ্য পান এবং গান-বাদ্য শোনা থেকে তওবা কর।

যুবকরা সকলেই তওবা করল। যুবকদের উযূর পানিতে নির্গত গোনাহসমূহ দেখেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরূপ বলতে পেরেছিলেন।

চার নং ঘটনা

হযরত শেখ আবদুল আযীয দাব্বাগ রহ. এতো মূর্খ ব্যক্তি ছিলেন যে, ভাল করে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারতেন না, কিন্তু তার সম্মুখে আরবী বাক্য পাঠ করলে সেটা কুরআনের আয়াত, না হাদীছ, না মানুষের কথা, তা তিনি শোনা মাত্র বলে দিতে পারতেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'পবিত্র কুরআন' তেলাওয়াতের সময় মুখাবয়ব থেকে সূর্যের আলোর মত

www.maktabatulabrar.com

নূর বের হয় এবং হাদীছ পাঠ করলে চাঁদের আলোর মত নূর বের হয় আর মানুষের কথা হলে এর কোনটাই বের হয় না- এভাবেই আমি বুঝতে সক্ষম হই।

পাঁচ নং ঘটনা

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ.-কে এক পণ্ডিত প্রশ্ন করল যে, একটি লোক নিজ বাড়িতে যেতে ইচ্ছুক। চৌরাস্তায় এসে নিজ বাড়ির পথ ভুলে গেল। চৌরাস্তায় দুইজন লোক দেখতে পেল। একজন জাগ্রত, অপরজন ঘুমন্ত। আগত লোকটি দুজনের মধ্যে কার নিকট রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করবে? হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. লোকটির চেহারার দিকে এক নজর দেখে তড়িৎ উত্তর দিলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তির অপেক্ষা করবে। সে জাগ্রত হলে তার নিকট থেকে নিজ বাড়ীর পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নিবে। পণ্ডিত লোকটি বলল, সে কেন জাগ্রত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করবে না? হযরত শাহ সাহেব বললেন, জাগ্রত ব্যক্তি স্বয়ং রাস্তা ভুলে ঘুমন্ত ব্যক্তির অপেক্ষায় বসে আছে। উত্তর শোনেই পণ্ডিত লোকটি দ্রুত চলে গেল। উপস্থিতবৃন্দের বারবার জিজ্ঞাসার কারণে হযরত শাহ সাহেব বললেন, লোকটি খ্রিষ্টানদের একজন মহাজ্ঞানী ও বিরাট পণ্ডিত। সে ইসলামের উপর বিরাট একটা জটিল প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমার উত্তর শোনে সে পরাজয় বরণ করে দ্রুত পালিয়েছে। যদি বলতাম যে, জাগ্রত ব্যক্তির নিকট থেকে নিজ বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করে নিবে, তাহলে খ্রিষ্টান পণ্ডিত বলত যে, ইসলামী আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. এখনো জীবিত আছেন, আর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত নন। সুতরাং হেদায়াত এবং মনযিলে মাকসূদে পৌছার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মকেই অনুসরণ করা ন্যায়সংগত। কিন্তু আমি উত্তর দিয়েছি যে, হযরত ঈসা আ. স্বয়ং ঘুমন্ত ব্যক্তি- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় বসে আছেন এবং শেষ যুগে তাশরীফ এনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হিসেবে দ্বীনে মুহাম্মাদীর তাবলীগ ও দাওয়াতে ইসলামের গুরুদায়িত্ব প্রতিপালন করবেন। খ্রিষ্টান লোকটি আসলেই অত্যন্ত সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্যে সে ব্যর্থ হয়ে দ্রুত চলে গেছে। এ ধরনের অগণিত ঘটনাবলির দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, উম্মতে মুহাম্মাদীর ভিতর যেমন 'ইল্‌মে নবুয়তের' ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে, তেমনিভাবে 'অন্তরদৃষ্টির ধারাবাহিকতা'ও বিদ্যমান এবং চালু আছে, কেয়ামত পর্যন্তই চালু থাকবে। বস্তুত যারা অন্তরদৃষ্টির অধিকারী, তারা বস্তুজগতেই আল্লাহ প্রদত্ত 'নূরে ইলাহী' পরিদর্শনে সক্ষম হয়।

বস্তুজগতে নূর পরিদর্শন

বস্তুজগতে নূর পরিদর্শনের যৌক্তিকতার বিষয়টি এভাবেই মূল্যায়ন করা যায় যে, নূর আমল ও আমলের একাগ্রতা এবং খুশু-খুযুর বদৌলতে সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমল সম্পাদনের সময় থেকেই অন্তর এবং যথাস্থলে নূর সংযুক্ত হয়ে থাকে। হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ جَعَلْنَا لَه نُوْرًا يَّمْشِىْ بِه فِى النَّاسِ .

আমি তাকে 'নূর' প্রদান করেছি। সেই নূর নিয়ে সে লোকালয়ে বিচরণ করে থাকে। (সূরা আন'আম: ১২২)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من كثرت صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار .

রাত্রি বেলায় অধিক নফল ইবাদতকারীর চেহারা দিনের বেলায় উজ্জ্বল হয় (নূরের বরকতেই)।

বস্তুত অন্তরদৃষ্টির অধিকারীদের পক্ষে চেহারায় বিদ্যমান নূর পরিদর্শন করা অসম্ভব কিছু নয়, খুবই সম্ভব।

অন্তরদৃষ্টি লাভ করার উপায়

বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার চিহ্ন কী? হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এ প্রশ্নের উত্তরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاعداد للموت قبل نزوله .

চিরস্থায়ী বাসস্থানের অভিমুখী হওয়া, ধোঁকার স্থান (বস্তুজগত) থেকে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

বস্তুত এই তিনটি বিষয় হচ্ছে অন্তরদৃষ্টি লাভের বিশেষ উপায়।

(৮১) সূরা তাকভীর, মক্কী
২৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।	اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
(২) আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়বে।	وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢
(৩) এবং পর্বতসমূহকে যখন চালিত করা হবে।	وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
(৪) আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী সকল পরিত্যক্ত বিচরণ করবে।	وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
(৫) আর বন্য পশু সকল যখন (ভয়ে) একত্রিত হবে।	وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥
(৬) এবং সাগরসমূহকে যখন উত্তাল করা হবে।	وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

اَلشَّمْسُ সূর্য, كُوِّرَتْ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, গুটিয়ে যাবে, اَلنُّجُوْمُ নক্ষত্ররাজি, اِنْكَدَرَتْ খসে পড়বে, মলিন হয়ে যাবে, اَلْجِبَالُ পাহাড়, পর্বতরাজি, سُيِّرَتْ পরিচালিত হবে, চালিত হবে, চলমান হবে, اَلْعِشَارُ পূর্ণগর্ভ উষ্ট্রীসমূহ, عُطِّلَتْ অবাধে বিচরণ করবে, পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করবে, اَلْوُحُوْشُ বন্যপশু, حُشِرَتْ জমায়েত করা হবে, اَلْبِحَارُ সমুদ্রসমূহ, سُجِّرَتْ প্রজ্বলিত হবে, উত্তেজিত হবে।

যোগসূত্র

সূরা আবাসা-র শেষ আয়াতসমূহে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, সেদিন ভাই ভাই থেকে, সন্তান পিতা-মাতা থেকে, স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজন থেকে অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার আপনজন থেকেও পালিয়ে থাকবে। আর আলোচ্য সূরায় সেই ভয়াবহ প্রলয়কারী কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে এবং কীভাবে হবে, তার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। (তাফসীরে হাক্কানী- ৪৪)

সূরার নামকরণ

আলোচ্য সূরাটির প্রথম আয়াতের দুইটি শব্দ অনুপাতে এর দুইটি নামকরণ করা হয়েছে।

(ক) সূরাতুশ শাম্‌স। শাম্‌স অর্থ সূর্য।

(খ) সূরাতুত তাকভীর। এ নামটি كورت শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। كورت অর্থ গুটিয়ে ফেলা হবে, নিষ্প্রভ করা দেয়া হবে।

হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে যুবাইরসহ সর্বসম্মতভাবে এই সূরাটি 'মক্কী' এবং এতে সর্বমোট ২টি রুকূ এবং ২৯টি আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

সূরার ফযীলত

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من قرأسورة التكوير اعاذه الله ان يفضحه .

যে ব্যক্তি সূরা তাকভীর তেলাওয়াত করবে, তাকে আল্লাহ পাক আমলনামা খোলার মুহূর্তে অপমান থেকে রক্ষা করবেন। (কাশশাফ- ২২৬/৪)

সূরার মূল আলোচ্য বিষয়

এই সূরার প্রথম ছয়টি আয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং ১৯ নং আয়াত থেকে ২৫ নং আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের সংবাদ পরিবেশনকারী মহামানব রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালত ও নবুয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট আয়াতসমূহে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির আলোকে মূল বিষয়বস্তুকে প্রমাণ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

সূরা প্রসঙ্গে বিশেষ বাণী

মুসতাদরাক হাকিম, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী এবং তিরমিযী শরীফে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من سره ان ينظر الى يوم القيامة كانه رأى عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت .

যে কেয়ামতের অবস্থা সরাসরি অবলোকনে আগ্রহী, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার, ও ইনশিকাক পাঠ করে।

এই তিনটি সূরা পাঠ করতে বলার কারণ হল- এই তিনটি সূরায় উপস্থাপিত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করলে কেয়ামত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এতে রয়েছে কেয়ামত সম্পর্কে বারটি অবস্থার বিশেষ বর্ণনা। বারটির মধ্যে ছয়টি প্রথম ফুৎকারের সাথে, আর ছয়টি দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কিত।

তাফসীর

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ **(যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।)**

এ আয়াতে বর্ণিত تكوير শব্দের এক অর্থ আলোহীন হওয়া। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করা। উভয় অর্থের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভব, প্রথমে সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ **(আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়বে।)**

আকাশের সব নক্ষত্র খসে খসে সমুদ্রে পতিত হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ **(এবং পর্বত সমূহকে যখন চালিত করা হবে।)**

পর্বতমালা স্থানচ্যুৎ হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ **(আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী সকল পরিত্যক্ত বিচরণ করবে।)**

উট ছিল আরবদের সর্বোত্তম মাল। বিশেষত দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী ছিল তাদের অতীব প্রিয়। কিন্তু সিঙ্গার প্রথম ধ্বনির ভয়াবহ মুহূর্তে এ মূল্যবান সম্পদেরও কেউ খবর নিবে না। স্বয়ং মালিকেরও হুঁশ থাকবে না নিজের প্রিয় মালের একটু খোঁজ নিতে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ **(আর বন্যপশু সকল যখন [ভয়ে] একত্রিত হবে।)**

অর্থাৎ, জংলী জীব-জন্তু যেগুলো মানুষের ছায়া দেখেও পলায়ন করে ভীত তটস্থ হয়ে তারাও শহরে ঢুকে পড়বে এবং গৃহপালিত পশুর সাথে একত্রিত হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ **(এবং সাগরসমূহকে যখন উত্তেজিত করা হবে।)**

এ আয়াতে বর্ণিত تسجير শব্দের অর্থ অগ্নিসংযোগ করা, প্রজ্বলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্রকে একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে আগুনে পরিণত করা হবে। এভাবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সিঙ্গায় প্রথম ধ্বনির সময় সংঘটিত হবে। যখন পৃথিবী আবাদ থাকবে এবং সিঙ্গার ফুঁৎকারে উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহ সাধিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

কেয়ামতের সময়ের ছয়টি নিদর্শন:

প্রথম ফুৎকারের মুহূর্তে যে ছয়টি ঘটনা ঘটবে তা নিম্নরূপ:

- সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।
- তারকারাজি খসে পড়বে।
- পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে।
- সহায়-সম্পদ পরিত্যাক্ত হবে।
- বন্য জীব-জন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জমায়েত হবে।
- সমুদ্রসমূহে স্ফীতি দেখা দিবে।

এই ছয়টি দুর্ঘটনার ফলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। আর আত্মা ও দেহের বস্তুগত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই সম্পর্কের কারণেই মানুষ পৃথিবীতে মৃত্যু যাতনা, কবর, বরযখ এবং হাশর-নশর সম্পর্কে উদাসীন এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নিপতিত ছিল; কিন্তু কেয়ামতের সাথে সাথে আবরণ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য সব কিছুই দৃশ্যমান ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নে কেয়ামতের ছয়টি নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন

আলোচ্য সূরায় প্রথম আয়াতে সূর্যের এক বিশেষ অবস্থা "তাকভীর" (নিষ্প্রভ হওয়া)-কে কেয়ামতের একটি বিরাট নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফের এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সূর্য এবং চন্দ্রের' তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাকভীর-এর বিবরণে মুফাস্সিরীনে কেরামের মতামতের সারকথা নিম্নরূপ–

ক. সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। অথচ এ আলোর সাথেই পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব ও জীবন-মরণের সম্পর্ক। সূর্যের আলোর সাহায্যেই মানুষ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। গবেষণা, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের সুযোগ লাভ করে। সূর্যাস্তের কারণেই অগণিত রহস্য ও

www.maktabatulabrar.com

তত্ত্বময় রজনীর আবির্ভাব ঘটে। সূর্যের আলোর সাহায্যে সৃষ্টি হয় লক্ষ কোটি বস্তু। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের বয়স, শৈশবকাল, যৌবন এবং বৃদ্ধকালের পরিবর্তনে সূর্য ক্রিয়াশীল। মোটকথা সূর্যই পৃথিবীর আলো। অন্যথায় পৃথিবী হতো তিমিরাচ্ছন্ন। এ কারণেই কোন কোন সম্প্রদায় সূর্যকে দেবতার আসনে সমাসীন করে তার পূজা করে থাকে।

সূর্যের প্রসারিত আলো সংকুচিত হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার অর্থে 'তাকভীর'-কে ব্যবহার করেছেন ইবনে আব্বাস, হাসান বছরী, কাতাদা, মুজাহিদ, জাহ্হাক এবং আওফী প্রমুখ মুফাস্সিরগণ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয়, সূর্যের অবস্থা কী হবে? সূর্যের অস্তিত্ব সংরক্ষিত থাকবে না কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এ সম্পর্কে মুফাস্সির আলূসীর মত নিম্নরূপ–

والظاهر ان ذلك مع بقاء جرمها كالقمر فى خسوفه وفى الاثار ما يريد ذلك.

চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়, কিন্তু চন্দ্র তার অস্তিত্বে অটুট থাকে। ঠিক এভাবেই সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, কিন্তু তার অস্তিত্ব সংরক্ষিত থাকবে।

স্বাভাবিক অর্থ এটাই। প্রমাণস্বরূপ যথেষ্ট হাদীছ বর্ণিত আছে।

খ. তাকভীরের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে মুফাস্সির আমের শা'বী, আবূ ছালেহ এবং রবী' ইবনে খাইছাম বলেন, সূর্যকে স্থানচ্যুৎ করে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং সূর্যের অস্তিত্ব অক্ষত থাকার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে কেয়ামতের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে মানুষকে যে ধারণা প্রদান করেছেন, তাতেও সূর্য অক্ষত থাকার মতটি বোধগম্য হয় না। আর কেয়ামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির ইতি ঘটানো। সুতরাং তখন সূর্যের সংরক্ষিত থাকাটা কেয়ামতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী বটে। বাহ্যত দুটি মত পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কিন্তু মূলত এখানে কোন বিরোধ নেই। বিষয় বস্তুটি সুন্দরভাবে বোঝাবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন শোভিত সুসজ্জিত সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরি করতে যেমন কিছু নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়, তেমনি সভা শেষে মঞ্চ ও প্যান্ডেল খুলে ফেলার জন্যও কিছু নিয়ম বিধি রয়েছে। এ কারণেই প্রথমে খুঁটিতে হাত দেয়া হয় না; বরং এর পূর্বে শামিয়ানা খোলা হয়। তারও পূর্বে খোলা হয় ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম। এবং বাতিসমূহ নির্বাপিত করা হয় তারও আগে। ঠিক এমনিভাবে সৃষ্টির জন্য সাজানো এই পৃথিবীমঞ্চ এক সুন্দর সঠিক পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর মঞ্চের অন্ধকার তিরোহিত করণার্থে সূর্য স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا.

আল্লাহ পাক সূর্যকে আলো এবং চন্দ্রকে নূর হিসেবে স্থাপন করেছেন। (সূরা ইউনুস: ৫)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.

আল্লাহ পাক চন্দ্রকে নূর এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করেছেন। (সূরা নূহ: ১৬)

আবার যখন পৃথিবীর সময়সীমার পরিসমাপ্তি আসন্ন হবে, তখন পৃথিবীরূপ মঞ্চকে খতম করে দেয়া হবে। আর তা করা হবে এক নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে। সূর্য ও চন্দ্রের আলো নিষ্প্রভকরণের মাধ্যমে হবে এর সূচনা। এর পর শুরু হবে একের পর এক ধ্বংসলীলা।

সুতরাং 'ক' এ বর্ণিত অর্থ হচ্ছে সূর্যের প্রথম অবস্থা এবং 'খ' এ বর্ণিত অর্থ হচ্ছে সূর্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা। অর্থাৎ, দুটি মতের মধ্যে সূর্যের দুটি অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথমে সূর্যের আলো নিষ্প্রভ করা হবে। অতঃপর নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং বোঝা গেল, উভয় মতের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই। তাকভীর শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও পরিস্কার ভাবে ফুটে ওঠে। তাকভীর শব্দের মূল অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাস্সির কুরতুবী বলেন,

واصل التكوير الجمع ما خوذ من كور العمامة على رأسه .

অর্থাৎ, তাকভীর শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে প্যাঁচানো। প্যাঁচিয়ে একত্রিত করা। মাথার পাগড়ী প্যাঁচিয়ে একত্রিত করাকে 'তাকভীরুল ইমামাহ' বলা হয়।

বিস্তৃত পাগড়ীকে প্যাঁচিয়ে যেমনি ভাবে জমা করা হয়, ঠিক তেমনি সূর্যের বিস্তৃত আলোকে পেঁচিয়ে সংকুচিত করা হবে। ফলে আলো থাকবে না। বস্তুত একসময় সূর্যের অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। এক সময় সূর্যের অস্তিত্ব টিকে থাকবে, কিন্তু নিষ্প্রভ অবস্থায়। অতঃপর সূর্যকে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। তাকভীর শব্দের ধাতুগত অর্থ বিশ্লেষণ পূর্বক উপরোক্ত অর্থ গ্রহণের অবকাশ আছে বলে বিশিষ্ট আভিধানিক আসমায়ী উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাকভীর শব্দটি ফার্সী 'কোর' থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে অন্ধ। তখন আয়াতরে অর্থ হবে এরূপ– যখন সূর্যকে অন্ধ করে দেয়া হবে। সূর্যকে অন্ধ করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে নিষ্প্রভ করে দেয়া। অর্থের দিক থেকে এখানে অসুবিধা না থাকলেও আরবী ভাষায় যেহেতু এই শব্দের মূল ধাতু বিদ্যমান এবং আভিধানিকগণও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাই শব্দটিকে ফার্সী থেকে গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। এটা আদৌ হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য কি না তাও ভেবে দেখার বিষয়।

সূর্য কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে?

প্রথমে সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হবে। অতঃপর সূর্য নিক্ষেপিত হবে। কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? এ সম্পর্কে মুফাস্সির ইবনে আসলাম বলেন, تقع على الارض অর্থাৎ, ভূমিতে পতিত হবে। মুফাস্সির আবূ মারইয়াম কর্তৃক দাইলামী এবং ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূর্য জাহান্নামে পতিত হবে। মুসনাদে বায্যারের হাদীছে এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহের ভেতর কোন বিরোধ নেই। কারণ, জাহান্নাম এবং সমুদ্র ভূমিতেই বিদ্যমান। তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীছে সমুদ্রের তলদেশে অগ্নির অবস্থিতির কথা উল্লেখ রয়েছে। সূর্য সমুদ্রে নিক্ষেপিত হলে পানি আগুনের দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে আগুনে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্পর্কেও হাদীছে বর্ণনা বিদ্যমান। পানি থেকে বিদ্যুত সৃষ্টির বিষয়টি পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাশরের ময়দান এবং সূর্য

এখানে যে প্রশ্নটি খুবই জটিল তা হচ্ছে– সূর্যকে যেখানেই নিক্ষেপ করা হোক না কেন পরিশেষে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে। তাহলে জাহান্নামীদের শাস্তির উদ্দেশ্যে সূর্যকে তাদের নিকটবর্তী করে দেয়ার কী অর্থ? এমনিভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে সূর্যকে জাহান্নামীদের সাথে

www.maktabatulabrar.com

জাহান্নামে নিক্ষেপ করার যে বর্ণনা এসেছে তার অর্থই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কথা হল, কেয়ামতের সময় সূর্য নিক্ষিপ্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন যদি ধরে নেই যে, সূর্য এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে, তার কোন অংশই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তবুও কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কারণ, আল্লাহর পক্ষে পুনরায় সূর্য সৃষ্টি করা মোটেও অসম্ভব নয়। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফুৎকারের পর একপর্যায়ে সকল ফেরেশতাও মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে পুনরায় ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের প্রতি বহুবিধ দায়িত্ব আরোপিত হবে। অনুরূপভাবে সূর্যকে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং নবসৃষ্ট সূর্যে উত্তাপ সন্নিবেশিত হয়ে জাহান্নামীদের শাস্তির কাজে তা ব্যবহৃত হতে পারে।

জাহান্নামীদের সাথে সূর্যকেও তথায় নিক্ষেপ করার ব্যাপারে প্রশ্ন হতে পারে যে, কী অপরাধে সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? এর উত্তর হলো, বস্তুত সূর্যের কোন অপরাধ নেই। তবুও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সূর্য পূজারীদের সামনে তাদের ভ্রান্তি প্রকাশের জন্য। বিরাট শক্তির আধার মনে করে যে সূর্যকে তারা পূজা করেছে, তাই আজ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। মূলত সূর্য পূজারীদের মর্মপীড়া বহুগুণে বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য।

হে বিশ্ব মুশরিক সমাজ, তোমাদের উপাস্য সূর্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা লাভ কর এবং মুক্তি পেতে হলে অংশীবাদিতা বর্জন করে তাওহীদের পতাকা তলে স্থান গ্রহণ কর।

কেয়ামতের দ্বিতীয় নিদর্শন

কেয়ামতের দ্বিতীয় নিদর্শন হবে তারকারাজি খসে পড়বে। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের 'ইনকাদারাত' শব্দ থেকে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায়। মুফাস্সিরগণ 'ইনকাদারাত' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন:

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারকারাজির আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), জাহ্হাক এবং কাতাদা বলেন, তারকারাজি খসে পড়বে। খসে কোথায় পড়বে? এ সম্পর্কে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। এক. খসে যমীনে পড়বে। দুই. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। মূলত উক্ত মতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, সর্বপ্রথম তারকারাজির আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। অতঃপর যমিনে নিক্ষেপিত হয়ে সর্বশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে। জাহান্নামে নিক্ষেপ শাস্তিস্বরূপ হবে না, বরং তা হবে তারকাপূজারীদের বিভ্রান্তি প্রকাশের জন্য। পবিত্র কুরআনের একস্থানে তত্ত্বটির প্রতি আলোকপাত করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ .

তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর, সব কিছুই জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আম্বিয়া: ৯৮)

এখান থেকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তা হচ্ছে– চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্রসহ অনেক কিছুই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অবশ্য শাস্তিস্বরূপ নয়; বরং ইন্ধন হিসেবে। আর মহান রব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে তারই সৃষ্টির যারা পূজা করত, তাদের জন্য এতে রয়েছে সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

সূর্য নিষ্প্রভ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন করে তারকারাজির বিষয়টি আলোচনা করার কী প্রয়োজন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে,

(ক) কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা পরম্পরায় বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে বস্তুত অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভবিষ্যত করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা দ্বারা শ্রোতা সাধারণ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

(খ) সূর্যের ন্যায় তারকারাজিও পৃথিবীর জন্য এক অপূর্ব শোভা। এর আলো বিচ্ছুরণের সাথে রয়েছে অসংখ্য বস্তুর নানান সম্পর্ক। সুতরাং এগুলোর বিপর্যয়ের বিষয়টিও ধীশক্তির অধিকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় এবং শিক্ষণীয়ও বটে।

তারকারাজি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা

তারকারাজি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন ঐকমত্য নেই। প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের মত ছিল-(ক) তারকারাজি স্বঅস্তিত্বে আসমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতে (খ) তারকারাজি আসমানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে ঝুলন্ত রয়েছে। (রূহুল মাআ'নী- ৫০/২৯)

ইসলামী চিন্তাধারায় তারকারাজি নূরের জিঞ্জিরে সংযুক্ত হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তারকারাজি নূরের জিঞ্জিরে সংযুক্ত হয়ে আসমানে ঝুলন্ত আছে। একশ্রেণির ফেরেশতা নূরের জিঞ্জিরসমূহ ধারণ করে আছেন। (কুরতুবী- ২২৮/১৯০)

এই নূরের জিঞ্জিরের প্রকৃত স্বরূপ কী তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা মুশকিল। অতএব মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে ঝুলন্ত থাকার বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের সাথে এ বর্ণনার কতটুকু বিরোধ রয়েছে বা নেই তাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে হাদীছের বর্ণনায় আমরা বিশ্বাস রাখি।

প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আসমান আর যমীনের সমস্ত জীব মৃত্যুবরণ করবে এবং সমস্ত তারকারাজি যমীনে পতিত হবে। (মাযহারী- ২০৪/১০) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারকারাজি আসমানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং আসমানের নিচে ঝুলন্ত আছে। তারকারাজি মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে ঝুলন্ত নয়, বরং নূরের জিঞ্জিরে সংযুক্ত হয়ে ঝুলন্ত রয়েছে এবং ফেরেশতাগণ নূরের জিঞ্জির ধারণ করে আছেন।

কেয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন

কেয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন হবে পাহাড় স্থানচ্যুৎ হয়ে যাওয়া। সূর্য এবং তারকারাজির পরিবর্তনের মাধ্যমে আসমান এবং উর্ধ্ব জগতের নেযাম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে দেয়া হবে। সেই সাথে সাথে যমীনের নেযাম-শৃঙ্খলাও ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর এর সূচনা ঘটবে, যমীনকে স্থির করে রাখার জন্য প্রোথিত পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুৎ করণের মাধ্যমে। আলোচ্য সূরার ৩নং আয়াতের وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হবে।) কথা দ্বারা উপরোক্ত তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা

পবিত্র কুরআনে পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(ক) পাহাড়কে স্থানচ্যুত করা হবে। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এটাই।

(খ) পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। সূরা 'হাক্কাহ' তে শব্দ দ্বারা এই অর্থ বোঝা যায়।

(গ) পাহাড়সমূহ ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত হয়ে যাবে। (সূরা কারিয়াহ)

(ঘ) পাহাড়-পর্বত ধূলার মত হয়ে যাবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ)

(ঙ) পাহাড় ধূলি-কনা হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। (সূরা তাহা)

(চ) পাহাড়ের স্থানসমূহ মরিচিকা সদৃশ হয়ে যাবে। (সূরা নাবা)

এ অবস্থাসমূহের কতকগুলো হবে প্রথম ফুৎকারের সময় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আর কতক অবস্থা সংঘটিত হবে দ্বিতীয় ফুর্ৎকারের মুহূর্তে। মুফাস্সির যামাখশারীর মতে আলোচ্যে আয়াতে দ্বিতীয় ফুর্ৎকারের সময় সংঘটিত পাহাড়ের অবস্থা বর্ণনারও অবকাশ আছে, কিন্তু আমাদের নিকট এ মতটি মোটেই বোধগম্য নয়। আসমানের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার পর যমীনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্বংস হওয়ার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হবে প্রথম ফুৎকারের মুহূর্তে। এটাই আয়াতের মর্মকথা এবং এটাই মুফাস্সির আবুস সুউদ এবং মুফাস্সির আলূসীসহ অন্যান্য মুফাস্সিরদের অভিমত।

কেয়ামতের চতুর্থ নিদর্শন

আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে العشار শব্দের দ্বারা কিয়ামতের চতুর্থ নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। العشار শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

(ক) এক অর্থ মেঘ-বৃষ্টি। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে- প্রথম ফুর্ৎকারের মুহূর্তে মেঘ-বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে যমীন থেকে উৎপাদনের ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে যাবে।

(খ) আর এক অর্থ উশরী যমীন। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে- যমীন উৎপাদনের উপযুক্ত থাকবে না।

(গ) আর এক অর্থ গর্ভবতী উষ্ট্রী। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে- গর্ভবতী উষ্ট্রী উত্তম সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি কারও আকর্ষণ থাকবে না। সুতরাং অন্যান্য সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

ভাষাগতভাবে উপরোক্ত অর্থসমূহের প্রত্যেকটি অর্থের অবকাশ থাকলেও শেষোক্ত অর্থটিই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতো। সেমতে আয়াতের মর্ম কথা হবে, সহায়-সম্পদের প্রতি মানুষের কোন প্রকার আকর্ষণ থাকবে না। এই আকর্ষণ না থাকার কারণ সম্পদের প্রতি অনীহা নয়; বরং কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিই এর মূল কারণ। যে সহায়-সম্পদের পেছনে পড়ে আল্লাহ এবং তার রসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি, আজ সেই সহায়-সম্পদ বৃথা প্রমাণিত হচ্ছে। এদিকে ইঙ্গিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কেয়ামতের ফুর্ৎকারের সময় উষ্ট্রী আসবে কোথা থেকে? এবং উষ্ট্রীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুফাস্সিরগণ বলেছেন, গর্ভবতী উষ্ট্রীকে

www.maktabatulabrar.com

উল্লেখ করে সহায়-সম্পদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ ধরণের রূপক অর্থ গ্রহণের রীতি রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আরববাসীকে সম্বোধন করেই আয়াত নাযেল হয়েছে, যা তৎকালীন আরববাসীদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল উষ্ট্রী। উষ্ট্রী গর্ভ ধারণ করলে তারা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করত। সর্বদা সেই উষ্ট্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখত এবং তার প্রতি যত্নবান হত। এজন্যেই আল্লাহ পাক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সারকথা হল, কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রাণপ্রিয় সম্পদের প্রতিও আকর্ষণ থাকবে না।

কেয়ামতের পঞ্চম নিদর্শন

আলোচ্য সূরার পঞ্চম আয়াতে কেয়ামতের ৫ম নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী حشرت (হুশিরাত) শব্দের অর্থ বর্ণনায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্নমত পোষণ করেছেন। যথা:

(ক) ইবনে আব্বাস এবং ইবনে খাইছাম বলেন, জীব-জানোয়ার সকল মৃত্যুবরণ করবে।

(খ) উবাই ইবনে কাআব বলেন, জঙ্গল এবং অনাবাদী স্থান থেকে সর্বপ্রকার জন্তু আবাদী এলাকায় জমায়েত হবে। তারা একে অপরের উপর আক্রমণ করবে না; বরং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

(গ) ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাহসহ অনেকের মতে বিচারের জন্য জীব-জন্তু হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে।

এই মতামতসমূহের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রথম ফুৎকারের মুহূর্তে সমস্ত জীব-জানোয়ার ছোটাছুটি করে একত্রিত হবে। অতঃপর মৃত্যু বরণ করবে। আলোচ্য আয়াতে এদিকেই আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী ফুৎকারের সময় সমস্ত জীব-জানোয়ার পুনর্জীবিত হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষের জমায়েত হওয়ার বিষয়টিতে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ অন্যান্য জীবের বিষয়টি এরূপ নয়। অন্যান্য জীবের পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন:

(১) জিন এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর কোন হিসাব-নিকাশ হবে না। কারণ, হিসাব নিকাশের পর জান্নাত অথবা জাহান্নামের প্রশ্ন আছে। আর অন্যান্য প্রাণির জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের কোন অবকাশ নেই।

(২) অনেকের মতে প্রতিটি জীবের হিসাব-নিকাশ হবে। সুতরাং তারা পুনর্জীবিত হবে এবং হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। মুফাস্‌সির আলূসী প্রথম মতটিকে অধিক গ্রহণীয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম গাযালীসহ অনেকেই উপরোক্ত মতামতকে চূড়ান্ত মতামত আখ্যায়িত করে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য জীব-জন্তু যেহেতু 'মুকাল্লাফ' তথা শরীয়তের বিধি-বিধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত নয় এবং সম্মানের উপযুক্ত নয়, তাই হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য অন্যান্য জীব-জন্তুর উপস্থিতি বোধগম্য নয়। হযরত ইমাম গাযালীর মতে এ বিষয়ে ব্যক্তি মতামতের কোন অবকাশ নেই এবং কোন অকাট্য দলীল দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

জীব-জন্তুর হিসাব নিকাশ

আমাদের দৃষ্টিতে '১' এ উল্লেখিত মতটি অধিক গ্রহণীয়। 'অন্যান্য জীব-জন্তু মুকাল্লাফ নয় এবং সম্মানের উপযুক্ত নয়' বলে মহান আল্লাহ পাকের আদল ইনসাফকে ভুলে যাওয়া যায় না। অন্যান্য

www.maktabatulabrar.com

জীব-জন্তুর মধ্যে পরস্পর জুলুম-অত্যাচার হয়ে থাকলে তারও ন্যায়বিচার হওয়া উচিৎ। উচিৎ বলেই আল্লাহ পাক অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে স্বীয় আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ইমাম গাযালীসহ যারা এ বিষয়ে সঠিক এবং অকাট্য দলীল প্রমাণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম চিন্তার অভাবই এ ধরনের বক্তব্যের কারণ। অন্যথায় তিরমিযী এবং মুসলিমসহ সহীহ হাদীছের কিতাব-সমূহে এ বিষয়ে যথেষ্ট হাদীছ বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجماء من الشاة القرناء .

কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের হক প্রত্যেককে অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি শিং বিহীন ছাগলের পক্ষে শিং বিশিষ্ট ছাগলের নিকট থেকে বদলা গ্রহণ করা হবে।

মুসনাদে আহমদের হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, 'পিঁপড়া থেকে বদলা গ্রহণ করা হবে।' জুমহুরের মতানুসারে জান্নাতী, জাহান্নামী এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য জীব-জন্তুকে হিসাব নিকাশের পরও জীবন্ত রাখা হবে। আর অবশিষ্টগুলোকে মাটিতে পরিণত করে দেয়া হবে। ইমাম গাযালীসহ যারা বলেছেন, জীব-জন্তুর হিসাব-নিকাশ নেই এবং হাশরের ময়দানে এগুলোকে জমায়েত করা হবে না– তাদের এ বক্তব্যের অর্থ এই হতে পারে যে, যেহেতু পরিণামে তাদের জাহান্নাম এবং জান্নাত কোনটিই নেই, তাই ব্যাপারটি গুরুত্বের দাবি রাখে না।

কেয়ামতের ষষ্ঠ নিদর্শন

সমুদ্রসমূহে স্ফীতি দেখা দেয়াকে কেয়ামতের ষষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বর্ণণা করা হয়েছে। আলোচ্য সূরার سجرت (সুজ্জিরাত) শব্দ থেকে এ তত্ত্ব উদঘাটিত হয়। 'সুজ্জিরাত'-এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যথা:

(১) ইবনে খাইছাম, কাল্‌বী, জাহ্‌হাক, উবাই ইবনে কাআব, মুকাতিল, হাসান বসরী প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, সমুদ্র পানিতে ভরপুর হয়ে যাবে। পানিতে উত্তাল ঢেউ সৃষ্টি হয়ে ভংয়কর আকৃতি ধারণ করবে।

(২) হুসাইন, কাতাদা এবং ইবনে হিব্বান বলেন, পানি শুকিয়ে তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে।

(৩) হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে কাআব, ইবনে যায়েদ, ইবনে আতিয়্যাহ, মুজাহিদ, মুকাতিল ইবনে সাঈদ, ওয়াহহাব, সুফিয়ান এবং কুশাইরী বলেছেন, সমুদ্র অগ্নিশিখায় পরিণত হবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে উপরোক্ত অর্থের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ লক্ষ্য করা যায় না। কারণ, সমুদ্রের ব্যাপারে এই তিনটি অবস্থায়ই সৃষ্টি হবে। সর্বপ্রথম পাহাড়-পর্বতসহ যমীনের উপরিভাগে বিদ্যমান সব কিছুই ধ্বংস এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রবাহমান সমুদ্রগুলো বাধন মুক্ত হয়ে একত্রিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ .

মিষ্ট এবং তিক্ত পানির মধ্যে বরযখ তথা প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। (সূরা আর-রহমান: ২০)

ঐ মুহূর্তে এই প্রতিবন্ধকতা শেষ হয়ে যাবে। ফলে-

تفجرت مياه البحار فعمت الارض كلها وصارت البحار بحرا واحدا وتصير البحار والارض كلها بساطا واحدا .

অর্থাৎ, সকল সমুদ্র একত্রিত হয়ে সমগ্র পৃথিবী একক সমুদ্র প্রবাহে পরিণত হবে। সমুদ্র এবং ভূমণ্ডলী একক বস্তুতে রূপান্তিত হবে। (কুরতুবী- ২৩০/১৯০)

দ্বিতীয় পর্যায়ে পানির অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হয়ে বায়ুর আকারে অগ্নি শিখায় রূপান্তরিত হবে। ফলে সমুদ্রে আর পানি অবশিষ্ট থাকবে না। বরং এক অগ্নিময় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে পরিপূর্ণ অগ্নিতে পরিণত হবে।

সমুদ্র ও জাহান্নাম

সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হওয়া সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে

(১) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন,

يكور الله الشمس والقمر والنجوم فى البحر ثم يبعث الله عليها ريحا دبورا فتنفخه حتى يصير نارا .

অর্থাৎ, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে প্যাঁচিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর অগ্নিবায়ুর তাপে সমুদ্রকে লেলিহান অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করবেন।

(২)

لايركب البحر الاحاج او معتمر او غازفان تحت ابلبحرنار .

অর্থাৎ, সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, হজ্জ, ওমরা এবং জেহাদের জন্য যেতে পারে। কারণ, সমুদ্রের নীচে জাহান্নাম বিদ্যমান। (আবূ দাউদ)

এরূপ বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রকে দুভাবে অগ্নি শিখায় পরিণত করা হবে। এক. সূর্যের তাপের মাধ্যমে। দুই, সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান অগ্নির মাধ্যমে। এ সম্পর্কে মুফাস্সির রাযী বলেন,

ان تكون جهنم فى قعور البحار فهى الان غير مسجورة لقوام الدنيا فاذا انتهت مدة الدنيا اوصل الله تاثير تلك النيران الى البحار فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك .

সমুদ্রের গভীরে জাহান্নাম বিদ্যমান। পৃথিবী সংরক্ষণের জন্য জাহান্নামের অগ্নিকে নিবৃত রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন পৃথিবীত মেয়াদ শেষ হবে, তখন আল্লাহ তাআলা ঐ আগুনের প্রভাবকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করে দিবেন। ফলে সমস্তটাই জ্বলন্ত আগুনে রূপ নিবে। (কাবীর- ৩৩৯/৮)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রোম সমুদ্রটি সমগ্র বিশ্বের মধ্যভাগে অবস্থিত। এর তলদেশে রয়েছে পিতলের তৈরী অসংখ্য কূপ। কেয়ামত প্রতিষ্ঠার সময় এই কূপসমূহ লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হবে। (ইবনে কাছীর- ৪৭৬/৪)

www.maktabatulabrar.com

পানি ও অগ্নি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

কোন বিষয়বস্তু শরীয়তের অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেলে আর কোন দলীল প্রমাণের অবকাশ থাকে না। কিন্তু বিজ্ঞানের এ যুগে কোন বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত হলে আন্তরিক পরিতৃপ্তি বোধ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সমুদ্রে অগ্নি সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। পানি বিশেষজ্ঞদের মতে পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন জাতীয় দু'প্রকার গ্যাস বিদ্যমান। এ দুয়ের সংমিশ্রণে পানি তৈরী হয় এবং তার জ্বালানী ও উৎক্ষেপন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে পড়ে। এ পানি বৃহত্তর অগ্নিকুন্ডকে নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম।

কিন্তু অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আগুন জ্বালানী এবং উৎক্ষেপনের শক্তি অর্জন করে। আল্লাহ পাক অসীম কুদরতের অধিকারী। তিনি তাঁর কুদরতের বলে যতদিন ইচ্ছা উভয়ের সংমিশ্রণে সমুদ্রকে প্রশান্ত পানিতে ভরপুর রাখবেন। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র ও সমুদ্রের পানিকে অগ্নিগিরিতে পরিণত করবেন। আবার আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি অক্ষমতার দোষ থেকে মুক্ত। ইমাম রাযী কতইনা সুন্দর বলেছেন, 'যিনি এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে সক্ষম, যিনি কেয়ামতের মত ভয়াবহ বিধ্বংসী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি কোন কারণ ব্যতিরেকেই সমুদ্র পানিতে অগ্নি সৃষ্টি করতে সুসক্ষম।'

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧	(৭) আর যখন জনে জনে লোকদেরকে জোড় বেঁধে দেয়া হবে।
وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨	(৮) আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ শিশু কন্যাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।
بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩	(৯) কোন অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?
وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠	(১০) আর যখন আমলনামা খুলে ধরা হবে?
وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١	(১১) আর যখন আকাশের আবরণ উন্মোচিত করা হবে।
وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢	(১২) আর যখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে।
وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣	(১৩) এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে।
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤	(১৪) তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে কী নিয়ে এসেছে।

শব্দার্থ

نُفُوْس (শব্দটি نَفْسٌ -এর বহুবচন) লোক সকল, زُوِّجَتْ জোড় বেঁধে দেয়া হবে, সমবেত করা হবে, مَوْءٗدَةُ জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে, سُئِلَتْ জিজ্ঞাসা করা হবে, জানতে চাওয়া হবে, بِاَيِّ কোন্, কী, ذَنْبٍ

অপরাধে, قُتِلَتْ নিহত হল, হত্যা করা হল, صُحُفُ আমলনামাসমূহ, نُشِرَتْ খুলে দেয়া হবে, ছড়িয়ে দেয়া হবে, كشطت উন্মোচিত করা হবে, جَحِيْمُ জাহান্নাম, দোযখ, سُعِّرَتْ উত্তেজিত করা হবে, উত্তপ্ত করা হবে, اُزْلِفَتْ নিকটবর্তী করা হবে, عَلِمَتْ অবগত হবে, জানতে পারবে, مَا اَحْضَرَتْ সে কী নিয়ে এসেছে।

ভাবার্থ

প্রথম ফুৎকারের পর সমগ্র পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে দলে দলে জমায়েত হবে। কাফেরদের দল ভিন্ন হবে। মুসলমানদের দল ভিন্ন হবে। আবার কাফেরদের মধ্যে বিভিন্ন দল হবে। ইয়াহুদীদের ভিন্ন দল হবে। এমনিভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল হবে। প্রত্যেককেই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যারা আরব জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করেছিল তাদেরকেও তাদের এহেন কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করে তাদেরকে অবরাধী সাব্যস্ত করা হবে। সকলের সম্মুখে আমলনামা খুলে ধরা হবে। তাদেরকে আমলনামা পাঠের যোগ্যতা দেয়া হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল সংরক্ষিত এবং লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে। আমলনামা দেখে কেউ খুশি হবে। আবার কারও চেহারা দুঃখে মলীন হয়ে যাবে। নেককারগণ আমলনামা দেখে খুশি হবে। পক্ষান্তরে বদকাররা তাদের আমলনামা দেখে দুঃখে মলিন হবে। আসমানের আবরণ উন্মোচন করা হবে। ফলে আসমানের উপরের সবকিছুই পরিদৃষ্ট হবে। জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামকে উত্তেজিত করা হবে। আর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। তখন আর কারও নিজের বিষয়ে কোন কিছু অজানা থাকবে না। কে কী নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছে, সবকিছু নিজেই বুঝতে সমর্থ হবে।

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতসমূহে প্রথম ফুৎকারের সময় সংঘটিত হবে এমন ছয়টি কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর পরকালের সময় হিসেবে চল্লিশ বছর অথবা এর অধিক সময় অতিবাহিত হলে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। তখন প্রথম ফুৎকারে মৃত্যুবরণকারী সমস্ত মৃত জীবন্ত হয়ে উঠবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সংঘটিত নিম্নোক্ত ৬টি বিষয় আলোচিত হয়েছে–

১. হাশরের ময়দানে দলে দলে জমায়েত হওয়া।
২. শিশু কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিত করার বিচার।
৩. আমলনামা খুলে ধরা।
৪. আকাশ উন্মোচিতকরণ।
৫. জাহান্নামকে নিকটবর্তী করা।
৬. আমলনামা দর্শন।

www.maktabatulabrar.com

তাফসীর

وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ **(আর যখন জনে জনে লোকদেরকে জোড় বেঁধে দেয়া হবে।)**

হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া

দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হবে। জমায়েত হওয়ার বিষয়টি ধ্রুব সত্য এবং মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে এ সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। আলোচ্য সাত নং আয়াতেও এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মুফাস্সিরগণ মত পোষণ করেছেন। অবশ্য অনেকে ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নরূপ:

● মুফাস্সির শা'বী, ইকরামা, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও আবূল আলিয়ার মতে ৭ নং আয়াতের অর্থ হচ্ছে–

قرنت الارواح بالاجساد .

রূহসমূহকে শরীরের সাথে সন্নিবেশিত করা হবে।

● সমস্ত মানবগোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত হবে। একদল হবে আপরাধীদের আর একদল হবে নেকবান্দাদের। সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মতটি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।' এই নির্দেশের ফলে সর্বপ্রকারের অপরাধী একত্রীভূত হবে এবং নেককারগণ এক সাথে একত্রীভূত হবেন।

● হযরত ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতবাসীগণ তিন দলে বিভক্ত হবে। অপর পক্ষে আছহাবুল ইয়ামীন (ডান দিকের দল) একদল হবে। অপর পক্ষে আছহাবুল মাশ্আমা (বাম দিকের দল) একদল হবে। সূরা ওয়াকিয়ার আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রা.) এই ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ওয়াকিয়ার আয়াতসমূহও তেলাওয়াত করেন। বস্তুত যে ব্যক্তি যে দলের বিবেচিত হবে, তাকে সেই দলের সাথে একত্রীভূত করা হবে।

● অনেকের মতে, প্রত্যেক লোককে তার নেতার সাথে একত্রিত করা হবে। যথা– যাদের সম্পর্ক রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে ছিল, তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে, যাদের সম্পর্ক সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকদের সাথে ছিল, তাদেরকে সেই সাথিদের সাথে, যাদের সম্পর্ক উলামা-মাশায়েখ, কারী, হাফেজ, মুফতী, মুহাদ্দিসের সাথে ছিল, তাদেরকে তাদের সাথে মিলিত করা হবে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেছিলেন 'তুমি হাশরের ময়দানে তার সাথে হবে যাকে তুমি পৃথিবীতে ভালবেসেছ।' অপর এক হাদীছে ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক লোকই হাশরের ময়দানে তার সাথি হবে যাকে সে ভালবেসেছে।' এ ধরনের হাদীছ দ্বারা এ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়।

● অনেকের মতে যে লোক যে সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি গ্রহণ করবে, তাকে সেই সম্প্রদায়ের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। যেমন, যে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, হিন্দু বা নাস্তিক এর রীতি-নীতি গ্রহণ করবে, তাকে তাদের সাথে, আর যারা মুসলমানদের রীতি-নীতি গ্রহণ করবে তাদেরকে মুসলামনদের সাথে মিলিত করা হবে। বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এ মতটি প্রমাণিত হয়।

● অনেকের মতে প্রত্যেক লোককে তার পথপ্রদর্শকের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। যথা কাদিয়ানী, বাহায়ী, যিক্‌রী, শিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক ভ্রষ্ট লোককে তার সাথে জুড়ে দেয়া হবে, যে তাকে ভ্রষ্ট করেছে। আর যারা সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদেরকে তাদের পথ প্রদর্শনকারীদের সাথে মিলিত করা হবে। ভাল-মন্দ পীর-মাশায়েখগণও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ .

অর্থাৎ, যে দিন প্রত্যেক মানুষকে তাদের নেতার সাথে আহ্বান করব। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এই মতটি প্রমাণিত হয়।

● অনেকের মতে একজনকে আরেকজনের সাথে আমল-আখলাক, তাহযীব-তামাদ্দুনের ভিত্তিতে একত্রিত করা হবে। যথা মু'মিনদেরকে মুমিনের সাথে। আবার মু'মিনদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর হবে। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণেরও একটা স্তর থাকবে। তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবেন। ছিদ্দীকীন ও শহীদগণের স্তর থাকবে। বিভিন্ন নেক আমল যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, ইলমে মারেফাত, হাদীছ, ফেকাহ, ফাতওয়াহ প্রভৃতি যার মধ্যে যে গুণের আধিক্য থাকবে তাকে সেইগুণে গুণান্বিত লোকের সাথে একীভূত করা হবে। অপর দিকে শির্‌ক, নেফাক, বিদআত, হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া, গীবত, কুৎসা, অন্যের অধিকার হরণ, যেনা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মদ, জুয়া, হত্যা, লুণ্ঠন, সুদ-ঘুষ প্রভৃতি যার মধ্যে যে অপরাধের আধিক্য থাকবে তাকে সেরূপ লোকের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। হযরত উমর ফারূক, ইবনে খাইছাম এবং যুজাজ থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে।

● হযরত ইবনে আব্বাস, মুফাস্‌সির আতা ও মুকাতিলের মতে জান্নাতীদেরকে হূরদের সাথে এবং জাহান্নামীদেরকে শয়তানের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। বাহ্যত উপরোক্ত মতামতগুলোর মধ্যে বিরোধ আছে মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মূলত এগুলোর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নেই। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মূলত ফুৎকারের পর প্রথমত শরীরের সাথে আত্মার জোড় সৃষ্টি হবে, এর পর সকলেই হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে।

সূরা গাশিয়ার মর্মানুযায়ী হাশরের ময়দানে সমবেত সমস্ত মানুষ দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হবে। একটি হবে বদকারদের আর একটি নেককারদের। আবার বদকারদের মধ্যে আকীদা আমলের ভিত্তিতে অসংখ্য দল হবে। এমনিভাবে নেককারদের আকীদা আমলের ভিত্তিতে অসংখ্য দল হবে।

কাফেরদের দল উপদল

কাফেরদের মধ্যে আকীদার পার্থক্যের কারণে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক, অগ্নিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, কাদিয়ানী, বাহায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দল সৃষ্টি হবে। হত্যা, ঘুষ, সুদ, মদ, জুয়া ব্যভিচার, হিংসা পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি আমলের ভিত্তিতেও বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হবে।

মুসলমানদের দল উপদল

মুসলমানদের মধ্যে আকীদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হবে। খাঁটি মু'মিনদের হবে প্রধানত তিনটি দল। (১) আছহাবুল ইয়ামীন, (২) আছহাবুল মাইমানাহ, (৩) মুকাররাবুন। এর মধ্যে নবীদের জামাত হবে ভিন্ন। এমনিভাবে ছিদ্দীকীন, শহীদ এবং ছালিহীনদের ভিন্ন ভিন্ন জামাত হবে।

www.maktabatulabrar.com

আবার এ সবগুলোর মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস ঘটবে। আমলের আধিক্যের ভিত্তিতে নামাযী রোযাদার, হজ্জ পালনকারী, যাকাত দাতা, সাধারণ দানকারী, মুজাহিদ, হাফেজ, ক্বারী, আলেম, মাশায়েখ, ছাত্র, শিক্ষক, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি হবে। হাশরের বিচার শেষে জান্নাতীগণ জান্নাতে হূরদের সাথে মিলিত হয়ে চির সুখের জীবন লাভ করবে। অপরদিকে অপরাধীরা শয়তানের সাথে মিলিত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামে কঠোর শাস্তির অধিকারী হবে। মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন অবস্থা এবং রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের কোন কোনটিকে উল্লেখ করেছেন। মূলত তাদের বক্তব্যে কোন বিরোধ নেই। হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাব বায়হাকী, মুস্তাদরক, ইবনে আবী হাতেমসহ অন্যান্য কিতাবসমূহে বর্ণিত নুমান ইবনে বাশীরের হাদীছ দ্বারা আমাদের এ পর্যালোচনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে জারীর, দুররুল মানছুর, রূহুল মাআনী, মাযহারী, আবুস সুউদ, ইবনে কাছীর, কাবীর, তানতাবী ইত্যাদি কিতাবসমূহেও এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

আত্মার সংযোজন

ইতোপূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ফুৎকারের পর শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্ক হবে। অথচ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময়, কাফন পরিধানের সময়, কবরের প্রশ্নোত্তরের সময় এবং বরযখের দীর্ঘ সময়েও শরীরের সাথে আত্মার সংযুক্ত থাকার কথা অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আত্মার সংযোজন পূর্বেই সাধিত হয়; তবে আত্মার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কম বেশি হতে পারে। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর আত্মার সাথে অধিক পরিমাণে ক্রিয়া ও শক্তি সংযোজিত হবে। যেমন: মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে, তখনও মানুষের শরীরের সাথে আত্মার পুরাপুরি সম্পর্ক থাকে, কিন্তু জাগ্রতাবস্থার মত নয়। বস্তুত উভয় অবস্থায় শরীরের সাথে আত্মার সংযোজন থাকে, কিন্তু সর্বাবস্থায় আত্মার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমান থাকে না। তদ্রূপ দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী সময় আত্মার প্রক্রিয়া তুলনা মূলক বৃদ্ধি পাবে। সেমতে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে এই বর্ধিত প্রক্রিয়াকে রূপক অর্থে আত্মা সংযোজন বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থান

পাপীদের আত্মা সিজ্জীনে এবং নেককারদের আত্মা ইল্লীনে থাকার কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং কবর এবং হাশরের ময়দান অতঃপর জাহান্নাম বা জান্নাতে অবস্থানের কী অর্থ? মেরাজের ঘটনায় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আসমানে হযরত আদম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। আমি দেখলাম তিনি বামদিকে তাকিয়ে দুঃখিত হলেন, আর ডানদিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন। পরে জানতে পারলাম, তার বাম দিকে গোনাহগারদের আত্মা রয়েছে। তাদেরকে দেখে তিনি দুঃখিত হন। আর ডানদিকে নেককারদের আত্মা রয়েছে তাদেরকে দেখে তিনি আনন্দিত হন'(বুখারী শরীফ- ৫০/১) কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয়, আত্মাসমূহের ইল্লীনে অথবা সিজ্জীনে থাকার কথা পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। গোনাহগারদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং হযরত আদম

(আ.) তাদেরকে অসমানে দেখলেন কী করে। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন,

يحتمل ان يقال النسيم الرئية لا تدخل الاجساد بعد وهى مخلوقة قبل وستقرها عن يمين ادم وشماله لاى ان قال بخلاف التى انتقلت من الاجساد الخ

অর্থাৎ, বলা সম্ভব যে, যে আত্মাসমূহ হযরত আদম (আ.) তার ডানে-বামে দেখে আনন্দিত ও দুঃখিত হয়েছেন, তা শরীর তৈরীর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, তবে এখনো শরীরে প্রবেশ করেনি। এগুলোর অবস্থান হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর ডান ও বাম পার্শ্বে। আর যে আত্মা শরীর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তার গন্তব্যস্থল জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছেছে, সেটা এখানে উদ্দেশ্য নয়। (ফাতহুল বারী-৩২৫/১)

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের একাধিক আত্মা রয়েছে। স্থান-কালের ভিত্তিতে এই আত্মাসমূহের প্রক্রিয়া প্রকাশ পায় অথবা সংযোজন সাধিত হয়। তাফসীরে মাযহারীতে পাঁচ প্রকার রূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (মাযহারী)। কিন্তু তার পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। বিষয়টি নিঃসন্দেহে দলীল-প্রমাণের দাবি রাখে। তদুপরী কাজী আয়ায (রহ.) ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-সহ অন্যান্য হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতামত একেবারেই ভিন্ন। (দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা- ৭১/১)

রূহের সংযোজন পদ্ধতি

প্রসিদ্ধ মতানুসারে রূহের সত্তা মাত্র একটি। একে অনেকেই রূহে আযম নামে আখ্যা দিয়েছেন। একই সময় বিভিন্ন স্থলে এর প্রক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পাওয়াটা অযৌক্তিক নয়। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একই সুইচের সাথে সংযোজিত একাধিক বৈদ্যুতিক পাখা এবং বাল্ব বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে সুইচে টিপ দিলে সমস্ত পাখা এবং বাল্বসমূহে বিদ্যুতের প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে রূহ একই স্থানে থেকে কবর, ইল্লীন ও সিজ্জীনে প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বৈদ্যুতিক সম্পর্কের জন্য তারের মাধ্যম প্রত্যক্ষ করা যায়, অথচ রূহের বেলায় কোন প্রকার মাধ্যম দৃষ্টিগোচর হয় না। এর উত্তরে বলা যায়, সর্বক্ষেত্রে মাধ্যমের দৃষ্টি গোচর হওয়া জরুরী নয়। যেমন সূর্য, নক্ষত্রসহ সমগ্র পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে সংযুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ দেখা যায় না। অনুরূপ লৌহকণা বিভিন্ন পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে ছড়িয়ে থাকলে চুম্বক সেই ছড়িয়ে থাকা কণাসমূহে স্বীয় প্রক্রিয়া বিস্তারে সক্ষম। তদ্রূপ মানবদেহ মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও সেই ছড়িয়ে থাকা দেহের অংশে রূহ স্বীয় প্রভাব এবং প্রক্রিয়া সৃষ্টিতেও সুসক্ষম। এটা অযৌক্তিক কোন বিষয় নয়।

وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ. بِاَىِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ **(আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ শিশু কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী আপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে?)**

তাফসীর

জীবন্ত কবর দেয়া

এ আয়াতে আরব জাহিলিয়াতের এক জঘন্য অপরাধের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তারা নিজেদের কন্যা শিশুদের বিনা দ্বিধায় কবরস্থ করত। এ ব্যাপারে না ছিল কোন আইনগত বাধা, না মানবিকভাবে এটাকে তারা অপরাধ মনে করত। কখনো তারা মরুভূমিতে গর্ত করে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় গর্ভবতী মহিলাকে সেই গর্তের নিকট নিয়ে যেত। যদি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হত, তাহলে খুশি মনে তাকে নিয়ে আসত। আর যদি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হত, তাহলে তাকে সুসজ্জিত করে সুগন্ধি দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখত। অনেক সময় সন্তান নিজ গৃহেই প্রসব করত। কন্যা প্রসব করলে তাকে পাঁচ ছয় বছর লালন-পালন করে জীবন্ত কবরস্থ করত। প্রশ্ন হলো, এ অমানুষিক অপরাধের সূত্রপাত হয়েছিল কী কারণে? গোত্র প্রধান 'রবিয়া'-এর মাধ্যমে এ অপরাধের সূত্রপাত হয়। ঘটনার বিবরণে মুফাস্সির আলূসী লেখেন, গোত্রীয় আক্রমণে 'রবিয়ার' কন্যা অপহরণ করা হলে সন্ধির পর অপহৃত কন্যাকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু কন্যা পিতার নিকট ফিরে আসতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কন্যার এহেন আচরণে লজ্জিত পিতা ক্ষিপ্ত হয়ে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করণের হুকুম জারী করে, যাতে আর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। তখন এটা গোত্রীয় অভিমান ও ক্ষোভের ভিত্তিতে হলেও পরবর্তীকালে সমগ্র আরবজাহানে এর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ভঙ্গুর আইনের প্রতিফল

জাতীয় সমস্যাবলির সমাধানের লক্ষ্যে এবং অধীনস্থদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ একটা স্বীকৃত উপায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সুচিন্তা এবং নিরপেক্ষ বিবেচনার গুরুত্ব অপরিসীম। অস্বাভাবিক অবস্থা ও সুচিন্তা বিবর্জিত পন্থায় প্রণীত আইন মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। আনতে পারে না আইনের স্থায়ী গতি। কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও জাতিকে এর ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত দিতে হয়, কলংকিত হয় গোটা জাতি। এজন্যই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধের অবস্থায় বিচার কার্য চালাতে নিষেধ করেছেন। রবিয়া গোত্রপ্রধানের জীবন্ত শিশু কন্যাদেরকে কবরস্থকরণ আইনের অশুভ এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে আমাদের উপর্যুক্ত বক্তব্যের যথার্থতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আইন পরবর্তী সময়ে সর্বস্তরে স্বীকৃত না হলেও এর বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞাও আরোপিত হতে পারেনি; বরং বিভিন্ন অজুহাতে জীবন্ত শিশুকন্যা কবরস্থকরণ অপরাধটি অবাধে সংঘটিত হতে থাকে। ফলে ইতিহাসে আরব জাতির ভাগ্যে এক ন্যাক্কারজনক অধ্যায় রচিত হয়।

জীবন্ত কবরস্থকরণের কারণসমূহ

পরবর্তী সময় যেসব অজুহাতে শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হতো, তার মধ্যে অন্যতম কারণসমূহ নিম্নরূপ:

ক. তারা এই বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যাসন্তান। সুতরাং কন্যাসন্তান কেবল আল্লাহর পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেয়া হতো।

www.maktabatulabrar.com

খ. তারা কন্যাসন্তানদেরকে বংশের জন্য অপমান এবং কলংক মনে করত। তাদের দ্বারা কোন উপকার তো হতে পারেই না, উপরন্তু তাদেরকে লালন-পালন করে অপরের হাতে তুলে দিতে হয়। জামাতা এবং তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের খাতির দারির অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে চেপে বসে। এসব চিন্তায় কন্যাশিশুদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করে তারা বিপদ মুক্ত হয়ে যেত।

গ. অর্থাভাবের কারণে অথবা ভবিষ্যতে অর্থাভাব দেখা দিতে পারে এই ভয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করে ফেলত। শেষোক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ছেলে সন্তানদেরকে কবরস্থকরণ অথবা হত্যা করণের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাভাব দেখা দিবে এই আশংকায় কন্যা এবং ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো কিনা এ বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কুরআনের এই নির্দেশ সর্তকতামূলকও হতে পারে। তবে ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা না করার পেছনে বিভিন্ন কারণও রয়েছে। তার মধ্যে তাদের দ্বারা বস্তু স্বার্থ উদ্ধারের বিষয়টি ছিল তাদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই স্বার্থবাদীরা বস্তুস্বার্থ উদ্ধার হবে– এই চিন্তায় ছেলে সন্তানদের ব্যাপারে নমনীয়তা পোষণ করত। মোটকথা জীব-জানোয়ারেরও শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, কিন্তু কন্যাসন্তানদের কোন প্রকার নিরাপত্তা এবং অধিকার ছিল না। নারীরা ছিল জীব-জন্তু এবং পশুর চেয়েও অধম। কুরআনের ভাষায়–

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ .

কন্যাসন্তান প্রসবের সংবাদে তাদের চেহারা কাল-মলীন হয়ে যেত। (সূরা নাহ্‌লঃ ৫৮)

নারীমুক্তি অভিযান

ইসলামই সর্বপ্রথম নারী সমাজকে এহেন অপমান এবং নির্যাতন থেকে মুক্ত করে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা তুলনাহীন এবং নজীর বিহীন। নারী মুক্তির অভিযানে ইসলামের অন্যতম অবদান ছিল নিম্নরূপ–

১. আকীদার পরিশুদ্ধি

আকীদা এবং বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি ব্যতীত মানুষের মৌলিক পরিশোধন করা যায় না। ইসলাম পরিশুদ্ধি অভিযানে আকীদার সংশোধনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। আর তাই নারীদের বিষয়েও ইসলাম গণ্ডমূর্খ আরবদের ভ্রান্ত আকীদা পরিশোধনের প্রচেষ্টা করেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদে তিন প্রকার যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ .

আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছে? (সূরা সাফফাতঃ ১৫০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ .

তারা আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে গণ্য করেছে। এরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (সূরা যুখরুফঃ ১৯)

কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করলে অবশ্যই তাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা যায়, কিন্তু এরা তাদের আদৌ প্রত্যক্ষ করেনি। সুতরাং তারা ফেরেশতাদেরকে কী করে নারীরূপে গণ্য করে?

জ্ঞানের দৃষ্টিতেও আরব মূর্খদের এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, নারীদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করা মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষে কী করে ন্যায়সংগত হতে পারে? এজন্যই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, (তিনটি আয়াত লক্ষ্য করুন।)

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْاُنْثٰى . تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى .

তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান? এতো অসঙ্গত বণ্টন! (সূরা নাজ্‌মঃ ২১-২২)

اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ .

তবে কি আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান আর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান? (সূরা তূরঃ ৩৯)

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا .

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ছেলেসন্তানের জন্য নির্বাচন করেছেন, আর তিনি নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমাদের বক্তব্য সত্যিই ভয়াবহ। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৪০)

সত্যবাদীর সংবাদ দ্বারাও অজানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু তাদের নিকট এ ধরনের কোন কিছু ছিল না। আসমানী কিতাব এবং ওহীর মাধ্যমেও এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাদের নিকট এরূপও কোন কিছু ছিল না। সুতরাং সাব্যস্ত হয়, তাদের এই দাবী নিছক বোকামী এবং মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

তবে কি আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান আর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান? তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে কি? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের কিতাব পেশ কর। (সূরা সাফফাতঃ ১৫৬-১৫৭)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা হলে তাদের মা কারা? জবাবে তারা বলেছিল, 'জ্বিন সরদারদের কন্যাগণ'। মূলত তাদের এই আকীদা ইয়াহুদীদের প্রবঞ্চনার ফল। জুহাইনা, কেনানা, খুযাআ, বনী সালামা, আবদুদদার এবং বনী মুলাইহ্ গোত্রের লোকদের আকীদা ছিল যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘটক হয়ে জ্বিন কন্যাদেরকে বিবাহ করেন এবং তাদের গর্ভে ফেরেশতাগণ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। তাদের অনেকেই মহান রব্বুল আলামীনকে শয়তানের ভাই মনে করত। নাউযুবিল্লাহ!

www.maktabatulabrar.com

তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ جَعَلُوْا بَيْنَه وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ. سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ .

তারা আল্লাহ এবং জিন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকে (শাস্তির জন্য) হাজির করা হবে। এদের বক্তব্য থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। (সূরা সাফফাত: ১৫৮–১৫৯)

আল্লাহ এভাবে তাদের ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মূল করেছেন। নারীগণও মানুষ। তারা পুত্র সন্তানদের মতই সম্মানী। তাদের রয়েছে মানবতার ন্যায্য অধিকার। এ কথা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। নারী পুরুষের ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ قُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ .

আমি বললাম, হে আদম, তুমি তোমার স্ত্রী (হাওয়া [আ.]) কে নিয়ে জান্নাতে বসবাস কর। (সূরা বাকারা: ৩৫)

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে পাঠায়ে দিলেন। কিন্তু তিনি জান্নাতে পরিপূর্ণ শান্তির ভিতর থেকেও খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই মহান আল্লাহ পাক হযরত আদমের অংশ থেকেই বিশ্বের প্রথম মহিলা হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করে হযরত আদমের সঙ্গীনী করে দেন এবং বিশ্বমানবের পিতা হযরত আদম চরম শান্তি ও স্বস্তি লাভে ধন্য হন। এখান থেকে শুরু হয় মানব জাতির ইতিহাস। যে নারী জাতির মাধ্যমে পুরুষের জীবনে শান্তি অর্জিত হয়, সে নারী জাতি অবশ্যই সম্মান পাওয়ার অধিকারী। তারা কী করে এতো অবহেলিত হতে পারে? নারী পুরুষ উভয়কে ভিত্তি করেই আল্লাহ পাকের বিরাট রহস্যময় পৃথিবী। নারী ও পুরুষ উভয়কে ভিত্তি করেই শত সহস্র বংশধর এবং গোত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً .

হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে অসংখ্য পুরুষ এবং মহিলা ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিছা: ১)

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ .

হে মানব, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী, যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত: ১৩)

www.maktabatulabrar.com

এই দুই আয়াতে নারী পুরুষ অভিন্ন এবং গভীর সম্পর্কে সম্পৃক্ত বলে ধারণা দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ধারণা দিয়ে ক্ষান্ত করা হয়নি বরং তাদের ন্যায্য অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২. নারীর অধিকার

● ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম পূর্ব যুগে পিতা এবং স্বামীর সম্পদে নারীর কোন অধিকার ছিল না। নারীদের জন্য পিতা-মাতা এবং স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকার বাধ্যতামূলক– এ আইন ইসলামেরই তুলনাহীন অবদান। কুরআন-হাদীছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

● নারীদেরকে ধর্ষণ, ব্যভিচার ও যৌন ভোগের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ন্যায্য মহরানা এবং সার্বিক নিরাপত্তার শর্তে বিবাহ-শাদির বৈধ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

● নারী হত্যা এবং নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী পুরুষদের প্রতি "কেসাস" (মৃত্যুদণ্ড) 'হদ্দে কাযফ' এবং 'লেআন'-এর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

● স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দিলে এবং তৃতীয় পক্ষের শালিসও ব্যর্থ হলে খোলা তালাক এবং কাজীর রায়ের মাধ্যমে স্ত্রীকে পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

● প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, তালাকপ্রাপ্তা অথবা প্রথম বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

● মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় যুদ্ধ এবং জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষণাবেক্ষণেও অধিকার দেয়া হয়েছে। মোটকথা, নারী সমাজের জন্য উপযোগী তাদের সার্বিক সুবিধা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ইসলাম করেছে, যা আধ্যাবধিও কোন মতবাদ বা কোন থিউরি করতে পারেনি।

৩. নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে মর্যাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। সম্মান এবং মর্যাদার প্রশ্নে স্ত্রী স্বামীর তুলনায় কোন অংশে খাট নয়। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধা-ভক্তি, মায়া-মমতা এবং অধিকারের আলোচনার পাশাপাশি, মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, মায়া-মমতা এবং অধিকারের বিষয়ে সমপরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; বরং পিতার তুলনায় মাকে অধিক উচ্চ আসনে সমাসীন করা হয়েছে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الجنة تحت اقدام الامهات .

(সন্তানদের) জান্নাত মাতাদের পায়ের নীচে।

এক হাদীছে মায়ের প্রতি তিন বার এবং পিতার প্রতি একবার রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ করা হয়েছে।

কন্যাসন্তান পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের ওসীলা।

● স্ত্রীকে স্বামীর চরিত্রের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خير كم خير كم لاهله .

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।

সতী স্ত্রীকে বস্তুজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলে ঘোষণা করে তাদের প্রতি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহ-মমতার কথা বলেছেন।

এক হাদীছে চারটি বিষয়কে সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করে নেক স্ত্রীকে স্বামীর সার্বিক সফলতার ভিত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে নারীদের সম্মান এবং মর্যাদার বিধান রচনা করে পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা হয়েছে, যাতে নারীদের সম্পর্কে তাদের মনে যে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের মনোভাব ছিল তা দূরীভূত হয়ে যায়।

অর্থাভাবে নারী হত্যা প্রসঙ্গ

রিযিকের মালিক আল্লাহ। তিনি সমস্ত জীবের খোরাকের ব্যবস্থা করে থাকেন। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا .

যমীনে বিচরণকারী সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।

লক্ষ-কোটি সৃষ্টির খোরাক যিনি যোগাতে পারেন, তিনি কি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির খোরাক যোগাতে অক্ষম। মোটেই নয়; বরং তিনি সুসক্ষম। (সূরা হুদ: ৬)

لَه مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ .

আসমান ও যমীনের কুঞ্জিসমূহ তারই। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন অথবা সংকুচিত করে দেন। (সূরা শূরা: ১২)

সুতরাং অর্থাভাবে অথবা ভবিষ্যতে অর্থাভাবের কাল্পনিক আশংকায় সন্তানদেরকে হত্যা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এজন্য যদি দায়ী করতে হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা এবং জন্মের ওসীলা হিসেবে পিতা-মাতাকে দায়ী করা যায়। অথচ কোনভাবেই তা করা সংগত নয়। সুতরাং নবাগত শিশুদেরকে দায়ী করার কী যৌক্তিকতা আছে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ .

তোমারা তোমাদের সন্তানদেরকে (অর্থাভাবের ভয়ে) হত্যা করো না, তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। (সূরা আনআম: ১৫১)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ .

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে (ভবিষ্যৎ) অভাবের ভয়ে হত্যা করো না। তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৩১)

www.maktabatulabrar.com

মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক, সুতরাং আল্লাহ পাকই তাদের মালিক। মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করতে পারে না। তাই মানুষকে হত্যা করা আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। এটা কেবলমাত্র অনধিকার চর্চাই নয়; বরং ধ্বংসের কারণও বটে। আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। এ মর্মে চারটি আয়াত লক্ষ্য করুন–

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ . اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ . ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ .

আমিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করো না? তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে চিন্তা করেছ? বীর্যকে তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি?। (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৫৭-৫৯)

এখানে বোঝানো হয়েছে, আমার সৃষ্টিকৃত বীর্যকে নষ্ট করার অধিকার তোমাদের নেই, অতএব বীর্য থেকে সৃষ্ট মানুষকে হত্যা করার অধিকার তোমাদের কী করে হবে?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ . ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ . لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ .

তোমরা যে বীজ বপন করে থাক, সে সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেছ কি? এই বীজকে তোমরা অঙ্কুরিত করে থাকো, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে এগুলোকে খড় কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা কেবল হতবুদ্ধি হয়ে থাকবে। (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৬৩-৬৫)

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ . ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ . لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ .

যে পানি তোমরা পান করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ কি? মেঘ থেকে পানি তোমরা বর্ষণ কর, না আমি করে থাকি? আমি ইচ্ছা করলে সে পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৬৮-৭০)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ . اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا . فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا . وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا . وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا . وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا . وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا . مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ .

মানুষ তাদের খাদ্যদ্রব্যাদির প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি (এই খাদ্য উৎপাদনের জন্য) প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর আমিই যমীনে ফাটল সৃষ্টি করে থাকি। সেখান থেকে শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যাইতূন, খেজুর, বৃক্ষ ভরা বাগান, ফলমূল এবং গবাদি খাদ্য আমিই উৎপন্ন করে থাকি– তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা: ২৪-৩২)

সুতরাং খাদ্যের বর্তমান অভাব কিংবা ভবিষ্যৎ অভাবের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা অথবা জীবন্ত কবরস্থ করা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে দোষারোপ করার শামিল এবং এতে আল্লাহকে অক্ষম বলে দাবী করা হয়। শুধু তাই নয়, এতে প্রকারান্তরে আল্লাহকে দায়িত্ব পালনে উদাসীন এবং ব্যর্থ মনে করে নিজকে মহাব্যবস্থাপক সাব্যস্ত করা হয়। এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আর কুফর মানুষকে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতে আল্লাহর রহম, দয়া-মায়া থেকে মাহরূম করে চির

জাহান্নামী করে দেয়। এভাবে ইসলাম অর্থাভাবের অজুহাতে নারী নির্যাতন এবং সন্তান হত্যার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে।

বিচারের মূল বিষয়বস্তু কী হবে

আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মহান রব্বুল আলামীনের আদালতে জীবন্ত কবরস্থকারীদের বিচারের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারের মূল বিষয়বস্তু হবে হত্যার কারণ অনুসন্ধান। এ সম্পর্কে মুফাস্সিরদের মতামত নিম্নরূপ–

ক. শিশুকন্যারা হত্যাকারী পিতা-মাতাকে হত্যার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে।

খ. শিশুকন্যারা আল্লাহ পাকের নিকট তাদের হত্যার কারণ জানতে চাইবে। রূহুল মাআনীতে এই মতটি উদ্ধৃত হয়েছে।

গ. শিশুকন্যাদেরকেই তাদের হত্যার কোন কারণ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হবে। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের মতামত।

আয়াতের মধ্যে প্রত্যেকটি অর্থের অবকাশ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আলী, হযরত জাবের, রাবী' ইবনে খাইছাম, ইবনে ইয়া'মুর, মুজাহিদ, আবুদ্দুহা এবং মুসলিম ইবনে ছুবাইহের কেরাতে سُئِلَتْ -এর স্থলে سَأَلَتْ পড়া হয়ে থাকে। এই কেরাত মোতাবেক প্রথম দুইটি মতামতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী শেষোক্ত মতটির পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। কন্যাদের মাতা-পিতাকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে জুলুম এবং অপরাধ সম্পর্কে মাতা-পিতাকে আতংকিত করা। আর শিশু কর্তৃক আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে তার নিকট জুলুমের ফরিয়াদ পেশ করা এবং তার নিকট বিচার প্রার্থনা করা। হযরত ইবনে আববাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان المرأة التى تقتل ولدها يأتى يوم القيامة متعلقا ولدها بثديها ملطخا بدمائها فيقول يارب هذه امى قتلتنى .

সন্তান রক্তাক্তাবস্থায় হত্যাকারিনী মায়ের স্তনের সাথে লটকে থেকে কেয়ামতের ময়দানে ফরিয়াদ করবে যে, হে আমার রব, আমার মা আমাকে হত্যা করেছে।

হযরত জাবের এবং আবূ সালেহের রেওয়ায়েতে পিতার কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর শিশু কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে তাদের হত্যাকারী আসামী এবং অপরাধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা। কেননা,

ক. আসামীর সম্মুখে নির্দোষ ফরিয়াদীকে জুলুমের কারণ জিজ্ঞাসা করলে অপরাধীর অন্তরে স্বীয় অপরাধের অনুভূতি জাগে, ফরিয়াদীর প্রতি অহেতুক জুলুম-অত্যাচারের জন্য পরিতাপ সৃষ্টি হয় এবং শাস্তির যৌক্তিকতা বুঝে আসে।

খ. অপরাধীর প্রতি বিচারকের চরম অসন্তুষ্টি এবং ক্ষোভ প্রমাণিত হয়। এতে ফরিয়াদির প্রাণে স্বস্তি ও শান্তি বোধ হয়।

www.maktabatulabrar.com

গ. ফরিয়াদীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করারও বিধান আছে। কারণ ফরিয়াদীর দাবী অযৌক্তিক হলে বিচারকার্য স্থগিতকরণের মাধ্যমে বিচারের ধারা পরিবর্তণ হতে পারে। অথবা ফরিয়াদির বক্তব্য শ্রবণের পরে অপরাধীর স্বীকারোক্তির ফলে অন্য কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, শিশুকন্যাদের হত্যার বিষটি এমন নয়। কারণ, তারা যে নির্দোষ, তা আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন। সুতরাং এখানে ফরিয়াদীর দাবীর অযৌক্তিকতা অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তির কোন ফলাফল নেই। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিচারকের জন্য স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা বিচার বিধানের পরিপন্থি। আর পরিপন্থি বলেই হাশরের ময়দানে বিচারাদালতের ব্যবস্থা করা হবে। কেবল বিচারকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করা গেলে হাশরের ময়দানে সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে বিচারের প্রয়োজন হতো না। কারণ, আল্লাহ পাক সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবেই পরিজ্ঞাত। তবে অপরাধীকে আদালতের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত করা ব্যতীত শাস্তি প্রদান করা যায় না। এজন্যেই আয়াতের মধ্যে হত্যার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হত্যা সংগত কারণেও হতে পারে। যেমন যিনার কারণে, মুরতাদ হওয়ার কারণে, অন্যকে হত্যার কারণে ইত্যাদি। কাউকে হত্যা করা হলে তার বদলে তাকে হত্যা করাকে শরীয়তের বিধানে 'কেসাস' বলা হয়। কেসাস দণ্ডে দণ্ডিত করা মোটেই অপরাধ নয়।

কাফেরদের বিচার করে লাভ কী?

উপরে উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, কাফের এবং বিধর্মীদের বিভিন্ন অপরাধেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে। অথচ এ বিচারের কোন বাস্তব ফলাফল উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, কাফেররা ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে বেঈমানীর অপরাধেই চিরস্থায়ীভাবে আযাবে পতিত হবে। অপর পক্ষে নির্দোষ সাব্যস্ত হলে তাদের জন্য মুক্তি বা জান্নাত লাভের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এই বিচারের ফলাফল কী? তাদের বিচার করে লাভ কী?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বুখারী শরীফসহ হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আবূ তালিব এবং আবূ লাহাবের এহসান ও দয়া-মমতার কারণে তাদের প্রতি আযাবকে লঘু করা হবে। কিন্তু তারা মুক্তি পাবে না। কারণ, কুফরীর কারণে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তবুও বাহ্যিক নেকির কারণে তাদের প্রতি আযাবের কঠোরতাকে কমিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে বিচারের পরে শাস্তির হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে বিচারের যথাযথ ফলাফর নির্ণিত হবে। অতএব কাফেরদের বিচারও ফলাফল শূন্য নয়। আরও একটি উল্লেখ করার রয়েছে, তা হল বালেগ কাফেরদের জন্য জাহান্নাম সুনিশ্চিত হলেও কাফেরদের না-বালেগ সন্তানদের ব্যাপারটি তেমন নয়। নিম্নে কাফেরদের না-বালেগ সন্তানদের হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

কাফেরদের না-বালেগ সন্তানদের হুকুম

মু'মিনদের নাবালেগ সন্তানগণ জান্নাতী। এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে কাফের এবং বিধর্মীদের না-বালেগ সন্তান-সন্ততি জান্নাতী, না জাহান্নামী– এ প্রশ্নটি খুবই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। আর

এ কারণে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ওলামা মাশায়েখদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মতবিরোধ সৃষ্টির একটি বিশেষ কারণ এই যে, নিছক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এ ধরনের কঠিন মাসআলাসমূহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে কুরআন হাদীছের অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও দিক নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। জান্নাত লাভের উপায় ও জাহান্নামী সাব্যস্ত হওয়ার কারণ ও মূল ধারাসমূহ সম্পর্কে মৌলিকভাবে আলোচনা পর্যালোচনা পবিত্র কুরআন হাদীছে বিদ্যমান রয়েছে। মু'মিন এবং আমলের অধিকারীগণ অবশ্যই জান্নাত লাভে সৌভাগ্যবান হবে। আর বেঈমান, পাপাচারীরা অবশ্যই জাহান্নামী হবে। মু'মিন ফাসেক-ফাজেরদের বিষয়টা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন হবে– একথাও শরীয়তের মূলধারায় সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। শরীয়তের মূলধারাসমূহের ভিত্তিতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর হাবীব হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ। অথচ আলোচ্য মাসআলাটির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছসমূহ পরস্পর বিরোধী।

এ সম্পর্কে হযরত আনাস, ইব্নে আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী, মুয়ায ইব্নে জাবাল, বারা' ইবনে আযিব, খাদীজাতুল কুবরা, আয়েশা সিদ্দীকা ও খানসা বিনতে মুআবিয়া প্রমুখ সাহাবী এবং সাহাবিয়াগণের হাদীছ বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীছসমূহের পরস্পর বিরোধের কারণে ওলামা-মাশায়েখ এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। (কুরতুবী) এ সম্পর্কিত মতামতসমূহ নিম্নরূপ–

১. অনেকে মনে করেন, এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করাই ভাল। কারণ, হাদীছের পরস্পর বিরোধের ফলে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এ সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই অপছন্দ করতেন।

২. অনেকের মতে তাদের বিষয়টি রব্বুল আলামীনের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে জান্নাতেও দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। এই দুটি মত হযরত ইবনে মুবারক, হাম্মাদ, সুফিয়ান ইব্নে উয়াইনা, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক ও ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩. অনেকের মতে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন, তারা বেঁচে থাকলে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করতো, বালেগ হয়েও অসৎ পথ অবলম্বন করতো না, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক জান্নাত দান করবেন। আর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন যে, তারা বেঈমান হয়ে মৃত্যু বরণ করত তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মিরকাত (শরহে মিশকাত) গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী এই মতটি উল্লেখ করেছেন। (লামে'– ৩৮৯/৪)

৪. অনেকের মতে হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাক তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দান করবেন। যারা আগুনে প্রবেশ করবে, নির্দেশ মানার ফলে তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাত দান করবেন আর যারা আগুনে প্রবেশ করবে না, তারা জাহান্নামী হবে। হযরত মুআয (রা.) কর্তৃক তাবারানী গ্রন্থে এবং হযরত আনাস ও আবূ সাঈদ (রা.) কর্তৃক বাযযার গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। (কাসতাল্লানী) কিতাবুল এ'তেকাদে বায়হাকী বলেন, অনেকেই এটাকে সর্বাপেক্ষা সঠিক মত বলে মন্তব্য করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

৫. অনেকের মতে তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যস্থলে আ'রাফে অবস্থান করবে।

৬. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. বলেন, তারা মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে। হযরত ছুমামা ইবনে আশরাস থেকেও এই মতটি বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী– ১৭৫/৩)

৭. অনেকের মতে তারা জাহান্নামী। খারেজী ফেরকার অন্তর্ভুক্ত আযারিকাদের এই মতটি ইবনে হাযম উন্দুলূসী বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী)

৮. অনেকের মতে তারা জান্নাতী। বিভিন্ন হাদীছের দ্বারা এই মতটি প্রমাণিত হয়। (কাশশাফ)

ইমামদের মতামত

আল্লামা ইব্নে আবেদীন এবং ইব্নে হুমাম রহ.-এর মতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. 'তাওয়াক্কুফ' তথা নীরবতা অবলম্বনের মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আবুল বারাকাত নাসাফীর মতে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এই মত অবলম্বন করেননি বরং 'কাফেরদের নাবালেগ সন্তানরা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন'– তিনি এই মত পোষণ করতেন। হযরত আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ.- এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, উভয় মতের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তার মতে ইবনে হাজার আসকালানী হযরত ইমাম শাফেয়ীকে এই মতানুসারী বলে মনে করেন। মুহাদ্দেছ আবূ আমরাহ তামহী নামক কিতাবে হযরত ইমাম মালেককেও এই মতানুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। (ফয়যুল বারী– ৪৯৩/২) হযরত আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ. মুহাদ্দিছ আয়াযের বক্তব্যকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য ইমাম আহমদ তাদেরকে জাহান্নামী বলে মত প্রকাশ করেন। (ফাতহুল বারী– ১৯৫/৩) ইব্নে তাইমিয়া রহ. মুহাদ্দিছ আয়াযের বক্তব্য সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তিনি ইমাম আহমদের অনুসারীদের এই মত বলে স্বীকার করেছেন। 'শিফাউল আলীল' নামক কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. দাবী করেছেন যে, ইমাম আহমদের মতে তারা জান্নাতী। তিনি 'তাওয়াক্কুফ'–এর মত উল্লেখ করেছেন। (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া) এ ব্যাপারে ইমাম বোখারী রহ.-এর মত তাওয়াক্কুফ বলে হযরত কাশমীরী রহ. উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় ইমাম বুখারীর মত তাদের জান্নাতী হওয়ার। ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ.ও তাদের জান্নাতী হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন এবং এটাকেই আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের মত বলে দাবী করেছেন। (লামে'– ৩৯৭/৪)

বিভিন্ন মতামতের পর্যালোচনা

অনেক সময় ওলামা মাশায়েখ এবং ইমামদের মতবিরোধের কারণে দুর্বলমনা মানুষের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়। কারণ, তারা যা সঠিক বুঝে থাকেন তা গোপন করেন না; বরং পরিষ্কার মনে তা ব্যক্ত করেন। তারা কোন গর্হিত অথবা মনগড়া কথা বলেন না। তারা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ সত্য পথ অবলম্বন করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, তাদের ইজতেহাদ তথা গবেষণায় ভুল হতে পারে। এই ভুলের কারণে তারা ছাওয়াবের অধিকরী হন, গোনাহগার হন না। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطاء فله اجر .

যে সঠিক ইজতেহাদ করে তার দুটি ছাওয়াব লাভ হয়, আর যে ইজতেহাদে ভুল করে তার একটি ছাওয়াব লাভ হয়।

তবে হ্যাঁ, ইজতিহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়। অন্যথায় মারাত্মক গোনাহগার হতে হবে। সাধারণত আয়াত এবং হাদীছের অর্থে বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিলেই আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে। কখনো কখনো শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং রূপক অর্থ নির্ধারণে ব্যতিক্রম ঘটার কারণেও মতবিরোধ দেখা দেয়। আবার অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যেও এই বিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য বিস্তৃত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়টিতেও ওলামা-মাশায়েখ এবং আইম্মায়ে কেরামের মতবিরোধের কারণ উপর্যুক্ত ধরনেরই। এ ধরনের ক্ষেত্রে সুচিন্তা করলে অনেক সময় প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়ে যায়।

একান্ত এই আশা নিয়েই এ বিষয়ের উপর নিম্নে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত হচ্ছে।

যারা তাওয়াক্কুফ তথা নীরবতা অবলম্বন অথবা আল্লাহর ইচ্ছাধীন বা আল্লাহর জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়াকেই এ বিষয়ের সমাধানের জন্য উত্তম মনে করেছেন, তাদের সম্মুখে রয়েছে এ সম্পর্কে প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণাদির পরস্পর বিরোধিতা। আর উসূল মোতাবেক প্রমাণাদির মধ্যে প্রকৃত বিরোধিতা বিদ্যমান থাকলে সেখানে তাওয়াক্কুফ তথা নীরবতা অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু এ কথাও বাস্তব যে, কুরআন-হাদীছের মধ্যে মূলত পারস্পরিক কোন বিরোধ থাকতে পারে না। বিবেচকের বিবেচনা এবং গবেষকের গবেষণার ত্রুটিই বিরোধের কারণ হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা এবং গভীর মনোনিবেশের সাহায্যে পরস্পর বিরোধ নিরসন করে স্বীকৃত মূলধারা অনুসরণ করত সঠিক এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ থাকে। এ ধরনের প্রচেষ্টাকে দোষারোপ করা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এ কারণেই আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বকারীদের প্রমাণাদি এবং যুক্তিসমূহের পর্যালোচনার বৈধতা আমাদের নিকট ন্যায়সংগত। আর এ কারণেই প্রত্যেকটি মতামতের এক একটি করে সম্ভাব্য পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তাওয়াক্কুফকারীদের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। যেমন নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়।

(এক) যারা 'আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন' এই মতটি অবলম্বন করেছেন, তারা বোখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন–

الله يعلم بما كانوا عاملين .

তাদের বিষয় আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত।

এ হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা এবিষয়টি আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন হওয়াই বোঝায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, প্রথম দিকে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবগতি ছিল না

www.maktabatulabrar.com

বিধায় উল্লখিত মত পেশ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময় ওহীর মারফত অবগত হয়ে চূড়ান্ত রায় দিয়ে থাকতে পারেন। যেমন বিভিন্ন হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন থাকার অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, তাহলে বে-গোনাহ লোকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ না করার কথাও তো তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে এ-ও বলা যেতে পারে যে, হাদীছের যে অর্থ করে এই মত পোষণ করা হয়েছে, অনেকে হাদীছের সে অর্থ নয় বরং ভিন্ন অর্থ করেছেন, যার বর্ণনা নিম্নে করা হবে। সুতরাং এই মতটির অবকাশ থাকলেও সেটা চূড়ান্ত বলে সাব্যস্ত হয় না। এ জন্যই অনেকে এক নং এবং দুই নং মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে মতপোষণ করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

(দুই) যারা মনে করেন, আল্লাহর ইলম অনুপাতে যারা বেঁচে থাকলে ভাল আমল করত, তারা জান্নাতী অন্যথায় জাহান্নামী, তারাও পূর্বে বর্ণিত হাদীছের দ্বারাই প্রমাণ পেশ করে থাকেন। মুহাদ্দিছ ইবনে কুতাইবা বলেন,

معنى قوله بما كانوا عاملين اى لو ابقاهم فلا تحكموا عليه بشيئ .

যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেন, তবে তারা কী করত তা আল্লাহ অবগত আছেন (সে মতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন), তাই তোমরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না। কিন্তু হাদীছের এই অর্থ অনেকের নিকট গ্রহণীয় নয়। তা ছাড়া বেঁচে থাকলে অপরাধ সংঘটিত হত– এ ধরনের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রয়োগ করা কেবল অযৌক্তিকই নয়; বরং শরীয়তের শাস্তি বিধানের পরিপন্থি। যারা এই মতটি পোষণ করেছেন তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে 'জান্নাতের জন্য নেক আমল' পূর্বশর্ত, অথচ তাদের নেক আমল নেই। মোল্লা আলী কারী রহ. মিরকাত (শরহে মিশকাত)-গ্রন্থে এ দিকটার উপর আলোকপাত করেছেন। অথচ জান্নাত লাভের জন্য আমলের পূর্ব শর্ত হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত বলে বিবেচিত নয়। এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

(তিন) যারা হাশরের ময়দানে পরীক্ষার মাধ্যমে জান্নাত-জাহান্নামের সিদ্ধান্তের মত গ্রহণ করেছেন, তারা হযরত আনাস, আবূ সাঈদ এবং মুআয ইবনে জাবালের হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কিন্তু বলা যেতে পারে, আখেরাত আমল এবং পরীক্ষার স্থান নয়, বরং পুরস্কার এবং শাস্তির স্থান। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর আমলেরও পরীক্ষা হতে পারে। প্রমাণ হিসাবে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নিম্নোক্ত আয়াত এবং হাদীছ পেশ করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ .

যেদিন 'সাক' অনাবৃত করা হবে এবং সাজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে, তখন তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না। (সূরা ক্বালাম: ৪২)

এই আয়াত দ্বারা হাশরের ময়দানে আমলেরও পরীক্ষা হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এমনিভাবে বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان اناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع ان يسجد .

অর্থাৎ, মানুষকে (হাশরের ময়দানে) সাজদা করার জন্য নির্দেশ করা হবে। তখন মুনাফেকদের পিঠ টান হয়ে যাবে, ফলে তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না।

এ হাদীছ দ্বারাও উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, হাশরের ময়দানে সাজদার আহ্বান আমল ও পরীক্ষা হিসেবে নয়; বরং মুনাফেক এবং মু'মিনদের পার্থক্য করার জন্য প্রমাণ এবং আলামতস্বরূপ। বাহ্যত এটাও একপ্রকার আযাবই বটে। আর যে হাদীছ দ্বারা পরীক্ষা অথবা হাশরের ময়দানে আমল সাব্যস্ত হয়, সে হাদীছ কাফেরদের সন্তানদের ব্যাপারে নয়; বরং পাগল অথবা পরিশুদ্ধ স্বভাবের উপর মৃত্যু বরণকারী শিশু সন্তানদের ব্যাপারে।

(চার) যারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে আ'রাফের অধিবাসী হওয়ার মত পেশ করেছেন তারা বলেন,

لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار .

জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাদের কোন নেক আমল নেই, জাহান্নামে প্রবেশ করবে এমন কোন অপরাধও নেই।

কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য নেক আমল কারণ বটে, কিন্তু পূর্বশর্ত মোটেই নয়।

(পাঁচ) মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার মতের পক্ষে কোন সঠিক দলীল-প্রমাণ আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যদি কাশ্‌ফ অথবা ইল্‌হাম এই মতের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে বলা হবে– কাশ্‌ফ এবং ইল্‌হামে ভুলের অবকাশ থাকে বিধায় কাশ্‌ফ এবং ইল্‌হাম শর্‌য়ী দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অবশ্য মুকাল্লাফ না হওয়ার প্রশ্নে শিশু সন্তানগণ অন্যান্য প্রাণীদের সদৃশ। সুতরাং যেমন অন্যান্য প্রাণীসমূহ মুকাল্লাফ নয় বিধায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তেমনি না মুকাল্লাফ সন্তানগণও মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার মতামতটি যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু এ হিসেবে কাফের এবং মু'মিনদের সন্তানদের মধ্যে কোন পার্থক্য না হওয়ার কথা, অথচ মু'মিনদের সন্তান সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত্য রয়েছে। অপরপক্ষে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বনী আদমের সৃষ্টিগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা থেকে বিনা কারণে কাফেরদের সন্তানদেরকে মাহরূম করারও কোন যৌক্তিকতা নেই।

(ছয়) জাহান্নামী হওয়ার মতামতটি হযরত ইব্‌নে মাসউদ, সালামাহ ইব্‌নে ইয়াযীদ এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরা কর্তৃক আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ এবং নাসায়ী শরীফের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত করা রয়েছে। এই সমস্ত হাদীছ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. যেসব হাদীছ দ্বারা জান্নাতী এবং জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে কোন চূড়ান্ত হুকুম বোঝা যায় না, তবে তাতে জাহান্নামী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যথা: হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন,

هم من ابئهم .

তারা তাদের মাতা-পিতার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি মাতা-পিতা মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা জাহান্নামী হবে, সুতরাং তাদের সন্তানগণও জাহান্নামী হবে।

www.maktabatulabrar.com

খ. যেসব হাদীছ দ্বারা জাহান্নামী হওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বোঝা যায়। যথা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদে তায়ালিসী শরীফের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان بنى ادم خلقوا طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحى مؤمنا ويموت مؤمنا . ومنهم من يولد كافر او يحى كافرا ويموت كافرا .

বনী আদমকে বিভিন্ন ভাগে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাউকে মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে; সে মুমিন হিসেবেই বেঁচে থাকে এবং তার মৃত্যুও ঈমানের উপরেই হয়। আবার কাউকে কাফের হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে; সে কাফের হিসেবেই বেঁচে থাকে এবং তার মৃত্যুও কুফ্‌রীর উপরেই হয়ে থাকে।

কুরআনের কারীমের দ্বারাও এ মতের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ইবনে মাজা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তিরমিযীর হাদীছ দ্বারাও এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ .

আমি অনেক জিন এবং মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা আ'রাফ: ১৭৯)

হযরত খিজির যে সন্তানটিকে হত্যা করেছিলেন, সৃষ্টিগতভাবে কুফ্‌রের কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এ ধরনের হাদীছ এবং আয়াতসমূহ দ্বারা বোঝা যায় কাফেরদের সন্তানরা জাহান্নামী।

গ. অনেক হাদীছে সরাসরী জাহান্নামী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা: হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) তার জাহেলী যুগের সন্তানদের কথা জিজ্ঞাসা করলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

هو فى النار .

তারা জাহান্নামে যাবে।

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আবূ দাউদের হাদীছেও জাহান্নামের কথা সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা ছয় নং মতটি যথার্থ প্রমাণিত হয়।

(সাত) হযরত খানসা ইব্‌নে মুআবিয়া কর্তৃক বর্ণিত মুছনাদে আবূ ইয়'লার হাদীছ, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুছান্নাফে আবদুর রায্‌যাকের হাদীছ এবং সামুরাহ ইব্‌নে জুন্দুব ও আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বোখারী শরীফের হাদীছের দ্বারা জান্নাতী হওয়া বোঝা যায়।

কিছু হাদীছ দ্বারা জাহান্নামী হওয়া এবং কিছু হাদীছ দ্বারা জাহান্নামী হওয়া– এই উভয় প্রকার হাদীছের বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে অনেকে বলেছেন, অনবগতির কারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কখনো জাহান্নামী বলে মন্তব্য করেছেন, আবার পরবর্তী সময়ে ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্বরূপ জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি কী, এ ব্যাপারে অনেকের মতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, তারা জাহান্নামী, আবার অনেকের মতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, তারা জান্নাতী। অতএব তারা জাহান্নামী না জান্নাতী, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন কিছুই এখনও সাব্যস্ত হল না। কারণ, দুই প্রকার হাদীছের বর্ণনা দুই রকম। অতএব হাদীছের বিরোধ নিরসনের জন্য

আমাদেরকে বিরোধ নিরসনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

হাদীছের বিরোধ নিরসনের পদ্ধতি:

উভয় প্রকার হাদীছের বিরোধ নিরসনের জন্য হাদীছের পরস্পর বিরোধ নিরসনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

ক. কোন একপ্রকার হাদীছকে রহিত সাব্যস্ত করা।

খ. কোন একপ্রকার হাদীছকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

গ. উভয় প্রকার হাদীছের মাঝে তাতবীক তথা সমন্বয় সাধন করা। (উলূমুল হাদীছ)

হাদীছের উপরোক্ত মূলনীতির অনুসরণে অনেকে বলেছেন, জাহান্নামী হওয়া বোঝায়– এ ধরনের হাদীছসমূহ রহিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সম্মুখে রহিত হওয়ার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ নেই। কারণ, কোন হাদীছকে রহিত করণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সঠিক ইতিহাসের উপর, অথচ ইতিহাস এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব।

অপরপক্ষে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا .

আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করলে তদাপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমতুল্য কোন আয়াত নিয়ে আসি। (সূরা বাকারা: ১০৬)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রহিত হুকুম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ইতিপূর্বে ধার্য করা হয়েছিল। অথচ কাফেরদের সন্তানদেরকে জাহান্নামী ঘোষণা করার অন্তরালে কোন কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকার বিষয়টি অবোধগম্য। যদি বলা হয়, কাফেরদের সন্তানদেরকে জাহান্নামী ঘোষণা করার মধ্যে কাফের মাতা-পিতাকে ভীতি প্রদর্শনের রহস্য নিহিত থাকতে পারে, তবে বলা হবে, কাফেররা জাহান্নাম এবং জাহান্নামের শাস্তিতে বিশ্বাসী ছিল না। সুতরাং এ ধরনের ঘোষণাকে ভয় প্রদর্শনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তদুপরি কোন হুকুম কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই সেটি রহিত হতে পারে কি না–এ মাসআলাটি খুবই বিতর্কিত (কুরতুবী)। অতএব পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীছসমূহের বিরোধ নিরসনে গৃহীত মূলনীতিমালার প্রথমটির ভিত্তিতে আলোচ্য হাদীছ সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই কঠিন। তাই এখানে অবশিষ্ট দুটি ধারা অনুসরণ করা যেতে পারে।

হাদীছের পরস্পর বিরোধ নিরসনের দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে কোন একপ্রকার হাদীছকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এ হিসেবে জান্নাতী হওয়া বোঝায় এ ধরনের হাদীছসমূহ অগ্রাধিকার পেতে পারে। কারণ, এর বিরোধী হাদীছসমূহ তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলে মুহাদ্দিছগণ রায় প্রদান করেছেন। মুফাস্সির কুরতুবী বলেন,

وهو اصح شئ روى فى هذا الباب وغيره من الاحاديث فيها علل وليست من احاديث الائمة الفقهاء .

এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ এটিই, এছাড়া অন্যান্য হাদীছসমূহ ত্রুটিমুক্ত নয়। (কুরতুবী)

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবূ আমর মালেকীও এই একই মন্তব্য পেশ করেছেন। মুফাস্সির কুরতুবী যে হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, ঐ হাদীছটি হযরত সামুরা ইব্নে জুন্দুব (রা.)

www.maktabatulabrar.com

কর্তৃক বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। এই হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরের সন্তানদেরকে জান্নাতী হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। হাদীছটিতে উল্লেখ আছে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবরাহীম আ.-এর চতুর্পার্শে জান্নাতের বাগানে কিছু সন্তান-সন্ততিকে দেখতে পান। অতঃপর হযরত জিবরীলের মাধ্যমে অবগত হন যে, এরা ফিৎরাতে ইসলামীর উপর ('ফিৎরাত' সম্বন্ধে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।) জন্মগ্রহণ করে বালেগ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে জান্নাতবাসী হয়েছে। হযরত ছামুরা ইব্নে জুন্দুব (রা.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, মুশরিকদের সন্তানরা কি এদের মধ্যে গণ্য? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুশরিকদের সন্তানরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

এই হাদীছের সমর্থনে হযরত খানাসা বিন্তে মুআবিয়া কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদে আহমদের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمولود فى الجنة والمؤدة فى الجنة .

নবীগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী, নবভূমিষ্ট সন্তানগণ জান্নাতী এবং জীবন্ত কবরস্থ শিশু কন্যাগণ জান্নাতী। (লামে')

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদে আবূ ইয়া'লার হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اطفال المشركين فى الجنة فمن زعم انهم فى النار فقد كذب .

মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানরা জান্নাতী। যারা মনে করে তারা জাহান্নামী, তারা মিথ্যুক। (ইব্নে কাছীর)

হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, আমি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবন্ত কবরস্থ শিশুকন্যাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি ইরশাদ করেন,

المؤدة فى الجنة .

জীবন্ত কবরস্থ শিশু কন্যাগণ জান্নাতী।

এ ধরনের বহু হাদীছ এবং সাহাবা তাবেয়ীদের বক্তব্যের দ্বারা কাফেরদের সন্তানগণ জান্নাতী বলে সাব্যস্ত হয়।

যে সমস্ত হাদীছ এর বিপরীত অর্থ বোঝায়, সে হাদীছসমূহ মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় বড়জোর দ্বিতীয় পর্যায়ের 'হাসান' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এমতাবস্থায় অপর পক্ষের হাদীছ সমূহের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত। কারণ, মুহাদ্দিছীনে কেরাম এই সমস্ত হাদীছকে প্রথম পর্যায়ের হাদীছ বলে মন্তব্য করেছেন।

এখানে বিশেষ দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। নিম্নে উত্তরসহ প্রশ্ন দুটি সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

প্রশ্ন– ১. মুফাস্সির কুরতুবী জাহান্নামী হওয়ার বর্ণনা সম্বলিত হাদীছসমূহের ব্যাপারে যে সমালোচনা করেছেন বা যে অভিযোগ করেছেন, সে সমালোচনা বা অভিযোগের পক্ষে তিনি কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করেননি। মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় এ ধরনের সমালোচনাকে 'জরহে মুবহাম' (অস্পষ্ট অভিযোগ) বলা হয়। আর জরহে মুবহাম গ্রহণযোগ্য নয়। (আর রফউ ওয়াত্তাকমীল– ৪৬)

প্রশ্ন– ২. আল্লাহ্ পাক পবিত্রে কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

তোমরা এই জান্নাতের অধিকারী হলে, তোমাদের আমলের ফল স্বরূপ। (সূরা যুখরুফ: ৭২)

এরূপ বহু আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য নেক আমলের বিশেষ প্রয়োজন। অথচ কাফেরের সন্তানদের কোন নেক আমলও নেই এবং তারা মুকাল্লাফ তথা বিধি-বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্তও নয়। সুতরাং তারা জান্নাতী হবে কী করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, মুফাস্সির কুরতুবী একজন নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ তথা হাদীছ বিশারদ। এ ধরনের প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিত্বের যে কোন ধরনের সমালোচনা যতক্ষণ শরীয়তের উসূল বিরোধী না হয় গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন মুহাদ্দিছ ইবনে মঈন এবং ইমাম আহমদের "জরহে মুবহাম" সকল মুহাদ্দিছগণের নিকটই গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া তার সমালোচনার কারণসমূহ সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ। এ কারণেই তিনি সমালোচনার কারণসমূহ উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। বস্তুত নিম্নোক্ত কারণে বিপরীত হাদীছসমূহ পরিহারযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

১. হাদীছসমূহের সূত্রগুলো তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। যথা ছয়-এর 'ক'-য়ে উল্লিখিত হাদীছের সূত্রে আবূ মুআয সুলাইমান ইব্নে আরকাম নামক রাবীকে মুহাদ্দিছগণ যয়ীফ তথা দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন (তাহযীব- ১৬৮/৪)। মুহাদ্দিছ ইব্নে হিব্বান বলেন, আবূ মুয়ায বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং "ইয়ামামাতে" বসবাস করেন। তিনি মওযূ' হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং হাদীছে পরিবর্তন সাধন করতেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, সে হাদীছ লেখার উপযুক্ত নয়। ইমাম মুসলিম বলেন, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করত। ইমাম বোখারী ও ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তার হাদীছসমূহ যয়ীফ, দুর্বল, বর্জনীয় ও পরিহারযোগ্য। ইমাম আহমদ বলেন, লোকটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে মাঈন বলেন, তার হাদীছের একপয়সাও মূল্য নেই। মুহাদ্দিছ আবূ আমর বলেন, তার হাদীছসমূহ মুনকার ও পরিহারযোগ্য এবং সে নিজেও নির্ভরযোগ্য নয়। অপর এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামে সন্তানদের ক্রন্দন শোনেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এই হাদীছ সম্পর্কে আল্লামা আইনী বলেন, হাদীছটি একেবারেই যয়ীফ এবং দুর্বল। তদুপরী এই হাদীছের বর্ণনাকারী আবূ আকীলকে মুহাদ্দিছগণ সর্বসম্মতভাবে পরিহারযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

২. কাফেরদের সন্তানগণ নাবালেগ হওয়ার দরুণ মুকাল্লাফ তথা বিধি-বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। সুতরাং তারা বে-গোনাহ। আর বে-গোনাহ কাউকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার মতটি ইসলামের মূল আকীদার পরিপন্থি। যে সমস্ত হাদীছ এরূপ মূল আকীদার পরিপন্থি হয়, মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় তাকে 'মুআল্লাল' বা ত্রুটিযুক্ত বলা হয়। আর 'মুআল্লাল' হাদীছ কোন হুকুম সাব্যস্ত করার বেলায় অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, জান্নাত লাভের জন্য আমল একটি উপায় মাত্র। আমল ব্যতীত জান্নাত লাভের আরো উপায় রয়েছে। যথা: ঈমান এবং আল্লাহর রহমত। ফুকাহা এবং বিজ্ঞ ইমামগণ লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছে, আর সে কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকে, তাহলে সে আমল না করে থাকলেও জান্নাতী। কারণ, তারা ফিৎরাতে

ইসলামীর উপর জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেছে। জাহান্নামী হওয়ার মত অপরাধ তারা করেনি। জন্মগত এই ঈমানী ফিৎরাত কাফেরদের সন্তানদের মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামী বলার কোন অবকাশ নেই। মহান রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

আল্লাহ পাক মানুষকে খোদায়ী ফিৎরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন, এর কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম: ৩০)

এই আয়াত দ্বারাও পূর্বের আলোচনার যথার্থতা সাব্যস্ত হয়। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেছিলেন, আমলের দ্বারা কেউ জান্নাত লাভ করতে পারবে না। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) প্রশ্ন করলেন, আপনিও না? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমিও না। তবে আল্লাহ পাক আমাকে তার বিশেষ রহমতে জান্নাতী করেছেন।

মূলত আল্লাহর রহমতই হচ্ছে জান্নাত লাভের একমাত্র উপায়। তবে আল্লাহর রহমতে জান্নাত লাভের জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে শরীয়ত মোতাবেক আমল করা। আমল না করলে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু আমল সে-ই করতে পারে, যে বয়স্ক হয়ে মুকাল্লাফ হয়। আর যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়, তারা মুকাল্লাফ হয় না, তাই তাদের জন্য আমলের শর্ত নেই। তারা মহান রব্বুল আলামীনের রহমত দ্বারা জান্নাতবাসী হবে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের এটাই চূড়ান্ত মত।

ফিৎরাতের অর্থ

আয়াত এবং হাদীছের মধ্যে যে ফিৎরাতের কথা উল্লেখ হয়েছে, বাংলা ভাষায় সাধারণত এর অর্থ হয়ে থাকে প্রকৃতি বা স্বভাব। তবে ফিৎরাতের দ্বারা মূলত কী বুঝানো হয়েছে– এ সম্পর্কে ওলামা ও মনীষীদের বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে সেই আত্মাগুলো থেকে তার প্রভুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আয়াতে ফিৎরাত দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইমাম আহমদ ও ইমাম আওযায়ী থেকে এই মতটি ইমাম আবূ দাউদ, ইবনে আবদুল বার এবং আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিছ তীবী এর সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। মুফাস্সির কুরতুবীও তাফসীরে কুরতুবীতে এই মতটিকে সমর্থন করেছেন।

কেউ কেউ ফিতরতের অর্থ 'ইল্ম' করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্টি সাধিত হয় আল্লাহর ইলম মোতাবেক। সেমতে যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত হন যে, ভবিষ্যতে সে মুসলিম থাকবে তাকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করেন, আর যার সম্পর্কে তিনি অবগত হন যে, সে ভবিষ্যতে কাফের হবে, তাকে কুফরীর উপর সৃষ্টি করেন। ইব্নে আব্দিল বার্ এ মতটিকে আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু মাতা-পিতা সন্তানদের ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে– আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছ দ্বারা এই মতটির অসারতা প্রমাণিত হয়।

অনেকের মতে 'ফিৎরাত' দ্বারা সৃষ্টিগত স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে। এই স্বভাবের উপর ভিত্তি করে সন্তানগণ বালেগ হওয়ার পর ঈমান অথবা কুফ্রকে গ্রহণ করে থাকে। সৃষ্টিগত এই স্বভাব ঈমান এবং

www.maktabatulabrar.com

কুফর থেকে একেবারেই ভিন্ন একটি বস্তু। ইবনে আব্দিল বার্ এই মতটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী' তে এর উপযুক্ত প্রতিবাদ করেছেন।

অধিকাংশের মতে 'ফিতরাৎ' দ্বারা ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী এর উপর ইজ্‌মা তথা ঐক্যমতের দাবী করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে ইজ্‌মার দাবী সঠিক নয়। তবে অধিকাংশের মতামত এটাই এবং দলীল-প্রমাণের দিক থেকে এই মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদছীতে ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক আদম (আ.) এবং তার সন্তানদেরকে হক ও ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের হালাল মাল প্রদান করেছেন, যে মালের ভিতর কোন প্রকার হারামের অবকাশ ছিল না। কিন্তু তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত মাল-সম্পদকে হালাল এবং হারামে বিভক্ত করেছে। এই হাদীছে ফিতরত দ্বারাও এই অর্থের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। এ হাদীছসমূহ গভীরভাবে চিন্তা বিবেচনা করলে কাফেরদের না-বাগেল সন্তানগণ জান্নাতী– এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ. বিরোধী হাদীছসমূহ দ্বারা কাফের মাতা-পিতার তাবে' তথা অনুগত হয়ে সন্তানদের জাহান্নামী হওয়া নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের কারণে অগ্রহণীয়। চারটি আয়াত লক্ষ্য করুন–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ .

প্রত্যেক লোকই নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। (সূরা মুদ্দাছছির: ৩৮)

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰی شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ .

স্মরণ কর, তোমার 'রব' আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন এবং তাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই, আমরা স্বীকার করছি। এই স্বীকৃতি এজন্য গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে কেয়ামতের দিন তারা বলতে না পারে, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। (সূরা আ'রাফ: ১৭২)

مَنِ اهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا .

যারা হেদায়াত গ্রহণ করবে, তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করবে, আর যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের ধ্বংসের জন্যেই। (সূরা হূদ: ১০৮)

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

কেউ অন্যের ভার বহন করবে না। আমি রসূল না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দিই না। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৫)

● প্রথম আয়াত দ্বারা দুটি বিষয় বোঝা যায়। যথা:

১. প্রত্যেক লোক নিজের আমলের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের জন্য অন্যকে দায়ী করা হবে না। সুতরাং মাতা-পিতার কুফরীর কারণে সন্তানদেরকে দায়ী করার কোন অবকাশ নেই।

২. যেহেতু আমলের প্রশ্ন তাকেই করা হবে; যে মুকাল্লাফ, আর না-বালেগ সন্তনগণ মুকাল্লাফ নয়। সুতরাং হাশরের ময়দানে তাদের উপর কোন প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হবে না।

● দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, হাশরের ময়দানে বনী আদম এবং বনী আদমের সন্তানদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তির উপর উঠানো হয়ে থাকে। এখন জন্মের পর যদি বালেগ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তাহলে সে মুকাল্লাফ হয় এবং তার প্রতি অধিক আমলের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ফলে তাকে হাশরের ময়দানে আমলের ব্যাপারে অতিরিক্ত জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যারা জন্মের পর বালেগ এবং মুকাল্লাফ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের জন্য আমলের বিষয়ে অতিরিক্ত কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। সুতরাং তাদের প্রতি আমল না করার অথবা গোনাহ করার কোন দায়-দায়িত্ব না আসার কারণে জন্মগতভাবে প্রভুত্বের স্বীকারোক্তির ফলে জান্নাত লাভে ধন্য ও ভাগ্যবান হওয়ার বিষয়টি খুবই যুক্তিপূর্ণ।

● তৃতীয় আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, একজনের অপরাধে অপর জনকে দায়ী করা হবে না এবং চতুর্থ আয়াতের মর্মকথাও এটাই। সুতরাং মাতা-পিতার অপরপাধের কারণে সন্তানদেরকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

● চতুর্থ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ্ পাকের আযাব তাদের জন্য ধার্য করা হয়েছে, যারা নবী রসূলগণের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। যদি কারও নিকট দাওয়াত না পৌঁছে থাকে, অথবা মুকাল্লাফ না হয়, তাহলে তাদের জন্য মোটেই আযাব ধার্য হতে পারে না। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন কোন আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা একজনের অপরাধের কারণে অপরজনের শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ لَیَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَ اَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ .

কেয়ামতের দিন তারা তাদের পাপের বোঝা এবং মূর্খতার কারণে যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে। (সূরা আনকাবূত: ১৩)

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

الميت يعذب ببكاء اهله عليه .

মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনের বিলাপের কারণে আযাব দেয়া হবে। (বোখারী শরীফ)

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা একজনের অপরাধে অন্যজনকে আযাব দেয়া সাব্যস্ত হয়। এর জবাবে বলা যেতে পারে, যদি কোন লোক অন্যের অপরাধের সাহায্যকারী অথবা কারণ ও ওছীলা হয়, তাহলে সে শাস্তি পাবে, অন্যথায় নয়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম উপরিউক্ত আয়াত এবং হাদীছের এই অর্থই করেছেন (ফাতহুল বারী– ৪৭৩)। কেননা, কারণ এবং ওছীলা ব্যতীত একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদান করা না কুরআন- হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, না শরীয়তের বিধান এবং উসূল সম্মত।

গ. হাদীছের পরস্পর বিরোধ নিরসনে সর্বশেষ এবং তৃতীয় উপায় হচ্ছে, উভয় প্রকার হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এ বিষয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, কাফেরদের সন্তানদের জাহান্নামী হওয়া বোঝায় এরূপ হাদীছসমূহ চার প্রকার:

www.maktabatulabrar.com

১. কাফেরদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, 'আল্লাহ পাকই ভাল জানেন যে, তারা বেঁচে থাকলে কীরূপ আমল করত।'

২. এক হাদীছে ইরশাদ করেন, 'যারা জাহান্নামী আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নামী করেই সৃষ্টি করে থাকেন। আর যারা জান্নাতী, আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতী করে সৃষ্টি করে থাকেন।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট এবং সরাসরিভাবে জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়।

৪. অপর এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তারা মাতা-পিতার তাবে' তথা অনুগত হবে। মাতা-পিতা যদি কুফ্‌রীর কারণে জাহান্নামী হয়, তবে সন্তানরাও জাহান্নামী হবে।' প্রথমোক্ত হাদীছের দুটি অর্থ হতে পারে:

ক. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তাই তিনি অবগত আছেন যে, তারা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে তারা কোন্ ধরনের আমল করত। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তার জ্ঞান অনুসারেই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানে তারা কাফের সাব্যস্ত থেকে থাকলে তারা জাহান্নামী, অন্যথায় জান্নাতী।

খ. অথবা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তারা যদি বেঁচে থাকত এবং মুকাল্লাফ হত, তাহলে তো তাদের আমল হিসেবেই সিদ্ধন্ত নেয়া হত' কিন্তু তারা তো বেঁচে থাকেনি, সুতরাং তারা মুকাল্লাফও হতে পারেনি, তাই তাদের বেলায় কোন সিদ্ধান্ত আমলের ভিত্তিতে হতে পারে না। আর কুফরী থাকার কারণে জাহান্নামী হওয়া উসূল এবং বিধান সম্মত নয়। অতএব এ কারণে তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর রহমতে তারা জান্নাতী হতে পারে। হাদীছের ফিতরাত দ্বারা এই অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত হয়। এই অর্থ গ্রহণ করলে উভয় প্রকার হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহীসহ অনেক মুহাদ্দিছ এই অর্থকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

● দ্বিতীয় প্রকার হাদীছের জাহেরী অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এই হাদীছে আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানের পরিধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ধরে নিলে মতবিরোধ শেষ হতে পারে। অর্থাৎ, যেহেতু আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ এবং তার অসীম জ্ঞানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বরাবর, তাই প্রতিটি মানুষ-চাই সে বয়স্ক হয়ে আমল করুক, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কাবস্থায় আমল না করেই মৃত্যুবরণ করুক-তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এককভাবে অবগত। সুতরাং তিনি যখন কোন মানুষকে সৃষ্টি করেন তখন তিনি সেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অবগত থাকেন যে, সে ঈমানদার হবে না কাফের হবে, সে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে। মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত অবস্থায় আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন এবং এই অবগতির ভিত্তিতেই মানুষের তাকদীর অর্থাৎ, ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন। আলোচ্য হাদীছে এই অবগতি এবং ইল্‌মের কথাই বলা হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'আমি জ্বিন এবং ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত অর্থাৎ, তাওহীদ এবং মারেফাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' এই আয়াত দ্বারা আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতা বোঝা যায়। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং তার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, যদি মানুষ মুকাল্লাফ অবস্থার সময় সুযোগ পেয়েও আল্লাহ পাকের আনুগত্য স্বীকার করে না থাকে,

www.maktabatulabrar.com

তবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হতে পারে। বস্তুত হাদীছের জাহেরী অর্থ গ্রহণ করলে কেবল উসূল বিরোধীই হয় না; বরং এই আয়াতের সাথেও বিরোধ সৃষ্টি হবে।

● তৃতীয় প্রকার হাদীছের প্রশ্নে বলা যেতে পারে যে, এ হাদীছসমূহে বলা হয়েছে, তারা আগুনে নিক্ষেপিত হবে। কিন্তু আগুন দ্বারা দগ্ধ করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, তা এই হাদীছসমূহে বলা হয়নি। সুতরাং জাহেরীভাবে তারা আগুনে নিক্ষেপিত হলে সেখানে তাদের নিরাপত্তা থাকতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহিম, আছহাবুল উখদূদ এবং দাজ্জালের ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। হযরত থানবী রহ. সহ অনেকেই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ অর্থ অনুযায়ী হাদীছসমূহের বিরোধ মিটে যায়। চতুর্থ প্রকার হাদীছের হুকুম দুনিয়ার হুকুমের ব্যাপারে। অর্থাৎ, কাফেরদের সন্তান মারা গেলে তার কোন জানাযা নেই। হ্যাঁ, তারা যদি বালেগ হয়ে কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাদের মাতা-পিতার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অধিকাংশ মুহাদ্দিছীন হাদীছের এই অর্থকেই গ্রহণ করেছেন।

মতামতসমূহের পর্যালোচনা

আলোচ্য মাসয়ালার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; এ সম্পর্কে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং ওলামা মাশায়েখদের মতামত ও উক্তিসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত মতামতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মূলত মতামত মাত্র দুটি।

(ক) কাফেরদের সন্তানরা জাহান্নামী।

(খ) কাফেরদের সন্তান জান্নাতী। কেননা, যারা এ বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে মন্তব্য করেছেন অথবা মন্তব্য থেকে বিরত রয়েছেন, তাদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এ জন্যেই ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এই দুই মতামতের মধ্যে পার্থক্য করেননি। এই দুই মতামতের সার কথা হচ্ছে, কাফেরদের সন্তানরা জাহান্নামীও হতে পারে এবং জান্নাতীও হতে পারে। যারা হাশরের ময়দানে পরীক্ষার মাধ্যমে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হওয়ার মত পেশ করেছেন, তাদের মত অনুসারেও উপরোক্ত ফলাফলই দাঁড়ায়। আর যারা বরযখী অথবা মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার মত পোষণ করেছেন, তাদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সন্তানরা জাহান্নামী নয় এ কথাই সুস্পষ্ট। কিন্তু আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই দুটি মতের মধ্যে মূলত তাদের জান্নাতী হওয়ার মতটি সাব্যস্ত হয়। কারণ, যারা জাহান্নামী বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের অধিকাংশের মতে জাহেরীভাবে তারা জাহান্নামী হবে। আসলে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব দেয়া হবে না এবং সেখানেই তারা জান্নাতের প্রশান্তি লাভ করবে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ.-সহ অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন। (বাওয়াদিরুন নাওয়াদির- ৬৩৩)। জাহেরীভাবে জাহান্নামও চিরস্থায়ী নয়; বরং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটা হবে তাদের কাফের মাতা-পিতাদেরকে মানসিক কষ্ট দেয়ার জন্য। বস্তুত তারা নামে জাহান্নামী হবে। জাহান্নামের আযাব তাদের উপর হবে না। যেমন জান্নাতে এমন একদল জান্নাতী হবে, যাদের নাম হবে জাহান্নামী। অথবা যেমন দাজ্জালের জাহান্নাম বাহ্যত আযাবের হবে, কিন্তু আসলে আযাব হবে না। এরূপ কোন কিছু করা আল্লাহর কুদরতের বাইরে নয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে নমরূদের আগুনে নিক্ষেপ করে আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতের প্রশান্তি দান করেছেন। সুতরাং কাফেরদের সন্তানদের বেলায়ও এটা অসম্ভব কোন কিছু নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জান্নাত লাভের জন্য আমল শর্ত। আর তাদের কোন প্রকার আমল নেই। সুতরাং তারা কী করে জান্নাতী হতে পারে? তবে বলা হবে, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বক্তব্য পেশ করেছি। তাতে আমরা উল্লেখ করেছি, যারা মুকাল্লাফ কেবল তাদের জন্যই আমলকে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর কাফেরদের সন্তানরা না-বালেগ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হেতু তারা মুকাল্লাফ নয়। আমরা একথাও উল্লেখ করছি যে, কেবল আমলের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করাই শরীয়তের বিধান নয়। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতের অধিকারী হয়েও অনেকেই জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ্ পাক হাদীছে কুদছীতে ইরশাদ করেন, 'আমার রহমত আমার গযবের উপর প্রবল।' তা ছাড়া জাহান্নামী সেই হবে যে পাপাচারী। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতানুসারে পাপাচারী আল্লাহর রহমতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জান্নাতী হয়ে যেতে পারে। জাহান্নামী তখনই হতে পারে যখন পাপাচারী সাব্যস্ত হয়। আর কাফেরদের না-মুকাল্লাফ নাবালেগ সন্তানরা যেহেতু পাপাচারী নয় সুতরাং তারা জাহান্নামী হতে পারে না; বরং আল্লাহর রহমতে তারা জান্নাতী হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশেষজ্ঞগণের মতামত

উপরোক্ত পর্যালোচনায় সাব্যস্ত হয় যে, কাফেরদের সন্তান জাহান্নামী নয় বরং জান্নাতী। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই মত পোষণ করেছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতী। যারা তাদেরকে জাহান্নামী বলে, তারা অবাস্তব কথা বলে (ইবনে কাছীর- ৪৭৭/৪)। হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত সামুরা ইব্নে জুন্দুব (রা.) এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) প্রমুখ সাহাবা থেকেও জান্নাতী হওয়ার মত বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইব্নে হাজার আসকালানী এবং আইনীর মতে ইমাম বোখারীর মতও এটাই (ফাতহুল বারী- ১৯৫/৩)। ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং শাফেয়ী ওলামা মাশায়েখদের মতও এটাই। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নে হাসান বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক গোনাহ ব্যতীত কাউকে আযাব দিবেন না (লামে'-৪০১/৪)। সুতরাং কাফেরদের সন্তানরা শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, তারা মুকাল্লাফ নয়। সেহেতু গোনাহগার সাব্যস্ত হতে পারে না। আল্লামা ইব্নে হাজার মক্কী ফাতওয়ায়ে হাদীছার মধ্যে বলেন, কাফেরদের সন্তানদের ব্যাপারে চার প্রকার মত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে তারা জান্নাতী। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মত এটাই। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, কাফেরদের সন্তানগণ জান্নাতী একথা সাব্যস্ত করার জন্য বোখারী শরীফে উল্লেখিত হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীছই যথেষ্ট, যে হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান এবং কাফেরদের সন্তানদের হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর চতুর্পার্শ্বে জান্নাতে দেখেছেন। আর নবীদের দেখা ওহীর হুকুম রাখে। তাছাড়া অন্যান্য হাদীছে জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। মুফাস্সির কুরতুবীর বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম নববী বলেন, এ সম্পর্কে সহীহ এবং সঠিক মত হলো, কাফেরদের সন্তানরা জান্নাতী এবং বিশেষজ্ঞগণের মতও এটাই। ইব্নে তাইমিয়া বলেন, যারা জাহান্নামী হওয়ার কথা ইমাম আহমদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে, তারা ভুল করেছে। ইবনুল কাইয়্যেম জাউযিয়া 'শিফাউল আলীল' কিতাবে বলেন, ইমাম আহমদ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের সন্তানরা জান্নাতী- এটিই হচ্ছে ইমাম আহমদের প্রকৃত মত। হযরত রাশীদ আহমদ গাংগুহীর মতও এটাই।

www.maktabatulabrar.com

এই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে একথা সাব্যস্ত হয় যে, কাফেরদের না বালেগ সন্তানরা জান্নাতী। স্তর ও শ্রেণিগত পার্থক্য হলেও তারা জান্নাতী হিসেবে জান্নাতের শান্তি অবশ্যই ভোগ করবে। তারা মোটেই জান্নাতীদের খেদমতগার এবং কেবল আপ্যায়নকারী হবে না। আপ্যায়নকারী এবং খেদমতগার হবে বলে যে সমস্ত হাদীছে উল্লেখ রয়েছে, পূর্বে বর্ণিত কারণেই তা অপ্রযোজ্য। অন্য হাদীছে খেদমত এবং আপ্যায়নের জন্য জান্নাতে নতুন করে হুর গেলমান সৃষ্টি করার ঘোষণা করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে ঐ হাদীছসমূহকেই মূল এবং অগ্রাধিকার দেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ **(কী কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?)**

এ আয়াতে হত্যার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে বলা হয়েছে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা বলা হয়নি। এ বিষয়ে বাদী অথবা বিবাদী উভয়ের যেকোন একজনকেই জিজ্ঞাসার অবকাশ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে বলে মুফাস্সিরগণ মন্তব্য করেছেন। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে বাদীকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। এ মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। বাদীকে কেন প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে, এ বিষয়টি বোঝার জন্য বাদী-বিবাদীর জেরা সম্পর্কিত আদালতের প্রচলিত নিয়ম-কানূনের রহস্য বুঝতে হবে। বাদী-বিবাদীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বার্থেই প্রয়োজনে উভয়কে জেরা করা যেতে পারে। তবে প্রথমে বিবাদীকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এমতাবস্থায় বিবাদী অপরাধ স্বীকার করে নিলে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আদালতের জন্য খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি বিবাদী অপরাধকে অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে, তাহলে বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন বাদী তরফ থেকে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষী পেশ করার জরুরত দেখা দেয়।

হাশরের ময়দানে সকলেরই কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ হবে, সকলকেই সকল অপরপাধের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সেমতে কর্মফল নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং কেবল শিশুকন্যা হত্যার বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিশেষত্ব কী? গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, শিশুকন্যারা –যাদের মা এবং পিতা তাকে হত্যা করে মাটির নীচে প্রোথিত করেছে– তাদের পক্ষ থেকে বিচারপ্রার্থী হওয়ার তো কেউ নেই। তাছাড়া গোপনভাবে প্রোথিত করার ফলে সে সম্বন্ধে কারও জানা থাকাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এ ধরনের নির্যাতিত, মজলূমের সাহায্য করবেন, মজলূমের প্রতিকার নিজেই করবেন। আল্লাহর আদালত ইনসাফের আদলত।

জরুরী ফায়দাসমূহ

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবন্ত প্রোথিত সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্য যে কোন উপায়ে সন্তানকে হত্যা করলে বা নষ্ট করলে, যে কোন উপায়ে সন্তানদের প্রতি জুলুম অবিচার করলে সে সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ পর্যায়ে নিম্নে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

ক. আমাদের দেশে দেখা যায়, সন্তান জন্ম হওয়ার পর অর্থাভাবে অথবা অবৈধ সন্তান হলে হত্যা করা হয় অথবা রাস্তাঘাটে, ময়দানে, জঙ্গলে কিংবা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ ধরনের আচরণ অমানবিক এবং মহাপাপ।

খ. চার মাসের গর্ভবতী স্বেচ্ছায় অথবা চাপের মুখে গর্ভপাত ঘটায়। অনেক সময় হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের সাহায্যে এরূপ অপকর্ম করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের কাজ মহাপাপ। যারা এ ধরনের কাজ করে কিংবা তাতে সহযোগিতা করে, তারা সকলেই গোনাহে কবীরায় লিপ্ত। কেননা,

গর্ভাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হলে রূহ সংযোজিত হয়ে যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা জীবিত মানুষকে হত্যা করার শামিল।

গ. গর্ভবতী মহিলার পেটে আঘাতের কারণে যদি চার মাসের গর্ভ খালাস হয়ে যায়, তাহলে ইমামদের সর্বসম্মত মতানুসারে এর জন্য দিয়াতস্বরূপ একটি গোলাম অথবা সে পরিমাণ অর্থ আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) গর্ভ খালাস হয়, তাহলে পূর্ণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দিয়ত দেয়া ওয়াজিব হবে।

ঘ. যদি গর্ভ চার মাসের কম হয়, তাহলে শরীয়তসম্মত ওজর এবং মজবূরী ব্যতীত গর্ভ খালাস করাও হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এর প্রমাণ রয়েছে।

ঙ. গর্ভধারণ না করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে মুসলিম শরীফের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ওয়াদীয়ে খফী' অর্থাৎ, বাচ্চাকে গোপনে জীবিতাবস্থায় মাটির নীচে প্রোথিত করার ন্যায় গোনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শরীয়ত অনুমোদিত ওজর এবং প্রয়োজন ব্যতীত আযলের মাধ্যমে গর্ভধারণ না করার ব্যবস্থাপনা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ। অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনেই দেয়া হয়েছে, অর্থাভাব বিশেষ প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীয়তগত ওজরের কারণে যেমন মহিলার স্বাস্থ্য রক্ষা অথবা দুগ্ধজাত শিশুর মায়ের দুধের প্রয়োজনে গর্ভধারণ না করার সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি আছে; তবে কোন অবস্থাতেই স্থায়ী ব্যবস্থা (যেমন ভেসেকটমী বা লাইগেশন) গ্রহণ করার অনুমতি নেই।

وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ **(আর যখন ছহীফা খোলা হবে।)**

এ আয়াতের সারমর্ম হল, হাশরের ময়দানে যখন সমবেত জনতার সামনে প্রত্যেকের আমলনামা খোলা হবে, আসমানের আবরণ অপসারিত করা হবে, জাহান্নামের অগ্নি উত্তপ্ত করা হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে, সে কী আমল নিয়ে হাজির হয়েছে– ভাল না মন্দ। সেখানে তার আমলের ভিত্তিতেই তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, ছহীফা খোলা হবে এবং প্রকাশ করা হবে। এই তাফসীর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ সম্পর্কে মুফাস্সিরদের দুটি মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

(১) জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা যখন বিচারের পর স্ব স্ব স্থান– জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীদের হাতে আর একটি অমলনামা তদ্রূপ উড়ে এসে পড়বে। সম্ভবত সিদ্ধান্তের কারণসমূহ সেখানে উল্লেখ থাকবে, যা প্রত্যেকেই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবে। এটা সেই আমলনামা নয়, যা প্রসিদ্ধ এবং বিচারের জন্য খোলা হবে। তাফসীরে কাশ্শাফ এবং আবুস সুউদে এই মন্তব্যটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণাদির উল্লেখ নেই। অবশ্য মারছাদ ইবনে ওয়াদা থেকে এমতটি বর্ণিত হয়েছে।

(২) অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মত অনুযায়ী ছহীফার দ্বারা ঐ আমলনামাকে বোঝানো হয়েছে যা প্রসিদ্ধ এবং যে আমলনামাকে বিচারের মুহূর্তে খোলা হবে এবং ডান বা বাম হাতে প্রদান করা হবে। মুফাস্সির কাতাদাহ্ জাহ্হাকসহ নির্ভরযোগ্য মুফাস্সিরদের মত এটাই।

www.maktabatulabrar.com

আলোচ্য আয়াতে نشرت (নুশিরাত) কথাটি বোঝার দাবী রাখে। কথাটির অর্থ হচ্ছে 'খোলা হবে'। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায়, ইতিপূর্বে এই আমলনামাটি বন্ধ ছিল। বন্ধের পূর্বে এই আমলনামাটির অবস্থা কী ছিল?

পবিত্র কোরআন এবং হাদীছের আলোকে বোঝা যায়, জন্মের পর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমলনামার অবশ্যকতা নেই। কিন্তু মুকাল্লাফ না হলেও তার নেক আমলসমূহের ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। নেক আমলসমূহকে নফল হিসাবে ধরা হলেও ছওয়াব প্রদান করা হয়। অবশ্য এমতাবস্থায় পাপসমূহ ক্ষমার যোগ্য। কারণ, সে মুকাল্লাফ নয়। বস্তুত আমলনামা খোলার অর্থ হচ্ছে আমল লিপিবদ্ধ করা। এ লিপিবদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু হয় বালেগ হওয়া অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স লাভের মুহূর্ত থেকে এবং চালু থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর সাকারাত তথা মৃত্যু-যাতনা শুরু হলেই আমলনামার লিপিবদ্ধ করণ স্থগিত হয়ে পড়ে। কারণ, বস্তুজগত হচ্ছে আমলের স্থান, আর মৃত্যুর পর আখেরাতের জগত হচ্ছে আমলের বিনিময়ের স্থান। মৃত্যুর পর অবশ্য মানুষ আমল করবে এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করেও আমল করবে; কিন্তু তখন কেবল ভাল আমলই করবে, আপরাধমূলক কর্মের কল্পনাও হবে না। কারণ মানুষ যেখানে সব কিছুই স্বচক্ষে পরিদর্শন করবে– ওটা পরীক্ষার জগত নয়। এজন্যই বিচারাদালত হবে বস্তুজগতের আমল নিয়ে। মৃত্যুর দ্বারা যেহেতু বস্তুজগতের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেই সাথে আমলনামাও বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ, তার কৃত কোন আমল আর এই আমলনামায় সংযোজিত হবে না। যদি তার কোন সদকায়ে জারিয়া থাকে এবং হিতাকাঙ্ক্ষীগণ ইছালে ছওয়াব করে, তবে তা অবশ্যই রেকর্ডভুক্ত হবে এবং উপকারে আসবে। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পূর্বে আমলনামায় সংযোজিত হবে না। বিচার-বিশ্লেষণের মূলবস্তু হবে স্বীকৃত কর্ম।

মৃত্যুর সাকারাত তথা মৃত্যু-যাতনার মুহূর্তে আমলনামা বন্ধ হবে, আর তা খোলা হবে হাশরের ময়দানে। আলোচ্য আয়াতে 'নুশিরাত' কথাটির মাধ্যমে এই 'খোলা হবে' কে-ই বোঝানো হয়েছে।

এই আমলনামা নেক লোকদের ডানহাতে আর পাপীদের বামহাতে প্রদান করা হবে। ডানহাতে প্রদান কামিয়াবী এবং নাজাতের প্রতীক হবে। আর বামহাতে প্রদান করা ধ্বংস এবং জাহান্নামী হওয়ার আলামত হবে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের বিভিন্ন স্থানে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

ছোট-বড় সমস্ত নেক এবং পাপ এই আমলনামায় উল্লেখ থাকবে। মানুষ এমন এমন কাজ-কর্ম তাতে লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে, যা মানুষ কোন দিন ধারণাও করেনি। এ আমলনামা থেকে কোন বিষয় বাদ পড়বে না। সকলেই আমলনামা দেখে বলে উঠবে,

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا .

এ কেমন কিতাব! এ'তো ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, বরং সব কিছুর হিসাব রেখেছে। (সূরা কাহ্ফ: ৪১)

আমলনামা খোলার পর বনী আদমকে লক্ষ্য করে নির্দেশ হবে,

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا .

তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমর হিসাব-নিকাষের জন্য যথেষ্ট। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৫)

শব্দার্থ

أُقْسِمُ আমি শপথ করছি, بِالْخُنَّسِ পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, الْجَوَارِ الْكُنَّسِ প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়, وَالَّيْلِ রাতের শপথ, عَسْعَسَ অবসান ঘটে, ছড়িয়ে পড়ে, وَالصُّبْحِ ভোরের শপথ, اِذَا تَنَفَّسَ যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে, তার আবির্ভাব হয়, لَقَوْلُ অবশ্যই বাণী বা বর্ণনা, رَسُوْلٍ প্রেরিত ব্যক্তির, كَرِيْمٍ সম্মানিত, ذِىْ قُوَّةٍ শক্তিশালী, عِنْدَ নিকট ذِى الْعَرْشِ আরশের অধিপতি, مَكِيْنٍ মর্যাদাবান, مُطَاعٍ মান্যবর, অনুসরণীয়, اَمِيْنٍ বিশ্বস্ত, وَمَا এবং নয়, صَاحِبُكُمْ তোমাদের সাথি, بِمَجْنُوْنٍ পাগল, উন্মাদ, وَلَقَدْ এবং অবশ্যই, رَاٰهُ সে দেখেছে তাকে, بِالْاُفُقِ আঙ্গিনায়, দিগন্তে, الْمُبِيْنِ মুক্ত, স্পষ্ট, عَلَى الْغَيْبِ গায়েবী, অদৃশ্য, بِضَنِيْنٍ কৃপণ, فَاَيْنَ কোথায়? تَذْهَبُوْنَ যাও তোমরা, اِنْ هُوَ اِلَّا এ তো শুধু ذِكْرٌ নছীহত, উপদেশ, لِلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীর জন্য, لِمَنْ شَآءَ যারা চায়, مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে, اَنْ يَّسْتَقِيْمَ সরল পথে চলতে, وَمَا تَشَآءُوْنَ তোমরা চাবে না, اِلَّآ তবে, اَنْ يَّشَآءَ যদি চায়, اللّٰهُ তাআলা, رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক।

যোগসূত্র

ক. পূর্বের আয়াতসমূহে আখেরাতের আলোচনা পেশ করা হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবুয়ত-রিসালাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, এ বিষয়সমূহ জ্ঞানের বহির্ভূত। কেবল নবুয়ত এবং রিসালাত সূত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করা সম্ভব। (হাক্কানী– ৫০)

খ. কেয়ামত, আখেরাত ও হিসাব-নিকাশের যে চিত্র পূর্বের আয়াতসমূহে তুলে ধরা হয়েছে তার সত্যতার প্রমাণ কী? আলোচ্য আয়াতসমূহে তারই প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে।

তাফসীর

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ **(নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত প্রেরিত জনের বর্ণনা।)**

আল্লাহর বার্তার প্রথম মাধ্যম হলেন হযরত জিবরীল। এখানে ১৯, ২০ এবং ২১ নং আয়াতে তার ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি রসূল, কারীম, যী-কুওয়াহ, মাকীন, মুতা' এবং আমীন। এই গুণাবলির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

রসূল

রসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত জন। বার্তাবাহক, দূত। যেহেতু জিবরীল (আ.) মহান আল্লাহর বার্তা এবং পয়গাম নবীগণের নিকট পৌঁছার মাধ্যম, তাই তাকে রসূল বলা হয়েছে। এখানে রসূল শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাকে বার্তা পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর নিকট পৌঁছার অধিকার এবং অনুমতি প্রাপ্ত। এখান থেকে সংবাদদাতার সাথে সংবাদ বাহকের সাক্ষাতের বিষয়টি অনুমেয় এবং কীভাবে জিবরীল (আ.) আল্লাহ্ পাকের নিকট পৌঁছাতে পারেন তাও বোঝা যায়।

এই আমলনামা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا .

আমি প্রত্যেকের কর্ম তার স্কন্ধে ধারণ করে রেখেছি, যা আমি তার জন্য কেয়ামতের দিন বের করব এবং তারা পাবে সে কিতাব খোলা অবস্থায়। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৩)

এ সকল বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানুষকে সতর্ক করেছেন, যাতে মানুষ হুশিয়ার হয় এবং এমন সব নেক কাজ করে, যা কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় উপকারে আসে এবং মুক্তির সনদ হয়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾	(১৫) আমি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের শপথ করছি।
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾	(১৬) যা প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়।
وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾	(১৭) আর রাতের শপথ, যখন তার অবসান হয়।
وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾	(১৮) আর ভোরের শপথ, যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে।
اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾	(১৯) নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত দূতের আনীত বাণী।
ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾	(২০) যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাবান।
مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾	(২১) যে মান্যবর এবং খুবই বিশ্বস্ত।
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾	(২২) আর তোমাদের সাথি উন্মাদ নয়।
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾	(২৩) সে অবশ্যই তাকে (আকাশের) উন্মুক্ত আঙ্গিনায় স্পষ্টভাবেই দেখেছে।
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾	(২৪) সে গায়েবী বিষয়ের বর্ণনায় কৃপণ নয়।
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾	(২৫) এবং কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।
فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾	(২৬) সুতরাং তোমরা কোন্ দিক চলেছ?
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) এ তো বিশ্ববাসীর জন্য পূর্ণ নছীহত।
لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾	(২৮) তোমাদের মধ্যে যে সঠিক সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।
وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾	(২৯) বস্তুত তোমরা তখন চাবে, যখন বিশ্বের রব আল্লাহ্ চাবেন।

www.maktabatulabrar.com

এখানে ১৯ নং আয়াতে কুরআনে পাকের বিশেষ দুইটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল কুরআনে পাক 'কাওলে রসূল' তথা রসূলের বর্ণনা, রসূলের বাণী। সামনে ২৭ নং আয়াতে আর একটি গুণের কথা বর্ণনা করা হবে। তা হল কুরআনে পাক যিকির বা নছীহত।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম, জিবরীলের মাধ্যমে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেহেতু জিবরীলের মাধ্যমে হয়েছে, এ হিসেবে 'কাওলে রসূল' বলা হয়েছে। মূলত এটা আল্লাহর কালাম। কোন মানব, শয়তান, যাদুকর, জ্যোতিষী অথবা শয়তানের প্রলাপ নয়। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই এটা বোঝা যায়।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। কিন্তু ১৯ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, পবিত্র কুরআন জিবরীলের বাণী, মহান আল্লাহর বাণী নয়। কেননা, উক্ত আয়াতে পবিত্র কুরআনকে 'কাওলে রসূল' বলা হয়েছে। আর রসূলের দ্বারা জিবরীলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায়, মূলত পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ পাকের বাণী, এই বাণী রসূলে পাকের নিকট পৌছানোর মাধ্যম হচ্ছেন হযরত জিবরীল (আ.)। যথা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ .

মহান রব্বুল আলামীনের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন নিয়ে জিবরীল আমীন রসূলে পাকের নিকট পৌছিয়েছে। (সূরা নাহ্ল: ১০২)

যেহেতু জিবরীল (আ.) দূত এবং মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন, তাই তার দিকে সম্পৃক্ত করে কাওলে রসূল তথা দূতের বাণী বলা হয়েছে।

মুতাযিলাদের অভিমত

১৯, ২০, ২১ নং আয়াতে জিবরীলের যে সমস্ত গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২২, ২৩, ২৪ নং আয়াতে রসূলে পাকের উপর জিবরীলের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই মুফাস্সির যামাখশারী রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জিবরীল (আ.) শ্রেষ্ট– এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর এটাই মুতাযিলাদের আকীদা ও মতামত।

কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা এবং চূড়ান্ত মত হচ্ছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির সেরা। তিনি সকল নবী রসূল এবং জিবরীল সহ সমস্ত ফেরেশতাগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর পরেই তাঁর স্থান।

মুতাযিলাদের প্রতিবাদ

মুতাযিলাদের প্রতিবাদে মুফাস্সির মাজহারী এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, আসলে ১৯, ২০ এবং ২১ নং আয়াতে যে গুণাবলি উল্লেখ হয়েছে, এগুলো জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলি নয়, বরং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলি। 'কওলে রসূলের' মধ্যে 'রসূল' শব্দ দ্বারা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, জিবরীল (আ.)-কে নয়। সুতরাং জিবরীল (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু মুফাস্সিরগণ মাজহারীর উক্তিটিকে প্রত্যাখান করেছেন এবং ১৯, ২০ এবং ২১ নং আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি হযরত জিবরীল (আ.)-এরই গুণাবলি বলে মত পোষণ

www.maktabatulabrar.com

করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে মাজহারীর বক্তব্যটি বোধগম্য নয়। মুফাস্সিরগণের মতামতটি সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত। আমাদের বক্তব্য হল–

ক. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ, না জিবরীল (আ.) শ্রেষ্ঠ– উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের এটা আলোচ্য বিষয় নয় এবং এ উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত গুণাবলি উল্লেখ করা হয়নি। এ গুণাবলির আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত গুণাবলির ভিত্তিতে জিবরীল (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

খ. পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই গুণাবলির ভিত্তিতে বিবেচনা করলে চূড়ান্তভাবেই জিবরীল (আ.)-এর উপর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়।

গ. রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি আরোপ করলে দেখা যায় উল্লিখিত আয়াতসমূহে জিবরীল (আ.)-এর জন্য যে গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। (পরবর্তীতে 'রসূল [সা.] ও জিবরীল [আ.]-এর গুণাবলির মধ্যে সাদৃশ্য' শিরোনামে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা রয়েছে।) অতএব এখানে উল্লেখ না করা হলেও অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে বা অন্যভাবে হলেও বর্ণিত হয়েছে বিধায় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সমস্ত গুণাবলিরও অধিকারী। সুতরাং জিবরীল (আ.)-এর প্রাধান্য সাব্যস্ত হয় না। ঘ. গভীরভাবে চিন্তা করলে এখান থেকেও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাধান্য সাব্যস্ত হয়। কেননা, এ ধরনের গুণাবলির অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা ওহী নিয়ে বারবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজিরা দিতে বাধ্য। সুতরাং যার দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য, যার চরণে উপস্থিত হওয়ার জন্য এরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, সেই নবীর মর্যাদা এবং সম্মান যে হাজিরাদাতার তুলনায় অনেক বেশি তা বলাই বাহুল্য।

রসূল (সাঃ) ও জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলির মধ্যে সাদৃশ্য

উপরের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন: আল্লাহ্ পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সাথী পাগল নয়। সুতরাং তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞানশক্তির অধিকারী। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে জিবরীল (আ.)-এর জন্য কথিত 'যী-কুওয়াহ' (শক্তিশালী)-এর অর্থ পাওয়া গেল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপক অর্থবোধক ও তত্ত্বসম্বলিত সত্য কথা বলেন। এমন আর এমন লোক সম্মানী হয়ে থাকে। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে জিবরীল (আ.)-এর জন্য কথিত 'মাকীন' (মর্যাদাবান)-এর অর্থ পাওয়া গেল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে পারেন, তাই তিনি নিজেরও কল্যাণ সাধন করেন এবং অন্যের কল্যাণ সাধনেও ব্রতী হন। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে জিবরীল (আ.)-এর জন্য কথিত 'কারীম' (সম্মানিত)-এর অর্থ পাওয়া গেল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বখীল এবং কৃপণ নন, বরং তিনি উদার চিত্তে ব্যয় করেন। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে আমীন এবং কারীম উভয়ের অর্থ থাকার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন শুনেছেন তা-ই বলেছেন। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে জিবরীল (আ.)-এর জন্য কথিত 'আমীন' (বিশ্বস্ত)-এর অর্থ পাওয়া গেল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে গুণাবলির কথা পূর্বে আলোচনা করা হল, এরূপ গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটই লোকেরা সমাগত হয়, লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা করে এবং নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মূলত এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে জিবরীল (আ.)-এর জন্য কথিত 'মুতাইন' মান্যবর)-এর অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিরিখে বলা যায় যে, জিবরীল (আ.)-এর জন্য বর্ণিত গুণাবলি এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলির মধ্যে অত্যন্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং এই গুণাবলির ভিত্তিতে জিবরীল (আ.)-এর প্রাধান্য সাব্যস্ত হয় না।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারীরিক শক্তি প্রসঙ্গ

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানশক্তি ও রূহানী শক্তি সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক ছিল– একথা শীরোধার্য, কিন্তু শারীরিক শক্তি অবশ্যই জিবরীল (আ.)-এর শারীরিক শক্তি বেশি ছিল। আর আয়াতে 'যী-কুওয়াতিন' (শক্তিশালী) বলে শারীরিক শক্তিকেও বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জিবরীল (আ.)-এর প্রাধান্য সাব্যস্ত হয়? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ হিসেবে যে পরিমাণ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, মানুষের মধ্যে এর কোন তুলনা হয় না। রুকানার ঘটনা ও খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খননের সময় পাথর অপসারিত করার ঘটনা ইত্যাদি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শারীরিক শক্তি শক্তিশালী চার হাজার লোকের শক্তির সমান ছিল। তাই বাহ্যত জিবরীল (আ.)-এর শারীরিক শক্তি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তুলনায় অধিক হলেও তাতে জিবরীল (আ.)-এর প্রাধান্য সাব্যস্ত হয় না। কারণ, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাধান্য সমষ্টিগত গুণাবলির ভিত্তিতে সাব্যস্ত। আর প্রাধান্য সাব্যস্ত করার মূলনীতি এটাই। সুতরাং কোন একটি গুণের আধিক্য দ্বারা জিবরীল (আ.)-এর প্রাধান্য হতে পারে। এটা সমষ্টিগত গুণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত প্রাধান্যের পরিপন্থি নয়।

জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলি বিশদভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য

এখানে কয়েকটি আয়াতে হযরত জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলি একটু বিশদভাবে উল্লেখ হয়েছে। সে তুলনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলি অল্প উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি বিষয় সামনে রাখলে এর তাৎপর্য বুঝে আসবে।

(ক) হযরত জিবরীল (আ.) পবিত্র কুরআন পৌছানোর মাধ্যম, তাই বিশেষভাবে হযরত জিবরীল (আ.)-এর পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। আর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ, মানুষের সাথেই তার উঠা-বসা, চলাফেরা সমস্ত কর্মকাণ্ড। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্র সম্বন্ধে সমস্ত আরববাসী অবহিত ছিল। তাই

www.maktabatulabrar.com

এখানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় বিশদভাবে পেশ করার প্রয়োজন নেই। তাই এখানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিস্তৃত গুণাবলি উল্লেখ না করে শুধু 'সাথী' শব্দ ব্যবহার করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

(খ) হযরত জিবরীল (আ.)-এর প্রতি ইয়াহুদীদের অনাস্থা ছিল। হযরত জিবরীল (আ.)-কে তারা শত্রু চিহ্নিত করে। তাই হযরত জিবরীল (আ.)-এর প্রতি ইয়াহুদী সমাজ কর্তৃক আরোপিত অপবাদের প্রতিবাদে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, তার কী দোষ! সে তো আমার মনোনীত রসূল মাত্র। সে তো কারীম তথা উদার চিত্তের অধিকারী সম্মানী ব্যক্তিত্ব। আমি যার নিকট ওহী পাঠাই সে তার নিকটই সে ওহী পৌছে দেয়। সে দুর্বল নয় যে, আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম ইয়াহুদীদের নিকট আর পথিমধ্যে কেউ শক্তি বলে তাকে মুহাম্মাদের নিকট নিয়ে গেছে, বরং সে পরম শক্তিশালী। সে সকল ফেরেশতাদের মধ্যে মান্যগণ্য ও আমীর। তাই সে নিজের পক্ষ থেকেও কোন এমন কাজ করতে পারে না, যা আমানতের খেলাফ হতে পারে। সুতরাং তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মূলত আমি আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণের শামিল।

(গ) মক্কার মুশরিকরা নবুয়ত লাভের পূর্বে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী, আল-আমীন ইত্যাদি বলে অত্যন্ত সম্মান করত, কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর পরশ্রীকাতর হয়ে মক্কার মুশরিকরা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল, জ্যোতিষী, জিনের আছরগ্রস্ত কবি ইত্যাদি অপবাদ দিতে শুরু করে। একবার রসূলে পাক অসুস্থ ছিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আ.)-এর আগমন দুই তিন দিন বিলম্বিত হওয়ায় এক মহিলা বলে ফেলেছিল, মুহাম্মাদ-এর নিকট যে জিন আসত, মনে হয় তার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় এই অপবাদসমূহের প্রতিবাদে বলা হয়েছে, তোমাদের সাথী জ্যোতিষী নন। জ্যোতিষীরা কিছু সত্য আর কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করে ভুল তথ্য পরিবেশন করে, তাও অর্থ স্বার্থের বিনিময়ে। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের নিকট আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত। তার কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনার অবকাশ নেই।

সারকথা এখানে হযরত জিবরীল (আ.)-এর বিশদ পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন ছিল বিধায় তা-ই করা হয়েছে। আর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু কাফেরদের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করা। এতটুকু প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সংক্ষেপে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুটি গুণ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এই তাৎপর্য উপলব্ধি না করে যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলির সাথে জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলির তুলনা করত, জিবরীল (আ.)-এর গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা দেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রায়াস পেয়েছেন, তারা আয়াতসমূহের সঠিক তাৎপর্যই বুঝতে পারেননি।

وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ **(তোমাদের সাথী উম্মাদ নন।)**

এখান থেকে দ্বিতীয় মাধ্যম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে। একটা হল তিনি তাদের সাথী। আর একটা হল তিনি পাগল বা উম্মাদ ছিলেন না।

সাথীরা খবর রাখে। একসাথে চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার করে থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথী ছিলেন। তারা চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা,

আচার-ব্যবহার দেখে একপর্যায়ে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল-আমীন উপাধীতে ভূষিত করে। (আখবারে মক্কা) তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার ব্যক্তিত্ব। কোন দিন মিথ্যা বলতেন না। আবূ লাহাবসহ সকলেই একথার স্বিকৃতি দেয় (যারকানী)। তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাভাজন এবং মান্যবর ব্যক্তি। আল্লাহর ঘরে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে তার ভূমিকা এর উজ্জ্বল প্রমাণ (তারিখুল ইসলাম, যাহাবী)। তার অসাধারণ গুণাবলি, পবিত্র চরিত্র মাধুর্য, জনসেবা ও জনকল্যাণকর অবদানে মুগ্ধ ছিল সমাজের সর্বশ্রেণির জনগণ। তার মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে আরবের ধনাঢ্য মহিমান্বিত নারী হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে নিজকে ধন্য মনে করেন। নবুয়ত লাভের মুহূর্তে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসার বাণী আজও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে (বোখারী শরীফ)। ওরাকার ভবিষ্যৎবাণীও ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় (উমদাতুল কারী)। তাঁর অসাধারণ গুণাবলী তার নবুয়তের পূর্বাভাস ও আলামতস্বরূপ। কিন্তু করার কিছু নেই। এত দিন যার এতগুণ-গান করা হয়েছে তাঁকে কী করে মিথ্যুক বলা যায়? কী করে স্বার্থপর বলা যায়? তবে কিছু তো বলতে হবেই! তাই বলা হল সে তো হঠাৎ করে পাগল হয়ে গেছে! আয়াতে এরই খণ্ডন করে বলা হয়েছে, তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়।

পাগলের পরিচয় হচ্ছে পাগল হয়ে থাকে জ্ঞানশুন্য। পাগল অর্থহীন ও বল্গাহীন কথাবার্তা বলে থাকে, ভাল-মন্দ বিবেচনায় ব্যর্থ থাকে। পাগল কাউকে সম্মান করতে জানে না। সে নিজেও সম্মান পায় না, কারও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে যে পাগল নয়, সে জ্ঞানশক্তির অধিকারী, সত্য এবং তত্ত্বসম্বলিত কথা বলে, ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে সক্ষম হয়, পরকে সম্মান দিতে জানে, সে নিজেও সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়।

স্বার্থান্বেষী মহল তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি পাগল? পাগলের মত প্রলাপ করে থাকেন? বরং তিনি তো অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও তত্ত্বময় জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন। সমাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অপরাধ-ফাসাদ বর্জন ইত্যাদির নছীহত উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁকে কী করে পাগল বলা যায়? আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতিবাদ করে বলেন, সে তোমাদের পুরানো সাথীই, সে পাগল নয়। সে আমার প্রিয় নবী। সে সঠিক মেধাশক্তির অধিকারী, সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন। সুতরাং তিনি যা বলেন, তা আমারই বাণী। আমি জিবরীলের মাধ্যমে তার নিকট তা প্রেরণ করেছি।

وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ (সে অবশ্যই তাকে [আকাশের] উন্মুক্ত আঙ্গিনায় স্পষ্টভাবেই দেখেছে।)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল নন। তিনি শ্রেষ্ঠনবী। তিনি হযরত জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর পয়গাম পেয়েছেন। কাফেররা এখান থেকে শুরু করে দিল তাঁর গুজব ছাড়ানো যে, না না মুহাম্মাদ হয়তো জিন-ভূত থেকে এসব কথাবার্তা সংগ্রহ করে থাকে আর মনে করে যে, তার নিকট ফেরেশতা এসে আল্লাহর ওহী পৌঁছিয়েছে। কিন্তু জিন ভূত কি এত সুন্দর বাণী রচনা করতে পারে? অবশ্যই পারে না। এতো মহান আল্লাহর বাণী, যা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে পেয়েছেন। তিনি জিবরীলকে চিনেন। বহুবার দেখেছেন এবং সুস্পষ্টভাবেই দেখেছেন। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুজাহিদ, সুফিয়ান থেকে জিবরীল

www.maktabatulabrar.com

(আ.)-কে দেখার ঘটনাবলি বিদ্যমান রয়েছে (তাবারী)। সুতরাং তাকে পাগল অথবা জিন ভূতের আছর যুক্ত বলা সঠিক নয়। সূর্য যেদিক থেকে উদয় হয়, সেই স্থানে হযরত জিবরীল (আ.)-কে অত্যন্ত সুন্দর সজ্জিতাবস্থায় আসল আকৃতিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন। এমতাবস্থায় তিনি বিশ্বনবীকে আল্লাহর বাণী শোনান। সুতরাং না দেখার অথবা ভুলের কোন অবকাশ নেই।

আরবী প্রবাদে বলা হয় 'শোনা আর দেখা সমান নয়'। কারণ, স্বচক্ষে দর্শন করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যা না দেখে কেবল শোনার উপর ভিত্তি করে সম্ভব হয় না। কথাটি নবীদের বেলায় প্রযোজ্য না হলেও সাধারণ লোকদের বেলায় অবশ্যই প্রযোজ্য। সুতরাং স্বচক্ষে দর্শন লাভ হলে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা যায়।

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (তিনি গায়বী বিষয়ের বর্ণনায় কৃপণ নন।)

তিনি গায়েবের কথা যখন যা আমার পক্ষ থেকে জিবরীলের মাধ্যমে পান তা পুরোপুরি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকেন। কোন কিছু গোপন করেন না। তিনি বখীলও নন যে, কৃপণতা করবেন। তোমাদের জীবন সমস্যার সমাধানে যে সমস্ত নছীহতের বাণী শোনান এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশের, জান্নাত জাহান্নামের যা কিছু বলেন, এ সব কিছু ধ্রুবসত্য, আমার পক্ষ থেকেই বলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের এসকল নছীহত ও হুকুম-আহকাম মেনে চলা উচিত। এতেই তোমাদের উভয় জাহানের মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

কৃপণ সাধারণত তিন প্রকার। সাধারণ কৃপণ, বিশেষ কৃপণ এবং চরম কৃপণ। সাধারণ কৃপণের পরিচয় হল তারা ধন-সম্পদের অধিকারী অথচ নিজের জন্য খরচ করায় উদাসীন, সন্তান সন্ততির জন্য অত্যন্ত মনোকষ্টের সাথে খরচ করে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বেলায় খরচ করতে হলে প্রয়োজনের তুলনায় কম মাত্রায় খরচ করে আবার অন্তরে কষ্ট পায়। আর বিশেষ কৃপণ হচ্ছে, যে নিজের সন্তান-সন্ততির, আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনেও খরচ করতে চায় না, বরং জমা করে রাখার মধ্যে শান্তি ও তৃপ্তি পায়। সাধারণ লোকদের জন্য খরচ করার তো প্রশ্নই আসে না। আর চরম কৃপণের পরিচয় হচ্ছে, যে জমাকৃত সম্পদ মোটেই খরচ করে না আর অন্যকে খরচ করতে দেখলে তার গায়ে জালা পোড়া শুরু হয় এবং নেহায়েত অস্বস্তি বোধ করে। সুযোগ পেলে খরচকারী লোকদেরকে কৃপণতার তালীম দেয়। বস্তুত এ ধরনের কৃপণদের নিকট লোকের সমাগম হয় না। পক্ষান্তরে যে কৃপণ নয়, সে তার সম্পদ যে ধরনেরই হোক নিজের জন্য খরচ করে, নিজের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ-বান্ধব ও জনসাধারণের কল্যাণে আনায়াসে ব্যয় করে এবং এই ব্যয় করাতে সে তৃপ্তি ও শান্তি পায়। এ ধরনের লোকের আশেপাশে লোকের সমাগম হয়, লোকেরা তাকে সম্মান করে নিজেদের নেতা এবং কর্তা হিসেবে মেনে নেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃপণ ছিলেন না। তাই তাঁর আশেপাশে লোকের সমাগম হত। লোকেরা তাঁকে সম্মান করে নিজেদের নেতা এবং কর্তা হিসেবে মেনে নিত।

وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ **(এবং কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। সুতরাং তোমরা কোন দিক চলেছ? এতো বিশ্ববাসীর জন্য পূর্ণ নছীহত।)**

আল্লাহর বার্তার তৃতীয় মাধ্যম পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। কুরআন আল্লাহর কালাম, সন্দেহমুক্ত কিতাব। এর সংরক্ষণের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। সমস্ত নবী রসূল ও তাদের উম্মতগণের সঠিক ইতিহাস এতে সংরক্ষিত হয়েছে। এতে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয়া আছে। নির্ভুল তত্ত্ব সম্বলিত এ কিতাব কোন মানুষের বা শয়তানের প্রলাপ নয়।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (সুতরাং তোমরা কোন দিক চলেছ?)

উপরোক্ত দুই পদ্ধতি অর্থাৎ, সঠিক সংবাদমাধ্যম ও সঠিক ইতিহাস মাধ্যমে তোমাদেরকে কেয়ামতের বাস্তবতার কথা জানানো হচ্ছে। সুতরাং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সুতরাং হে বিদ্রোহী সমাজ, তোমরা কোথায় চলেছ? তোমরা কেন চিন্তা করো না? তোমাদের ভুল চিন্তা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, চির লাঞ্ছনা-বঞ্চনার পথে চালাচ্ছে। তোমাদের ধারণা হল পবিত্র কুরআন শয়তানের কথাবার্তা অথবা যাদুটোনা কিংবা কবির কল্পনা। এটা তোমাদের ভুল ধারণা। শয়তান, মানুষ, যাদুকর, জ্যোতিষী ও পৃথিবীর সকলে মিলেও কী এরূপ গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম? বিশেষত পণ্ডিতগণ, কবি-সাহিত্যিকগণ পবিত্র কুরআনের মতো কিতাব রচনা করতে চেষ্টা করেনি কি? অবশেষে ব্যর্থ হয়ে লজ্জিত সুরে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকৃতী দেয়নি কি? যদি এটা জিন-ভূতের প্রলাপ হবে, তবে তারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে না কেন? পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের সময় ভয়ে পলায়ন করে কেন? একটু চিন্তা কর এবং নিজের সার্বিক জীবনের কামিয়াবীর জন্য পবিত্র কুরআন ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুকরণ ও অনুসরণে ব্রতী হও।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (এতো বিশ্ববাসীর জন্য পূর্ণ নছীহত।)

পূর্বে ১৯ নং আয়াতে কুরআনে পাকের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছিল যে, কুরআনে পাক হল কাওলে রসূল (দূতের বাণী)। আর এই ২৭ নং আয়াতে কুরআনে পাকের আর একটি গুণ বর্ণনা করা হল যে, কুরআনে পাক হল 'নছীহত'।

গভীরভাবে গবেষণা করলে সস্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআন হল সম্পূর্ণ উপদেশমালা। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের দিক-নির্দেশনা দানকারী একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। সুতরাং হে মানবজাতি, হে কাফের সমাজ, তোমরা মনেপ্রাণে এই নছীহতনামা কবূল কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল সাধিত হবে।

(৮২) সূরা ইনফিতার, মক্কী
১৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ①
(২) আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②

www.maktabatulabrar.com

(৩) আর সাগরসমূহ যখন প্রবাহিত হয়ে পড়বে।	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③
(৪) আর যখন কবরসমূহ ওলট পালট করে দেয়া হবে।	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④
(৫) (তখন) প্রত্যেক মানুষ জেনে নিবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑤
(৬) হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?	يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑥
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।	الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ⑦
(৮) যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তোমাকে গঠন করেছেন।	فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ⑧

শব্দার্থ

اِذَا যখন আসমান, اَلسَّمَآءُ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, اَلْكَوَاكِبُ নক্ষত্ররাজি, اِنْتَثَرَتْ বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, اَلْبِحَارُ সাগরসমূহ, فُجِّرَتْ প্রবাহিত হয়ে পড়বে, اَلْقُبُوْرُ কবরসমূহ, بُعْثِرَتْ ওলট পালট করে দেয়া হবে, عَلِمَتْ জেনে নিবে, نَفْسٌ প্রত্যেক মানুষ, مَا قَدَّمَتْ সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে, وَاَخَّرَتْ এবং সে কী পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানুষ! مَا কোন্ জিনিস, غَرَّكَ তোমাকে ভ্রমে ফেলে রেখেছে, بِرَبِّكَ তোমার প্রতিপালক সম্বন্ধে, اَلْكَرِيْمِ দয়ালু, اَلَّذِىْ যিনি, خَلَقَكَ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, فَسَوّٰىكَ অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন, فَعَدَلَكَ এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ যে আকৃতিতে شَآءَ তিনি ইচ্ছা করেছেন, رَكَّبَكَ তোমাকে গঠন করেছেন।

সারমর্ম

১-৩ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে প্রথম ফুৎকারের সময়ের ঘটনা এবং সামনের আয়াতসমূহে দ্বিতীয় ফুৎকার পরবর্তী ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

তাফসীর

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (আর সাগরসমূহ যখন প্রবাহিত হয়ে পড়বে।)

অর্থাৎ, লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে একাকার হয়ে যাবে। অতঃপর সব পানি আগুনে পরিণত হয়ে যাবে। যেমন সূরা তাকভীরে বর্ণিত হয়েছে।

وَ اِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ **(আর যখন কবরসমূহ ওলট পালট করে দেয়া হবে।)**

অর্থাৎ, কবর থেকে মৃতরা বের হয়ে আসবে। (বয়ানুল কুরআন)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ **(প্রত্যেক মানুষ জেনে নিবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।)**

অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ আমল করা এবং পশ্চাতে ছেড়ে যাওয়ার অর্থ আমল না করা। সুতরাং কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে নেক-বদ কী আমল করেছে আর কী আমল করেনি। আরেক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি, কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা চালু করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার ছওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। (আইছারুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ **(হে মানুষ, কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলে রেখেছে?)**

এ আয়াত থেকে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিয়ে সামান্য চিন্তা ভাবনা করলে মানুষ সহজে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত। কিন্তু মানুষ ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কীসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে?

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ তার ভাল মন্দ কৃতকর্ম সব কিছুই জানতে পারবে এবং স্বচক্ষে দেখতে পারবে। অতঃপর হিসাব-নিকাশের পর শাস্তি ভোগ করবে অথবা জান্নাতী হবে। এসব কিছু যা হবার দুনিয়ার আমলের পরিপ্রেক্ষিতেই হবে। অতএব মানুষের সম্মুখে দুটো রাস্তা! একটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাস্তা, অপরটি হচ্ছে ইবলীস শয়তানের রাস্তা। শয়তানের কোন অবদান বা এহসান মানুষের প্রতি নেই। তদুপরী মানুষের কারণে শয়তান আল্লাহর অভিশপ্ত হয়েছে, এ কারণেই মানুষের প্রতি তার ক্ষোভ, চরম শত্রুতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা। মানুষের কল্যাণ, উন্নতি ও শান্তি হোক শয়তান তা সহ্য করতে পারে না। তার চিন্তা হল মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও ধ্বংস করে দেয়ার চিন্তা। জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়ার জন্য রয়েছে তার অবিরাম এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা। অপর পক্ষে আল্লাহ্ পাক মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি অত্যন্ত মহব্বত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি বড় মায়া করেন, ভালবাসেন। মানুষের প্রতি তার উদারতা ও ক্ষমা অপরিসীম। মানুষের জীবন সফল হোক, উন্নত হোক, তার পরিণাম ভাল হোক, নিরাপদ হোক, জান্নাত লাভে মানুষ চির সুখী হোক– আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য এটাই চান। কিন্তু মানুষ শতানের ধোঁকায় এই মরিচিকাময় পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার অমূল্য জীবনকে ধ্বংসের দিকে

www.maktabatulabrar.com

ঠেলে দেয়। দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টিকেই বিনষ্ট করে দেয় এবং জাহান্নামী হয়। অথচ এটা মানুষের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। আল্লাহ পাক করুণাময়ী। তিনি স্বীয় করুণার তাগিদেই মানুষকে সতর্ক এবং হুশিয়ার করে দিচ্ছেন। মূলত আলোচ্য আয়াতে রব ও কারীম– এ দুটি গুণের উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, হে মানুষ, তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি। জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তিতে সকল সৃষ্টির উপর তোমাকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছি। এই কি তোমার জ্ঞানের প্রতিফল, এই কি তোমার বিবেচনা? তুমি যে প্রতারিত হচ্ছ, শয়তানের পথে পরিচালিত হয়ে সর্বস্ব নিপাত করে দিচ্ছ, পরিণামে জাহান্নামী হতে চলেছ। তোমার প্রতি অগণিত এহসান ও দয়ামায়া প্রদর্শনকারীর সাথে বেঈমানী এবং নিমকহারামী করছ– তা কি তুমি কখনো ভেবে দেখেছ? যিনি তোমার স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিণাম নির্ধারণের মালিক, তার প্রতি আত্মসমর্পণ করত তার হুকুম-আহকাম পালন করে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কি তোমার উচিত নয়?

রব ও কারীম ব্যবহারের উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি লালন-পালন করেন। মানুষের শারীরিক চাহিদা, প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থাপনার পিছনে মহান আল্লাহর কত মায়া-মমতা, হেকমত, কুদরত ও রহস্য নিহিত রয়েছে, তা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে এসব কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। 'কারীম' অর্থ দয়ালু। মহান আল্লাহর কৃপা, ক্ষমা, উদারতা এবং মানুষের প্রতি তার অনুগ্রহের প্রতীকস্বরূপ এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় শব্দের সাহয্যে আল্লাহ পাক মানুষকে শয়তানের রাস্তা বর্জন করে আল্লাহ পাকের রাস্তায় আসার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। কারণ, তিনি রব তিনি কারীম।

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ **(কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলে রেখেছে?)**

ধোঁকার কারণ

মানুষের জন্য পদার্থ সৃষ্টি, মানুষের উপকারের উপকরণ সৃষ্টি এবং মানুষকে উত্তম আকৃতি দানসহ মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অগণিত এহসান থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন হয়– ধোঁকাগ্রস্ত হয় এর কারণ কী? এ উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মানুষ দুই প্রকার। যথা:

(ক) কাফের-মুশরিক, যারা তাওহীদ, রিসালাত এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে না। এরা শয়তানের প্রবঞ্চণা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বিভ্রান্ত ও ধোঁকাগ্রস্ত হয়। শয়তানের ধোঁকা বুঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি না থাকাই তাদের উদাসীনতার বড় কারণ।

(খ) তবে অনেক মু'মিন মুসলমানকেই আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন এবং ধোঁকাগ্রস্ত দেখা যায়, এর একটি বড় কারণ হচ্ছে শয়তানী প্রতারণা এবং পরিবেশের প্রভাব। পরিবেশের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় আজ সারা বিশ্ব অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য একপ্রকার মুসলমানদেরকে এও বলতে শোনা যায় যে, আল্লাহ্ পাক বড়ই করুণাময়, দয়াশীল, ক্ষমাকারী, তাই আমরা যত পাপই করি না কেন, তিনি তা

ক্ষমা কর দিবেন। তাদেরকে একথাও বলতে শোনা যায় যে, পাপ কাজ করার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক আযাব দেননি কেন? আযাব দিয়ে দিলে বান্দা সতর্ক হয়ে যেত। সুতরাং যেমন আল্লাহ্ পাক দয়া করে অপরাধের সাথে সাথে আযাব দেননি, তেমনি পরবর্তী সময়ে হাশরের ময়দানেও তিনি ক্ষমা করে দিবেন। হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রহ.) বলেন যে, 'আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাকে আমার ব্যাপারে কে ধোঁকা দিয়েছিল? তাহলে আমি এই উত্তর দিব, আমার গোনাহের প্রতি আপনার ক্ষমা এবং অবকাশের কারণেই আমি গোনাহ করতে সক্ষম হয়েছি এবং ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছি।' হযরত আলী (রা.) কয়েক বার তার গোলামকে সজোরে ডাকলেন। কিন্তু গোলাম তার ডাক শোনার পরও গোলাম উত্তর দেয়নি, সম্মুখেও আসেনি। হযরত আলী (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার ডাক শুনেও তুমি উত্তর না দেয়ার সাহস পেলে কোথা থেকে? গোলাম উত্তরে বলল, 'আপনার ধৈর্যের বিশ্বাস এবং আপনার পক্ষ হতে আমাকে শাস্তি না প্রদানের একীন।' হযরত আলী (রা.) গোলামের এই উত্তরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং তাকে আজাদ করে দেন। বস্তুত আল্লাহর রহম-দয়া এবং ক্ষমার বিশ্বাসও অনেকের জন্য ধোঁকার কারণ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সঠিক নয়; বরং যিনি এহসান করেন তার আনুগত্য স্বীকার করা, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই হচ্ছে মানবতার চাহিদা। স্নেহ, দয়া ও করুণার বাহানায় তার প্রতি অনাস্থা, অবিশ্বাস মূর্খতার নামান্তর, চরম বিশ্বাস ঘাতকতা। এরূপ ধারণার পিছনেও রয়েছে শয়তানের প্রতারণা।

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ **(যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন এবং তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।)**

অর্থাৎ, তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তদুপরি তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমার উপাদান চতুষ্টয় ও মেযাজকে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। যথা: হাত দুটো, পা দুটো, কান দুটো, চক্ষু দুটো, একটি যবান, একটি মাথা। অর্থাৎ, যেখানে যে পরিমাণ প্রয়োজন সেখানে সেই পরিমাণ সংযোজন করেছেন এবং বাহির ভিতরকে সুন্দর সুঠাম করেছেন। মূলত আলোচ্য সাত নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক মানুষের গঠন প্রকৃতির জাহের ও বাতেনে বিদ্যমান সমস্ত বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তোমাকে গঠন করেছেন।)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক পার্থক্য থাকত না এবং সমষ্টিগতভাবে তিনি মানবজাতিকে প্রাণীকুলের মাঝে সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন। সুতরাং যে পালনকর্তা মানুষের মাঝে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর ব্যাপারে ধোঁকা খাওয়া এবং তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। বরং তার হুকুম-আহকাম মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা মহানুভব হওয়ার দ্বারা ধোঁকা খাওয়ার পরিবর্তে তার অপার দয়া ও কৃপার কথা স্মরণ করে আরও অধিক অনুগত হওয়া উচিৎ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর এক মহা এহসান

মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণী ও অগণিত এহসানের আংশিক বর্ণনা আলোচ্য সূরার ৭ ও ৮ নং আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি হচ্ছে– 'মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গ'। এক সময় মানুষ ছিল অস্তিত্বহীন, তার কোন নামগন্ধও ছিল না। অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছায় মানুষ তৈরীর মূল পদার্থ সৃষ্টি করেন এবং সেই পদার্থকে মাটিতে, পানিতে, আকাশে, বাতাসে, অগ্নিতে, সূর্য ও তারকারাজির আলোতে অনুপরমাণুর আকারে বিন্যস্ত করত পানাহারের মাধ্যমে ভিটামিন রূপে অথবা অন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে নারী পুরুষের মাংস পেশীতে এবং শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করান। সেখানে পুরুষ হলে তার মধ্যে শুক্রের সৃষ্টি হয় আর নারী হলে তার মধ্যে ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। অতঃপর স্বামী স্ত্রীর মিলনে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংমিশ্রণ ঘটে এবং পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্ পাক মানুষকে তৈরি করেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝

আমি মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা মুমিনূন: ১২)

অর্থাৎ, মাটির উপাদানকে শুক্রে রূপান্তরিত করে নারীর জরায়ুতে ধারণ করেছি। অতঃপর আমি শুক্রকে জমাট রক্ততে আর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। তার মধ্যে হাড় সৃষ্টি করি। এরপর হাড়ের সাথে মাংস সংযুক্ত করত এক পূর্ণাঙ্গ মানবে রূপান্তরিত করি। এ মর্মে সূরা হজ্জের শুরুতে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۔

এ আয়াতের ভাবার্থ হল– পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতির মাংসপিণ্ড তৈরি করে তোমাদেরকে আমার কুদরতের পরিধি বুঝাই। অতঃপর ঐ মাংসপিণ্ডকে আমার ইচ্ছামতো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি। আর আমি তোমাদেরকে শিশু হিসেবে গড়ে তুলি। তৎপর তোমরা উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হও। বস্তুত তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটানো হয়, আবার কাউকে বার্ধক্যের বয়সে পৌছানো হয়, এমন বার্ধক্যের বয়সে যে, জ্ঞাত বিষয়ে তারা অজ্ঞাত হয়ে পড়ে। (সূরা হজ্জ: ৫)

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টির বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। এর ভেতর গভীরভাবে চিন্তা করলে মহান রব্বুল আলামীনের কুদরত এবং মানুষের প্রতি তার কল্পনাতিত দয়া ও করুণার যথেষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব।

মহান আল্লাহ্ পাক কেবল মানুষের পদার্থ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, বরং পদার্থসমূহকে সার্বিক সুন্দরভাবে অতি সমাঞ্জস্যপূর্ণ করে সংযোজন করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকৃত হওয়ার উপকরণ বিদ্যমান রেখেছেন, মানুষ তা থেকে উপকৃত হয়। চোখে দেখে, কানে শোনে, হাতে ধরে, পায়ে চলে, যবানে কথা বলে, আল্লাহর যিকির করে আন্তরিক

সমৃদ্ধি লাভ করে, জ্ঞান-বুদ্ধির সাহয্যে সমগ্র পৃথিবী এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রূহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে মারেফাত লাভে ধন্য হয়। এসব কিছু প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা এবং রহমত।

সকল সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ পাক মানুষকে অধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি মানুষকে অতি ঘৃণ্য আকৃতিতে অথবা পশুর আকৃতিতে তৈরী করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে কেই তাকে বাধা দেয়ার ছিল না। কিন্তু তিনি মেহেরবানী করে এবং মহব্বত করে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে তৈরি করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, 'অব্যশই আমি মানুষকে অতি উত্তম করে সৃষ্টি করেছি।' কোন একলোক বলেছিল, তুমি যদি চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর না হও, তবে তোমাকে তিন তালাক দিলাম। খলীফা মনছুর এ সম্পর্কে সঠিক ফাতওয়ার জন্য বিশিষ্ট ওলামা মাশায়েখদের জমা করে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। উপস্থিত একজন বললেন, 'তালাক হয়নি'। কারণ, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।' এতে বোঝা যায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সুন্দর এবং উত্তম। (সেমতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর।) খলীফা মনছুর মতটিকে অগ্রাধিকার দেন।

আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে কি?

এখানে একটা বিষয় আলোচনায় আনা যায় যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাহলে কি আর কেউ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়? এ পশ্নের জবাবে বলা হবে সৃষ্টিকর্মে আর কেউ আল্লাহর শরীক নেই। 'সৃষ্টিকরণ' প্রক্রিয়ায় আল্লাহ তাআলা ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। এ বিষয়ে কেউ তার শরীক নেই, কেউ তার সমকক্ষ নেই। তাঁই তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন,

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ .

(হে নবী! তুমি তাদেরকে) বল, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক সেই সমস্ত দেব-দেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। অথবা পৃথিবী ও আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? (সূরা আহ্কাফ: ৪)

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আধুনা এ বিশ্বের কিছু কিছু জ্ঞানী গুণী স্বীয় আবিষ্কারসমূহকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে পেশ করতে চায়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, ইতিমধ্যে তারা রক্ত আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে যান্ত্রিক উপায়ে রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করতে সক্ষম হবে। এভাবেই ধাপে ধাপে উন্নতি সাধন করে একদিন তারা আপন লক্ষ্যমূল– মানব সৃষ্টিতে পৌছে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল– একে সৃষ্টি বলা যায় কী? আল্লাহ পাক মানুষকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টির জন্য তার কি ফর্মূলা, কী কী পদার্থ কীভাবে কত সময়ে সংযোজন করা হয়, পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র হাদীছে এর বিশদ বিবরণ পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এখন কেউ যদি সেই ফর্মূলা মতে কোন কিছু তৈরি করে, তবে কি সে স্রষ্টা, নাকি ফর্মূলা অনুসরণকারী এবং অন্যের ফর্মূলা চুরি করার অপরাধে অপরাধী? সৃষ্টির মূল হচ্ছে পদার্থ সৃষ্টি করা। অতএব আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট পদার্থসমূহকে সংযোজন করে কোন কিছু প্রস্তুত করা কি সৃষ্টি? না আবিষ্কার? গণ্ড মূর্খ রাজমিস্ত্রি ইট, সিমেন্ট, বালু রড ইত্যাদির সংমিশ্রণে একটি ইমারত নির্মাণে সক্ষম হয়, তবে কি সে-ই স্রষ্টা? একজন মুচি চামড়ার

www.maktabatulabrar.com

কিছু টুকরাকে একসাথে জুড়ে সেলাই করে থাকে, তাতে সুন্দর জুতা প্রস্তুত হয়, তাহলে মুচিও কি স্রষ্টার আসনে সমাসীন? আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি করা পদার্থ তার দেয়া জ্ঞানের মাধ্যমে সংযোজন করে কোন বস্তু প্রস্তুত করাকে আবিষ্কার বলা যেতে পারে, একে সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা মূর্খতার নামান্তর নয় কি? এর পর প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মাবিহীন শরীর তথা রূহবিহীন কংকালকে মানুষ বলে না, মূর্তি বলা চলে, মৃত লাশ বলা চলে। তাই আত্মা পরিবেশন এবং সৃষ্টি করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। 'বর্তমানে পাষ্টিক সার্জারী মানুষের মধ্যে নতুন এক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে এ চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে, তাদের মতে, 'মানুষ তার আয়ুর সীমা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।' সেই সঙ্গে বার্ধক্যকেও কীভাবে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দময় করে তোলা যায়, কীভাবে থাকা যায় আরো সুস্থ ও সচল সে ব্যাপারেও নিরন্তর চেষ্টা চলছে। বার্ধ্যক্যকে ঠেকিয়ে রাখারও অনেক চেষ্টা চলছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব নব পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেও সবল দীর্ঘ জীবন লাভের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমে দেহসৌষ্ঠব ধরে রাখারও চেষ্টা চলছে। এমন একদিন হয়ত আসবে, মানুষ যখন জরাবার্ধক্য জয় করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কেমন হবে তখন? মানুষ হবে চির যৌবনের অধিকারী। কেউ বৃদ্ধ হবে না। কারও দেহের ত্বক হবে না শিথিল। চোখে উঠবে না পুরু লেন্সের চশমা। মাথায় শোভা পাবে না শুভ্র কেশরাজি। কপালে পড়বে না বয়সের বলী রেখা। জানি না এ জীবন কেমন হবে'। (ইত্তেফাক: অক্টোবর, ১৯৯২ইং)

এরই উত্তর পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কবি ইকবালের গদ্যে। তিনি লিখেন, 'কোন এক পাগল নতুন কাল সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু নতুন পৃথিবী এবং নতুন আসমান সৃষ্টি করতে পারেনি বিধায় তার কাল বানানো হলো না।'

কবি তার ভাষায় উপহাস করেছেন। কারণ, কাল সৃষ্টি করলে সেই কালের জন্য একটি নতুন পৃথিবীর প্রয়োজন। সেই নতুন পৃথিবী নতুন কালে পরিচালিত হবে। কেননা বর্তমান পৃথিবী আল্লাহর তৈরী কালের আওতাধীন পরিচালিত। এ ধরনের লোকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ الخ

হে জিন ও মানুষ, তোমরা যদি আসমান যমীনের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হও তাহলে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা (তার শক্তি) ব্যতিরেকে পারবে না। (সূরা আর-রহমান: ৩৩)

মোটকথা, পদার্থ সৃষ্টি, পদার্থ সংযোজন ও তাকে ক্রিয়াশীলকরণে আল্লাহ পাকের কোন শরীক নেই। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ।

আল্লাহ পাক যাকে যেভাবে ইচ্ছা করেছেন তাকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কাউকে মাতা-পিতার, নানা-নানীর অথবা বংশের কারও আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছেন। কাউকে একেবারেই ভিন্ন আকৃতি দিয়েছেন। কাউকে করেছেন কালো, অথচ তার মাতা-পিতা সুন্দর। আবার কাউকে করেছেন

সুন্দর, অথচ তার মাতা-পিতা উভয়ই অথবা দুজনের একজন কালো। মুখমণ্ডলের সামান্য জায়গায় নাক, জিহ্বা, দাঁত, চক্ষু, কান এসবকিছু এতো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যার কোন তুলনা হয় না। প্রত্যেকটির কর্মকাণ্ড এবং গঠন প্রণালী এক, কিন্তু কোন মিল নেই। একের চেহারা অপরের সাথে মিলে না। কথাবার্তা, স্বর এবং আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এসব কিছু আল্লাহ্ পাকের একক কুদরতের প্রতিফল। অন্য কেউ এতে শরীক নেই। কারও পরামর্শ অথবা সামান্য ক্ষমতারও অবকাশ নেই। কেউ তার নিকট দরখাস্তও করেনি অথবা তাকে বাধ্য করেনি, বরং সব কিছু করায় তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বীয় ক্ষমতা এবং ইচ্ছায় করছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩	(৯) মোটেই নয়, বরং তোমরা তো কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে থাক।
وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠	(১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়কগণ নিয়োজিত আছেন।
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١	(১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ।
يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢	(১২) তারা জানে যা তোমরা করে থাক।
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝١٣	(১৩) যারা সৎলোক তারা অবশ্যই পরম সুখে থাকবে।
وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝١٤	(১৪) আর যারা অসৎ তারা অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে।
يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥	(১৫) তারা বিচার দিনে সেখানে প্রবেশ করবে।
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝١٦	(১৬) তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧	(১৭) প্রতিফল দিবস কেমন তা কি তুমি জান?
ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٨	(১৮) পুনরায় বলছি, বিচারের দিন সম্পর্কে তোমার জানা আছে কি?
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝١٩	(১৯) সেদিন কেউ কারও কোন কিছু করতে সক্ষম হবে না। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর হবে।

শব্দার্থ

كَلَّا অবশ্যই না, بَلْ বরং تُكَذِّبُوْنَ অস্বীকার করে থাকে, بِالدِّيْنِ কর্মফল দিবসকে, বিচারের দিনকে, اِنَّ অবশ্যই, عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর, حٰفِظِيْنَ তত্ত্বাবধায়কগণ, সংরক্ষকগণ, كِرَامًا সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়, كَاتِبِيْنَ লেখকবৃন্দ, يَعْلَمُوْنَ তারা জানেন, تَفْعَلُوْنَ ما যা কিছু তোমরা করে থাক, اَلْاَبْرَارَ নেক লোকগণ,

www.maktabatulabrar.com

نَعِيْمٍ জান্নাত, اَلْفُجَّارَ পাপী লোকেরা, جَحِيْمٍ জাহান্নাম, يَصْلَوْنَهَا তাতে প্রবেশ করবে, يَوْمُ الدِّيْنِ কর্মফল প্রদানের দিন, বিচারের দিন, وَهُمْ عَنْهَا তথা থেকে তারা, بِغَآئِبِيْنَ অন্তর্হিত উধাও, وَمَا اَدْرٰىكَ তুমি কি জান? لَا تَمْلِكُ সক্ষম হবে না, نَفْسٌ কোন ব্যক্তি, شَيْـًٔا কোন কিছু, وَالْاَمْرُ সমস্ত কর্তৃত্ব, সমস্ত ক্ষমতা, يَوْمَئِذٍ সেদিন, لِّلّٰهِ আল্লাহর।

সারমর্ম

হে মানবজাতি, এমন করুণাময় দয়ালু প্রভুকে ভুলে যাওয়া এবং তার ব্যাপারে ধোঁকা খাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। তার এহসানের শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ, কিন্তু তোমাদের কি হলো, তোমরা যে একেবারেই তাঁকে ভুলে রয়েছ? বিচারের দিনের কথা, কর্মফলের কথাও ভুলে বসেছ? তোমরা হয়ত ভাবছ যে, কবে কী করেছি তার কি কোন হিসাব আছে? তোমাদের এরূপ চিন্তা-ভাবনা নিতান্ত ভুল। কেননা, তোমাদের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সব কর্মকাণ্ড লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। তারা অতি মহান এবং সু-লেখক। তারা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয় এবং সঠিক সুন্দর ভাবেই লিখে রাখে। বিচারের দিন এই লিপিমালা অনুপাতে হিসাব-নিকাশ হবে। যাদের কর্ম ভাল প্রমাণিত হবে, তারা অতি আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে বেহেশতের অধিবাসী হয়ে সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। আর যারা পাপী এবং গোনাহগার সাব্যস্ত হবে, তারা চিরস্থায়ী ভাবে অতি কষ্টে জাহান্নামে থাকবে। বিচারের দিনটি খুবই কঠিন এবং ভয়াবহ। সেদিন কেউ কারও কোন উপকার বা কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। আত্মগোপনেরও কোন সুযোগ হবে না। কেবল আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চলবে। যাকে তিনি সুপারিশের সুযোগ দিবেন সে সুপারিশ করতে পারবে, অন্য কারও কোন অধিকার থাকবে না।

তাফসীর

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ **(মোটেই নয়, বরং তোমরাতো কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে থাক।)**

মানুষের প্রতি মহান রব্বুল আলামীনের আংশিক এহসানের কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এই এহসানের কারণে আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্য জ্ঞাপন ও তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার নেহায়েত প্রয়োজন ছিল। মানুষের উচিত ছিল, তারা যেন করুণাময় আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলে। কিন্তু তা না করে মানুষের একটি শ্রেণি খোদ আল্লাহকেই অস্বীকার করে বসেছে। আখেরাতের জীবন, হাশর-নাশর ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের পক্ষে এরূপ করা মোটেই সমীচীন নয়। এর মর্মকথা হচ্ছে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করছ, যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

تكذيب دين -এর অর্থ

আলোচ্য ৯ নং আয়াতে উল্লেখিত تكذيب دين (তাকযীবে দ্বীন)-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. দ্বীনের অর্থ হিসাব নিকাশ ও কেয়ামতের দিন। তখন আয়াতের অর্থ হবে তোমরা হিসাব নিকাশ ও কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে থাক।

২. দ্বীনের অর্থ কর্মফল। অতএব আয়াতের অর্থ হবে তোমরা কর্মফলকে অস্বীকার করে থাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে 'দ্বীন' শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও উভয় অর্থ হতে পারে। মুফাস্সির কুরতুবী এবং মুফাস্সির মাজহারী উভয় অর্থকেই গ্রহণ করেছেন।

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ **(অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়কগণ নিয়োজিত আছে।)**

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতে কাফের সম্প্রদায় কর্তৃক কর্মফলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে কাফেরদের কর্মফল অস্বীকার করার কারণ কী ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেররা ভাবতো, মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়। শরীরের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকে না। তা ছাড়া হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের জন্য খুঁটিনাটি আমলের সংরক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ রাখার প্রয়োজন। অথচ এত সব কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ রাখা কি সম্ভব? কে কার খবর রাখে? এ আয়াতে তাই বলা হয়েছে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সুতরাং কাফেরদের এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়।

তাফসীর

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সব কর্মকাণ্ডকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। তারা মানুষের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। হিসাব-নিকাশের দিন এই সকল ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হবে এবং সেই অনুপাতেই হিসাব-নিকাশ হবে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও মুজাহিদ (রহ.)-এর হাদীছেও এই তথ্য বর্ণিত হয়েছে। রসূলে পাক এরশাদ করেন, 'তোমাদের আমল সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের সম্মান কর, তাঁরা সার্বক্ষণিক তোমাদের সাথে থাকেন। অবশ্য নাপাক ও পেশাব পায়খানার সময় তোমাদের সাথে থাকেন না।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদে বায্যারের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উলঙ্গ হওয়া থেকে বারণ করেছেন। তোমরা তোমাদের সাথে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ফেরেশতা থেকে লজ্জাবোধ কর। তারা সম্মানিত লেখক। পেশাব-পায়খানা, নাপাক অবস্থা ও গোছলের সময় ব্যতীত সর্বদা তারা তোমাদের সাথেই থাকেন। অতএব তোমরা যখন উলঙ্গ হয়ে গোসল কর, তখন কাপড়, দেয়াল অথবা উটের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোসল করবে।'

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সংরক্ষণকারী উভয় ফেরেশতা বান্দার যে আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করে, এই আমলনামার প্রথম এবং শেষে এস্তেগফার থাকলে আল্লাহ পাক বলবেন, এই দুই এস্তেগফার-এর মধ্যে আমলনামার সমস্ত গোনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

এরূপ বহু হাদীছে আমল লিপিবদ্ধকরণ এবং আল্লাহর দরবারে পেশ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে মানুষের সমস্ত আমল সংরক্ষিতভাবে পেশ হচ্ছে এবং সে অনুপাতে হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল স্থির করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

উপরোক্ত তথ্যের সমর্থনে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

(দুইজন লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা ডানে-বামে আছে। তারা আমল লিপিবদ্ধ করে রাখে।) মানুষ যে কোন কথা উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। (সূরা ক্বাফ: ১৮)

ফেরেশতাদের লেখা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর:

এখানে ফেরেশতা ও তাদের লেখা সম্বন্ধে বিশেষ ৬টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। নিম্নে সেই ৬টি প্রশ্ন ও তার উত্তর পেশ করা হল।

(প্রশ্ন: ১) আদৌ ফেরেশতা নামের কোন জাতির অস্তিত্ব আছে কি না? থাকলে তারা দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? ইসলামী আকীদা মতে দুইজন ফেরেশতা আমাদের স্কন্ধে বসে আমলনামা লিপিবদ্ধ করে থাকেন, অথচ তাদের দেখা তো দূরের কথা তাদের ব্যাপারে কোন অনুভূতিও হয় না। অতএব ফেরেশতা আছে তার যুক্তি কী?

ফেরেশতার অস্তিত্ব

(ক) পরিবত্র কুরআন ও হাদীছের প্রমাণাদির মাধ্যমে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের কথা সাব্যস্ত রয়েছে।

(খ) আসমানী সমস্ত কিতাবে এবং ধর্মে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি বিদ্যমান। খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী এমনকি মক্কার মুশরিকদের নিকটও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

(গ) যে মহান আল্লাহ পৃথিবী এবং অগণিত দৃশ্য-অদৃশ্য জাতি-প্রজাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তার পক্ষে পৃথিবীর শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ফেরেশতাদের মত নিষ্পাপ একটি জাতি সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? আল্লামা ইবনে হযম তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল মিলাল ওয়ান্নিহাল'-য়ে এ বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ অলোচনা করেছেন। সুতরাং একটি নিরেট নূরের একটি নিষ্পাপ জাতি সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় ছিল। ফেরেশতাগণই হচ্ছেন খালেছ নূরের দ্বারা তৈরী সেই জাতি।

এখন কথা হল, আমরা তাদের দেখতে পাই না কেন এবং উপলব্ধিও করতে পারি না কেন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে,

'দেখি না, অনুভূত হয় না' কথাটি বাস্তব সম্মত নয়। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন। যার বাস্তব প্রমাণাদি ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। হযরত জিবরীল (আ.)-কে দর্শন করার বিস্তারিত ঘটনা সহীহ হাদীছের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। প্রতি যুগের বিশ্বস্ত ও শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ তথা নবীগণ ফেরেশতাদেরকে কেবল দেখেছেন তা নয়, বরং ফেরেশতাগণ তাদের বড় বড় জটিল কর্ম সমাধান করেছেন, সুতরাং দেখা না যাওয়ার কথাটি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তা ছাড়া কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দর্শন করা জরুরী নয়। আমরা জিন, বাতাস, বিদ্যুৎ এবং রোগকে দেখি না। এমন আরও অসংখ্য বস্তু রয়েছে যা আমরা দেখি না, কল্পনাও করতে পারি না অথচ বিশ্বাস করে থাকি। আমাদের কথাবার্তারও সূক্ষ্মতম শরীর বিদ্যমান রয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে

সেই আওয়াজ ও কথা-বার্তাকে নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে, অথচ এর কোন দৃশ্যমান আকৃতি নেই। এজন্য কি একে অস্বীকার করা যায়?

ফেরেশতাদের জন্য অদৃশ্য এবং গোপন হয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তারা আল্লাহর বিশ্বশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার গোয়েন্দা বাহিনী। সৃষ্টির গোপন তত্ত্ব সংগ্রহ করা তাদের একটি মহান দায়িত্ব। এই দায়িত্বের যথার্থ প্রতিপালন তখনই সম্ভব যখন তারা অদৃশ্য থাকেন। কেননা দৃশ্য হয়ে গেলে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। অধুনা এ বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং গোপন খবরাখবর ও তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(প্রশ: ২) মানুষ তার অন্তর এবং সেটার সাহায্যে অনেক আমল করে, কল্পনা করে। ফেরেশতাগণ সেগুলি কিভাবে লিপিবদ্ধ করেন? তারা তো গায়েবের বিষয়ে অবগত নন।

অন্তরের আমল সংরক্ষণ

(ক) ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন, ফেরেশতাগণ জাহেরী আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে সমস্ত আমল হয়ে থাকে তারা কেবল সেগুলোই লিপিবদ্ধ করতে আদিষ্ট। সুতরাং ফেরেশতাগণ গায়েবের বিষয়ে অনবগত হলে দায়িত্ব পালনে কোন অসুবিধা নেই। মুফাস্সির রাযীর এই উক্তি মূল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(খ) মূল প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের আমল দুই প্রকার : **প্রথম প্রকার আমল** হচ্ছে অন্তরের উপলব্ধি, কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা। যদি উপলব্ধি, কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা কার্যে পরিণত না করা হয়, তাহলে মহান রব্বুল আলামীন তা ক্ষমা করে দেন। একে ওয়াসওয়াসার পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা যায়। আর ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ পাক আমার উম্মতের ওয়াসওয়াসার গোনাহসমূহের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন।" সুতরাং এগুলো লেখার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি অন্তরে নেকের স্পৃহা অনুভূত হয়, তাহলে আল্লাহ পাক স্বয়ং তার নিয়তের উপর ছাওয়াব প্রদান করে থাকেন। আর তা বান্দার অন্তরের অবস্থার কারণেই প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ হাদীছে আছে, 'আল্লাহ পাক তোমাদের শরীরের প্রতি লক্ষ্য করেন না বরং তোমাদের অন্তর এবং নিয়তকে লক্ষ্য করে থাকেন' এবং নিয়তের স্বচ্ছতার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। পবিত্র কুরআনের নিম্ন আয়াত থেকেও এই তত্ত্বটি সত্যায়িত করা যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে যে বাড়ি থেকে বের হয়, অতঃপর পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে যায়, আল্লাহ তার প্রাপ্য বিনিময় দান করেন। (সূরা নিছা: ১০০)

এই আয়াত দ্বারা নিয়তের ওপর কার্য সম্পাদন করা ব্যতীতই ছওয়াব প্রদানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ্ পাক আমলনামার সূত্রপাত ছাড়াও অনেক বান্দাদেরকে ক্ষমা করবেন আর তা করবেন স্বীয় ক্ষমতা এবং অধিকারের ভিত্তিতেই। কারণ, বান্দার কিছু আমল হবে, যা কেবল আল্লাহ পাকই জানেন, অন্য কারো জানা নেই। সুতরাং এরূপ কিছু আমল

ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধকরণের বহির্ভূত হতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার আমল হচ্ছে যা অন্তর এবং মেঠার উপলব্ধি-অনুধাবনের পরিধি অতিক্রম করে বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়। তা ভাল হোক আর মন্দ হোক, ফেরেশতা এ ধরনের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করতে আদিষ্ট। আর আদিষ্ট বিষয়ে তারা যথার্থ দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

(গ) মূল প্রশ্নটির সর্বাধিক সঠিক উত্তরের সন্ধান রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ থেকে সংগ্রহ করা যায়। এক হাদীছে তিনি ইরশাদ করেন,

اذا اذنب العبد ذنبا نكتت فى قبله نكتة سوداء ... الخ

যখন কোন মানুষ গোনাহ করে তখন তার অন্তরে কালো দাগ লাগে। এমতাবস্থায় যদি সে তওবা-এস্তেগফার করে ফেলে, তবে সেই দাগটুকু মিটে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তাহলে ঐ দাগটি আরো অধিক পড়তে পড়তে সমস্ত অন্তরকে বেষ্টন করে ফেলে।'

এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, বান্দার যেকোন প্রকার গোনাহের একটি চিহ্ন হয়। তেমনি নেক আমলেরও চিহ্ন হয়ে থাকে। হাদীছে পাকে উযুর অঙ্গসমূহের নূর সৃষ্টি হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এই সব চিহ্ন দেখেই লেখক ফেরেশতাগণ মানুষের অন্তর ও ব্রেইনের গোনাহ অথবা নেক আমল সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এরূপ অর্ন্তদৃষ্টি আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে দান করেছেন, যে দৃষ্টির মাধ্যমে তাদের গোপন বিষয়বস্তু বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেছ সুফিয়ানকে কোন একলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দ কাজের ইচ্ছা, কল্পনা বা অনুসূচনা সৃষ্টি হলে, আমল না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ কীভাবে বুঝতে সক্ষম হন? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'বান্দা নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে ফেরেশতাগণ মেশক আম্বরের সুগন্ধ পান। আর পাপ কাজের ইচ্ছা করলে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, 'বান্দা গোনাহের কাজ করলে গোনাহের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা অনেক দূরে সরে যায়।'

সুতরাং বোঝা গেল, বান্দা পাপ করুক আর নেক আমল করুক, প্রকাশ্যে করুক, অথবা গোপনে করুক, অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে করুক বা মনে মনে করুক সবকিছুকে সংরক্ষণ করার নিমিত্তে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের সম্মুখে আলামত এবং নিদর্শন রাখেন, যে আলামত এবং নির্দশন মোতাবেক ফেরেশতাগণ বান্দার যাবতীয় আমল সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। আল্লাহ পাক একেক জন বান্দার সাথে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে ২০ জন বিশেষ কাজের জন্য নিয়োজিত এবং বান্দার মাতৃগর্ভের সূচনা হতে শুরু করে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরমুহূর্ত পর্যন্ত ৪০০ (চারশত) ফেরেশতা তার সাথে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে বলে মুফাস্সিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন। তবে বান্দার ভাল মন্দ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য হচ্ছেন দুইজন। তাদের একজন ডানে অপর জন বামে অবস্থান করেন।

(প্রশ্নঃ ৩) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, নাপাক অবস্থায় এসতেনজা, স্ত্রী সহবাস, গোসল ইত্যাদির সময়ে ফেরেশতাগণ দূরে সরে যায়। এমতাবস্থায় লিপিবদ্ধ করার উপায় কী? তারা দূরে সরে গেলে জানবে কী করে আর লিখবে কী করে?

www.maktabatulabrar.com

নাপাক অবস্থার আমল

নাপাক অবস্থায়, গোসলের সময় এবং স্ত্রী সহবাস ইত্যাদির সময় ফেরেশতাগণ দূরে সরে যাওয়ার অর্থ এই না যে, তারা বান্দার আমল এবং কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ছেড়ে দেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে দূরে আশে পাশে অবস্থান করেন এবং বান্দার আমলের সংরক্ষণ করে থাকেন। আর যেহেতু আমলের কারণে চিহ্ন সৃষ্টি হয় সুতরাং যে কোন অবস্থায় চিহ্ন পরিদর্শন করে আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা কঠিন বিষয় নয়।

(প্রশ্নঃ ৪) আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের জাহেরী বাতেনী বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনি ভোলেনও না। সুতরাং ফেরেশতার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করণের স্বার্থকতা কি?

আল্লাহ পাক জানা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমল সংরক্ষণের হেকমত

অধুনা এই বিশ্বের কিছু সংখ্যক লোক, যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী বিজ্ঞানী মনে করে থাকে, (মূলত তারা নিরেট বস্তুবাদী।) তারা বলে থাকে, যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং যা কিছু ঘটে তা তিনি কখনো ভুলেন না, সুতরাং ফেরেশতার মাধ্যমে আমলনামা তৈরি করার প্রয়োজন কোথায়? তিনি তো নিজ জ্ঞান অনুপাতেই হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ এবং বিচার আদালত করতে সক্ষম। বস্তুত তাদের মতে পরকাল সংক্রান্ত সবকিছু রূপকমাত্র। মানুষকে বুঝ দেয়ার জন্যই কেবল এগুলি বলা হয়েছে। সেমতে কিরামান কাতিবীনের ব্যাপারটিও ঠিক তা-ই; এরও কোন প্রকৃত স্বরূপ তথা বাস্তবতা নেই। কিন্তু এ ধরনের উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তার তিনটি কারণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) যদি আল্লাহর জ্ঞান এবং শক্তির ভিত্তিতেই সব কিছু হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে হিসাব নিকাশেরই বা প্রয়োজন কী? তিনি তার জানামতে সিদ্ধান্ত করে জান্নাত বা জাহান্নামের ফায়সালা করতে পারেন। তাছাড়া বিশ্ব এবং বিশ্বের এই অসংখ্য সৃষ্টিরই বা কী প্রয়োজন ছিল? আসমান, যমীন, আলো, বাতাস, আগুন, পানি, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? এই পানাহার সামগ্রী, যানবাহন, হাত পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মোটকথা এত সব উপকরণেরই বা কী প্রয়োজন ছিল? মহান রব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান, তিনি কোন ওছীলা এবং মাধ্যম ছাড়াই তো সব কিছু করতে সুসক্ষম। তাহলে এতসব সৃষ্টির কী প্রয়োজন? আসলে এ ধরনের উক্তি নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। এসব কিছুর রহস্য এবং তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করলে এগুলোর অনেক তাৎপর্য বুঝে আসে এবং সাথে সাথে এও বুঝে আসে যে, অন্যান্য সৃষ্টি উপকরণের ন্যায় কিরামান কাতিবীনের নিয়োগও শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যবস্থাপনার একপ্রকার উপলক্ষ মাত্র।

(২) পৃথিবীর বুকে মানুষের সমস্যাবলি এবং প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যাতে মানুষের জন্য বোধগম্য হয়। আল্লাহ পাক মানুষের সমস্যাবলি এবং প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা এবং পরাক্রমশালিতার ভিত্তিতে অপ্রাকৃতিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা মানুষের জন্য যেমন হত অসহনীয়, তেমনি হত অগ্রহণীয়। হযরত ইমাম রাযী বলেন, 'আল্লাহ পাক তার কর্মকাণ্ডসমূহ বান্দার যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনা করেন, যাতে বান্দার জন্য সহনীয় এবং গ্রহণীয় হয়। হিসাব-নিকাশের সময় লিপিবদ্ধ আমলনামা পেশ করার বিষয়টিই যেহেতু মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবে বোধগম্য, তাই বান্দার হিসাব-নিকাশের জন্য

www.maktabatulabrar.com

তার আমলনামা তৈরি করা এবং সংরক্ষণের এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। হিসাব-নিকাশের জন্য অপ্রাকৃতি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(৩) তাছাড়া বিচার আদালতের নীতিমালাও তাই। কেননা হাকিম এবং জজ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন না, বরং হাকিম সাক্ষী-প্রমাণ ও কাগজপত্রের দৃষ্টিতেই রায় প্রদান করে থাকেন। এটাই হচ্ছে বিচার আদালতের ন্যায়সংগত বিধান। সুতরাং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন পরাক্রমশালী এবং ন্যায় বিচারক, এ হিসেবে হাশরের ময়দানে কেবল স্বীয় জ্ঞান এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে বিচার এবং রায় প্রদান করবেন না বরং বান্দার সমস্ত আমল এবং কৃতিকলাপ সম্মুখে হাজির করে বিচারের নীতিমালা অনুসরণেই বিচার করবেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেমতে হিসাব-নিকাশ ও বিচারের জন্য আমলনামা তৈরী রাখাই যুক্তিযুক্ত ও বিচার আদালতের নীতিসম্মত।

(প্রশ্নঃ ৫) কাফের এবং বেদ্বীনদের আমল সংরক্ষণের জন্যও কি ফেরেশতা নিয়োজিত আছে? কারণ, একে তো তারা নাপাক, দ্বিতীয়ত তাদের তো নেক আমলের কোন প্রশ্নই নেই, বরং তাদের সমস্ত আমলই অগ্রহণীয়। অতএব তাদের আমল সংরক্ষণের কী প্রয়োজন? নিম্নে কাফেরদের আমল সংরক্ষণ করা হয় কি না– এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

কাফেরদের আমল সংরক্ষণ করা হয় কি না ?

কোন কোন মুফাস্সিরগণ মত পোষণ করেছেন যে, কাফেরদের আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়নি। কারণ, এখানে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, বরং তাদের ঈমান না থাকার কারণে তারা চূড়ান্তভাবেই জাহান্নামী। তাছাড়া কাফেরের বেলায় ডানের ফেরেশতার লেখার কোন কিছুই নেই। কেননা, কাফেরের কোন নেক আমল কুফ্রীর কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য তাদের পাপের কারণে তাদের শরীরে একপ্রকার চিহ্ন এবং নিদর্শন ফুটে উঠবে, সেই নিদর্শন এবং আলামতের ভিত্তিতেই তাদের উপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে,

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ الْأَقْدَامِ.

পাপীদেরকে তাদের আলামত দেখেই চেনা যাবে। সেমতে তাদের কপালের চুল এবং পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা আর-রহমান: ৪১)

কিন্তু এ ব্যাপারে যে মতটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে কাফেরদের আমল সংরক্ষণের জন্যও কিরামান কাতিবীন নিয়োজিত আছেন। অধিকাংশ মুফাস্সির এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। আর গ্রহণ করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। যথা:–

(ক) পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে আমল নিরীক্ষণের বিষয়ে কাফের এবং মু'মিনদের মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) হাশরের ময়দানে ডানহাতে এবং বামহাতে আমলনামা প্রদানের কথা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত রয়েছে। সেখানে কাফেরদের আমলনামা তাদের বামহাতে দেয়া হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত তাদের আমলনামা লেখা না হলে বামহাতে আমলনামা প্রদানের কথাটি অমূলক হয়ে দাঁড়ায়।

(গ) কুফ্‌রীর উপর মৃত্যু হলে অবশ্যই চির জাহান্নামী হতে হবে, কিন্তু সকলের শাস্তি সমান হবে না, বরং কাফেরদের শাস্তির মধ্যে কমী বেশির পার্থক্য হবে। যথা ঐ সমস্ত কাফের যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছে, মুসলমানদের কোন ক্ষতি সাধন করেনি, বরং উপকার করেছে, এ ধরনের কাফেরদের চির জাহান্নামী হওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্ত কাফেরদের তুলনায় আযাব কম হবে, যাদের দ্বারা ইসলাম এবং মুসলমানদের অধিক ক্ষতি সাধিত হয়।

আবূ তালেব এবং আবূ লাহাবের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করলে বিষয়বস্তুর প্রকৃত রূপ অধিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সহীহ বোখারী শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা এবং মহব্বতের কারণে কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আযাবের মাত্রা কম হবে। মুনাফেকরাও কাফের, কিন্তু যেহেতু মুনাফেকদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের অধিক ক্ষতি সাধিত হয়, তাই তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে– 'নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।'

এমনিভাবে কুফ্‌রীর সাথে সাথে পাপ কাজসমূহেও কাফেরদের মধ্যে কমী বেশির পার্থক্য রয়েছে। এমন কাফের রয়েছে, যারা কোন পাপ কাজই বাদ দেয়নি, আবার এমন কাফেরও রয়েছে যারা পাপ কাজ অবশ্যই করেছে, কিন্তু তুলনামূলক কম করেছে। আবার অনেক কাফের রয়েছে যারা কুফরী ব্যতীত আর কোন পাপ করেনি। আবার পাপের মধ্যেও শ্রেণিবিন্যাস করা আছে। যথা ছগীরা, কবীরা। অতএব এসব কিছুর প্রয়োজনে কাফেরদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

(ঘ) কাফেরদের মধ্যে একটি শ্রেণি এমনও আছে, যারা মুসলমানদেরকে এবং ইসলামকে সাহায্য করে থাকে অথবা সেবামূলক কাজও করে থাকে। তাদের এ ধরনের সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং সাহায্য সহযোগিতার অবশ্যই প্রতিদান রয়েছে। হযরত হাকীম ইব্‌নে হিযাম (রা.) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে সমস্ত নেক আমল করেছি সে আমলসমূহের কোন প্রতিদান পাব কি? উত্তরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তুমি তোমার নেক আমলের উপরে ইসলাম গ্রহণ করেছ।' অর্থাৎ, ঐসমস্ত নেক কাজের ছওয়াব অবশ্যই তুমি পাবে। মুহাদ্দিছীন এবং হাদীছ বিশারদগণ উপরোক্ত হাদীছটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যথা কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নেক আমলের বদৌলতে তুমি ভাল স্বভাব এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়েছ। কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নেক আমলের বিনিময়ে স্বচ্ছলতার অধিকারী হয়েছ। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবনে বাত্তাল বলেছেন যে, নেক আমলের ছওয়াব আখেরাতে অবশ্যই তুমি পাবে। হাদীছের উপরোক্ত বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কাফেরদের নেক কর্মের বদলাস্বরূপ পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়। হযরত আবূ সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত দারাকুতনীর হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন কাফের সত্যিকারভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং পূর্বের আমলের ছওয়াব তার আমলনামায় সংযুক্ত করে

www.maktabatulabrar.com

দেন।' এই দুইটি হাদীছের বিষয়বস্তুর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, কাফেরদের নেক আমলের প্রতিদান অবশ্যই রয়েছে– সে প্রতিদান কারও জন্য দুনিয়ায় হবে আবার অনেকে সে প্রতিদান আখেরাতের জীবনে লাভ করবে। যাদের মৃত্যু কুফ্‌রীর উপর হবে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই প্রদান করা হবে। আর আখেরাতের জীবনে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হলেও শাস্তির মধ্যে কমী করা হবে। আর যাদের মৃত্যু কুফ্‌রীর পর ইসলামের উপর হবে, তারা কুফ্‌রী অবস্থায় কৃত নেক আমলের ছওয়াব আখেরাতের জীবনে লাভ করবে। অবশ্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা আমাদের এই বিবরণ সঠিক বলে মনে হয় না। যথা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْأٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ .

যারা পার্থিব জীবন এবং সুখ শান্তির কামনা করে, আমি তাদের কর্মফল পৃথিবী হতেই প্রদান করে দেই। (কর্মফল প্রদানে কমী করা হয় না।) তবে ওদের জন্য আখেরাত নিষ্ফল এবং নিরর্থক হবে। (সূরা শূরা: ২০)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا .

যে কেউ পার্থিব সম্ভোগ কামনা করে, আমি তাকে আমার ইচ্ছা অনুপাতে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। তৎপর তার জন্য আমি জাহান্নাম প্রস্তুত করে রাখি, যেখানে সে লাঞ্ছিত এবং ধিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৮)

এমনিভাবে এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا .

কাফেরদেরকে তাদের সৎকাজের বিনিময় পৃথিবীতেই দিয়ে দেয়া হয়। (পরকালে তাদের আমলের কোন ছওয়াব নেই।)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কাফেরদের নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতে কিছু থাকলেও আখেরাতের জীবনে মোটেই নেই। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছের সাথে আমাদের বক্তব্যের মোটেই বিরোধ নেই। কেননা, কাফেরদের মধ্যে সাধারণত তিনটি শ্রেণি রয়েছে। প্রথম শ্রেণির কাফের হল, যাদের মৃত্যু কুফরীর উপর হয় এবং তারা চরম পর্যায়ের কাফের। যারা ইসলাম এবং মুসলমানের চরম শত্রু। সেই সাথে সাথে তারা সমগ্র জীবন নানাবিধ পাপকাজে নিয়োজিত রেখেছে। দ্বিতীয় শ্রেণির কাফের হচ্ছে যারা কুফ্‌রীর উপরই মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেনি, অন্য ধরনের পাপাচারেও লিপ্ত হয়নি, হয়ে থাকলেও প্রথম পর্যায়ের কাফেরদের তুলনায় অনেক কম। আর তৃতীয় শ্রেণির কাফের হচ্ছে, পরবর্তীকালে যারা ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশীল হয়েছে। এমতাবস্থায় সব শ্রেণীর কাফেরদের অবস্থা একই ধরনের হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۭ وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ .

আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের পাল্লা স্থাপন করব এবং কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও তিল পরিমাণ আমল থাকলে তাও আমি হাজির করব। আর হিসাবের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া: ৪৭)

এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, কাফেরদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে, সকলকে একপ্রকার শাস্তি প্রদান করা হবে না। কোন নেক আমল থেকে থাকলে তাও নিস্ফল যাবে না। মুনাফেকরাও কাফের, কিন্তু যেহেতু তাদের দ্বারা ইসলাম এবং মুসলমানদের অধিক ক্ষতি সাধিত হয়, তাই অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় তাদেরকে অধিক শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের বেলায় আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

মুনাফেক দল জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। (সূরা নিছা: ১৪৫)

এতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, যাদের মৃত্যু কুফরীর উপর হয় তাদের আযাবের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস হবে। কারও আযাব অধিক হবে, আর কারও কম হবে। সুতরাং বোঝা গেল, নেক আমলের প্রতিদান কাফেরগণ আখেরাতের জীবনেও লাভ করবে। তাহলে প্রশ্ন হয়, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং হাদীছের অর্থ কী? যে আয়াতদ্বয় ও হাদীছে পরকালে কাফেরদের কোন ভাল প্রতিদান না পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দুই অর্থ হতে পারে।

(১) তাদের ইবাদতসমূহ নিরর্থক হবে, এর কোন ছওয়াব এবং বিনিময় তারা আখেরাতের জীবনে লাভ করতে পারবে না। তা ছাড়া অন্যান্য নেক আমলসমূহের যথাযথ প্রতিদান তারা আখেরাতের জীবনেও লাভ করবে। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং হাদীছ ইবাদতের বিনিময় না পাওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য। হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরি (রহ.) এরূপ মত পোষণ করেছেন।

(২) কাফেররা তাদের নেক আমলের বদৌলতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি না পেলেও কোন কোন শ্রেণির কাফেরদের আযাবের মধ্যে কমী করা হবে। যেমন দ্বিতীয় স্তরের কাফেরদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস হবে। সুতরাং তাদের শাস্তি এবং আযাবের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং হাদীছ প্রথম শ্রেণির কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য, অন্যদের বেলায় নয়।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এই বক্তব্যের পরিপন্থি মনে হয়। যথা: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ .

তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না। (সূরা বাকারা: ৮৬)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কাফেরদেরকে কঠোর আযাব প্রদান করা হবে, আযাবে মোটেই কমী করা হবে না। তবে এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, জাহান্নামে প্রবেশের পর আযাবের মধ্যে কমী বেশি করা হবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই। হ্যাঁ, জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের নেক আমলের বদৌলতে হালকা এবং কম পরিমাণ আযাব ধার্য করা হবে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইবনে মুনীর বলেন, 'মহান আল্লাহ পাকের করুণা এবং রহমতে কাফেরদের কতক আমলের প্রতিদান পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।'

www.maktabatulabrar.com

মোটকথা, এতক্ষণের এই বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করে, তাদের নেক আমলের কোন না কোন প্রতিদান আল্লাহ্ পাক দিয়ে থাকেন- তা পৃথিবীতে হোক অথবা আখেরাতের জীবনেই হোক। সুতরাং যে কাফের কুফরী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সৌভাগ্যশালী হয়, সেও যে আখেরাতের জীবনে তার পূর্বের নেক আমলের বিষয়ে প্রতিদান পাবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। বস্তুত যখন কাফেরদের আমলের যথাযথ প্রতিদান রয়েছে, তাহলে তাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না এ মতটি সঠিক নয়, বরং মু'মিনদের আমলের ন্যায় কাফেরদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করণের জন্যও কিরামান কাতিবীন নিয়োজিত থাকেন।

(প্রশ্নঃ ৬) পবিত্র কুরআন ও হাদীছে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বান্দার গোপন দোষ-ত্রুটি সংরক্ষণ করা খোদার বিধানের পরিপন্থি নয় কি? নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

গোপন তথ্য অনুসন্ধান প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অন্যের গোপনীয় বিষয়াদির অনুসন্ধান করাকে গোনাহে কবীরা বলা হয়েছে এবং কঠোরভাবে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ .

তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং অপরের অগোচরে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভায়ের গোশত ভক্ষণ করতে সম্মত হবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্য মনে করে থাক। এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা হুজুরাত: ১২)

উল্লেখ্য, এখানে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

অপরের গোপন দোষ-ত্রুটি তালাশ করা লোকসম্মুখে প্রকাশ করার শামিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ .

যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা নূর: ১৯)

পবিত্র হাদীছে বলা হয়েছে, 'হে লোকেরা, যাদের মুখে মুখে ঈমান, যাদের ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি- তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না, তাদের গোপন দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে মুসলমানদের গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ পাক তার গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ পাক যার গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করেন, সে আপন জনের হাতেই অপমানিত হয়।'

এরূপ বহু আয়াত এবং হাদীছে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি তালাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কিরামান কাতিবীন নিযুক্ত করে গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা কী করে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে?

এর জবাবে বলা যেতে পারে, কারও ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে বা স্বীয় আক্রোশবশত কিংবা পরশ্রীকাতর হয়ে কারও গোপন দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মহাপাপ এবং হারাম। কিন্তু শরীয়তসম্মত কারণে এবং বৃহত্তম দ্বীনী স্বার্থের লক্ষ্যে গোপন তথ্য অনুসন্ধান করা বৈধ। ইমাম নববী এবং গাজালী লিখেছেন, শরীয়তগত উদ্দেশ্য হাসিলের অন্য কোন উপায় না থাকলে গীবতের অনুমতি আছে। এখন জানার বিষয় হল, সেই অনন্যোপায় অবস্থাগুলো কী, যার ভিত্তিতে গীবতের অনুমতি আছে? এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায় সাধারণত এরূপ কারণ ছয়টি। অর্থাৎ, ছয়টি এমন কারণ রয়েছে, যে কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে গীবত এবং গোপন তথ্য অনুসন্ধানের অনুমতি রয়েছে। যথা:

(১) মজলুমের পক্ষে ইনসাফ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিচারকের বরাবর জালিমের বিরুদ্ধে গোপন তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি আছে।

(২) মুফতীর নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে ফতওয়া চাওয়ার সময় সেই ব্যক্তির গোপন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার অনুমতি আছে।

(৩) মুসলমানদেরকে ফিতনা ফাসাদ ও সম্ভাব্য বিপদ থেকে সতর্ক করার জন্য অথবা তাদের বৃহত্তম স্বার্থে কারও গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা যেতে পারে। বিবাহ-শাদির সময় পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের প্রকৃত দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করা, আদালতে সাক্ষীর সমালোচনা এবং হাদীছের রাবীদের সমালোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি ফাসেকী এবং বেদআতী কাজে লিপ্ত, তার ঐ সমস্ত অপরাধ উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক করার অনুমতি রয়েছে।

(৫) মুনকার তথা গোনাহের প্রতিরোধ কল্পে গোপন বিষয়াদির অনুসন্ধান এবং প্রকাশ করার অনুমতি আছে।

(৬) সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রকৃত পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন দোষ বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার অনুমতি আছে। যেমন কোন ব্যক্তি 'অন্ধ হাফেজ' নামে সুপরিচিত, তার পরিচয়ের জন্য অন্য কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় 'অন্ধ হাফেজ' বলার অনুমতি আছে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের দৃষ্টিতেও বিশেষ উদ্দেশ্যে গোপন তথ্য অনুসন্ধানের অনুমতির কথা সাব্যস্ত হয়। যথা এক স্থানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

হে মু'মিনগণ, যদি কোন ফাসেক লোক তোমাদের কোন সংবাদ দেয়, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে নিবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করো এবং পরে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (সূরা হুজুরাত: ৬)

কুফার গভর্নর হযরত সাআদ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হলে হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে সে বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এধরণের অসংখ্য ঘটনাবলি রয়েছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ধর্মীয় বৃহত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে গোপন তথ্য অনুসন্ধান করা এবং সে অনুপাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত ব্যাপার।

www.maktabatulabrar.com

সুতরাং বিশ্বশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কর্মফল নির্ধারণের স্বার্থে কিরামান কাতিবীনসহ ফেরেশতাদেরকে গোপন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত- অযৌক্তিক কিছু নয়।

সূরা ইনফিতারের শেষোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর

মানুষের আমল সংরক্ষণের জন্য কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত ফেরেশতা দুইজন নিযুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। ১৩ থেকে ১৬ নং আয়াতসমূহে ফেরেশতা কর্তৃক সংরক্ষিত আমলনামার ভিত্তিতে মানুষের ভাল মন্দ পরিণামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আবরার তথা সৎ লোক তারা অবশ্যই পরম সুখে থাকবে। আর যারা ফুজ্জার তথা অসৎ লোক, তারা অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে। তারা বিচার দিনে সেখানে প্রবেশ করবে। তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। এরপর ১৭ থেকে ১৯ নং আয়াতসমূহে বিচারের দিন সম্পর্কে সাবধান সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, 'বিচারের দিনটি কেমন তা কি তুমি জান? পুনরায় বলছি, বিচারের দিন সম্পর্কে তোমার জানা আছে কি? সেদিন কেউ কারও কোন কিছু করতে সক্ষম হবে না। সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর হবে।' এসব আয়াতে ফুজ্জার পাপিষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সেদিন তারা দিশেহারা হয়ে পড়বে। আসন্ন নিশ্চিত বিপদ থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাবে না। কারও নিকট সাহায্য সহানুভূতিও পাবে না। কারণ, সেদিন কর্তৃত্বের অধিকার কেবল মাত্র আল্লাহর। অন্য কারও কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না। এখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

১. আবরার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় কী?
২. আবরারদের গুণাবলী কী কী?
৩. ফুজ্জার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় কী?
৪. ফুজ্জাররা চির জাহান্নামী কী না?

নিম্নে এ চারটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আবরার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয়

ابرار (আবরার) শব্দটি بر-এর বহুবচন। ভালকাজের ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মহান রব্বুল আলামীন সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ ও মঙ্গলের আধার বিধায় তার একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে بر (বার্)। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে 'বির্' শব্দটি ব্যাপকভাবে মানুষের সব ধরনের নেক আমল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তথা তার আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণও এর আওতাভুক্ত। ইমানিয়াত, ইবাদাত, আখলাক, মুআমালাত, মুআশারাত, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, ধর্মীয় রাজনৈতিক, ব্যক্তিজীবন, সামাজিকজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন, বস্তুজগত ও পারলৌকিক জগত সর্ববিষয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান এ শব্দের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সাথে সাথে অন্তরের আমলও এর অন্তর্ভুক্ত।

মৌলিকভাবে আবরার তথা সৎ লোকদের চারটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের। দ্বিতীয় স্তরের হচ্ছেন সিদ্দীকগণ। তৃতীয় স্তরের হচ্ছেন শহীদগণ। আর অবশিষ্ট নেক

লোকগণ হচ্ছেন চতুর্থ স্তরের। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই আবরার তথা সৎ লোকদেরকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবরারদের গুণাবলি

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা থেকে আবরারদের বিশেষ বিশেষ গুণের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে তাদের নিম্নোক্ত গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(১) আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস।

(২) আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, রাস্তার পথিক, অন্যান্য সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের সাহায্য করা।

(৩) নামায কায়েম করা।

(৪) যাকাত আদায় করা।

(৫) ওয়াদা পূরণ করা।

(৬) ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহর মহব্বত এবং জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে নেক অমল করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বিভিন্ন নেক আমলের কথা উল্লেখ করে সেগুলো আমলের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন আমল পরিশুদ্ধ ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দুইটি :

(এক) আমল সুন্নাত মোতাবেক হওয়া। আমল নবীর সুন্নাত মোতাবেক না হলে আমলের শরীর সৃষ্টি হয় না। আর যখন আমল সুন্নত মোতাবেক হয় তখন আমলের শরীর সৃষ্টি হয়।

(দুই) আমল এখলাছওয়ালা হওয়া। এখলাছ বিহীন আমল আত্মাবিহীন লাশ তুল্য। এখলাছ না থাকার কারণে হাশরের ময়দানে অনেক নেক আমলকারীর বেইজ্জতী হবে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং আবরারের বিশেষ দুইটি গুণ হচ্ছে–

(৭) সুন্নাতের পাবন্দী ও

(৮) এখলাছ।

ফুজ্জার-এর সংজ্ঞা বা পরিচয়

আবরারের মোকাবেলায় বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্তদের জন্য ফুজ্জার শব্দ ব্যবহৃত হয়। ফুজ্জারদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা:

ক. যাদের মধ্যে কুফর, শিরক ও আকীদাগত মুনাফেকী বিদ্যমান রয়েছে, এরা প্রথম প্রকারের ফুজ্জার হিসেবে গণ্য।

খ. যাদের মধ্যে বিদআত বিদ্যমান।

গ. যারা গোনাহে কবীরা করে থাকে।

ঘ. যারা গোনাহে ছগীরা করে থাকে।

ঙ. যারা সন্দেহপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকে।

তিরমিযী শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

'কোন মানুষ তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হতে পারে না, যদি সে ঐ সমস্ত মুবাহ আমল বর্জন না করে– যা হারাম কাজের সুযোগ করে দেয়।' বোখারী শরীফের হাদীছে এই কথাটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে, 'হালাল এবং হারাম বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট, এ দুয়ের মধ্যে কিছু আমল রয়েছে অস্পষ্ট। যারা এসব অস্পষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকবে, তারা স্বীয় দ্বীন ইজ্জতকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। আর যারা অস্পষ্ট সন্দেহযুক্ত আমলে রত হয়, তাদের উদাহরণ ঐ রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে পাশে জানোয়ার চরায়। এরূপ রাখালের জানোয়ার অচিরেই ঐ নিষিদ্ধ চারণভূমিতে প্রবেশ করে বসবে। এমনিভাবে যারা সন্দেহযুক্ত আমলে রত হয়, তাদের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার খুবই আশংকা রয়েছে।' এজন্যেই অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, যে কাজে সন্দেহ হয় তা বর্জন করে সন্দেহমুক্ত কাজে মনোনিবেশ কর।'

মোটকথা হল, যারা অপরাধ ও শরীয়তবিরোধী কাজ করে, তাদেরকে ফুজ্জার বলা হয়। আর যে স্তরেরই ফুজ্জার হোক তাদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ফুজ্জাররা চির জাহান্নামী কি না?

কারও কারও মতে সর্বস্তরের ফুজ্জাররা চির জাহান্নামী। তারা কখনও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না, কখনও জান্নাতবাসী হতে পারবে না। কেননা, আয়াতে সমস্ত ফুজ্জারকে চির জাহান্নামী বলা হয়েছে। অপর দিকে কেবল আবরারদেরকে জান্নাতী বলা হয়েছে। আবূ আলী জুব্বায়ী বলেন, 'যদি ফুজ্জারদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় আর একশ্রেণির ফুজ্জারকে জান্নাতী বলতে হয়, তাহলে তা হবে আয়াতের পরিপন্থি। মুতাযিলা এবং খারেজীরাও এই মত পোষণ করে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত এরূপ নয়। তাদের মতে যে সমস্ত ফুজ্জার কুফর-শিরক এবং নেফাকের মধ্যে লিপ্ত তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। কিন্তু যারা মৃত্যুর পূর্বে খালেছ তওবা করে নেয়, তারা আবরারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতবাসী হতে পারে। কারণ, তাওবার কারণে তারা ফুজ্জারদের কাতার থেকে বহির্ভূত হয়ে আবরারদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা জান্নাতবাসী হলে তা আয়াতের পরিপন্থি হয় না। হ্যাঁ, যারা আকীদাগত ফুজ্জার এবং সেই ভ্রান্ত আকিদার উপর মৃত্যুবরণ করে, তারা চির জাহান্নামী। আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের ফুজ্জারদেরকেই চির জাহান্নামী বলা হয়েছে। আর যারা আকীদাগতভাবে ফুজ্জার নয়, তাদেরও মুক্তির তিনটি রাস্তা রয়েছে।

১. মৃত্যুর পূর্বে খালেছ তওবার কারণে তারা আবরারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতী হতে পারে। হাদীছে পাকে বলা হয়েছে, যারা খালেছ তওবা করে, তারা সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং তাদের জান্নাতী হতে কোন বাধা নেই। যদি তওবার পরও তারা ফুজ্জার থেকে যায় বা আবরারের অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে, তাহলে কুরআন ও হাদীছে ফুজ্জারদেরকে তওবার প্রতি আহ্বান করার কোন অর্থ থাকে না।

২. তওবাবিহীনভাবে মৃত্যু হলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তারা আবরারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতবাসী হতে পারে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ .

আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিছা: ৪৮)

৩. যদি কেউ প্রথম পর্যায়ে ক্ষমা না পায়, তবুও সে নির্ধারিত সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি লাভ করে জান্নাতবাসী হতে পারে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফসহ হাদীছের কিতাবে এর সমর্থনে বহু হাদীছ রয়েছে। যদি বলা হয়, আলোচ্য আয়াতে আবরারদেরকে জান্নাতী আর ফুজ্জারদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাহলে ফুজ্জারগণ কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? এর উত্তর এই যে, আলোচ্য আয়াতে প্রথম প্রকারের ফুজ্জার উদ্দেশ্য। যদি প্রশ্ন করা হয়, ফুজ্জাররাও যখন জান্নাতে যাবে তাহলে আবরারদের বিশেষত্ব কী? এর উত্তরে বলা হবে, ফুজ্জাররা গোনাহমুক্ত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার দরুণ আবরারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আবরারদের বিশেষত্ব বহাল থাকবে। তাছাড়া আবরারদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে। যে সমস্ত ফুজ্জার তওবা ও ক্ষমার কারণে জান্নাতী হবে তাদের তুলনায় প্রথম শ্রেণির আবরারদের মর্যাদা অধিক হবে। যাহোক উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আবূ আলী জুব্বায়ীর প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবেই বুঝে আসে। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ দুটো দলীল পেশ করা হল।

(১) ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ .

তারা সেখান (জাহান্নাম) থেকে বের হতে পারবে না। (সূরা ইনফিত্বার: ১৯)

এখানে ফুজ্জারদের দ্বারা আকীদাগত কাফের মুশরিক ও মুনাফেকদের বুঝানো হয়েছে। কেননা, যারা আকীদাগতভাবে ফুজ্জার নয়, তাদের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশের কথা হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ কর্তৃক বোখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। শাফাআতের হাদীছ দ্বারাও একই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়।

(২) তওবার আয়াত ও হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। খালেছ তওবার প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ পাক ফুজ্জারের অন্তর্ভুক্ত করলে অপরাপর আয়াত ও হাদীছের সাথে কঠিন বিরোধ সৃষ্টি হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের এ বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে মুফাস্‌সির যামাখশারী ও আবূ আলী জুব্বায়ীর মতে সকল প্রকার ফুজ্জার চির জাহান্নামী।

(৮৩) সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, মক্কী
৩৬ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ①	(১) যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য সর্বনাশ।
الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ②	(২) যখন অন্যের নিকট থেকে ওজন করে আনে তখন পুরোপুরি আনে।
وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ③	(৩) আর যখন অন্যদেরকে পাত্র দ্বারা পরিমান করে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

وَيْلٌ সর্বনাশ, ধ্বংস, مُطَفِّفِيْنَ যারা কম দেয়, اكْتَالُوْا মাপে, يَسْتَوْفُوْنَ তারা পুরোপুরি গ্রহণ করে, وَزَنُوْهُمْ অন্যদেরকে ওজন করে দেয়, يُخْسِرُوْنَ তারা কম দেয়।

ভাবার্থ

যারা মাপে ওজনে হের ফের করে, কম-বেশি করে, অন্যের নিকট থেকে নিজের হক পুরোপুরি আদায় করে, আর অন্যের হক আদায়ের বেলায় খেয়ানত করে, কম করে দেয়। তারা মোটেই লাভবান হয় না; বরং মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর প্রায়শ্চিত্ত তাদেরকে যেমন বস্তুজগতে ভুগতে হয়, তেমনি ভুগতে হবে পরকালের অনন্তকালীন জীবনে। এরূপ অপকর্ম কেবল তাদের পক্ষেই করা সম্ভব যাদের অশুভ পরিণামের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। অথচ এর প্রত্যেকটি বিষয় ধ্রুব সত্য। প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু যেমন অকাট্য বাস্তব, তেমনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ ও কেয়ামতের দিন বিচারের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টিও চরম সত্য। অতএব প্রত্যেককে স্বীয় নিরাপত্তার তাগিদেই এরূপ অপকর্ম থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

সূরা পরিচিতি

● সূরাটির নাম মুতাফ্‌ফিফীন। এক রুকূ বিশিষ্ট এই সূরাটিতে সর্বমোট ৩৬টি আয়াত রয়েছে। আর শব্দের সংখ্যা মতান্তরে ১৬৯/১৭৩/১৯৯টি। আর অক্ষরের সংখ্যা ৭৫৮/৭৩০/৭৮০টি।

● সূরাটি কোথায় নাযেল হয়েছে এবং কখন নাযেল হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত হয়েছে। যথা:

১. সূরাটি পবিত্র মদীনায় নাযেল হয়েছে এবং মদীনা পাকে সর্বপ্রথম এই সূরাটিই অবতীর্ণ হয়। মুফাস্‌সির কাতাদাহ, মুকাতিল, জাহ্‌হাক, হাসান এবং ইকরামার সূত্রে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ মতটি বায়হাকী, নাসায়ী মুসতাদরাক, ইবনে মাজাহ্ এবং তাফসীরের কিতাব-সমূহে বর্ণিত হয়েছে। (ফুতুহাত–৫০১/৪)

২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত ইবনে যুবায়ের সহ অনেকের মতে আলোচ্য সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাযেল হয়েছে এবং এটা সেখানে নাযেলকৃত সর্বশেষ সূরা। (হক্কানী–৬৪)

৩. অনেকের মতে প্রথম ছয়টি আয়াত। (রূহুল মাআনী–৬৭/৩০) অথবা প্রথম আটটি আয়াত পবিত্র মক্কায় নাযেল হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন–৬৯৩/৮) আর অবশিষ্ট আয়াতসমূহ পবিত্র মদীনায় নাযেল হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

৪. কারও কারও মতে মক্কা মদীনার পথে মধ্যবর্তী কোন স্থানে এই সূরাটি নাযেল হয়।

পর্যালোচনা

আয়াত অথবা সূরার অবতীর্ণকাল, অবতীর্ণ হওয়ার স্থান এবং শানে নুযূল আয়াতের অর্থ ও তত্ত্ব নিরূপণে সহায়ক অবশ্যই হয়, কিন্তু এগুলো না জানা থাকলেও আয়াতের অর্থ এবং তত্ত্ব নিরূপণ করা

যায়। অন্যান্য আয়াত, হাদীছ, সাহাবাদের উক্তি, মুফাস্‌সিরীন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এর ইজতেহাদ-গবেষণা এবং তত্ত্বানুসন্ধানের নির্ধারিত উসূল তথা মূলনীতিমালার অনুসরণ করলে অতি সহজেই প্রকৃত অর্থ এবং তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়।

তাফসীরের এই সত্যটি সম্পর্কে যারা উদাসীন, অথবা যারা বক্র চিত্তে পর্যালোচনার প্রয়াসী, তারা উপরোক্ত বিষয়সমূহ অজানা থাকলে অথবা কোন বিষয়ে ঐতিহাসিক মতানৈক্য দেখা দিলে বিষয়টিকে পাহাড়তুল্য জটিল মনে করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয় আর পূর্বসূরিদের প্রতিও ভুল-ভ্রান্তির দোষ আরোপ করে বসে। এতে একদিকে যেমন পর্যালোচনাকারীর প্রতি বিবেকবান ব্যক্তিবর্গের আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস জন্মে, তেমনি অপর দিকে অবিবেচক মহলে পূর্বসূরিদের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি হয়। এমনকি মূল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের পথ প্রশস্ত হয়। ধর্মীয় বিষয়াদিতে কলহ-বিবাদ এবং দলাদলির একটি অন্যতম কারণ এটাই। এর একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য সূরাটি। এই সূরাটি কখন, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় না মদীনায়– এ ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও অর্থ এবং তত্ত্ব নিরূপণে মোটেই কোন জটিলতা নেই। আমাদের আলোচনার মাধ্যমে তা প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এই মতপার্থক্য উল্লেখ করে কোন এক মুফাস্‌সির লিখেন (তাফহীমুল কুরআন দ্রষ্টব্য।) কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণার কারণ হল তারা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের বিষয়ে ভুলের শিকার হয়েছে। অথচ মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার মতটি ইব্‌নে মাসউদ এবং ইব্‌নে যুবায়ের থেকেও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত উক্তির ভিত্তিতে কেবল কোন কোন মুফাস্‌সির এই ভুলের শিকার হয়েছেন তা নয়, বরং ভুলের মধ্যে রয়েছেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট দুজন সাহাবী। এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ১৪/১৫ শত বৎসর পর্যন্ত এই ভুলটির অবতারণা হচ্ছে, অদ্যাবধি তা কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। পক্ষান্তরে বিংশ শতাব্দীর মুফাস্‌সির সাহেব সকল মুফাস্‌সিরদের এই ভুলের ইতি ঘটালেন।

কিন্তু আমরা মনে করি এখানে কারও কোন ভুল হয়নি। হ্যাঁ, তাফসীরের মূলধারা সমূহ অনুসরণের নীতি বর্জন করার কারণে এবং ঐতিহাসিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এবং আয়াত ও হাদীছের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের নীতি পরিহারের ফলে খোদ এই লেখকই ভুলের শিকার হয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও যারকাশী সহ প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির এবং উসূলে তাফসীরের বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেন যে,

ক. কোন কোন আয়াত বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে।

খ. অনেক সময় কোন বিষয় অথবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি আয়াত নাযেল হয়েছে, পরবর্তী সময়ে ঐরূপ বিষয়ের প্রয়োজনে অথবা ঐ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সময় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বের অবতীর্ণ আয়াত পুনরায় তেলাওয়াত করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এই বিষয় এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযেল হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সাহাবাগণ শোনেছেন, তাদের বর্ণনায়ও অনুরূপ ঘটেছে। যারা সাহাবাদের নিকট থেকে শোনেছেন তাদের বর্ণনায়ও অনুরূপ ঘটেছে। এমতাবস্থায়

www.maktabatulabrar.com

বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য দেখা দিলেই কাউকে ভুল তথ্য পরিবেশনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ, বিষয়বস্তুর মিলের কারণে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এরূপ বক্তব্য রেখেছেন, যা থেকে বাহ্যিকভাবে বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং পারস্পরিক বৈপরিত্যপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে সেরকম নয়। আমাদের সমাজেও এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু এ কারণে কেউ কোন দিন 'অমুকে ভুল করেছে'– এরূপ মন্তব্য করে না। আলোচ্য সূরার বিষয়টি একই ধরনের। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যখন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলেন, তখন যারা শোনেছেন তারা তাদের বর্ণনায় মক্কার কথা উল্লেখ করেছেন। মক্কা-মদীনার পথে তেলাওয়াত করে যাদেরকে শুনিয়েছেন তারা মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে নাযেল হওয়ার কথা বলেছেন। আর মদীনা পাকে পৌছার পর যাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছেন তারা মদীনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা-ই করা উচিৎ ছিল। সুতরাং ভুল কোথাও হয়নি। আসলে যিনি ভুল ধরেছেন তিনি নিজেই ভুলের স্বীকার হয়েছেন।

যোগসূত্র

সূরাটির যোগসূত্রের বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী এবং তানতাভী তাদের তাফসীরে বিশেষ আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতামতগুলোর সারাংশ নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. সূরাতুল ইনফিতারে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিনটি অত্যন্ত ভয়াবহ, সেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। সমস্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। এই ঘোষণা কাফের, মুনাফেক এবং অপরাধীদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী। আলোচ্য সূরার প্রথমেও ويل শব্দের মাধ্যমে পাপীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। (কাবীর– ৩৪৯/১৯)

২. পূর্বের সূরাটিতে আমলের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানুষকে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের পথ অবলম্বনের তাগিদে হক্কুল ইবাদ সংক্রান্ত কতক আমলের কথা বর্ণনা করে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে । (বয়ানুল কুরআন) [এ সূরার শুরুতে অনুরূপ সতর্ক উচ্চারিত হয়েছে।]

৩. মানুষের আমল দুই প্রকার। কতক আমলের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। এগুলোকে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) বলা হয়। আর কতক আমলের সম্পর্ক মানুষের সাথে। এগুলোকে হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) বলা হয়। মানুষকে উভয় প্রকার হক আদায় করতে হবে এবং উভয় প্রকার হক সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তবে মহান রব্বুল আলামীন পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। সুতরাং বান্দাকে কোন বাহানা করে ক্ষমা করে দিতে পারেন এই আশা-ভরসা করা যায়। কিন্তু হক্কুল ইবাদ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ দাবী রাখে। ইতিপূর্বের সূরাটিতে আল্লাহ্ পাকের নিজের হকের বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, আর আলোচ্য সূরায় হক্কুল ইবাদের কথা বর্ণনা করে মানুষকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

শানে নযুল

হিজরতের পূর্বে মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বেচা-কেনার নিয়ম চালু ছিল, যা কোন ক্রমেই কল্যাণমূলক ছিল না। তখন এমন কিছু প্রথা চালু ছিল যেগুলোর কারণে জেনে বুঝে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত অথবা অন্যকে ক্ষতি করার সুযোগ হত। মুলামাসাহ, মুনাবাযাহ প্রভৃতি ধরনের

বেচা-কেনা এরই অন্তর্ভুক্ত। (মুলামাসাহ ও মুনাবাযা প্রভৃতি ছিল জাহেলী যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বেচাকেনার পদ্ধতি। ফেকাহর কিতাবে এগুলোর বিশদ বিবরণ রয়েছে।)

শুধু প্রথাগতভাবেই নয়, বরং অনেক লোক এমনও ছিল যারা ইচ্ছাকৃতভাবেই মানুষকে ঠকাবার চেষ্টা করত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, মদীনায় এক লোক ছিল, যার আসল নাম ছিল আমর আর ডাক নাম ছিল আবূ জুহায়না। তার নিকট মাপের দুইটি বর্তন ছিল, একটি বড় আর একটি ছোট। যখন মানুষকে মেপে দিত, তখন ছোট বর্তন দ্বারা মেপে কম দিত আর অন্যের নিকট থেকে মেপে আনার সময় বড় বর্তন দ্বারা মেপে আনত। যেহেতু পাপ পুণ্যের প্রশ্ন ছিল না, ভয়-ভীতি ছিল না, তাই প্রকাশ্যেও এরূপ রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তখন এরূপ কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে আহবান জানালেন এবং আলোচ্য সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনালেন। ফলে এরূপ কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। (কুরতুবী- ৩৫০/১৯) এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, সেদিন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, 'পাঁচের মধ্যে পাঁচ'। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এর অর্থ কি? ইরশাদ করলেন, (১) যে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভ্যাস চালু হবে, তারা শত্রুচারিতায় বিধ্বস্ত হবে। (২) যে জাতির প্রশাসকবৃন্দ আল্লাহর নাযেল কৃত কুরআনের বিধান উপেক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সে জাতি অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হবে। (৩) যাদের মধ্যে যেনা, চুরী, মদ্যপান, ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে, তাদের মধ্যে কলেরা মহামারী এবং মৃত্যুরোগ দেখা দিবে। (৪) যাদের মধ্যে ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা দেখা দিবে, তাদের খামারে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। (৫) যারা মালের যাকাত আদায় করবে না, তাদের প্রতি আকাশের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা ভীষণ খরার সম্মুখীন হবে।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীছের বাস্তবতা আজ আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, 'যে দেশের প্রশাসক আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাত মোতাবেক প্রশাসন পরিচালনা করবে না, তাদের মধ্যে পরস্পর সংঘাত ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে, (তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে) আর তাদের উপর বিজাতিরা আক্রমন চালাবে। (যার ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।)।'

আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি তাদের আত্মঘাতি অবস্থা এবং জাতির মধ্যে বিজাতীয় কর্মসূচি ও বিধর্মীয় প্রভাব ইত্যাদির একই কারণ, যা উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের শুভবুদ্ধি এবং সু-অনুভূতি দান করুন।

শব্দ পর্যালোচনা

ويل (ওয়াইলুন) এর নিম্নোক্ত অর্থ করা হয়:

(ক) আল্লামা রাগিব, বিশিষ্ট অভিধান বিশারদ আল্লামা আছমায়ী প্রমুখ ওয়াইলুন-এর অর্থ করেছেন 'গভীর চিন্তা অনুশোচনা, সর্বনাশ এবং ধ্বংসতু'।

(খ) ইবনে জারীর এবং দুররুল মানছুরসহ তাফসীরের কিতাবসমূহে এর অর্থ জাহান্নামের একটি পাহাড়, অথবা কূপ, কিংবা গভীর গর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর মতে কাফেরদের পঁচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত এবং পুঁজ জড়ো হওয়ার একটি গভীর গর্তের নাম হচ্ছে

www.maktabatulabrar.com

'ওয়াইলুন'। ইব্‌নে হিব্বান, হাকিম এবং আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের দ্বারা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মুসনাদে আহমদ এবং তিরমিযীর হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ويل واد فى جنهم يهوى فيه الكافر اربعين خريفا قيل الله يقع فى قعره .

'ওয়াইলুন' জাহান্নামের একটি গভীর কূপ বা গর্ত। এতে কাফেরদেরকে নিক্ষেপ করা হলে চল্লিশ বৎসরে সেই গর্তের তলদেশে পতিত হবে।

এই গভীরতার কারণেই কোন কোন রেওয়াতে একে কূপ বলা হয়েছে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই, বরং নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান।

مطففين (মুতাফ্‌ফিফ): এই শব্দটি আরবী মূল তাত্‌ফীফ থেকে নির্গত। যার অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং অতি সামান্য। অভিধান বিশেষজ্ঞ আল্লামা যুজাজ বলেন, যারা গোপনে চুরি করে ওজনে এবং পরিমাপে কম দেয়, ক্রেতাকে ঠকায়, তাদেরকে মুতাফ্‌ফিফ বলা হয়। কারণ, তারা এভাবে বেশি কিছু নিতে পারে না, অতি সামান্য পরিমাণেই চুরি করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে ওজনে এবং মাপে কম দেয়া এবং নেবার কালে বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা- এই উভয় অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তাফসীর

যারা পরিমাপে এবং ওজনে হেরফের করে, কম দেয় এবং বেশি গ্রহণ করে, তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে এবং কাঠোর আযাবের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছে। তাদের এরূপ অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতেই ভোগ করতে হবে। চাই সে মুসলিম হোক, চাই অমুসলিম হোক। ইহকালের প্রায়শ্চিত্ত এই যে,

ক. অপকর্ম হল দুর্গন্ধ সদৃশ। কোন না কোন দিন এই অপকর্মের দুর্গন্ধ লোক সমাজে ছড়াবেই। অর্থাৎ, সমাজে তার অপকর্মের দুর্নাম ছড়াবেই। ফলে তার নিকট ক্রেতা বিক্রেতার সমাগত হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায় বেচা-কেনা কমে যাওয়ার কারণে লাভের পরিমাণ কমতে কমতে অবশেষে তাকে নিঃসম্বল হয়ে যেতে হবে।

খ. এরূপ লোক ঠকবাজ ও স্বার্থপর হিসেবে সমাজের নিকট ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য হবে। এভাবে সে সামাজিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে।

গ. সামান্য সামান্য করে অসংখ্য লোকের বিরাট পরিমাণ প্রাপ্য এবং হক স্কন্ধে চেপে পড়ার কারণে পরে পরিশোধের উপায় থাকে না। যে কারণে এটা বিবেকহীনতা এবং মুর্খতার পরিচয়, কোন বুদ্ধিমান এবং সুস্থ চিন্তার লোক এরূপ পাপ কাজ করতে পারে না। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ পাপাচারিতা গ্রহণযোগ্য হবে কী করে।

আর পরকালের প্রায়শ্চিত্ত হল- এরূপ পাপাচারীকে হাশরের ময়দানে আল্লাহর ইনসাফের আদালতে অপমানিত হতে হবে। শুধু অপমানিত নয়, জাহান্নামেও যেতে হতে পারে বরং যেতেই হবে। যদি না কোন উপায়ে আল্লাহ পাক রহমত করেন। হাদীছে আছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক প্রসঙ্গক্রমে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'আমার

উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব এবং সহায়-সম্বলহীন হতভাগ্য লোকটি কে, তা কি তোমরা বলতে পার? সাহাবাগণ উত্তর করলেন, না। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাশরের ময়দানে এক লোক নামাযী, রোযাদার এবং অনেক ইবাদত সহকারে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, বাহ্যিকভাবে সে জান্নাতী, কারণ তার কোন গোনাহ নেই। কিন্তু এমন সময় কিছু লোক হাজির হয়ে তার নিকট পাওনার দাবী পেশ করবে। সেখানে পাওনাদারের দাবী পরিশোধ করার মত তার নিকট কোন কিছুই থাকবে না। ফলে তার নেকীগুলো পাওনাদারদের দাবী পরিশোধ কারণে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সমস্ত নেকী দিয়ে দেয়ার পরও দাবী পরিশোধ না হওয়ার দরুণ দাবীদারদের গোনাসমূহ ঐ লোকের কাঁধে তুলে দেয়া হবে। অবশেষে তার কোন নেকীই থাকবে না, বরং গোনাহের বোঝা বহন করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ-ই হল আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক নিঃস্ব এবং সহায়-সম্বলহীন। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে, পরিমাপে এবং ওজনে কম-বেশির কারণে কীরূপ কঠোর শাস্তি ভোগতে হবে। কোন বিবেকবান সঠিক বুদ্ধির অধিকারী দূরদর্শী লোক কোনদিন এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। যাতে এরূপ অপকর্মে কোন লোকই লিপ্ত না হয় সেজন্যেই উপরোক্ত আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এই সকর্কবাণীকে কীরূপে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন তা অতি সহজেই অনুমেয়। নিম্নে পরিমাপ এবং ওজনে হেরফের করা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

পরিমাপ এবং ওজনে হেরফের করা প্রসঙ্গ

শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিমাপ এবং ওজনে হেরফের করা 'হক্কুল ইবাদে' খেয়ানত বিধায় মস্তবড় কবীরা গোনাহ এবং নীচ মন-মানসিকতার পরিচায়ক। হাদীছের ভাষায়, 'যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমার জন্য তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা জঘন্য অপরাধ এবং খেয়ানতের শামিল। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সাথে করা হলে তা কি তুমি মেনে নিবে? তাহলে তুমি অপরের সাথে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কীরূপে? হাদীছে পাকে এরূপ লোকের ঈমান দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত নাযেল হওয়ার পর মদীনাবাসীর প্রতিক্রিয়া

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি উল্লিখিত আয়াত নাযেল হলে তিনি সাহাবায়ে কেরাম এবং মদীনাবাসীকে তা তেলাওয়াত করে এবং ব্যাখ্যা করে শোনালেন। এতে তাদের মধ্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন। তাতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

ক. হেলাল ইব্‌নে তালক বলেন, 'আমি হযরত ইবনে উমরের সাথে বিচরণ করা অবস্থায় কথা প্রসঙ্গে বললাম যে, মক্কা এবং মদীনাবাসীদের ওজন ও পরিমাপ অত্যন্ত সঠিক এবং সুন্দর হয়। এর উত্তরে তিনি বললেন, তাদের জন্য এরূপ হওয়াই বাঞ্ছণীয়। কারণ, আল্লাহ্ পাক ওজনে এবং পরিমাপে হেরফেরকারীদের জন্য ওয়াইলুনের হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।'

খ. হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, 'রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তাশরীফ এনে দেখতে পান, এখানের লোকেরা ওজনে এবং পরিমাপে হেরফের করায় অত্যধিকভাবে

অভ্যস্ত, তবে এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর তারা তাদের এই কু-অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিহার করেন এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপে বেচা-কেনা করেন।

গ. বায্‌যার এবং দালায়েলে বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যান আর সিবা ইবনে উরফুতাকে মদীনা পাকে স্বীয় স্থলাভিসিক্ত করেন। তিনি ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুতাফফিফীন তেলাওয়াত করলে আমি মনে মনে বলে উঠলাম– অমুক ব্যক্তির সর্বনাম হয়েছে। কারণ, সে বেঁচা-কেনায় হেরফের করার জন্য দুই ধরনের ওজন এবং পরিমাপের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

ঘ. একদিন হযরত আলী (রা.) কোন এক ব্যক্তিকে যাফরান ওজন করে দিতে দেখলেন। লোকটি পরিমাণে বেশি দিচ্ছিল, তবুও হযরত আলী (রা.) নিজ হাতে পাল্লা ধরে বরাবর করে দিয়ে বললেন, প্রথমে ওজন সঠিক করবে, অতঃপর যত মনে চায় বেশি দিয়ো, তাতে কোন আপত্তি নেই। হযরত নাফে' বলেন, হযরত আলী (রা.) যে কোন বিক্রেতার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বিক্রেতাকে লক্ষ্য করে বলতেন,

اتقى الله واوف الكيل والوزن بالقسط .

আল্লাহকে ভয় কর, ওজন করবে এবং মাপ দিবে সঠিক সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে।

তিনি তাদেরকে একথা বলতেন এ কারণে যে, যারা ওজন এবং পরিমাপে হেরফের করে থাকে তারা কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে যখন দাঁড়াবে তখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হবে। যে বিপদের ভয়ের কারণে শরীরের ঘাম নির্গত হয়ে কানের লতি পর্যন্ত ডুবে থাকবে।

ঙ. হযরত ইকরামা একদিন বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, 'ওজনকারী ও পরিমাপকারীরা সকলেই জাহান্নামে যাবে।' একজন বলল, আপনার পুত্র মাপ এবং ওজন করে থাকে। তিনি উত্তর করলেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

চ. হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার রহ. মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে তাকে এই বলতে শুনলেন, জাহান্নামের দুই পাহাড়, জাহান্নামের দুই পাহাড়।' তিনি ভাবলেন, লোকটির বোধ হয় মতিবিভ্রম ঘটেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অর্থহীন কথা বলছ কেন?' লোকটি বলল, 'হে আবূ ইয়াহ্‌ইয়া, ঐ দেখ আমার দুইটি পরিমাপের পাত্র। এর বড়টি দিয়ে পরিমাপ করে অন্যদের থেকে গ্রহণ করতাম, আর ছোটটির দ্বারা অন্যকে মেপে দিতাম। এইভাবে আমি ওজনে হেরফের করতাম। তাই আমি মৃত্যুর মুহূর্তে জাহান্নামের দুই অগ্নিময় পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।' তখন হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহ.) উঠে গিয়ে পরিমাপের সেই পাত্র দুটিকে একটি অপরটির উপর ছুড়ে মেরে চুরমার করে ফেলেন। লোকটি বলল, 'হে আবূ ইয়াহইয়া, যতবার তুমি চুরমার করার জন্য আঘাত করেছ, ততবার শুধু অগ্নির পাহাড় দুটিকে বৃহৎ আকার ধারণ করতে দেখেছি। নিবৃত্ত হচ্ছে না মোটেই।'

ছ. হযরত আসমায়ী (রহ.) বলেন, আমি এক গ্রাম্য মূর্খকে কেবল এই বলতে শুনেছি যে, 'পরিমাপ এবং ওজনকারীদের নিকট ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতার কামনা করো না।'

www.maktabatulabrar.com

পর্যালোচনা: উপরোক্ত আলোচনা থেকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে যে, শরীয়তের চাহিদা এবং হুকুম-আহকামের মোকাবেলায় স্বীয় চাহিদা এবং সার্বিক স্বার্থ পরিহারকরণে তাঁরা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এটাই প্রকৃত ঈমানের চাহিদা। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ.

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে এই এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে। (সূরা আহযাব: ৩৬)

আর এক আয়াতে ইরশাদ করেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে নিজের মনে কোন সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্ট চিত্তে কবূল করে নিবে। (সূরা নিছা: ৬৫)

পর্দা, মদ, জুয়া ইত্যাদির বেলায় হুকুম নাযেল হলে সাহাবায়ে কেরাম অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয়ার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা থেকেও প্রমাণিত হয় আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য কী ছিল। সকল মু'মিনের জন্য এ আদর্শ অনুসরণযোগ্য। আলোচ্য আয়াত নাযেল হলেও সাহাবায়ে কেরাম তাদের ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের ভিতর নিম্নোক্ত প্রতিফলন ঘটে–

১. সমগ্র মদীনায় ওজন ও পরিমাপে হেরফেরের যে কুপ্রথা এবং ঠকানোর মন-মানসিকতা প্রচলিত ছিল তার সম্পূর্ণ অবসান হয়। আর অদ্যাবধি একই অবস্থা সেখানে অব্যাহত রয়েছে।

২. যাদের দ্বারা এরূপ অপকর্ম হয়েছিল তারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হন, খাঁটি মনে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে নেন।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত ইব্‌নে উমর (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যাদের মধ্যে এরূপ অপকর্ম বিদ্যমান ছিল, তারা এ ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন এবং অপকর্ম ও মুনকার পরিশোধনে পরিশ্রম করতেন।

৪. সমাজ থেকে এরূপ মুনকার দূরীভূত করার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতেন।

আনুগত্য সৃষ্টির উপায়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, আযাবের ভয় মানুষের আমল-আখলাক ও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। গর্হিত আকীদা-বিশ্বাস এবং চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ঐতিহাসিকগণ যে জাতিকে চরম অসভ্য জাতি এবং যে যুগকে জাহিলিয়াতের যুগ

www.maktabatulabrar.com

বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তাদের জীবনে এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সংশোধনের মূল উপকরণ ছিল এটাই। কবর, হাশর ও জাহান্নামের ভয়ভীতি শরীয়তের প্রতি মানুষের আনুগত্যের পথ সুগম করতে পারে। এ কারণে বলা হয়েছে যে, الايمان بين الخوف والرجاء অর্থাৎ, ঈমান ভয় এবং আশা ভরসার মধ্যভাগে অবস্থিত।

এই ভয়-ভীতি ছাড়াও মানুষের মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টির আরও একটা পন্থা রয়েছে, তা হল বিশ্বাস ও ভালবাসা। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালবাসা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রেরণাকে জাগ্রত করে তোলে। আন্তরিক ভালবাসা প্রেমাস্পদের আদর্শের প্রতি আনুগত্যশীল করে তোলে। একারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসাকে ঈমানের নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর নবীর অনুসরণ ও অনুরকরণকে আল্লাহ পাকের ভালবাসার উপায় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আনুগত্যের সর্বাধিক ক্রিয়াশীল উপায় এটাই।

সারকথা– কারও প্রতি অনুরক্ত অভিভূত হলে, কাউকে ভালবাসলে বা কারও থেকে শাস্তি পাওয়ার ভয় থাকলে মানুষ তার আনুগত্য করে থাকে। সাহাবায়ে কেরামের অন্তর আল্লাহ্ পাক এবং রসূলের ভালোবাসা ও ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল বিধায় তারা এই আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের চরম শিখরে উপনীত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলেই তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল আমূল পরিবর্তন।

ওজন ও মাপে হেরফের করার শাস্তি কাদের জন্য প্রযোজ্য?

ওজন ও মাপে হেরফের করার শাস্তি কাদের জন্য প্রযোজ্য– এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

(১) অনেকের মতে ওজন ও মাপে হেরফের করার শাস্তি শুধু মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য। কাফেররা আলোচ্য আয়াতে ওজন ও মাপে হেরফের করার ব্যাপারে বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত নয়। সুতরাং ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করার কারণে কাফেররা কোন প্রকার আযাবের সম্মুখীন হবে না? হ্যাঁ, মু'মিন-মুসলমানগণ ওজন ও মাপে হেরফের করলে তার জন্য আযাব প্রাপ্ত হবে। কাফেররা এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়– এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি রয়েছে।

(ক) কাফেররা তাদের কুফ্‌রীর কারণেই জাহান্নামী হবে, অন্য কোন আমল বর্জন ও বা অন্য কোন গোনাহের কারণে নয়। কেননা, কাফেররা তাদের কুফ্‌রীর কারণে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকামের মুকাল্লাফ তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। এ কারণেই মাতুরীদী হানাফীগণের মতে কাফেররা নামাযের মুকাল্লাফ তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। সুতরাং কাফেররা যখন মুকাল্লাফ নয়, তখন এরূপ হুকুম পালন না করা তাদের জাহান্নামী হওয়ার কারণ হতে পারে না।

(খ) আলোচ্য সূরার ৪ নং আয়াতে ওজন ও পরিমাপে হের-ফেরকারীদেরকে সতর্ক এবং ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। এর কার্যকারিতা মু'মিনদের বেলায় প্রযোজ্য বটে, কাফেরদের বেলায় নয়। কারণ, তারাতো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হাশর, বিচারাদালত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন বৈ আর কিছুই নয়। অবুঝ সন্তানের জন্য আগুন কি ভয়ের কারণ হতে পারে?

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাতুরীদী মাযহাবে কাফেররা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ফুরূয়াত তথা শাখা বিধি-বিধানের মুকাল্লাফ। সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ে শরীয়ত লঙ্ঘন করলে তারা শাস্তির উপযুক্ত হবে। হ্যাঁ, কাফেররা অপবিত্র এবং তাদের নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তারা ইবাদত করবে কী করে? তবে ইবাদত না করলে সে কারণে তাদের শাস্তি হবে না একথা সঠিক নয় বরং ইবাদত তরকের কারণেও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তা এভাবে যে, কুফ্রীর জন্য শাস্তি প্রদানের সময় ইবাদত তরকের শাস্তিকে সংযোগ করে দেয়া হবে।

আয়াতের মধ্যে জাহান্নামের কারণ হিসেবে ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করাকে স্থির করা হয়েছে। কুফ্রকে কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং যারাই ওজন ও পরিমাপে কম-বেশি করার অপকর্মে লিপ্ত হবে, তারা সকলেই এই আযাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় উল্লিখিত কারণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় তুলনামূলকভাবে ছোট অপরাধকে আযাব এবং শাস্তির কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তার উদ্দেশ্য হয় সতর্কীকরণ। কেননা, অত্যধিক প্রচলনের কারণে ছোট অপরাধের প্রতি মনোনিবেশ হয় না। কুফর, শিরক করা অপরাধ, এদিকে মানুষের মন যায়, এগুলোকে অপরাধ কাজ উপলব্ধি করে। কিন্তু ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করাও যে মারাত্মক গোনাহ, এদিকে মন যেতে চায় না। তাই এ কারণকে ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করা যে অপরাধ তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা হল, যেহেতু ওজন এবং পরিমাপে কম বেশি করার কু প্রথা ঐ সমাজে অধিক মাত্রায় চালু ছিল, তাই এর পরিশোধনের প্রয়োজনেই আয়াতটি নাযেল হয়েছে। (২) ওজন ও মাপে হেরফের করার শাস্তি কাদের জন্য প্রযোজ্য– এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মত হল, এই শাস্তি মু'মিন ও কাফের উভয় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। তাহলে এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আলোচ্য আয়াতটি আবূ জুহাইনার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এই হুকুম অন্যের উপর প্রযোজ্য হবে কেন? এর উত্তরে দুটো বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা:

১. অনেক সময় কোন আয়াত বা হাদীছ ব্যক্তি বিশেষের জন্য বর্ণিত হয়েছে এবং তার হুকুমও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য চার এর অধিক বিবাহের অনুমতি। এমনিভাবে এক সাহাবীর জেহাদের সময় নাক কেটে পড়ে গেলে তার জন্য স্বর্ণ দিয়ে নাক তৈরি করার অনুমতি প্রভৃতি। এ ধরনের আয়াত এবং হাদীছে বর্ণিত হুকুম ব্যক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় কোন কোন আয়াত কোন একটা শ্রেণি বিশেষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার হুকুমও সেই শ্রেণিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তার পত্নীদের পক্ষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। এ ধরনের আয়াত এবং হাদীছে বর্ণিত হুকুম শ্রেণিভিত্তিক হয়ে থাকে। আর যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীছ ব্যক্তি অথবা শ্রেণিবিশেষের জন্য বর্ণিত হয়নি, সেগুলো কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হলেও তার হুকুম ব্যাপক হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতটি এই তৃতীয় প্রকারের। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন আয়াতের হুকুমকে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণিভিত্তিক মনে করেননি। তা ছাড়া হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মদীনাবাসীদের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত

www.maktabatulabrar.com

ওজন ও পরিমাপে হেরফের করার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। এতে প্রতীয়মান হয়, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যও কোন ব্যক্তি অথবা শ্রেণিকে সতর্ক করা নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্যই তিনি এই সতর্কতা সম্পর্কিত আয়াত তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

২. উসূলে তাফসীর এবং আয়াত থেকে মাসালা-মাসায়েল উদ্ভাবনের মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন আয়াত কোন ব্যক্তি, শ্রেণি অথবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযেল হলেও অর্থের প্রশ্নে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে পারে। হ্যাঁ, ব্যক্তি, শ্রেণি অথবা ঘটনার সাথে হুকুমের বিশেষত্বের কোন উপযুক্ত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। বস্তুত আলোচ্য আয়াতে কোন শ্রেণির বিশেষত্বের কারণ নেই বিধায় সংশ্লিষ্ট হুকুম ব্যাপক অর্থে নিতে কোন বাধা নেই। এ কারণেই যদিও আয়াতে ওজন এবং কাইল (বিশেষ এক ধরনের পরিমাপ)– কেবল এই দুই প্রকারের কথাই বলা হয়েছে, তবুও হুকুমকে এই দুই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করা হয়নি, বরং সর্বপ্রকার পরিমাপ এবং ধোঁকা ও ঠকানোর মন-মানসিকতা নিয়ে যেসমস্ত অপকর্ম করা হয়– ঐ ধরনের সমস্ত বিষয়কে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে সমস্ত মুফাস্সির মত পোষণ করেছেন। যথা, আল্লামা আবুল কাসেম কুশাইরী বলেন, 'মুতাফ্ফিফ'-কথাটি এখানে ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: নিজের দোষ গোপন করে পরের দোষ প্রকাশ করা। নিজের বেলায় ইনসাফ ও সুবিচার কামনা করা, অন্যের বেলায় তা কামনা না করা। অন্যের ভুল-ত্রুটি তালাশ করা নিজের গোনাহের পরোয়া না করা। নিজের জন্য সম্মান কামনা করা, নিজে অন্যের সম্মান না করা। নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা। শ্রমিক এবং অধীনস্তদের নিকট থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করা, তাদের পারিশ্রমিক পুরোপুরি আদায় না করা। আরাম আয়েশের সমস্ত সামগ্রীর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করা, কান্নাকাটি করা আর তার ফরমাবরদারী এবং পুরাপুরি আনুগত্য না করা। আল্লাহ্ পাকের নামে দান-দক্ষিণা গ্রহণ করা এবং নিজে কখনও দান-খয়রাত না করা। মানুষকে গোনাহের কাজ বর্জন করার জন্য নছীহত করা আর নিজে গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকা। প্রকাশ্যে ভাল ভাল কথা বলা, বুযুর্গীর ছুরত ধরা আর গোপনে শয়তানী কর্ম করা। এরূপ অপকর্মকারী সকলেই মুতাফফিফীনের অন্তর্ভুক্ত। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারাও আল্লামা কুশাইরীর উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়। তিনি ইরশাদ করেন,

اوف يا ابن ادم كما تحب ان يوفى اليك الخ .

হে বনী আদম, তুমি নিজের জন্য যেমন কামনা কর যে, তোমার প্রাপ্য তোমাকে পুরোপুরি দেয়া হোক, তেমনি তুমিও অন্যের প্রাপ্য পুরোপুরি দিয়ে দাও।

এখানে একটা প্রশ্ন হয়, সর্বপ্রকার পরিমাপ উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে ওজন এবং কাইল দুইটি শব্দকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? এর দুইটি কারণ হতে পারে:

(১) যাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তারা এই দুই তরীকার মাপে উপরোক্ত কর্ম করে থাকত। যথা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বের যুগে মদীনা পাক এবং অন্যান্য অঞ্চলে ধান-চাউল শস্য ফসল ইত্যাদি বিশেষ পাত্র দ্বারা মেপে দেয়া হত। আর স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুসমূহ ওজন করা হত। আমাদের দেশেও বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থাই অধিকাংশ স্থানে চালু

আছে। এ কারণেই আয়াতের মধ্যে দুই ধরনের মাপের কথা উল্লেখ হয়েছে। বর্তমান যুগের সমস্ত পরিমাপ, যথা গজ, মিটার ইত্যাদিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

(২) অন্যান্য পরিমাপের দ্বারা চুরি করা এবং ঠকানো তত সম্ভব হয় না, ধরা পড়ার আশংকা অধিক থাকে। পক্ষান্তরে ওজন এবং কাইল-এর মধ্যে উপরোক্ত অপকাজ অতি সহজেই সম্ভব হয়। এজন্য বিশেষভাবে এই দুই রকমের বিষয়কে উল্লেখ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

(৪) তারা কি ভাবে না যে, তারা পুনর্জীবিত হবে?	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤
(৫) এক বড় দিনে,	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥
(৬) যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে দাঁড়াবে।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

শব্দার্থ

اَلَا يَظُنُّ তারা কি ভাবে না, তারা কি বিশ্বাস করে না? مَبْعُوْثُوْنَ তারা পুনর্জীবিত হবে, يَقُوْمُ দাঁড়াবে, لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ এক বড় দিনে, এক ভীষণ দিনে, لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে।

ভাবার্থ

যারা ওজন এবং পরিমাপে হেরফের করে, তারা কি ভাবে না যে, এক ভীষণ এবং ভয়াবহ দিনে তাদেরকে এরূপ অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগকরণের জন্য নিশ্চয়ই উত্থাপিত হতে হবে? যে দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়াবে।

তাফসীর

আলোচ্য আয়াতসমূহে ওজন ও পরিমাপে হেরফেরকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এ সতর্ক বাণী যেমন অতীতের হেরফেরকারীদের জন্য প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যতের হেরফেরকারীদের জন্যও। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এরূপ অপকর্ম অতীতে করেছে অথবা বর্তমানে লিপ্ত আছে তারা যেন খাঁটি মনে তওবা করে এবং যারা এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়নি তারা যেন কোন দিন লিপ্ত না হয়। নিজে সতর্ক থাকে এবং অন্যদেরকেও সতর্ক করে।

উপরোক্ত সতর্কবাণীর সাথে সম্পর্কিত দুটি দিক নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করা যায়। একটি হচ্ছে তারা কেন এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল? অর্থাৎ, অপকর্মের মূল উৎস কী?। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই অপকর্ম থেকে মুক্তির উপায় কী? নিম্নে উভয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

অপকর্মের মূল উৎস

প্রথম দিকটার বিশ্লেষণে অর্থাৎ, তারা কেন এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল তার বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, অনেক অপকর্মের মূল এবং অন্যতম উৎস হচ্ছে দুটি। যথা:

ক. অপকর্মের পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা।

খ. অর্থলোভ ও পুঁজি সংগ্রহের অভিলাষ।

তবে 'খ'-য়ে বর্ণিত উৎস তুলনামূলক ভাবে বেশি মারাত্মক। কেননা, জ্ঞান না থাকার কারণে কোন অপকর্মে লিপ্ত হলে তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে তার অবসান সম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অর্থাভিলাষী, লোভাতুর কোন ব্যক্তিকে যুক্তি তর্ক ও ভয়াবহ পরিণাম জ্ঞান দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করা যায় না। অতীতেও যায়নি, সুতরাং ভবিষ্যতেও যাবে না। এরপরও রয়েছে মানবতা ও সততার প্রশ্ন। ঈমান ও আখেরাতের বিশ্বাস ভিত্তিক মানবতা ও সততা দুর্বল হওয়ার কারণে অর্থলোভ প্রকট ও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য আর একটি রয়েছে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিঙ্গির মানবতা ও সততা। এরূপ মানবতা ও সততা অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখে না। বর্তমান যুগের মানবতা এবং সততার দাবীদারদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, যে মানবতা এবং সততার উৎস হচ্ছে আখেরাত এবং ঈমান ভিত্তিক চেতনা, কেবল এরূপ মানবতা এবং সততাই মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়। যদি দুইজন লোক এক সাথে চলতে থাকে। তাদের একজনের নিকট লক্ষাধিক টাকা গচ্ছিত থাকে, আর চলতে চলতে বনে, জঙ্গলে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছে। যেখানে কোন লোকজন নেই, প্রতিরোধের কোন উপায়-উপকরণ নেই। এরূপ নিরাপদ নীরব স্থানে যদি অপর লোকটির মনে সাথীর লক্ষাধিক টাকার প্রতি লোভের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে, আর সাথীকে হত্যা করে তার অর্থ আত্মসাৎ করতে সক্ষম হবে চিন্তা করে এই মানবতা বিবর্জিত অপকর্ম করতে উদ্যত হয়। অপর পক্ষে সাথী যদি অত্যন্ত দুর্বল হয়। তাহলে এ মুহূর্তে তাকে এই অপকর্ম থেকে বিরত রাখার কী উপায় বলুন? কে তাকে এই মারাত্মক অপরাধ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে? কোন উপায় নেই। কেউ তাকে বাধা দেয়ার নেই। হ্যাঁ, যদি তাকে বাঁধা দেয়ার কোন উপায় থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও প্রায়শ্চিত্তের ইয়াকীন, আল্লাহ পাকের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও খোদাভীতি, অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্কে দুটো ঘটনা পেশ করা হল।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাপড়ের বিরাট ব্যবসা ছিল। একবার তিনি তার এক কর্মচারী হাফ্‌ছ ইব্‌নে আব্দুর রহমানকে কিছু কাপড় দিয়ে বিক্রির জন্য পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, এই কাপড়গুলোর মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং বিক্রির সময় ক্রেতাকে অবশ্যই সে সম্বন্ধে অবহিত করবে। কিন্তু কর্মচারীটি ভুলবশত কাপড়ের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা ব্যতীত তা বিক্রি করে দিল। ফিরে আসলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. বিষয়টি অবহিত হলেন। তখন তিনি তৎকালীন ত্রিশ হাজার দেরহাম গরীব মিসকীনদের মধ্যে সদকা করে দেন এবং উক্ত কর্মচারীকে স্বীয় ব্যবসার তত্ত্বাবধান থেকে অপসারণ করেন। (উকূদুল জুমান– ২৪০)

হযরত ইমাম বোখারী রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম বোখারী (রহ.)-এর কাপড়ের বিরাট ব্যবসা ছিল। একবার একদল ক্রেতা কিছু কাপড় ৫০০ দেরহাম লাভে ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব করলে তিনি বলেন যে, আমি কথা দিচ্ছি না, তবে আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আপনারা আমার সাথে পরে যোগাযোগ করবেন। এমন

www.maktabatulabrar.com

সময় অপর এক ক্রেতা উপস্থিত হয়ে ১০০০ দেরহাম লাভ দিয়ে সেই কাপড় ক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইমাম বোখারী (রহ.) এই দরে তাদেরকে কাপড় দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন যে, ইতিপূর্বে যে দলটি ৫০০ দেরহাম লাভে কাপড়গুলো ক্রয় করার প্রস্তাব করেছিল, তাদেরকে ঐ মূল্যে কাপড়গুলো দেয়ার প্রতি আমার মনে ভাব জন্মেছিল, তাই তাদেরকেই দিতে হবে। অতঃপর ১০০০/= দেরহাম লাভের পরিবর্ত ৫০০ দেরহাম লাভ করে প্রথম ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করেন, অথচ তাদের সাথে কোন প্রকার পাকাপাকি কথা ছিল না। (মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী– ৫৬৫)

বলা বাহুল্য, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), হযরত ইমাম বোখারী (রহ.) এবং তাদের ন্যায় অসংখ্য ব্যবসায়ীদের এরূপ সদাচারণের মূল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান বৈ আর কী ছিল? এই বিশ্বাসই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জুলায়খার আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আর ইবরাহীম ইব্‌নে আদহামের ন্যায় সম্রাটকে বস্তু জগতের বাদশাহী থেকে পৃথক করে আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাটের আসনে সমাসীন করেছিল।

এখন দেখার বিষয় হল আয়াতে ওজন ও পরিমাপে হেরফের করার যে অপকর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে অপকর্মের উপরেল্লিখিত দুটি কারণের কোনটি বিদ্যমান ছিল। হতে পারে অজ্ঞতাই এই অপকর্মের কারণ ছিল। যাদের মধ্যে এই কারণ বিদ্যমান ছিল তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে। কিংবা অর্থলোভও তার কারণ হতে পারে। আউস, খাযরাজসহ অনেক ইয়াহুদী এবং দুর্বল নও মুসলিমদের মধ্যে এরূপ মন-মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল। তাদের আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ছিল, কিন্তু দুর্বল বিশ্বাস তাদেরকে এহেন অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। এরূপ লোকদেরকেও আলোচ্য আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে। তবে প্রথম প্রকার লোকদের তুলনায় দ্বিতীয় প্রকার লোকদের প্রতি আল্লাহ পাকের উক্ত হুশিয়ার বাণী এবং বিস্ময় প্রকাশ তুলনামূলকভাবে অধিক।

আলোচ্য আয়াতে يظن (ইয়াজুন্ন) বাক্যটি আমাদের উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে– (এক) এর অর্থ নুন্যতম ধারণা। (মাযহারী– ২১৮/১০) সেমতে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে এই যে, 'তারা কি ধারণা করে না, তারা পুনরুত্থিত হবে।' অর্থাৎ, যদিও তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না তাহলেও ন্যূনতম ধারণা তো হতে পারত যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।' (দুই) এর অর্থ ইয়াকীন অর্থাৎ, বিশ্বাস। সেমতে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে, 'তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।' এই বিশ্বাস পরিমাপে হের-ফের করার মত অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং যাদের আখেরাতের কঠোর আযাবের উপর বিশ্বাস আছে, তাদের জন্য এ অপকর্মের আযাব এবং তা বর্জন করার গুরুত্ব যে কত অধিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুফাস্‌সিরীনে কেরাম কর্তৃক উভয় অর্থের সমর্থনে মতামত পাওয়া যায়।

অপকর্ম থেকে মুক্তির উপায় কি?

আয়াতে বর্ণিত ওজন ও পরিমাপে হেরফের করা সহ অন্যান্য অপরাধ থেকে মুক্তির উপায় কি? এ বিষয়টির বিশ্লেষণে বলা যায়, সমস্ত অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার উপায় হল–

১. নিজের বিবেক বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করা। অন্যায়ের অশুভ পরিণাম এবং সততার শুভপরিণাম অস্পষ্ট কোন বিষয় নয়। সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই তা বোঝা সক্ষম হয়। যখন

www.maktabatulabrar.com

নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো হয়, তখন অনেক অন্যায় অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। যেমন একটা ঘটনা শুনুন। সহীহ হাদীছে আছে যে, এক লোক রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে বলেছিল যে, 'আমি অমুক মহিলার প্রতি চরমভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছি এবং অপকর্মে লিপ্ত হতে চাই।' রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিকটে ডেকে বসালেন এবং তাকে অতি নম্রভাবে এবং ভদ্রতার সাথে বুঝিয়ে বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তোমার আপন বোনের সাথে এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করে, তাহলে কি তুমি তাতে সম্মত হবে? না অন্য কিছু করবে? লোকটি উত্তর করল, 'সম্মত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং আমি তখনই তাকে হত্যা করে দিব।' রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যে মহিলার সাথে অপকর্ম করতে ইচ্ছা করেছ সেও তো কারো না কারো বোন হবে?' লোকটি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেকমতপূর্ণ নছীহত শোনে পরিতৃপ্ত ও অভিভূত হল এবং এই অপরাধের অযৌক্তিকতা তার বুঝে আসল।

২. অন্যায় অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার আর একটি উপায় হল– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওয়ারিছ ও প্রতিনিধিদের আদর্শ অনুসরণ করা। যদি নিজ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যায় অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা দূর করা সম্ভব না হয় এবং অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকা সম্ভব না হলো, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ওয়ারিছ ও প্রতিনিধিদের আদর্শ অনুসরণ করে অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ উপলব্ধি না আসা উদাসীনতা এবং গাফিলতির পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত অন্যায় অপকর্ম থেকে মুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করা হল। এতদসত্ত্বেও যদি কারও দ্বারা অন্যায় অপকর্ম হয়ে যায়, তাহলে তার আযাব থেকে মুক্তির উপায় হল তওবার রাস্তা অবলম্বন করা, শরীয়তের হুকুম-আহকাম মোতাবেক সুন্নাতী যিন্দেগীর পাবন্দী করা এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদাবের উপর আমল করা। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বুশাইরকে ওছিয়ত করে বলেছিলেন যে, হে বুশাইর! প্রত্যহ রাতে ঘুমানোর পূর্বে কেয়ামতের এবং হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা থেকে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ **(তারা কি ভাবে না যে, তারা পুনর্জীবিত হবে? এক বড় দিনে?)**

বড় দিন পরিভাষার বিভ্রান্তি

আমাদের দেশে 'বড় দিন' বলতে খ্রিষ্টানদের ঐতিহাসিক একটি দিনকে বুঝায়। খৃষ্টানদের ধারণা মতে যেদিন সমস্ত পাপের শাস্তি থেকে উম্মতের মুক্তির মানসে স্বয়ং যিশু শুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সেদিনই হল বড় দিন। সুতরাং খ্রিষ্টানদের ধারণা মতে হাশরের ময়দানে তাদের শাস্তির কোন অবকাশই নেই। কিন্তু ইসলামী আকীদা মোতাবেক খ্রিষ্টানদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। না যিশু শূলিবিদ্ধ হয়েছেন, না তারা বিচার এবং শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যিশু মৃত্যুর আকীদা পোষণের কারণে কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে খ্রিষ্টানদের অনুসারী তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়।) যাহোক 'বড় দিন' খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক একটি দিন। এদিন খ্রিষ্টানজগত পালন করতে পারে, মুসলমানগণ তা পালন করতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অজ্ঞতার কারণেই হোক অথবা অবহেলার

কারণেই হোক, খ্রিষ্টানদের ঘৃণ্য তৎপরতার অন্তরালে 'বড় দিন' পালনের মন-মানসিকতা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান। এজন্য অর্থ বরাদ্দ হতে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত এবং রাষ্ট্রীয় ছুটিসহ পত্র-পত্রিকায়, রেডিও টেলিভিশনে প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিম আকীদা-বিশ্বাস ও মুসলিম সংস্কৃতির গোড়ায় কুঠারাঘাত হানা হচ্ছে, আর খৃষ্টীয় ভ্রান্ত আকীদা প্রতিষ্ঠার মহড়া চলছে। অথচ আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী মহল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রমূলক 'বড় দিন' পরিভাষার কারণেই অনেকের পক্ষে এরূপ উক্তি করা সম্ভব হতে চলেছে যে, হুজুর, আপনারা খ্রিষ্টানদের 'বড় দিন'-এর বিরোধিতা করেন অথচ পবিত্র কুরআনে বড় দিন-এর কথা আলোচিত হয়েছে। সরল প্রাণ মুসলমানগণ এভাবে খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছে।

অথচ পবিত্র কুরআন, হাদীছে পাক এবং আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতে আল্লাহর দরবারে হাজিরী হিসাব নিকাশ এবং পরিণামের দিনকে 'বড় দিন' বলা হয়েছে। আর উপরোক্ত কারণে এবং বাস্তবেও যে ঐ দিনটি বড় এবং মহান তা বলাই বাহুল্য। কেননা, সেদিন সমস্ত মানুষকে মহান রব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে জীবনের ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য। সেদিন আল্লাহ পাকের ন্যায় এবং ইনছাফের আদালতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। সেটা হবে প্রকৃতই এক বড় দিন, প্রকৃতই এক ভয়াবহ দিন। নিম্নে সেদিনের ভয়াবহতার কিঞ্চিত বিবরণ প্রদান করা হল।

বড় দিনের ভয়াবহতা

এদিনের ভয়ভীতির প্রতি আলোকপাত করে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, 'তোমাদের পূর্বসূরিগণ অধিক পরিমাণ সদকা-খয়রাত করেও এদিনের বিষয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন।' (মুসলিম শরীফ) হযরত হাসান বসরী (রহ.) ছিলেন একজন বড় ধরনের তাবেয়ী। তিনি পূর্বসূরিদের দ্বারা সাহাবাদেরকে বুঝিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের ফযীলতের বিষয় কে না জানে? পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে তাদের পবিত্রতার কথা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত রয়েছে। তাদের সদকা-খয়রাতের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'অন্যদের উহুদ পরিমাণ সদকা-খয়রাত সাহাবাদের সামান্য পরিমাণ সদকার তুলনায়ও নগন্য হিসেবে গণ্য হবে।' (দুররুল মানছুর– ৩২৫/৬) হযরত হাসান বসরী (রহ.) এ মুহূর্তে সদকার কথা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র হাদীছে বর্ণিত আছে– দান খয়রাত আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির আগুনকে নিবৃত করে দেয়, ঈমানী মৃত্যু লাভ হয়। এত সব কিছুর পরও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.)সহ সাহাবাগণ এদিনের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত, বরং সমস্ত নবী রসূলগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। সুতরাং এদিনটি যে কত বড় ভয়াবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হযরত ইবনে উমর, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, জারীর, মেকদাদ, উক্‌বা, আনাস, ইব্‌নে মাসউদ প্রমুখ সাহাবা থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুস্তাদরক, তাবারানী, বায়হাকী, মুসনাদে আবূ

www.maktabatulabrar.com

ইয়ালা', ইবনে হিব্বান এবং তাফসীরে ইব্‌নে জারীরে যথেষ্ট হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। এই হাদীছসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

(ক) ঐ দিনের ভয়ের কারণে শরীর থেকে ঘাম নির্গত হবে এবং মানুষ নির্গত ঘামে কানের লতি পর্যন্ত ডুবে থাকবে।

(খ) গরম এবং তাপের কারণে মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। যেমন গরম পানি রান্নার হাড়িতে টগবগ করতে থাকে। কারণ, সেদিন সূর্যকে একেবারেই নিকটে করে দেয়া হবে এবং তাপকে অধিক বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।

(গ) সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় লোকেরা বলবে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করে দিন। তাতে আমাদের এতো কষ্ট হবে না যা এখানে হচ্ছে। এই কষ্ট এবং বিপদের কথা স্মরণ করে একদিন হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) পূর্বে উক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াতের সময় কেঁদে কেঁদে অধীর চিত্ত হয়ে যান, তার তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে দাঁড়াবে।)

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য মানুষকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। হিসাব-নিকাশের জন্য কত কাল আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তথা হিসাবের সময় সীমা কত দীর্ঘ হবে– এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

হিসাবের সময়সীমা কত দীর্ঘ হবে?

হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর দরবারে কতকাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তা সঠিকভাবে আল্লাহ পাকই অবগত আছেন। তবে এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন, يقوم مقدار ثلاثة سنة 'তিন শত বৎসর কাল।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীছেও এরূপ পরিমাণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে একশত বৎসরের কথাও উদ্ধৃত হয়েছে। তাবারানী, মুস্তাদরক ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.) চল্লিশ বৎসরের কথা উল্লেখ করেছেন। (কুরতুবী– ২৫৫/১৯) এরূপ আরও মত রয়েছে। মূলত এসব মতের ভিতর কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, এ পার্থক্য হচ্ছে পাত্র ভিত্তিক। অপরাধের কম-বেশির ভিত্তিতে এরূপ পার্থক্য হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) বলেন, কারো ঘামের পরিমাণ হবে টাখনু পর্যন্ত, কারো হবে হাঁটু পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত (মাযহারী)। হযরত আনাস (রা.) বলেন, কারো ঘামের পরিমাণ সমুদ্র পরিমাণ হবে, যেখানে নৌকা চলতে সক্ষম হবে (মাযহারী)। আল্লাহ পাকের সম্মুখে অবস্থানের সময়সীমাও তদ্রূপ আমলের এবং পাত্রের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে।

হিসাবের সুদীর্ঘ সময়ে মু'মিনদের অবস্থা কী হবে

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয়, হাশরের ময়দানে বিচারের এ সুদীর্ঘ সময়ে মু'মিনদের অবস্থা কীরূপ হবে? মু'মিনদেরও কি এত সুদীর্ঘ সময় অবস্থানের কষ্ট সইতে হবে? অনেক মুফাস্‌সির মনে করেন যে, সময় সকলের জন্যই সমান হবে, তবে মু'মিনগণ আনন্দে উল্লাসে থাকার কারণে দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে দীর্ঘ সময় অনুভূত হবে না। মু'মিনদের জন্য বাস্তবেই সময় কম হয়ে যাবে তা নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছও উদ্ধৃত করা যায়। যথা হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক

বর্ণিত এক হাদীছে আছে- বুশাইর গিফারীকে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, 'হে বুশাইর! যখন মানুষ পার্থিব জগতের হিসেবে তিনশত বৎসর কাল হিসাবের জন্য আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান থাকবে, তখন তুমি কী করবে? বুশাইর উত্তর দেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করব। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মু'মিনদের বেলাতেও দীর্ঘ সময় অনুভূত হবে। তবে আল্লাহ পাকের রহমতে এ দীর্ঘ সময় আরামে এবং আনন্দে কেটে যাবে। যে সমস্ত হাদীছে অল্প সময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে এটাই হচ্ছে তার মর্মার্থ। এই ব্যাখ্যা মোতাবেক যে সমস্ত হাদীছে স্বল্প সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো রূপক অর্থে উদ্ধৃত বলে মেনে নিতে হবে। অথচ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ এখানে কোন বাধা দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ, মহান রব্বুল আলামীন অসীম কুদরতের মালিক। তিনি তাঁর অসীম কুদরত দ্বারাই তার নবীকে স্বল্প সময়ে মেরাজের কার্য সম্পন্ন করাতে সক্ষম হয়েছেন। এই পৃথিবীর বুকেও তিনি রাত-দিনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, রাত ও দিনের সময়সীমা স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে কম ও বেশি করে তার মহান ক্ষমতার জ্বলন্ত প্রমাণ স্থাপন করে চলেছেন।

এ সম্পর্কে হযরত হুযাইফা, ইবনে মাসউদ, আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ সাহাবী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে,

انه ليخفف ▯

মু'মিনদের প্রতি সময়কে স্বল্প করে দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোর জন্য যতটুকু সময় লাগে, মু'মিনদের নিকট সময় এতটুকু অনুভূত হবে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, ফরয নামায আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে মু'মিনদের এতটুকু সময় অনুভূত হবে। বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, মু'মিনগণ স্বর্ণের সিংহাসনে আল্লাহ পাকের রহমতের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট থাকবে। (ইবনে জারীর)

আল্লাহ পাকের এই দয়া এবং মেহেরবানীর প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ .

মনে রেখ, যারা আল্লাহর প্রিয় তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে না তারা চিন্তিত হবে। কেননা, তারা ঈমান এনেছে এবং সর্বদা ভীত রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব এবং পরকাল উভয় জীবনেই। (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ .

যারা বলে যে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না বরং তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শ্রবণ কর। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ: ৩০)

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى. وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى. وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى .

যারা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যারা তাদের পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে, তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযিআত: ৩৭-৪১)

হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয় আলোচনায় আনতে হয়। তাহলো-

(১) মানুষের ন্যায় জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে কি না?

(২) গোনাহগার মু'মিনদের অবস্থা কী হবে?

নিম্নে এ দুটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা পেশ করা হল।

মানুষের ন্যায় জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে কি না?

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক মানুষের ন্যায় জিনরাও শরীয়তের মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের বিধি-বিধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত। সুতরাং তাদেরও বিচারাদালত হবে এবং তাদেরকেও আল্লাহ পাকের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এবং কৃত আমলের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। সঠিক মতানুসারে তারাও মানুষের মতই সমাজ এবং পরিবার পরিজন নিয়ে থাকে। তারা পানাহারও করে থাকে। সুতরাং তারাও জুলুম, অত্যাচার ও পরিমাণে হেরফের করা ইত্যাদি অপরাধ ও পাপের জন্য অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। আলোচ্য আয়াতে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলেও মুকাল্লাফ হিসেবে জিনরাও এই আয়াতের অর্ন্তভুক্ত। তবে মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি মানুষ ও জিনদের ন্যায় মুকাল্লাফ তথা বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাই তাদের জুলুম অত্যাচারের হিসাব ও বিচার-বিধি হবে অন্য রকম।

গোনাহগার মু'মিনদের অবস্থা কী হবে?

যারা গোনাহগার মুমিন, অর্থাৎ, যারা পরিমাপে হের-ফের করেছে অথবা জুলুম অত্যাচার করেছে কিংবা অন্য কোন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনটি স্তর হবে। যথা:

(১) যারা মৃত্যুর পূর্বেই হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হকসমূহ) এবং হক্কুল ইবাদ (বান্দার হকসমূহ) থেকে তওবা ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্ত হয়েছে।

(২) যারা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে হাশরের ময়দানে ক্ষমা পেয়ে যাবে।

(৩) যারা মুক্তি পাবে না, বরং নির্ধারিত সময়ের জন্য জাহান্নামে যাবে এবং পরবর্তীকালে মুক্তি পেয়ে যাবে।

প্রথম দুই প্রকার মু'মিনগণও ময়দানে হাশরের ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর তৃতীয় প্রকার মু'মিন ফাসেকগণ তাদের আমল এবং অপরাধের পরিমাণে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। যার যে পরিমাণ গোনাহ ও অপরাধ সে সে পরিমাণে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

www.maktabatulabrar.com

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ۝٧	(৭) মোটেই এরূপ নয়, পাপাচারীদের আমলনামা নিশ্চয় সিজ্জীনে চিহ্নিতভাবে থাকবে।
وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨	(৮) সিজ্জীন কী তা কি তুমি জান?
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩	(৯) চিহ্নিত আমলনামা।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠	(১০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের হবে সর্বনাশ।
الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١	(১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।
وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢	(১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল সেদিনকে মিথ্যা মনে করতে পারে।
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣	(১৩) যখন তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা বলে, এসব তো পূর্ববর্তীদের কাহিনী।

শব্দার্থ

كَلَّا মোটেই এরূপ নয়, فُجَّار পাপাচারীগণ, سِجِّيْن কারাগার, আমলনামা, مَرْقُوْم মোহর কৃত, চিহ্নিত, লিখিত, وَيْل সর্বনাশ, يَوْمَئِذٍ সেদিন, لِلْمُكَذِّبِيْنَ মিথ্যাচারীদের জন্য, يُكَذِّبُوْنَ মিথ্যা মনে করে, يَوْمِ الدِّيْنِ কর্মফলের দিনকে, مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী, اَثِيْمٍ পাপাচারী, গোনাহগার, تُتْلٰى পাঠ করে, শোনানো হয়, اٰيٰتُنَا আমার আয়াতসমূহ, اَسَاطِيْرُ উপকথা-কাহিনী, اَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের, পুরাতনদের।

ভাবার্থ

বিচার দিবসের শাস্তি বিধান সম্পর্কে পাপাচারীরা যেরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে, বাস্তবতা কিন্তু মোটেই সেরূপ নয়। পাপাচারীদের কৃত আমলের সুসংরক্ষণের জন্য আমলনামা তৈরি করে সীল মোহরকৃতভাবে সিজ্জীনে সংরক্ষণ করা হয়। এরূপভাবে সীল মোহর করা পরকালের শাস্তি বিধানের প্রতি গভীর ইঙ্গিত বহন করে। আসলে বিচার দিনের দুর্ভোগ মিথ্যাচারীদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিপজ্জনক হবে। বিচার দিনের বিষয়বস্তু কেবল তারাই অস্বীকার করতে পারে, যারা চরম ও পরম পাপিষ্ট এবং সীমালঙ্ঘনকারী। এরা পবিত্র কুরআনকে রূপকথা এবং ভিত্তিহীন পুরাতন কাহিনী বলে সমালোচনা ও অবমাননা করে থাকে।

যোগসূত্র

(ক) অপরের হক বিনষ্ট করা এবং পরিমাপে হের-ফের করা জঘন্য অপরাধ। মানবতা বিবর্জিত এরূপ অপরাধের প্রতিবাদে মৌলিকভাবে আলোচনা করার পর বিষয়বস্তুটির সঠিক মূল্যায়ন এবং অনুধাবনের জন্য আলোচ্য আয়াতে এসম্পর্কে কিছু আনুসঙ্গিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। (কাবীর- ৩৫২/৮)

www.maktabatulabrar.com

(খ) অপরাধীর উপর শাস্তি বিধান কার্যকর করার জন্য অপরাধীর উপস্থিতি এবং অপরাধ সম্বলিত নথিপত্র সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এটাই আইন সংগত কথা। আইন এবং শাস্তি প্রয়োগের জন্য যথাসময়ে যথাস্থলে আইন ও শাস্তি প্রয়োগকারীর নিকট নির্দেশমালা এবং কাগজপত্র বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। সেমতে পূর্বের আয়াতসমূহে অপরাধীর উপস্থিতি এবং আলোচ্য আয়াতসমূহে আমলনামা এবং নথিপত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তাফসীর

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ (মোটেই এরূপ নয়, পাপাচারীদের আমলনামা নিশ্চয় সিজ্জীনে চিহ্নিত ভাবে থাকবে।)

যারা ওজনে হেরফের করে এবং হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশ ও তার কঠোর শাস্তিকে অস্বীকার করে থাকে, আল্লাহ পাক তাদের খণ্ডন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, তাদের এরূপ বিশ্বাস অথবা ধারণা সঠিক নয়, বরং অবশ্যই হিসাব-নিকাশ হবে এবং অপরপাধীদেরকে কঠোর আযাব ও দুর্ভোগে পতিত হতে হবে। আর তা এভাবে যে, তাদের আমলনামা এবং বিচারের নথিপত্র সিজ্জীনে সংরক্ষণ করা হবে। সেখানে অপরাধীদের তালিকা বিদ্যমান থাকবে। সে অনুপাতে শাস্তি বিধান কার্যকর করার নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

এখানে আয়াতসমূহের বক্তব্য বুঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) সিজ্জীন কী জিনিস?

(২) সিজ্জীনের স্থান কোথায়?

(৩) সিজ্জীনে প্রবেশের পদ্ধতি।

বস্তুত এ সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আখেরাত এবং অদৃশ্য জগতের সাথে। তাই বস্তুকেন্দ্রিক যুক্তি-তর্ক এবং জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এ সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত তত্ত্ব নিরূপণ করা মোটেই সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই এসব বিষয়ের তত্ত্ব অনুধাবনের জন্য ঐশীবাণী এবং ওহীর প্রয়োজন দেখা দেয়। ওহীগত সিদ্ধান্তের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণা প্রসূত মতামত ও বিবেচনা-পর্যালোচনার নিরিখে এ সব বিষয়ে যা তথ্য ও তত্ত্ব প্রতীয়মান হয় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

সিজ্জীন কী জিনিস

১.'সিজ্জীন' একটি পাথর। এ মন্তব্য করেছেন হযরত ইব্‌নে আব্বাস, কাতাদাহ, ইব্‌নে যুবায়ের, কাআব, মুকাতিল ও কাল্‌বী।

২. 'সিজ্জীন' একটি কালো পাথর। এ মন্তব্য করেছেন হযরত কাআব ও ইব্‌নে সালাম।

৩. 'সিজ্জীন' সাত তবক যমীনের সর্বনিম্ন স্তর। এ মন্তব্যটি করেছেন সাহাবী হযরত আনাস, ইব্‌নে উমর, কাতাদাহ, মুজাহিদ, জাহহাক, হাসান ও আতা।

৪. 'সিজ্জীন' একটি গভীর গর্ত বা কূপ, যার উপরিভাগ প্রশস্ত এবং খোলা। এ মন্তব্য করেছেন সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)।

৫. 'সিজ্জীন' হল কারাগার এবং অতি সংকীর্ণ এবং বিপজ্জনক কয়েদখানা। এ মন্তব্য করেছেন হযরত আবূ উবায়দা, আখ্‌ফাশ ও যুজাজ।

৬. 'সিজ্জীন' একটি নির্দিষ্ট খাতা। (রূহুল মাআনী)

৭. 'সিজ্জীন' অর্থ ধ্বংস ও সর্বনাশ। এ মন্তব্য করেছেন হযরত ইকরামাহ।

৮. 'সিজ্জীন' একটি স্থানের নাম। এ মন্তব্য করেছেন হযরত কুশাইরী।

উপরোক্ত মতামতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে দেখা যায় মতামত মূলত দু'টি।

(১) সিজ্জীন দ্বারা কোন স্থান বা কূপ অথবা পাথরকে বুঝানো হয়েছে।

(২) সিজ্জীন দ্বারা কোন স্থান বা কূপ অথবা পাথরকে বুঝানো হয়নি, বরং অস্বীকারকারীদের দুঃখজনক পরিণাম এবং দুর্দশাকে বুঝানো হয়েছে। আর সিজ্জীন শব্দটি উপমাস্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা হলো, সিজ্জীন শব্দের অভিধানগত অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণ কারাগার। বস্তুত কারাগার যে কষ্টের স্থান একথা বলাই বাহুল্য। তাই সিজ্জীনের উপমার মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের মারাত্মক পরিণামের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত ইকরামাহ এই মতটিই পোষণ করেছেন।

قال عكرمة ان السجين عبارة عن الخسارة والهوان.

সিজ্জীন দ্বারা চূড়ান্ত ক্ষতি ও অপদস্ততাকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী– ৭২/৩০)

মুফাস্‌সির ইকরামার এই মতটি সিজ্জীনের অভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়। কিন্তু আল্লামা ওয়াহেদী এই অর্থকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। তার মতে 'সিজ্জীন' শব্দটি আরবী পরিভাষায় অপ্রচলিত বরং শব্দটি আরবী নয়। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

وما اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ.

কারণ এই আয়াতে ما (মা) হরফের অর্থ হচ্ছে 'না' অর্থাৎ, সিজ্জীন কি তা তুমি জান না। যদি আরবী পরিভাষায় সিজ্জীন শব্দটি প্রচলিত হত, তাহলে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এরূপ বলা হত না। (কাবীর)

কিন্তু আল্লামা ওয়াহেদীর এই উক্তি মোটেই সঠিক নয়। কারণ, একথা চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের সমস্ত শব্দই আরবী এবং তা কুরআনে পাকের আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া সিজ্জীন শব্দের মাধ্যমে অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি এর অর্থ অবোধগম্য ধরা হয়, তাহলে আয়াতের মূল লক্ষ্যই উপেক্ষিত হয়ে যাবে। কেননা, অর্থ অবোধগম্য থাকলে সতর্কতার শিক্ষা লাভ করবে কী করে? আসলে 'মা' হরফের অর্থ নিরূপণে ভুলের কারণে আল্লামা ওয়াহেদী এই মন্তব্য করেছেন। অথচ এই হরফটি এখানে 'না'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং হরফটি প্রশ্নবোধক, গুরুত্বের অর্থ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (কুরতুবী– ২৫৮/৮)। পবিত্র কুরআন হাদীছে এর যথেষ্ট নমুনা রয়েছে। অতএব ইকরামার মতকে দুর্বল সাব্যস্ত করার জন্য এই বক্তব্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের দৃষ্টিতে হযরত ইকরামা (রহ.)-এর মতামতটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ নিম্নরূপ–

(ক) এই মত অনুযায়ী অপ্রয়োজনে কুরআনের শব্দকে রূপক অর্থে মেনে নিতে হয়।

(খ) অপর পক্ষে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীছের অর্থ এবং সঠিক তত্ত্বকে পরিহার করতে হয়। কেননা, হযরত ইব্‌নে আব্বাস, ইব্‌নে উমর, সালমান, আনাস এবং আবূ হুরায়রা প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ 'সিজ্জীন' শব্দটিকে প্রকৃত বা মৌলিক অর্থে গ্রহণ করেছেন, রূপক অর্থে গ্রহণ করেননি।

(গ) যদি বলা হয়, সিজ্জীন শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, এতেই প্রমাণিত হয় যে, এখানে রূপক অর্থই অগ্রাধিকার রাখে, তাহলে বলা হবে, রূপক অর্থ গ্রহণের জন্য এরূপ কারণ যথেষ্ট নয়। বরং রূপক অর্থ গ্রহণের জন্য তাফসীরের এ বিষয়ে নির্ধারিত মূলধারাসমূহের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়; যা সিজ্জীনের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। বরং এতসব মতবিরোধ সত্ত্বেও রূপক অর্থ গ্রহণ না করা এবং প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সকলের স্বচেষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত হয় যে, এখানে সিজ্জীন শব্দটি প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (কাবীর)

বস্তুত গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরে উক্ত মতবিরোধসমূহ মূলত বিরোধ নয়, বরং একই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বুঝানোর জন্য বর্ণনার পার্থক্য মাত্র। কেননা, উল্লিখিত মতামতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য কায়েম করা যায়। যথা: হযরত আনাস এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতানুসারে সিজ্জীন দ্বারা গভীর কূপ এবং খোলা গর্ত বোঝানো হয়েছে। অপর পক্ষে হযরত অনাস এবং ইব্‌নে উমর (রা.)-এর মতানুসারে সিজ্জীন সর্বনিম্ন স্তরের যমীনে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং উভয় মন্তব্য দু'টি সঠিক হতে পারে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস এবং কাআব সিজ্জীনকে পাথর অথবা কালো পাথর বলে মন্তব্য করেছেন। এই বিরাট পাথরটি গভীর কূপে বিদ্যমান রয়েছে। শয়তানের ক্ষমতার পরিধি এ পর্যন্তই শেষ। এর অধিক নিম্নদেশে ইবলীস এবং তার সহচরদের ক্ষমতা চলে না (কুরতুবী)। যেহেতু এই কূপ এবং গর্তটি কাফেরদের জন্য হবে অতীব কষ্টের এবং যাতনার স্থান –এ হিসাবে আবূ উবাদাসহ আভিধানিকদের মন্তব্য 'সিজ্জীন অর্থ কারাগার'খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, এতে বিরোধ নেই মোটেও। এখানে আমলনামার নথিপত্র অথবা অপরাধী ও অস্বীকারকারীদের একটি তালিকাযুক্ত খাতা দৃশ্যমান থাকবে; অনেকে সিজ্জীন দ্বারা এদিকে আলোকপাত করেছেন। এ পর্যালোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, সিজ্জীনের উদ্দেশ্য এবং অর্থ নির্ধারণে প্রকৃত কোন মতবিরোধ নেই, কেবল বর্ণনা এবং উপস্থাপনার পার্থক্য। একারণে আমাদের দৃষ্টিতে সিজ্জীনের প্রশ্নে এই দ্বিতীয় মতটিই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে এবং এটাই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মত। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা সিজ্জীন কী জিনিস যেমন এই প্রশ্নের উত্তর সংগৃহীত হয়, তেমনি সিজ্জীনের স্থান কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরও অতীব সহজেই অনুমেয়। অনুমেয় যে, 'সিজ্জীন' হল যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থিত।

সিজ্জীন ও জাহান্নাম ভিন্ন ভিন্ন, না অভিন্ন

এখানে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন যে, সিজ্জীন এবং জাহান্নাম ভিন্ন ভিন্ন দুটি জিনিসের নাম, না কি একই বস্তুর দুই নাম। এ বিষয়টি এজন্যেও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার যে, মৃত্যুর পর অপরাধী ও পাপিষ্ট লোকদের রূহকে সিজ্জীনে আবদ্ধ রাখার কথা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা

www.maktabatulabrar.com

সাব্যস্ত আছে। এখন যদি জাহান্নামের অন্য নাম সিজ্জীন হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন দেখা দিবে যে, শেষ বিচারের পূর্বেই পাপিষ্টের রূহকে কী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অথচ শেষ বিচারের পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কথা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। আর যদি জাহান্নাম এবং সিজ্জীন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে পাপিষ্টের রূহকে সিজ্জীনে নিক্ষেপ করার কারণ কী এবং শেষ বিচারের পর এই রূহকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর সিজ্জীনের অবস্থা কী হবে? সত্য বলতে কী এ বিষেয় চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ, যুক্তি-তর্ক এবং বস্তুকেন্দ্রিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে কোন কিছু করার উপায় নেই। কেবল ওহীগত সূত্রেই যা কিছু বলা যায়, অথচ ওহীর সূত্রে পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে এ বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। আমলের জন্য প্রয়োজন নেই বিধায় এর বিস্তারিত আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিদ্যমান নেই। শরীয়তের উদ্ধৃতির নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্জীন মূলত জাহান্নামেরই অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ, তবে জাহান্নামের উপরিভাগে বিদ্যমান। এর তলদেশই হচ্ছে জাহান্নামের প্রশস্ত এলাকা। শেষ বিচারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বরযখী যিন্দেগীতে পাপাচারীদের রূহকে আবদ্ধ রাখার জন্য এটাই উপযুক্ত স্থান। শেষ বিচারে তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হলে তাদেরকে জাহান্নামের নির্ধারিত শাস্তি ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তখন তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অথবা নির্ধারিত সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর সিজ্জীন যেহেতু জাহান্নামেরই অংশ বিশেষ, তাই জাহান্নামের অংশ হিসেবেই সেটা থেকে যাবে।

সিজ্জীনে প্রবেশ পদ্ধতি

ইমাম আহমদ, নাসায়ী এবং ইব্‌নে মাজাহসহ হাদীছের বিভিন্ন কিতাবসমূহে সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্‌নে উমর, ইব্‌নে আব্বাস এবং বারা' ইব্‌নে আযিব কর্তৃক বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, পাপাচারীদের মৃত্যুর মুহূর্তে মালাকুল মওত বিকট ও ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে হঠাৎ আসন্ন মৃত্যুমুখী লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এ লোকের দৃষ্টির পরিধি পর্যন্ত প্রসারিত বিকট ছুরতের রাগান্বিত অপরিচিত মালাকুল মওতকে দেখে সে চিনে ফেলবে। এমতাবস্থায় মালাকুল মওত তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলবে, হে অপবিত্র আত্মা, অপবিত্র শরীর থেকে বের হয়ে চলে এসো।' কিন্তু তার আত্মা সজোরে শরীরের সাথে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করবে। এমতাবস্থায় মালাকুল মওত স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে সজোরে ছিড়ে কুটে আত্মাকে বের করে নিয়ে আকাশের দিকে রওনা হবে। আত্মা হতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে পথে পথে অন্যান্য ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবে, 'এতো দুর্গন্ধময় অপবিত্র আত্মাটি কার? উত্তরে বলা হবে, 'অমুকের ছেলে অমুক' এবং খুবই জঘন্যভাবে নাম নিবে। এভাবে আত্মাসহ প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছার পর আসমানের দরজা খোলা হবে, কিন্তু পাপিষ্ট আত্মাকে আকাশের এলাকায় ঢুকতে দেয়া হবে না। এ পর্যন্ত বর্ণনা দিয়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন–

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ .

তাদের জন্য আকাশের দরজা মোটেই খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না– যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (সূরা আ'রাফ: ৪০)

এমতাবস্থায় মহান রব্বুল আলামীন নির্দেশ দেন পাপিষ্ঠের নাম সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর। তখন

www.maktabatulabrar.com

দুর্গন্ধ পাপিষ্ট আত্মাকে সজোরে নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন–

وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ .

যে আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হজ্জ: ৩১)

এ সময় হতেই সিজ্জীনে পাপিষ্ঠরা কঠোর যাতনা ভুগতে থাকে।

সিজ্জীন সম্বন্ধে ইনজীল-এর বর্ণনা

পাপাচারী আত্মার সিজ্জীনে আবদ্ধ হওয়া এবং যাতনা ভোগ করার বাস্তবতা সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ইনজীল লুক-এর ষোল নং অধ্যায়ে তিনি বলেন, এক লোক বিরাট অর্থ সম্ভারের অধিকারী ছিল। অত্যন্ত বেপরোয়া, বিলাসপ্রবণ এবং অপরাধপ্রবণ ছিল। তার পড়শী ছিল একজন নিতান্ত গরীব, অর্থ সম্বলহীন। সেই ধনাঢ্য লোকটির মৃত্যুর পর তাকে ফেরেশতাগণ যমীনে পুতে রাখল এবং সে কঠোর আযাবে আক্রান্ত হল। সে আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় যমীনের গর্ত থেকে অনেক দূরে ইবরাহীমকে দেখতে পেল এবং ইবরাহীমের সাথে ঐ গরীব লোকটিকে সুখে-শান্তিতে দেখতে পেল। এমতাবস্থায় ধনাঢ্য লোকটি ইবরাহীমকে ডেকে বলল, 'হে ইবরাহীম, আমার প্রতি করুণাশীল হও এবং আমার পড়শী গরীব লোকটিকে পাঠাও, যাতে সে তার আঙ্গুল ভেজানো পানি দিয়ে আমার দগ্ধ কলিজাকে পরিতৃপ্ত এবং ঠান্ডা করে। কেননা, আমি তো জ্বলন্ত অগ্নি বাতাসে দগ্ধ হচ্ছি।' উত্তরে ইবরাহীম বললেন, 'হে বৎস, তুমি তোমার দুনিয়ার জীবনকে স্মরণ কর, তুমি তো সেখানেই সুখ শান্তি এবং বিলাসিতা করে আসছ, আর গরীব এই লোকটি দুনিয়ার জীবনে দুঃখ কষ্ট করে এসেছে, অভাব-অনটন এবং অনাহারে জীবনযাপন করেছে, তাই সে আজ পরম সুখ শান্তি ও আনন্দ উল্লাসে জীবন যাপন করছে। তাছাড়া তোমার এবং আমার মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিরাট কূপ বিদ্যমান রয়েছে। যে কারণে এখানের লোক তোমার নিকট অথবা তোমার ঐখানের কোন লোক আমার নিকট পৌছতে পারবে না। ইবরাহীমের এ উত্তর শোনে ধনী লোকটি অত্যন্ত কাকুতি মিনতির সুরে প্রার্থনা জানাল, 'হে ইবরাহীম, আপনি দয়া করে ঐ গরীব লোকটিকে আমার পিতার নিকট পাঠিয়ে বলুন যে, আমার পাঁচটি ভাইকে কঠোর আযাবের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে আসুক, যাতে তারা আযাবে আক্রান্ত না হয়। ইবরাহীম উত্তর দিলেন, 'তাদের নিকট নবী রসূলগণ বিদ্যমান আছেন, তাদের জন্য নবীগণের আনুগত্য এবং অনুকরণই যথেষ্ট।' ধনী লোকটি পুনরায় কাকুতি মিনতির সুরে আরয করল, 'হে ইবরাহীম, আপনি দয়া করলে মৃত্যুবরণকারী কোন লোক সতর্ক হবে এবং সঠিক-ভাবে তাওবা করতে সক্ষম হবে।' ইবরাহীম বললেন, 'যখন তারা নবীদের কথা গ্রহণ করে না, তবে কি তারা মৃত্যু ব্যক্তির কথা গ্রহণ করবে?' এই ঘটনার মধ্যে যে গর্ত এবং কূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই হচ্ছে সিজ্জীন। আর সিজ্জীনে নাম লিপিবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে সেখানে সিজ্জীন বাসীদের নাম লিষ্ট করার জন্য রেজিস্টার বুক রয়েছে, সেই রেজিস্টার বুকে নাম লিপিবদ্ধ করা। যেমন কারাগারে আসামীদের নাম লিস্ট করার জন্য দফতর থাকে এবং সেই দফতরে রেজিস্টার বুক থাকে।

কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে বিশেষ ৩টি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা:

প্রশ্ন-১. সিজ্জীন হচ্ছে কাফেরদের অবস্থানস্থল আর ইল্লীন হচ্ছে নেককার মু'মিনদের অবস্থানস্থল। তাহলে বরযখী জীবনে গোনাহগার মু'মিনদের অবস্থানস্থল কোথায়?

প্রশ্ন-২. মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তার আত্মাকে তার শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। সুতরাং সিজ্জীন অথবা ইল্লীনে আত্মাকে সংরক্ষণ করার অর্থ বা উপায় কী? আর আত্মাকে কবরস্ত শরীরের সাথে সংযুক্ত করা হলে সিজ্জীন এবং ইল্লীনে তা সংরক্ষণের অর্থ কি?

প্রশ্ন-৩. শয়তান কেয়ামত পর্যন্ত মৃত্যু মুক্ত, সুতরাং সিজ্জীনে শয়তান ও তার সহচরদের অবস্থানের অর্থ কি?

নিম্নে এই ৩টি প্রশ্নের উত্তরে ৩টি শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

বরযখী জীবনে গোনাহগার মু'মিনদের অবস্থানস্থল

এ সম্বন্ধে দু-ধরনের মতামতের অবকাশ আছে।

(১) গোনাহগার মু'মিনদের আত্মাও সিজ্জীনেই সংরক্ষিত হবে। কারণ, তারা গোনাহের কারণে ইল্লীনের উপযুক্ত নয়। তাদের আত্মাকে সিজ্জীনে না রাখার কথা উল্লেখ নেই। তদুপরি যেমন অনেক গোনাহগার মু'মিন কাফেরদের সাথে জাহান্নামে থাকবে, তেমনি বরযখী জীবনেও তাদের আত্মা সিজ্জীনে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

(২) কিন্তু বিশেষজ্ঞমহল এই মতটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে এ সমস্ত বিষয়ে নিরেট যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না, কেবল ওহীর দিক-নির্দেশনাই এক্ষেত্রে মূল উপাত্ত। অথচ উপর্যুক্ত মতের পক্ষে ওহীগত দিক-নির্দেশনা অথবা অসমর্থন নেই। অপর পক্ষে সিজ্জীনে আত্মাকে সংরক্ষণ করার মূল কারণ হচ্ছে কুফ্‌র ও মুনাফেকী। আর গোনাহগার মু'মিনগণ, অবশ্যই কুফ্‌র ও মুনাফেকী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তাদের আত্মাকে সিজ্জীনে সংরক্ষণের মূল কারণ অনুপস্থিত।

আত্মার সিজ্জীনে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে কুফ্‌র ও মুনাফেকী, বদ আমল নয়- এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, অনেক কাফের এমনও হয়, তার জীবনে কুফ্‌র ব্যতীত কোন বদ আমল নেই, তবুও তারা বরযখী জীবনে সিজ্জীনেই নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের শিষ্টাচারিতা এবং সভ্যতা সিজ্জীন থেকে মুক্তির কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সিজ্জীনে প্রবেশ করানোর কারণ গোনাহ ও পাপাচারিতা নয়, বরং কুফ্‌র ও মুনাফেকী। আলোচ্য সূরার ১২নং আয়াতের দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা, ১২নং আয়াতে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে পূর্বসূরিদের ভিত্তিহীন পুরাতন কাহিনী আখ্যায়িত করার পরিণামে তাদেরকে সিজ্জীনবাসী হওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। অলোচ্য আয়াতসমূহ ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা অথবা নজর ইব্‌নে হারিছের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা দু'জনই কাফের ছিল। হযরত ইব্‌নে আব্বাস, কাআব, কাতাদা প্রমুখের মত এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তারা বলেন,

تحتها ارواح الكفار .

অর্থাৎ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত পাথরের নীচে সিজ্জীন। সেটাই কাফেরদের আত্মাসমূহকে সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থান।

এতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, মু'মিন গোনাহগারদের আত্মার অবস্থানের ব্যাপারে প্রথম মতামতটি যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথম মতের প্রবক্তাগণ এই যুক্তিও পেশ করেছিলেন যে, তাদের আত্মাকে সিজ্জীনে না রাখার কথা উল্লেখ নেই। একথাটিও ঠিক নয়। কারণ,

عدم الذكر فى معرض البيان دليل العدم .

অর্থাৎ, বর্ণনা করার স্থানে বর্ণনা না করা হুকুমের অর্ন্তভুক্ত নয় বলে বোঝায়।

শেষ বিচারের পর গোনাহগার মু'মিনগণ জাহান্নামে যাবে বিধায় সিজ্জীনেও কাফেরদের সাথে থাকবে- এরূপ মন্তব্যও সঠিক নয়। কারণ, মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন,

(১) এক নং পার্থক্য হল- জাহান্নামে কাফেরদের প্রবেশ হবে চিরস্থায়ী, আর মু'মিন গোনাহগারদের অবস্থান ও প্রবেশ হবে সাময়িক এবং অস্থায়ী।

(২) কাফেরদেরকে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হল কুফ্‌রী। আর এই কারণ শাস্তির দ্বারা খতম হবে না, যেমন মল এবং নাপাক পানি দ্বারা ধৌত করলে শেষ হয় না। কিন্তু মু'মিন গোনাহগারদেরকে কেবল শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার মধ্যে তাদেরকে গোনাহ থেকে মুক্ত করাও হবে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। যেমন: স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি স্বর্ণ বের করে তার দ্বারা গলার মালা তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে মু'মিনদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করত গোনাহ মুক্ত করে জান্নাতের সুখ সামগ্রী ভোগের জন্য তৈরি করা হবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

গোনাহগার মু'মিনদেরকে সিজ্জীনে দাখেল করার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হচ্ছে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ঈমান। এই ঈমানের বদৌলতেই তারা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে আবরারদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। হ্যাঁ, গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্যই তারা জাহান্নামী হতে পারে অথবা আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর বরযখী জীবনে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হলে তারা সিজ্জীনে আবদ্ধ হবে না, বরং বাহরুল কালাম আল্লামা নাসাফীর মতে-

ارواح العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والارض فى الهواء .

অর্থাৎ, গোনাহগার মু'মিনদের আত্মাসমূহ আসমানও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অবস্থান করবে।

যারা যেনাকারী, ব্যভিচারী, তাদের আত্মাকে আগুনের গহবরে শাস্তি দেয়ার কথা বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। অনেক গোনাহগারদের রক্তের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে বলেও সহীহ হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। আল্লামা ইব্‌নে হাজার এবং কুরতুবী থেকেও এরূপ মত উদ্ধৃত হয়েছে। ইব্‌নে আব্দুল বার্ বলেছেন, অনেকের আত্মাকে কবরেই আবদ্ধ করে রাখা হবে। এ কারণেই ইব্‌নে কাইয়্যিম বলেন যে,

www.maktabatulabrar.com

আসলে মু'মিন গোনাহগারদের বরযখী অবস্থানের ভিন্নতা আবরারদের অবস্থানের মত। কেননা, আবরারদের মূল অবস্থানকেন্দ্র ইল্লীন হলেও আমলের ভিন্নতার কারণে শহীদগণ সরাসরী জান্নাতে অবস্থান করবে। অনেকের অবস্থান হবে আরশের নীচে, আবার পাখীর আকারে। মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌নে মাজা, মুয়াত্তা, বায়হাকী, মুস্তাদরক, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ইব্‌নে আবি শাইবা, মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ইত্যাদি কর্তৃক ইব্‌নে মাসউদ, ইব্‌নে আবূ সাঈদ খুদরী, আবুদ্দরদা, ইব্‌নে কাআব, উম্মে হানী ও ইবনে আমরের হাদীছে এটা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী এবং আল্লামা কুরতুবী যথাক্রমে শরহুছ-ছুদুর এবং তযকিরা নামক কিতাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমাদের উপরোক্ত আলোচনায়ও এটা প্রমাণিত হয়।

(ক) ইব্‌নে ওয়াহাব, সুহায়লী, ইবনুল আরাবী সহ কতক তর্কশাস্ত্রবিদদের মত হলো, মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের আত্মাসমূহেরও মৃত্যু ঘটে। এ মত মোটেই সঠিক নয়। এ মত পবিত্র কুরআন হাদীছ এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ঐক্যমতের পরিপন্থি। আর পরিপন্থি বলেই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

(খ) কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় আত্মাকে অন্য মানুষের দেহে পরিবেশন করা হয়। এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থি। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চূড়ান্ত আকীদার বিরোধী। অতএব এ মতটিও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিরোধী কোন মত গ্রহণযোগ্য নয়।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনে আত্মার সংরক্ষণের অর্থ

এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, সিজ্জীন এবং ইল্লিয়্যীন হচ্ছে আত্মা সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় স্থান, যেখান থেকে কবরস্থ শরীরে অনুভূতি শক্তির সঞ্চার হয়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইব্‌নে কাইয়্যেম বলেন,

لا منافاة بين كون الروح فى عليين او فى السماء او فى الجنة وان لها بالبدن اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ.

অর্থাৎ, আত্মার ইল্লিয়্যীন বা আসমান বা জান্নাতে থাকা এবং কবরস্থ শরীরের সাথে তার সম্পর্ক থাকার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, কবরস্থ শরীরের সাথে আত্মার এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে, শরীরে অনুভূতি শক্তি সঞ্চারিত হয়, শোনতে পারে, নামায আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াতে সক্ষম হয়।

বায়হাকী, মুসনাদে বাযযার, তাবারানী এবং মুসনাদে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত আবূ হুরায়রা, আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির এবং ইব্‌নে মুনাব্বিহের হাদীছ দ্বারাও উপর্যুক্ত তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইব্‌নে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

ولكل روح بجسدها اتصال معنوى لايشبه الاتصال فى الحياة الدنيا بل اشبه شىء بحال النائم وان كان هواشد من حال النائم اتصال.

অর্থাৎ, প্রত্যেক রূহের কবরস্থ শরীরের সাথে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান হয়। তবে এ সম্পর্ক দুনিয়াতে জীবিত থাকাকালীন সম্পর্কের মত নয়, বরং অনেকটা ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীর এবং আত্মার সম্পর্কের সদৃশ। তবে কবরস্থ শরীরের সাথে তার আত্মার সম্পর্ক এর চেয়েও অধিক মজবুত হয়।

সিজ্জীনে শয়তান ও তার সহচরদের অবস্থান প্রসঙ্গ

মুফাস্‌সির ইব্‌নে জারীরের উদ্ধৃতি অনুসারে শয়তান সিজ্জীনে কারারুদ্ধ আছে। অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যাপারে নীরব রয়েছেন। এই উদ্ধৃতির সূত্র সম্পর্কে আমি এ মুহূর্তে নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে শয়তানের মৃত্যু কেয়ামত পর্যন্ত মওকুফ হলেও তার বংশধরের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তাদের আত্মার সংরক্ষণ সিজ্জীনে হবে। পক্ষান্তরে কেয়ামত কায়েমের সময় মানুষের সমস্ত কার্যক্রমেরও সমাপ্তি সাধিত হবে। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বস্তরে এবং যমীনের তলদেশেও শয়তানের অধিকার এবং শক্তি প্রয়োগের অবকাশ বিদ্যমান আছে। হাদীছের আসল লক্ষ্য এতটুকুই, এর অধিক নয়।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ **(যখন তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা বলে, এসব তো পুরাতনদের কাহিনী।)**

তাফসীর

ওজনে হেরফেরকারী এবং এরূপ অপরাধীর নিকট যখন আমার নিদর্শনাবলি এবং আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা উপদেশ এবং শিক্ষাগ্রহণ করার পরিবর্তে তিরস্কার করে ও উপেক্ষার সুরে বলে থাকে যে, এসব তো পুরাতন কাহিনী। এগুলো আমাদের অন্তরসমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। না, না, মোটেই না। এগুলো মানব রচিত পুরাতন কাহিনী নয়, বরং আল্লাহর বাণী, যা খুবই বাস্তব এবং মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ, যা অতি সতর্কতা এবং নৈপুণের সঙ্গে শক্তিশালী আমানতদার ফেরেশতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

যারা ওজন ও পরিমাপে হেরফের করার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত; মানবিক কারণেই তাদের এরূপ অপরাধ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু মূর্খতা অথবা লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ জ্ঞান বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব ও আখেরাতের ভয় এরূপ অপরাধ বর্জনে সহায়ক হয়; তবে আখেরাতের ভয়ভীতি সঞ্চার হওয়া নির্ভর করে আল্লাহ প্রদত্ত নবীদের আদর্শের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের উপর। এ বিশ্বাস অর্জনে অন্যতম সহায়ক হয় নবীদের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর বাণী এবং তার মর্মকথা ও তত্ত্বের প্রতি আন্তরিকতা ও স্বীকৃতি। কিন্তু যখন শ্রোতাগণ ওহীর প্রতিও বিদ্রোহ করে বসে, তখন আর তাদের হেদায়াতের কোন পথ থাকে না। বস্তুত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন ও পরিমাপে হেরফেরকারীদেরকে আখেরাতের ভয় প্রদর্শন করেন, এর সমর্থনে ওহীর বাণী শোনান। কিন্তু তারা ওহীর বাণীকে পূর্বসূরিদের রচিত ভিত্তিহীন কাহিনী বলে উপেক্ষা করে। ১৩ নং আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টির প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(১৪) মোটেই না, বরং তারা যা করত তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।	كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
(১৫) মোটেই না, নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।	كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾
(১৬) অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾
(১৭) অতঃপর বলা হবে, এটা তা-ই, যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করতে।	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾

শব্দার্থ

كَلَّا মোটেই না, بَلْ বরং, رَانَ মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে, قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহ, يَكْسِبُوْنَ তারা যা করে, اِنَّهُمْ অবশ্যই তারা, عَنْ رَّبِّهِمْ তাদের রব থেকে, لَمَحْجُوْبُوْنَ পর্দার অন্তরালে থাকবে, لَصَالُوا প্রবেশ করবেই, নিপতিত হবে, الْجَحِيْمِ জাহান্নাম, অগ্নিকণ্ডলী, ثُمَّ يُقَالُ অতঃপর বলা হবে, هٰذَا الَّذِىْ এটাই তা-ই, كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করতে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (মোটেই না, বরং তারা যা করে তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।)

তাফসীর

এ আয়াতে বিদ্রোহীরা কুরআনে পাকের নূরানী বাণী এবং হেদায়াতকে গ্রহণ করতে পারছে না কেন, তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর কারণ বাণীর অন্তর্নিহীত প্রভাবের নিষ্ক্রিয়তা নয় বরং এর মূল কারণ হচ্ছে, তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। অর্থাৎ, পাপাচারিতা এবং অপরাধের প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তরসমূহ ব্যাধিগ্রস্ত ও আবর্জনাযুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই সত্যের আলো সেখানে প্রতিভাত হয় না, হতে পারে না। পারে না সেখানে হকের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হতে।

এ আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে যে, বস্তু স্বাদ আস্বাদনের জন্য যেমন ইন্দ্রীয়ের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন থাকা প্রয়োজন। রোগাগ্রস্থ এবং জড়তার কারণে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে থাকলে ইন্দ্রীয়সমূহ বস্তুর শোভা আকর্ষণে ব্যর্থ হয়, আয়না ময়লা তথা আবর্জনাযুক্ত হলে যেমন মুখমণ্ডলীর ভাল-মন্দ দর্শন করা যায় না, তেমনি হক এবং সত্যকে নিরূপণ এবং অনুধাবনের জন্য মানুষের অন্তর হচ্ছে একটি আয়না এবং সঠিক মাধ্যমস্বরূপ। যতক্ষণ হক এবং সত্য অনুধাবনের এই মাধ্যম তথা অন্তর জড়তামুক্ত এবং স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে ততক্ষণ অন্তর স্বাভাবিকভাবেই সত্যকে অনুধাবনে সক্ষম হয়। কিন্তু কলুষিত এবং রোগাগ্রস্ত হলে তাতে স্বাভাবিক ক্রিয়াশূন্যতা দেখা দেয়, ফলে অন্তর হক এবং সত্যকে

অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। একারণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে অন্তরের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب .

অর্থাৎ, জেনে রাখ– নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা এমন রয়েছে যা বিশুদ্ধ থাকলে সমগ্র শরীর বিশুদ্ধ থাকে, আর তা অশুদ্ধ হলে সমগ্র শরীর অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর তা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। (বোখারী শরীফ)

এখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন:

(১) অন্তরের মরিচা তথা আবর্জনা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(২) অন্তর মরিচাযুক্ত তথা আবর্জনাযুক্ত হয় কীভাবে?

(গ) অন্তরকে আবর্জনামুক্ত করা এবং রাখার উপায় কী?

নিম্নে এ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

অন্তরের মরিচা তথা আবর্জনা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

অন্তরের মরিচা তথা অন্তরের আবর্জনাজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দ কুরআন–হাদীছে রয়েছে। যথা: ختم (খাতম), طبع (তাবা'আ), اقفال (আক্‌ফাল), اكنة (আকিন্না) مرض (মরয) ইত্যাদি। অলোচ্য আয়াতে ران (রা'না) শব্দটিকে এরূপ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। মুফাস্‌সির রাযী, কুরতুবী, আলূসী ও যামাখশারী এ ব্যাপারে বিশিষ্ট অভিধান বিশারদগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মুফরাদাত, লিসানুল আরব ইত্যাদি কিতাবসমূহের বর্ণনায় বোঝা যায় যে, অন্তরের কলুষতার প্রথম স্তরকে বুঝানোর জন্য ران দ্বিতীয় স্তরকে বুঝাবার জন্য طبع শব্দ ব্যবহার হয় এবং সর্বশেষ স্তরকে বুঝাবার জন্য ختم শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত শব্দসমূহের অভিধানগত অর্থে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকার কারণে সাধারণত অন্তরের সর্বপ্রকার আবর্জনাকেই বোঝায়; শরীয়তের পরিভাষাতেও এরূপ ব্যাপক অর্থই স্বীকৃত। এখানে অন্তরের মরিচা তথা আবর্জনা বলতে কী উদ্দেশ্য– এ সম্পর্কে আমাদের সম্মুখে দুটি মত বিদ্যমান রয়েছে:

(১) অন্তরের অযোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন নেক আমল করে এবং পাপকর্ম বর্জন করে, তখন তার মধ্যে এক প্রকার রূহানী শক্তি সৃষ্টি হয়। এই রূহানী শক্তির মাধ্যমে সে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ক্বলব' অর্থাৎ, অন্তর বলতে এই শক্তিকেই উদ্দেশ্য করা হয়। গোনাহের কারণে এই রূহানী শক্তির অবসান ঘটে, অন্তরের মৃত্যু সাধিত হয়। একেই 'রানা' শব্দের দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। (হক্কানী তাফসীর– ৭১) অন্তর একটি গোস্তের টুকরা আর তাতে পরিবর্তন সাধিত হয়, অথবা তাতে কালো দাগ লেগে যায়– এ অর্থ মোটেই নয়। (কাবীর– ৩৫৪/৮)

(২) বাস্তবেও অন্তরে দাগ পড়ে তথা অন্তর আবর্জনা যুক্ত হয়। যার ফলে অন্তরের ক্রিয়াশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় হক বাতিলের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ আর অপরটিকে বর্জন করতে সক্ষম হয় না।

www.maktabatulabrar.com

আমাদের বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা,

(ক) প্রথম মতটির সমর্থনে আমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। অধিকন্তু এর ভিত্তি হচ্ছে 'কলব' অর্থাৎ, অন্তরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অস্বীকারের উপর, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা চির সত্য যে, অন্তরদৃষ্টি এবং আন্তরিক যোগ্যতা হক ও বাতিলের সন্ধান দেয়। কিন্তু রূহানী শক্তি এবং অন্তরদৃষ্টিই মূলত কলব তথা অন্তর– এ কথা সঠিক নয়। কলব তথা অন্তর কী জিনিস, কী তার হাকীকত– এ বিষয়ে নানান জন নানানভাবে বিবরণ পেশ করেছেন, কিন্তু সকলেই এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন, সকলেই এর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এর অস্তিত্বের সমর্থনে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। অন্তরের অণু পরিমাণ ঈমানের বদৌলতে অসংখ্য পাপাচারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দাখিল করার বিষয় বোখারী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে হাদীছ উদ্ধৃত রয়েছে। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। সুতরাং অন্তরের অর্থ 'রূহানী শক্তি'– মতটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্তর মরিচাযুক্ত তথা আবর্জনাযুক্ত হয় কীভাবে?

অন্তর বহুবিধ কারণে মরিচাযুক্ত তথা আবর্জনাযুক্ত হয়ে থাকে। যথা:

(১) গোনাহ ও পাপের কারণে অন্তর অবর্জনাযুক্ত হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহ পাক মানুষকে পাক পবিত্রভাবে সৃষ্টি করেন। যেমন, পবিত্র কালামে বলা হয়েছে,

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .

আল্লাহ পাক মানুষকে স্বীয় ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। (আল্লাহ পাক স্বয়ং পূতঃ পবিত্র, সুতরাং তাঁর ফিতরাত তথা কর্মকাণ্ডও পবিত্র।) (সূরা রূমঃ ৩০)-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهود انه او ينصر انه او يمجسانه .

প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর সৃষ্টি হয়, অতঃপর তাঁর মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা এবং অগ্নিপূজক বানায়।

ফিতরাতের অর্থে বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ থাকলেও পূতঃপবিত্রতার অর্থ এতে রয়েছে।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষের অন্তর আবর্জনাযুক্ত হওয়ার উপকরণ হচ্ছে গোনাহ এবং পাপকর্ম। এই পাপকর্মে মানুষ বিভিন্ন কারণে লিপ্ত হয়। তবে এর অন্যতম একটি কারণ হয় পরিবেশ। বস্তুত মাতা-পিতা যদি বিধর্মী হয়, তাহলে বিধর্মীর আকীদা আমলের কারণে সন্তান সন্ততিগণ অজ্ঞাতভাবে গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়। এমনিভাবে মাতা-পিতা মুসলিম এবং সৎপরায়ণ হলেও তাদের সন্তানদের প্রতি অবহেলা এবং তাদের সঠিক তালীম-তারবিয়তের প্রতি অনীহা প্রকাশ পেলেও সেই সন্তানরা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্যই সন্তাদের সঠিক লালন-পালন এবং শারীরিক প্রতিপালনের সাথে সাথে রূহানী ও চরিত্রগত তালীম-তারবিয়তের দায়িত্ব অতি গুরুত্বের সাথে আরোপ

www.maktabatulabrar.com

করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবহেলা মারাত্মক অপরাধ, যে অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

গোনাহের কারণে মানুষের অন্তর কলুষিত এবং বিনষ্ট হয়ে যায়– এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছও বিদ্যমান রয়েছে। যথা: মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্‌নে মাজা, ইবনে হিব্বান, মুস্তাদরক কিতাবে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর সূত্রে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان العبد اذا اذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه .

অর্থাৎ, যখন মানুষ গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যদি সে তওবা করে তা দূরীভূত করে এবং এস্তেগফার করে, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি পুনরায় গোনাহ করতে থাকে, তাহলে কালো দাগটি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ অন্তরটিকে পরিবেষ্টিত করে ফেলে।

(২) অন্তর আবর্জনাযুক্ত হওয়ার আরও অনেকগুলো কারণ হয়েছে। তন্মধ্যে এক হাদীছে বলা হয়েছে, চারটি জিনিস দ্বারা মানুষের অন্তর বিনষ্ট হয়ে যায় ঃ

(এক) আহমকের শ্রবণ,

(দুই) অধিক মাত্রায় গোনাহ করা,

(তিন) বেগানা মহিলাদের সাথে নির্জনে বসা, তাদের পরশে আত্মতৃপ্তি বোধ করা এবং তাদের মতের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা,

(চার) মৃত ব্যক্তিদের সংশ্রব গ্রহণ করা। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃত লোকের দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন? উত্তর করলেন, ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাকে তার অর্থ অহংকারী করে তুলেছে। মুফাস্‌সির ইব্‌নে কাছীর, মুজাহিদ, কুরতুবী, ইব্‌নে জারীর, সূয়ূতী ও মাজহারী গ্রন্থকার এই বিষয়ের সমর্থনে হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদা, ইব্‌নে আব্বাস, ইব্‌নে ওয়াহাব, ইব্‌নে যায়েদ এবং আতা প্রমুখদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, বহুবিধ গোনাহের কারণে অন্তর বিনষ্ট হয়ে থাকে।

অন্তরকে আবর্জনামুক্ত করা এবং রাখার উপায় কী?

(ক) উপর্যুক্ত হাদীছ থেকে যেমন অন্তর কীভাবে বিনষ্ট হয় তা বোঝা যায়, তেমনিভাবে অন্তরকে আবর্জনামুক্ত করা এবং আবর্জনামুক্ত রাখার উপায়ও প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান হয় যে, গোনাহ এবং পাপাচারিতা থেকে নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখাই হচ্ছে অন্তরকে আবর্জনা মুক্ত রাখার একমাত্র উপায়। গোনাহ বর্জন করা ব্যতীত অন্তরকে আবর্জনা মুক্ত রাখার ভিন্ন কোন উপায় নাই। আর যদি আল্লাহ না করুন গোনাহের কারণে অন্তর কলুষিত এবং আবর্জনাযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে খাঁটি মনে তওবা করা এবং গোনাহের কাজ বর্জন করা। কেননা, কুরআন এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোন মানুষ যতই পাপকার্য করুক না কেন, যদি সে অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে

তওবা করে আর গোনাহ না করার অঙ্গিকার করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন এবং স্বীয় খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ **(মোটেই না, নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে নিপতিত হবে। অতঃপর বলা হবে, এটা তা-ই, যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করতে।)**

১৫ থেকে ১৭ নং এই তিন আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের অন্তরদৃষ্টি শূন্যতার অপকারিতা শুধু এতটুকুই নয় যে, তারা হক অনুধাবনে ব্যর্থ, বরং তারা পরকালের জীবনে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ ও তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম অন্ধকারে অন্তরীণ থাকবে। এতে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিপতিত হবে, যেখানে তাদেরকে স্মরণ করানো হবে যে, জাহান্নামের এই যন্ত্রণা, আল্লাহর নৈকট্য এবং রহমত থেকে বঞ্চিত থাকা, তোমাদের আমার নিদর্শনাবলি এবং আয়াতসমূহ অস্বীকারের ফল, এই কর্মফলের কথাও তোমরা অস্বীকার করেছিলে।

বোঝা গেল অন্তর রোগাগ্রস্ত হওয়ার একটি মারাত্মক ক্ষতি হলো এই, এমন লোকেরা আল্লাহ পাকের দীদার তথা দর্শনের মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত অভিশপ্ত এ ধরনের লোকেরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপিত হয়। জাহান্নামে তাদের যন্ত্রণাকে আরো বৃদ্ধি করার প্রয়াসে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে– 'এই সেই শাস্তি এবং যন্ত্রণা-বঞ্চনা, যা তোমরা পৃথিবীতে অবাস্তব এবং মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছিলে।

আল্লাহর দর্শন লাভের অর্থ

এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) বস্তুজগতে আল্লাহ পাকের দর্শন সম্ভব কি না?

(খ) আখেরাতে আল্লাহর দর্শন লাভ হবে কি না?

প্রথম বিষয় সম্পর্কে সমস্ত উম্মত একমত যে, বস্তুজগতে চর্ম চোখে আল্লাহ পাকের দীদার বা দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। হযরত মূসা (আ.) বস্তুজগতে আল্লাহ পাককে দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি আমাকে দেখতে সক্ষম হবে না।' রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের রাত্রে দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন বলেই জুমহুর মত প্রকাশ করেছেন। তবে এ দর্শন বস্তুজগতে হয়নি। অধিকন্তু এটা হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একান্ত একটি মুজিযা এবং বৈশিষ্ট্য, যা কেবল তাঁরই জন্য স্বতন্ত্র বিষয়।

অন্তরদৃষ্টিতে দর্শন লাভ

পক্ষান্তরে মুরাকাবার অন্তরদৃষ্টির অধিকার সম্পন্ন আল্লাহর ওলীদের জন্য আল্লাহ পাকের দীদার ও দর্শন লাভ হওয়ার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এমনিভাবে স্বপ্নযোগেও আল্লাহ পাকের দীদার লাভ হতে পারে। হযরত ইমাম অহমদ (রহ.) বলেন, 'আমি আল্লাহকে স্বপ্নে দর্শন করেছি এবং তাঁর মিলন লাভের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আল্লাহ পাক আমাকে উত্তর দিয়েছেন যে, পবিত্র

www.maktabatulabrar.com

কুরআনের তেলাওয়াত আমার মিলন এবং মারেফাত লাভের অন্যতম উপায়। আমি জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহ, তেলাওয়াত বুঝে পড়তে হবে? আল্লাহ পাক উত্তর করেছেন, না, না বুঝে তেলাওয়াত করলেও আমার মিলন লাভে ধন্য হবে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এবং অন্যান্য বিশিষ্ট্য ওলীদের বস্তুজগতে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের অর্থ এটাই যে, তারা স্বপ্নযোগে অথবা মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করেছেন, চর্ম চোখের মাধ্যমে নয়।

আখেরাতে আল্লাহর দর্শন

এ সম্পর্কে দু-ধরনের মত রয়েছে–

(ক) আখেরাতে আল্লাহর দর্শন লাভ হবে না।

(খ) আখেরাতে আল্লাহর দর্শন লাভ হবে।

প্রথম মত মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। তাদের মতে আল্লাহ পাক নিরাকার, সীমা এবং পরিধিমুক্ত। সুতরাং মানুষ তার সীমিত দৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ পাককে তার সীমিত দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। আর যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের যথার্থতা প্রমাণ হয় সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি স্বীয় রহমত এবং করুণা দ্বারা সম্মানিত ও সৌভাগ্যশীল করবেন। মুফাস্সির যামাখশারী, আবূ মুসলিম এবং জুব্বায়ী প্রমুখ মুতাযিলী বিশেষজ্ঞগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আখেরাতে জান্নাতীদেরকে আল্লাহ পাক স্বীয় দীদার লাভে ধন্য করবেন। এক হাদীছে বলা হয়েছে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতী সামগ্রী ভোগ করবে আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমাদের আর কোন কিছু চাওয়ার থাকলে আমার নিকট চেয়ে নিতে পার। তারা বলবে, হে মহান আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি সমস্ত শান্তি এবং ভোগ বিলাস সামগ্রী দান করেছেন, আর কোন কিছুই চাওয়ার নেই। দীর্ঘ এই হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে, এরপর আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে স্বীয় দর্শন দানে সৌভাগ্যশীল করবেন। বোখারী মুসলিমসহ হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন, তোমরা পূর্ণিমার চাঁদকে যেমন স্বচক্ষে দেখতে পাও তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের দর্শনে সৌভাগ্যশীল হবে। আলোচ্য ১৫ নং আয়াতের বিশদ বিবরণে হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমদ (রহ.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আখেরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবে। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) একথাও বলেছেন যে,

اما والله لولم يوقن محمد بن ادريس انه يرى ربه فى المعاد لما عبده فى الدنيا .

অর্থাৎ, আমি আখেরাতের জীবনে আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী না হলে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতাম না। (কাশ্শাফ- ২৩২/৪) হযরত ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন,

وما ارى من جحد الووية المدلول عليها بقواطع الكتاب والسنة يخطئ بما .

অর্থাৎ, কুরআন এবং সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ হওয়া সাব্যস্ত থাকার পর এ বিষয়ে কেউ ভুলের শিকার হবে বলে আমি ধারণা করি না। (ইবনে জারীর- ১০০/১৫)

মতামতের পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত আলোচনায় উভয় মতের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়েছে। আমাদের মতে মুতাযিলাদের মতামত মোটেই বোধগম্য নয়। কেননা,

(ক) তাদের মতটি নির্ভর করে নিরেট যুক্তির উপর, যার সমর্থনে কোন শরীয়তগত প্রমাণাদি নেই। আখেরাতের বিষয়াদিকে নিরেট যুক্তির কষ্টিপাথরে বিবেচনা করা যায় না; বরং আখেরাতের বিষয়াদিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় ওহীগত দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। আর এ ব্যাপারে সেরূপ কোন দিক-নির্দেশনা নেই। আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে মানুষকে তার দীদার লাভে সৌভাগ্যশীল করতে সক্ষম। বান্দার দৃষ্টিশক্তি সীমিত হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত সীমিত নয়। তিনি তাঁর অসীম কুদরত দ্বারা দর্শন সমাধা করতে সুসক্ষম।

(খ) তদুপরী বহু আয়াত এবং বহু হাদীছে দর্শনের পক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং এসমস্ত আয়াত এবং হাদীছের অর্থ রহমত এবং করুণা করা হলে প্রকৃত অর্থকে পরিহার করতঃ রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। অথচ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলে রূপক অর্থ গ্রহণ করলে তাফসীরের মূলধারা বিরোধী পথ অবলম্বন করতে হয়, যা মোটেই সমীচীন নয়।

(গ) আলোচ্য ১৫নং আয়াত দ্বারাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত প্রমাণিত হয়, কাফের সম্প্রদায় আল্লাহ হতে পর্দার আড়ালে অন্তরীণ হয়ে থাকবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কুফ্‌রীর কারণে আল্লাহকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। ফলে তাদের জন্য এটা হবে বিরাট আযাব স্বরূপ। পক্ষান্তরে মু'মিনগণের সম্মুখ থেকে পর্দাকে হটিয়ে দেয়া হবে। এটা হবে তাদের জন্য চরম ও পরম শান্তির বিষয়। অন্যথায় কেবল পর্দাকে হটানো হলে আর দীদার লাভ না হলে কাফের এবং মু'মিনদের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না এবং আয়াতের কোন সার্থকতা থাকে না।

(ঘ) এখানে সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ কী মন্তব্য করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমদের মত উল্লেখ করেছি। মুফাস্‌সির মুজাও একই মত পোষণ করেছেন। হযরত হাসান এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন,

يكشف الحجاب فينظر اليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية .

অর্থাৎ, পর্দাকে দূরীভূত করে দেয়া হবে, ফলে মু'মিনগণ সকাল বিকাল আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করবে। (রূহুল মাআনী- ৭৩/৩০)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আল্লাহর শত্রুদল পর্দার আড়ালে থাকবে। সুতরাং তারা আল্লাহ পাকের দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে, আর আল্লাহ পাক তার শান অনুযায়ী ওলীগণকে দর্শন দানে ধন্য করেন। (ইবনে কাছীর- ৪৮৪/৪)

হুসাইন ইবনে ফুযাইল বলেন, কাফেররা বস্তুজগতে তাওহীদের নূর থেকে যেমন পর্দার আড়ালে ছিল, তেমনি আখেরাতেও পর্দার আড়ালে থাকবে। তাই আল্লাহ পাকের দর্শন থেকে তারা মাহরূম থাকবে।

এসব উক্তি এবং বক্তব্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়, আখেরাতের জীবনে মু'মিনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবে।

www.maktabatulabrar.com

ইবনে জারীরের মত

ইবনে জারীর লিখেছেন যে, আলোচ্য ১৫ নং আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের পক্ষে প্রমাণ পেশ করা অকাট্য নয়। কারণ, সম্ভাবনা আছে যে, পর্দার আড়ালের দ্বারা রহমত এবং করুণা না করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি এরূপ মন্তব্য এজন্য করেছেন যে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস, মুজাহিদ এবং কাতাদা থেকে এরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতের মধ্যে উভয় অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান হেতু কোন এক অর্থকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের যুক্তি নেই। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ইব্‌নে জারীরের এ উক্তি যথার্থ নয়। কারণ-

প্রথমত হযরত ইব্‌নে আব্বাস, কাতাদা এবং মুজাহিদের বক্তব্য আর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্যের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ, সকলের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, কাফেরদের আল্লাহ পাকের রহমত এবং করুণা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত থাকাটা প্রকারান্তরে আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকার নামান্তর। যেন মূলত রহমত, করুণা এবং সম্মান থেকেই বঞ্চিত রইল।

দ্বিতীয়ত কোন আয়াতের অর্থে কিছুটা অস্পষ্টতা দেখা দিলে অন্য আয়াতের সহযোগিতায় সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করার নীতি অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং এখানে আমরা সেই নীতি অনুসরণ করতে পারি। আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

অর্থাৎ, ঐদিন অনেকের মুখমণ্ডলী হবে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, তারা তাদের রবকে দর্শন করতে থাকবে। (ক্বিয়ামাহ: ২২-২৩)

এই আয়াতে আল্লাহ পাকের দর্শনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য আয়াতকেও আল্লাহ পাকের দর্শনের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মুফাস্‌সির ইব্‌নে কাছীরও এরূপ উক্তি করেছেন।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾	(১৮) মোটেই না, নেককারদের আমলনামা ইলিয়্যীনে সংরক্ষিত আছে।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾	(১৯) ইলিয়্যীন কী? তা কি তুমি জান?
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾	(২০) চিহ্নিত আমলনামা।
يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾	(২১) নৈকট্যপ্রাপ্তগণ তা দেখাশোনা করে।
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾	(২২) নেক লোকেরা পরম স্বচ্ছন্দ্যে থাকবে।
عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) তারা সিংহাসনে সমাসীন হয়ে অবলোকন করবে।
تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾	(২৪) তাদের মুখমণ্ডলে তুমি সুখের সজীবতা দেখতে পাবে।

(২৫) তাদেরকে মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি পান করানো হবে।	يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾
(২৬) তার মোহর হবে কস্তুরী। প্রতিযোগীদের এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।	خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾
(২৭) তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি,	وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾
(২৮) তাসনীম একটি ঝর্না, নৈকট্যশীলগণই এর পানি পান করবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

শব্দার্থ

كَلَّا মোটেই না, كتب আমলনামা, ابرار নেককারদের, مرقوم চিহ্নিত, يشهد প্রত্যক্ষ্য করে, দেখে, مقربون নৈকট্য প্রাপ্ত, نعيم স্বাচ্ছন্দে, الارائك সিংহাসনে, ينظرون অবলোকন করবে, تعرف দেখতে পাবে, وجوههم তাদের মুখমণ্ডলে, نضرة সজীবতা, يسقون পান করানো হবে, رحيق বিশুদ্ধ পানি, مختوم মোহরকৃত, ختمه তার মোহর, مسك কস্তুরী, فليتنافس প্রতিযোগিতা করা উচিৎ, متنافسون প্রতিযোগীরা, مزاجه তার মিশ্রণ, تسنيم পানি, عينا ঝর্না, يشرب পান করবে, المقربون নৈকট্যশীলগণ।

ভাবার্থ

পবিত্র কুরআন ভিত্তিহীন কাহিনীর কিতাব নয়। নেককারদের পুণ্য লাভ এবং পুরস্কৃত হওয়ার সুসংবাদ মিথ্যা নয়। যারা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে সৎ লোক। তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং প্রতিদান। এ উদ্দেশ্যেই তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুসংরক্ষণ এবং চিহ্নিত করতঃ লিপিবদ্ধ করে আমানতদার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে ইল্লিয়্যীনে রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাদেরকে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়া হবে। তারা জান্নাতে সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে সব কিছুই অবলোকন করবে এবং পরিতৃপ্ত হবে। সেদিন তাদের মুখমণ্ডলে সুখ-শান্তি ও সজীবতা ফুঁটে উঠবে, চমকে উঠবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। জান্নাতে তাদের জন্য সরবরাহ করা হবে অকল্পণীয় ভোগ-সামগ্রী। কস্তুরীর মোহরকৃত পাত্রের জান্নাতী ঝর্না তাসনীমের পানি মিশ্রিত শরবত পানে তাদেরকে সম্মানিত করা হবে। তারাই হবে সেদিন পরম সৌভাগ্যশীল। বস্তুত এরূপ বিষয়ই হচ্ছে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত বিষয়।

যোগসূত্র

ওজনে হেরফেরকারীদের ঘৃণ্য মন-মানসিকতা, জঘন্য অপরাধ এবং মারাত্মক পরিণামের বিষয়ে আলোকপাত করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে আবরার এবং সৎ লোকদের পুরস্কার এবং প্রতিদানের

বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। তাদের পরম সুখ-শান্তি এবং চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত লাভে সৌভাগ্যশীল হওয়ার মূল উপকরণ হচ্ছে আল্লাহ্ পাক এবং তার রসূল কর্তৃক জীবনবিধানের অনুশীলন ও অনুসরণ।

কিন্তু পাপাচারীদের বিবেচনায় এসব কিছু হচ্ছে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন লোভ-লালসা, যার কোন বাস্তবতা নেই এবং যুক্তির বহির্ভূত। কেননা,

ক. এ সমস্ত লোভ-লালসা এবং বক্তব্যের সূত্রপাত ঘটেছে কুরআন থেকে। আর তাদের দৃষ্টিতে কুরআন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়, এতো হচ্ছে পূর্বসূরিদের রচিত ভিত্তিহীন কাহিনী, যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

খ. উপরন্তু এসব প্রতিদান ও পুরস্কারের পূর্বশর্ত হচ্ছে হিসাব-নিকাশ। আর হিসাব-নিকাশের জন্য প্রয়োজন খুঁটিনাটি সমস্ত কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করা। একজন নয়, দুইজন নয়, এই বিশাল পৃথিবীর অসংখ্য মানব দানবের ভালমন্দ সমস্ত কর্মকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষণ করা কী সম্ভব?

গ. পৃথিবীর প্রথম থেকে অদ্যাবধি অসংখ্য মানব-দানবের মৃত্যু হয়েছে। তাদের কর্মকাণ্ড, আমালনামা কোথায়? কারা তা সংরক্ষণে নিয়োজিত? তাদের সরক্ষণের বিষয়টি কতটুকু সুনিশ্চিত?

এসব ধ্যান-ধারণা ও ভ্রান্তির খণ্ডনে নাযেল করা হল–

তাফসীর

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ. وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ. كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ. يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ .

মোটেই না, নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে সংরক্ষিত আছে। ইল্লিয়্যীন কী? তা কি তুমি জান? চিহ্নিত আমলনামা। নৈকট্যপ্রাপ্তগণ তা দেখা শোনা করে।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম

মহান আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতের প্রথমে كَلَّا (কাল্লা) শব্দের মাধ্যমে উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণাসমূহের প্রতিবাদ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। যদি পবিত্র কুরআন মানব রচিত কিতাব হতো, অথবা পূর্বসূরিদের ভিত্তিহীন কাহিনীর পুথিপুস্তক হতো, তাহলে বারবার চ্যালেঞ্জের পরেও কেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হলো না। প্রকারান্তরে এতে আকীদা, আমল, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক ইত্যাকার বিষয়াদি সম্পর্কে যেরূপ বিশদ বিবরণ সংযোজিত রয়েছে, মানবজীবনের সার্বিক উন্নয়নে যেরূপ নিপুণ জীবনবিধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে অবজ্ঞা করা যায় কি? পবিত্র কুরআনের বাক-প্রণালী, অলংকারশাস্ত্র, গ্রামার এবং সাহিত্য বিধি পর্যালোচনা করলে একে মানবরচিত পুস্তক বলার অবকাশ থাকে কি? ইহকাল এবং পরকাল সম্পর্কে যেরূপ সঠিক নির্ভুল তত্ত্ব এতে পরিবেশিত রয়েছে, সেগুলো কি পবিত্র কুরআনের আসমানী এবং রব্বানী কিতাব হওয়ার পরিচায়ক নয়? অজ্ঞতা এবং পরশ্রীকাতর হয়ে আবূ জাহেল, উৎবা এবং শাইবা প্রমুখ অবশ্যই কুরআনের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের বিশ্বাস এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে খণ্ডন করে বিশ্বনবীকে দেশান্তরও করেছে বটে, অনেকে পবিত্র কুরআনে সংশোধনী এবং সংযোজনেরও

www.maktabatulabrar.com

প্রস্তাব করেছে, কিন্তু অবশেষে আরববাসীরাও কি পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়নি? তারা সমগ্র আরবের দায় দায়িত্ব বিশ্বনবীর হাতে ন্যস্ত করে তাঁর অনুসরণ এবং অনুকরণে স্বীয় জীবনকে ধন্য করেনি কি?

তাদের এরূপ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল এবং মূর্খতার পরিচায়ক যে, অসংখ্য সৃষ্টির সমস্ত কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব কীরূপে? কেননা, সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন সৃষ্টির বেলায় অবশ্যই প্রনিধানযোগ্য, কিন্তু যিনি সর্বশক্তিমান, অসীম শক্তির অধিকারী, যিনি এ বিশাল সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন, তার বেলায় কি সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন তোলা যায়? স্রষ্টাকে সৃষ্টির গণ্ডির ভিতরে অনুমান করা গণ্ডমূর্খতা নয় কি? আল্লাহ পাক তাঁর অসীম কুদরতের সাহায্যে অসংখ্য ফেরেশতা গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিটি সৃষ্টির সাথে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষের খুঁটিনাটি সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ স্থলে পৌছানোর কঠোর ব্যবস্থা করেছেন মানুষের নাগালের বাইরে ইল্লিয়্যীনে অথবা সিজ্জীনে। সেটাকে আমানতদার এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং সংযোজনের অবকাশ মোটেই নেই সেখানে। হাশরের বিচারাদালতের পর এর ভিত্তিতেই পাপাচারীদেরকে জাহান্নামে এবং নেককার সৎ লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, এতে সন্দেহ নেই মোটেই।

আলোচ্য আয়াতসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচার যোগ্য ঃ

১. ইল্লিয়্যীন কী জিনিস?
২. ইল্লীয়্যিন কোথায় অবস্থিত?
৩. আমলনামার বিশদ বিবরণ।
৪. মুকাররব এবং আবরারের পরিচয়।
৫. প্রতিদান এবং পুরস্কারের ব্যাখ্যা।

ইল্লিয়্যীন পরিচিতি

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, তাবারী, ইউনুস, মুজান প্রমূখ থেকে علیین (ইল্লিয়্যীন) শব্দটির বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ আভিধানিক ফাররার মতে علیین (ইল্লিয়্যীন) একটি স্থানের নাম। অপরদিকে আবুল ফাতাহ মূসিলীর মতে علیین আরবী শব্দটি علو এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে সীমাহীন উচ্চতা, উপর এবং মর্যাদা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

ক. কারও কারও মতে নেককারদের আমলনামার সংরক্ষণ স্থান এবং তত্ত্বাবধানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন লাওহে মাহ্‌ফূজে বান্দার আমল সংরক্ষিত আছে, এমনিভাবে মৃত্যুর পূর্বে বান্দা যা আমল করে তার মধ্যে নেককারদের আমলসমূহকে ইল্লিয়্যীনে বিশেষ ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করা হয়। নেককারদের মধ্যকার শ্রেণি পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের আমলসমূহের সংরক্ষণস্থল বিভিন্ন হতে পারে। এ কারণেই علیین শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। গভীরভাবে দৃষ্টি আরোপ করলে উভয় মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। ২০ নং আয়াতের দ্বারা علیین এর মাধ্যমে 'আমল সংরক্ষণ স্থল' মতামতের অগ্রাধিকার সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

www.maktabatulabrar.com

ইল্লিয়্যীন কোথায় অবস্থিত?

ইল্লিয়্যীন কোথায় অবস্থিত? ইল্লিয়্যীন এবং জান্নাতের মধ্যে ব্যবধান আছে কি না– এ সম্পর্কে সাহাবা ও মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। যথা:

১. মৃত্যুর পর মু'মিনদের আত্মার অবস্থান সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'জান্নাতে'। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইল্লিয়্যীন জান্নাতে বিদ্যমান।

২. হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان اهل علیین لینظرون فاذا اشرف رجل من اهل علیین اشرفت الجنة لضیاء وجهه فیقولون ما هذا النور؟ فیقال اشرف رجل من اهل علیین الابرار اهل الطاعة والصدق.

ইল্লিয়্যীন বাসীগণ জান্নাত অবলোকন করবে। যখন কোন একজন জান্নাত অবলোকনের জন্য মাথা উঁচু করবে, তখন তার মুখমণ্ডলীর নূরে সমস্ত জান্নাত নূরান্বিত হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীরা বলবে, এই নূর কীসের? বলা হবে– 'সৎ এবং আনুগত্যকারী ইল্লিয়্যীনবাসী আবরারদের একজন জান্নাত অবলোকনের জন্য মাথা উঁচু করেছে।

অন্যত্র আছে,

ان اهل الجنة لیرون اهل علیین کما یری الکوکب الدری فی افق السماء.

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীগণ ইল্লিয়্যীনবাসীদেরকে আসমানের উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দেখতে পাবে।

উল্লিখিত দুই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত এবংইল্লিয়্যীন পৃথক পৃথক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

তবে উপরোক্ত আলোচনা এবং প্রমাণাদির ভিত্তিতে এতটুকু চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয় যে, জান্নাতীদের আত্মাসমূহ জান্নাতে এবং ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করবে, অথচ অন্যান্য হাদীছে এর বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা:–

ক. হযরত ইব্‌নে মাসউদ, ইব্‌নে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আনাস (রা.) কর্তৃক মুসলিম এবং আবূ দাউদের হাদীছে জান্নাতের প্রবাহে অবস্থানের কথা বিদ্যমান রয়েছে।

খ. মুআত্তা মালেক, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে উম্মে হানী এবং কাআবের হাদীছে জান্নাতী বৃক্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে।

গ. মারওয়াযীর কিতাবুল জানায়েযে বর্ণিত হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে জিবরীলের তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলা হয়েছে।

ঘ. হযরত ইব্‌নে মুবারাক, ইব্‌নে মিন্দা এবং হাকীম তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উছুলে বর্ণিত হযরত সালমান (রা.)-এর হাদীছে বরযখের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঙ. বহু হাদীছে আরশের নীচে অথবা কানাদীলে আরশের (আরশের ঝাড়বাতির) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চ. হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ইব্‌নে আসাকিরের হাদীছে জাবিয়া এবং শামের কথা বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে জমজম কূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, মু'মিনদের আত্মার অবস্থানের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান রয়েছে। তবে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত মতামতসমূহের মধ্যে মৌলিকভাবে দুটি মত অধিক গুরুত্ব রাখে। অন্যান্য গুলোর মধ্যে সমতা সৃষ্টির অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। যে দুটি মতের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন– তার একটি হচ্ছে, মু'মিনদের আত্মা যমীনে নয়, বরং আসমানের উপরে কোন স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। এর বিপরীত অপর মতটি হচ্ছে যে, মু'মিনদের আত্মাসমূহ যমীনের কোন স্থানে অথবা কবরেই সংরক্ষণ করা হয়। কোন একটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের মতো বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ কিতাবুর রূহ এবং মাদারিজুস সালিকীন প্রমূখ কিতাবে আলোচনা করে সর্বশেষে এই উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

مسئلة مقر الارواح بعد الموت عظيمة لا تتلقى الا تتلقى من السمع.

অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আত্মাসমূহের অবস্থানস্থলের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল বিষয়, এ সম্পর্কে শরীয়তের বর্ণনার বাইরে কোন কিছু বলার বা গ্রহণের অবকাশ নেই।

ইবনুল আরাবীর মতামত

হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ কাজী আবূ ইয়ালা তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মু'তামাদ' য়ে আত্মাসমূহের যমীনে সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ সালামের হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তার বক্তব্যের সারমর্ম, অসংখ্য হাদীছে কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীকে সালাম পেশ করার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। যদি মু'মিনের আত্মা কবরে অবস্থান না করবে তাহলে সালাম প্রদানের কোন অর্থ হয় না। বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ ইবনুল আরাবী এই মতটিকে সমর্থন করে বলেন,

حديث الجريدة يستدل به على ان الارواح فى القبور تنعم او تعذب.

অর্থাৎ, হাদীছুল জারীদা (কবরে ডাল গাড়া সম্পর্কিত হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়, আত্মাসমূহ কবরে অবস্থান করে এবং শান্তি অথবা শাস্তি ভোগ করে।

হাদীছুল জারীদার বিশদ বিবরণ হলো, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের ডাল দু-টুকরো করে এসতেনজায় অপবিত্রতা অবলম্বনকারী এবং গীবতকারী দুজনের কবরের আযাব মুক্তির নিদর্শনস্বরূপ পুতে রাখেন। যদি কবরে আত্মার অবস্থান না হতো, তাহলে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং যেমন পাপাচারীদের আত্মা কবরে শাস্তি ভোগ করে, তেমনি নেককারদের আত্মাসমূহ কবরে শান্তি ভোগ করে থাকে। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এ বিষয়টা প্রমাণিত হয়।

মতামতের পর্যালোচনা

কিন্তু উপরোক্ত মতটি এবং তার প্রমাণাদি যথার্থ নয়। কেননা,

(ক) এমতটি পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চূড়ান্ত মতের বিরোধী।

(খ) একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের আত্মা জান্নাতে অবস্থান করে। তবে এখানে

www.maktabatulabrar.com

একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীছে পাকে তো এ-ও উল্লেখ রয়েছে যে, উম্মতের দুরূদ সালাম মদীনার রওযা শরীফে পৌছানো হয় এবং রওযা শরীফে হাজির হয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করলে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শোনেন ও গ্রহণ করে থাকেন। এতে প্রমাণিত হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মা জান্নাতে নয়, বরং কবরে থাকে। পরবর্তী শিরোনামের আলোচনায় এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হবে।

(গ) তদ্রূপ শহীদদের ব্যাপারে চূড়ান্ত মতামত রয়েছে যে, তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতে অবস্থান করে এবং তাদের আত্মাসমূহ বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে থাকে।

চূড়ান্ত মত

বস্তুত মু'মিনদের আত্মাসমূহের কেন্দ্রীয় অবস্থান হবে জান্নাত এবং ইল্লীয়্যিনে। উভয়টি অভিন্ন স্থান, তবে মু'মিনদের মধ্যে মূলত চারটি স্তর রয়েছে। নবীর স্তর, সিদ্দীকীনদের স্তর, শহীদদের স্তর এবং ছালিহীনদের স্তর। আবার প্রত্যেক স্তরের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিবিন্যাস। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে এ সমূহ স্তরকে 'আসহাবুল ইয়ামীন' এবং 'মুকাররাবুন'– দুই স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের মর্যাদা এবং স্তর হিসেবে আসমান এবং যমীনের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করবে এবং শান্তি ভোগ করবে।

আর সকলেরই কবরের সাথে একপ্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে, সেই সম্পর্কের কারণে কবরের সালাম প্রদান করা হলে তা শোনতে সক্ষম হবে, আর তা হবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুপাতে। আবার অনেকে কবরে শান্তি ভোগ করবে। সুতরাং বিভিন্নমুখী বর্ণনায় তাদের মর্যাদার প্রকারভেদ এবং পার্থক্যের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত কোন পার্থক্য এবং বিরোধ নেই। আল্লামা সুয়ূতী বলেন,

ولا دليل فى ذالك على ان الارواح ليست فى الجنة فان العرض على الجسد وللروحيه اتصال.

অর্থাৎ, যে সমস্ত হাদীছে সালাম অথবা কবরে আযাব এবং শস্তির কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা আত্মাসমূহের কবরে অবস্থানের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা যায় না। কারণ, সালাম এবং শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক কবরে হতে পারে। শরীরের সাথে আত্মার একপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

তবে এ সম্পর্ক ব্যক্তি বিশেষে কমবেশি হতে পারে। এর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তবে নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্কের ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা করলে বিষয়টি অনুভব করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

ইবনুল কাইয়্যেম-এর মত

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনুল কাইয়্যেম বলেন,

الصحيح ان الارواح متفاوة فى مستقرها فى البرزخ اعظم تفاوة ولا تعارض بين الادلة فان كلا منهما وارد على فريق من الناس بحسب در جاتهم فى السعادة اوالشقاوة فمنها ارواح على اعلى عليين فى الملاء على الا وهى الانبياء وهم متفاوتون منازلهم.

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মতানুসারে বরযখী জীবনে আত্মাসমূহের অবস্থানস্থলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকবে। এ সম্পর্কে শরীয়তের দেয়া দলীলসমূহে কোন প্রকার বিরোধ নেই। কেননা, দলীলসমূহ পাপাচারী এবং নেককারদের আত্মাসমূহের অবস্থা অনুপাতে নির্ধারিত অবস্থানের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে নবী রসূলদের আত্মার অবস্থান হচ্ছে মালায়ে আলার সর্বোচ্চ স্তরে। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে। ...।

এই শ্রেণিভাগ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে সর্বশেষ যে প্রার্থনা আল্লাহ পাকের দরবারে করেছিলেন, তা থেকে অনুমিত হয়। সে প্রার্থনা হল–

اَللّٰهُمَّ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى .

হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।

এতে তার জন্য সুরক্ষিত স্থানের প্রার্থনাই বোধগম্য হয়।

ইমাম রাযীর মতামত

ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে এ বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেন,

ان المعتمد فى تفسير هذه الاية ما بينا ان العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة والسفل والضيق الظلمة من علامات الشقاوة فلما كان المقصود من وضع كتاب الفجارة فى اسفل السافلين وفى اضيق المواضع اذلال الفجار وتحقير شانهم كان المقصود من وضع كتاب الابرار فى اعلى عليين وشهادة الملئكة لهم بذالك اجلا لهم وتعظيم شانهم .

অর্থাৎ, এই আয়াতের নির্ভরযোগ্য অর্থ হচ্ছে, উচ্চমর্যাদা, কবরের প্রসস্ততা, নূর এবং পবিত্রতা নেককারদের সৌভাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ। আর নিচুতা, কবরের সংকীর্ণতা এবং অন্ধকার, অপরাধীদের দুর্ভাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ। তাই যখন অপরাধীদের আমলনামাকে সর্বনিম্ন স্তরে ও সংকীর্ণ স্থলে সংরক্ষণ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে অপদস্ত অপমানিত করা, তখন নেককারদের আমলনামাকে সর্বোচ্চ স্তরে সংরক্ষণ করা ও ফেরেশতাদের সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেককারদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শন করা।

ইমাম শা'বীর মত

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইমাম শা'বী বলেন, মূলত আত্মাসমূহ চারভাগে বিভক্ত:

(ক) নবী রসূলগণের আত্মাসমূহ। তাদের আত্মাসমূহ শরীর থেকে বের হয়ে মেশকে আম্বর এবং কর্পূরের সুগন্ধে মোহিত হয়ে জান্নাতে পানাহার করে, শান্তি এবং নেয়ামত উপভোগ করে। অতঃপর রাত্রে আরশের নীচে নির্ধারিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(খ) শহীদগণের আত্মাসমূহ। তাদের আত্মাসমূহ শরীর থেকে বের হয়ে পাখির আকারে জান্নাতে বিচরণ করে, পানাহার করে, শান্তি উপভোগ করে। অতঃপর রাতে আরশের নীচে তাদের নির্ধারিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.maktabatulabrar.com

(গ) নেককার মু'মিনদের আত্মাসমূহ। তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগানে বিচরণ করে এবং জান্নাতের অতুলনীয় সামগ্রী অবলোকন করে। (মাজহারী- ২২৪/১০)

এতেও মু'মিনদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই বিবরণ অনুপাতে মু'মিনদের আত্মাসমূহের শাম, জাবিয়া, যমযম, এবং যমীনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান এবং বিচরণের বিষয়টি বুঝে আসে। এর অর্থ হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিলন এবং পরস্পর সাক্ষাৎ। ইব্নে আসাকির, ইব্নে মিন্দা, মুস্তাদরকে হযরত ইব্নে উমর, হযরত আলী এবং ইব্নে আমরের হাদীছে এই স্থানে মিলনের কথাই বর্ণিত হয়েছে, মূল অবস্থানের কথা নয়। এভাবেই মেরাজের রাত্রে সমস্ত নবী রসূল রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং বিভিন্ন আসমানে মিলিত হন। এরূপ আলোচনা ইমাম নাসায়ী কর্তৃক 'বাহরুল কালাম'-গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, বোখারী শরীফের হাদীছে মু'মিনদের আত্মাসমূহ হযরত আদম (আ.)-এর ডান পার্শ্বে এবং বদকারের আত্মা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পার্শ্বে অবস্থানের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং বদকারদের আত্মা সিজ্জীনে সংরক্ষণের এবং মু'মিনদের আত্মাসমূহ ইল্লিয়্যীনে থাকার অর্থ কী? ফাতহুল বারী এবং উমদাতুল কারীসহ হাদীছের শরাহগ্রন্থসমূহে এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যথা:

(ক) উপর্যুক্ত আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর দৃষ্টি আরোপ করলে অতি সহজেই মূল উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়। কেননা, এ হাদীছে ডানে অথবা বামে আত্মাসমূহের অবস্থানকেন্দ্র- এ কথা বলা হয়নি। হতে পারে মেরাজের রাতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানোর জন্য বিশেষভাবে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

(খ) হতে পারে আত্মাসমূহ তার নির্ধারিত স্থানেই বিদ্যমান ছিল, আর বিশেষ উদ্দেশ্যে পর্দাসমূহকে উন্মোচন করে দেয়া হয়েছিল। (ফাতহুল বারী)

(গ) ইব্নে হাজমের মতে মানুষের শরীর সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ পাক আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করে এক নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করে রাখেন। যেখানে পানি, বাতাস, মাটি এবং অগ্নির অবকাশ ছিল না। অতঃপর শরীর সৃষ্টি করে আত্মাসমূহকে শরীরে পরিবেশন করেন। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের আত্মাসমূহকে পুনরায় পূর্বস্থানে সংরক্ষণ করা হয়। অবশ্য আম্বিয়াদের আত্মাকে জান্নাতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এ বক্তেব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণাদি নেই। এ সম্পর্কে ইফছাম নামক কিতাবে এবং আল্লামা কুরতুবী সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন। তার সারমর্ম আমাদের পূর্ব আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ .

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর রয়েছে একটি স্থায়ী অবস্থানস্থল ও একটি অস্থায়ী অবস্থানস্থল। (সূরা আন'আম: ৯৮)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا .

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) তাদের স্থায়ী অবস্থানস্থল ও অস্থায়ী অবস্থানস্থল সম্বন্ধে অবগত আছেন। (সূরা হূদ: ৬)

এই আয়াতসমূহে مُسْتَوْدَعًا (অস্থায়ী অবস্থানস্থল) শব্দের মাধ্যমে মৃত্যুর পর আত্মাসমূহের নিধারিত স্থানে অবস্থানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

মুতাযিলাদের মতামত

স্পেনের বিশিষ্ট ফকীহ ইবনে ওয়াহাব, পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক সুহায়লী, ইবনুল আরাবী মালেকী এবং মুতাযিলাদের মতে মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মাসমূহেরও মৃত্যু সাধিত হয়। কিন্তু এটা একটি ভ্রান্ত মতবাদ তা উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহ্নূন ইবনে সাঈদ বলেন,

هذا قول اهل البدع والنصوص الكثير على بقاء الارواح ...الخ

অর্থাৎ, এরূপ বক্তব্য ভ্রান্তবাদীদের বক্তব্য। মৃত্যুর পর শরীরের সাথে আত্মাসমূহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার অসংখ্য প্রমাণাদি এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে। (শারহুছ ছুদূর)

আমলনামার বিশদ বিবরণ

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আমলের ভিত্তিতেই মানুষের লাভ অথবা ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করা হয়। ভাল আমলের উত্তম পুরস্কার আর পাপাচারের বিনিময় হয় শাস্তি এবং ক্ষতি। আখেরাতের পুরস্কার এবং ক্ষতির বিষয়টিও তদ্রূপ। আমল ভাল হলে উত্তম পুরস্কার অন্যথায় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ভালমন্দ আমলের বিচার বিশেষণের তাগীদেই সর্বপ্রকার আমলসমূহ সিজ্জীন অথবা ইল্লিয়্যীনে সংরক্ষণ করা হয়। ইল্লিয়্যীনে নেককারদের আমলনামার তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে আল্লাহর নৈকট্যশীল ও মর্যাদাশীল বিশেষ ফেরেশতা। কোন কোন হাদীছের দ্বারা বোঝা যায় যে, নেককারদের মৃত্যু হলে তার পবিত্র আত্মাকে ফেরেশতাগণ জান্নাতী রেশমের পোশাকে আবৃত করে অতি সম্মানের সাথে প্রথম আসমানে নিয়ে যায়। এরপর প্রত্যেক আসমান থেকে ফেরেশতাগণ সম্মানের সাথে ইল্লিয়্যীনে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে তার আমলনামা পরিদর্শন করায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অপর এক হাদীছের দ্বারা বোঝা যায়, নেককারের মৃত্যুর পর তার আমলনামাকে ইসরাফীল ফেরেশতার দ্বারা মোহর করে দেয়া হয়। ফলে তার ভিতর আর পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং সংযোজনের অবকাশ থাকে না। এরই বিবরণে ইবনে ইসহাক বলেন,

صعدت الملائكة وله نور يتلألأ لا فى السموات كنور الشمس فى الارض حتى ينتهى بها الى اسرافيل فيختم عليها ويكتب .

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আমলনামা নিয়ে ঊর্ধ্ব পথে অগ্রসর হয় আর আমলনামা যমীনের সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকে। অতঃপর ইসরাফীলের নিকট পৌছলে তাতে তিনি কিছু লিখে মোহর করে দেন। এসব কিছু সম্মানস্বরূপ করা হয়ে থাকে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ... مِنْ تَسْنِيْمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ . **(নেক লোকেরা পরম স্বাচ্ছন্দে থাকবে। ... তাসনীম একটি ঝর্ণা, নৈকট্যশীলগণই এর পানি পান করবে।)**

www.maktabatulabrar.com

আখেরাতের জীবনে কাফের এবং পাপাচারীদের জন্য যেমন রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং যাতনা-নিপীড়ন, তেমনি মু'মিন এবং নেককারদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত শান্তি এবং পুরস্কার। ২২ নং আয়াত থেকে শুরু করে ২৮ নং আয়াত পর্যন্ত ঐ সমস্ত শান্তি এবং পুরস্কারের কিঞ্চিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে নেককারদের স্বাভাবিক কামনা এবং আকাঙ্খার পূরণের জন্য। কেননা, আমলনামার সংরক্ষণ এবং গুরুত্বের যে চিত্র ইতিপূর্বের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে যার আমলনামা তার মধ্যে শান্তি এবং সম্মানের বিষয়টি জানার আগ্রহ সৃষ্টিই হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ২২নং এবং তার পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী সুখ-শান্তির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

জান্নাতের পুরস্কার দুই প্রকার

পবিত্র কুরআন এবং হাদীছের আলোকে জান্নাতের নেয়ামত এবং পুরস্কার গণনাতীত ও কল্পনা বহির্ভূত প্রমাণিত হয়। তাই গণনাতীত এবং কল্পনা বহির্ভূত নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করে نعيم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এই শব্দের ব্যাপকতায় সকল প্রকার নেয়ামত এবং পুরস্কারের প্রতি দিক-নির্দেশনা করা হয়েছে। এই নেয়ামত এবং পুরস্কার দুই প্রকারের। যথা:

(ক) কিছু নেয়ামত রয়েছে যার বস্তুজগতের নেয়ামতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বিধায় তার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হয় না। এক হাদীছে বলা হয়েছে, নেককারদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরী রাখা হয়েছে, যা মানুষের দেখা-শোনা ও কল্পনারও বহির্ভূত।

(খ) আর কিছু নেয়ামত এমন রয়েছে, যা বস্তু জগতের নেয়ামতের সদৃশ বিধায় অনুভূত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সাথেও বস্তুজগতের নেয়ামতের কোন তুলনা চলে না।

عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ **(তারা সিংহাসনে সমাসীন হয়ে অবলোকন করবে।)**

জান্নাতীদের সিংহাসন লাভ

সিংহাসন লাভ করা ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার কামনা-বাসনা মানুষের স্বভাবগত কামনা-বাসনা। এ কারণেই মানুষ এর পিছনে বহুবিধ প্রচেষ্টা করে থাকে। এই প্রচেষ্টায় সফল হতে পারাতেই সর্বোচ্চ সম্মান এবং তৃপ্তি বোধ করে। এর চেয়ে অধিক ক্ষমতার আর কোন স্তর নেই। এই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অনেকেই নমরূদ, ফিরআউন, শাদ্দাদ ও হামানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যারা কেবল আল্লাহর মহব্বতে বস্তুজগতের সিংহাসন পরিহার করে নিজেকে দীন-হীনদের কাতারে শরীক করে, তারাই হচ্ছেন আবরার এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় পাত্র। তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়স্বরূপ আখেরাতের জীবনে আল্লাহ পাক তাদেরকে সিংহাসনের অধিকারী করবেন। অসংখ্য মণিমুক্তা ও কারুকার্য খচিত সুসজ্জিত সিংহাসনের অধিকারী হবে তারা। সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে তারা উপভোগ করবে চরম শান্তি এবং তৃপ্তি। তারা হবে সেদিন তুলনাহীন শক্তির অধিকারী।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে কী কী দেখবে?

সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে কি কি দেখবে- এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে:

(১) মুফাস্‌সির মুকাতিলের মতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে জাহান্নামে শত্রুদের শাস্তি অবলোকন করবে। (রূহুল মাআনী– ৭৫/৩০)

(২) সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় যে সমস্ত ভোগ-সামগ্রীর কামনা বাসনা মনে জাগ্রত হবে, সাথে সাথে তা উপস্থিত পাবে এবং অবলোকন করতে পারবে।

(৩) জান্নাতে বিদ্যমান সমস্ত কিছুই অবলোকন করতে সক্ষম হবে।

(৪) মহান আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবে।

ইমাম রাযী এবং মাজহারীর মতে শেষোক্ত মতটিই অধিক গ্রহণীয়। কারণ, ইতিপূর্বে কাফেরদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাকের দীদার থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং তাদের মোকাবেলায় মু'মিনদের পক্ষে আল্লাহ পাকের দীদার লাভের বিষয়টি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইকরামা, মুজাহিদ, মুকাতিল এবং ইব্‌নে আব্বাস থেকেও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, উপর্যুক্ত মতসমূহের ভিতর মূলত কোন বিরোধ নেই, আর কোন একটির সাথে আয়াতের অর্থকে সীমাবদ্ধ করারও কোন যৌক্তিকতা নেই, বরং অবলোকনের বিষয় ব্যাপকতার প্রতিই আয়াতে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যথা:

(ক) আয়াতে সিংহাসনে বসে অবলোকনের কথা বলা হয়েছে, অথচ অবলোকনের বিষয়সমূহ উহ্য রাখা হয়েছে। আর এরূপ উহ্য রাখা বিষয়টির ব্যাপকতারই ইঙ্গিত।

(খ) আবরার অর্থাৎ, নেককারদের নেয়ামত এবং পুরস্কারে ব্যাপকতার দিকনির্দেশনা স্বরূপ نعيم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ব্যাপকহারে নেয়ামত উপভোগ করা। অতএব সিংহাসনে উপবেশনকারী আবরারগণ যা দেখবেন তা ব্যাপকই হবে।

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ **(তাদের মুখমণ্ডলে আপনি সজীবতা দেখতে পাবেন।)**

জান্নাতীদের মুখমণ্ডলির সজীবতা

যাদের জীবন শান্তির হয়, যারা দুঃখ কষ্ট করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত নয়, তাদের মুখমণ্ডলি হয় সজীব, সুন্দর ও মলিনতা মুক্ত। তাদের চেহারায় দুঃখের ছাপ দেখা যায় না। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেমের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, যাদের অন্তর প্রেমাস্পদের মিলন চিন্তায় বিচলিত থাকে, যারা প্রেমাস্পদের করুণার প্রতীক্ষায় শেষ রাতে গাত্রোত্থান করে চরম ইবাদত, রিয়াজত, মুজাহাদা, দুনিয়া বিরাগিতা, তাহাজ্জুদগুজারী ও অবিরাম প্রার্থনায় লিপ্ত থাকে, বস্তুজগতে কি তাদের মুখমণ্ডলোতে সজীবতা এবং শান্তির অবকাশ আছে? মোটেই না। তাই আখেরাতে তাদের চেহারাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সজীব করা হবে। সেদিন তাদের মুখমণ্ডল হবে অত্যন্ত লাবণ্যময় এবং সুন্দর। আন্তরিক প্রশান্তির সাথে সাথে তারা সেদিন বাহ্যিক শান্তিতেও সৌভাগ্যবান হবেন। ২৩ নং আয়াতে এদিকেই আলোকপাত করা হয়েছে। (ইব্‌নে জারীর– ১০৫/৩০)

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ. خِتٰمُهٗ مِسْكٌ **(তাদেরকে মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী।)**

জান্নাতের শরবত প্রসঙ্গ

মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, নূরান্বিত ও সজীব মুখমণ্ডলীর অধিকারী আল্লাহর মেহমানকে সম্মান স্বরূপ জান্নাতী শরবত পরিবেশন করা হবে। তিতা ও পচন-গন্ধমুক্ত, পাক পবিত্র ও সুগন্ধিত এই শরবতের ক্রিয়াশক্তি তাদের শিরা উপশিরায় পরিবেশিত হয়ে সৃষ্টি করবে তাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব শান্তি; মোহিত করে তুলবে তাদের আশপাশ। অতি মূল্যবান পাক-পবিত্র পেয়ালায় এই শরবত ভর্তি করে জান্নাতী মেশক আম্বরের মোহর দ্বারা অনেক পূর্বেই তাদের জন্য মোহর করে রাখা হয়েছিল, যাতে কারো হাতে লাগানোর অবকাশ না থাকে। তারা বস্তুজীবনে কোন প্রকার শিরক করেনি, নেফাক-কুফর এবং বিদআত ও পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়নি, একমাত্র তাওহীদ এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। তাই তাদেরকে আজ এভাবে সম্মানিত করা হবে। (ইবনে কাছীর)

وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ **(প্রতিযোগীদের এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।)**

প্রতিযোগিতার বস্তু

মানুষের মধ্যে লাভের বস্তু হাসিলের জন্য প্রতিযোগিতা করার মানসিকতা একটি স্বভাবগত বিষয়। প্রকৃত লাভ হচ্ছে আখেরাতের লাভ। কারণ, আখেরাতের লাভই হচ্ছে চিরস্থায়ী। এ কারণেই আল্লাহ পাক মানুষকে আখেরাতের লাভের জন্য প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, فاستبقوا الخيرات এবং وسارعوا الى مغفرة আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের সফলতা এবং কামিয়াবীর কথা বর্ণনা করে এখানেও মানুষকে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। এ আয়াতে প্রতিযোগিতার আহ্বানের উদ্দেশ্য এটাই।

وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ **(তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি, তাসনীম একটি ঝর্ণা, নৈকট্যশীলগণই এর পানি পান করবে।)**

তাসনীমের পরিচয়

বস্তুজগতে শরবতের মধ্যে সুগন্ধি এবং স্বাদ সৃষ্টি করার জন্য গোলাপ, কস্তুরী ও পরিমাণ মোতাবেক অনেক ধরনের জিনিস মেশানো হয়। তেমনিভাবে জান্নাতীদেরকে যে শরবত দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে তাতে তাসনীমের মিশ্রণ করা হবে। হযরত ইব্‌নে মাসউদ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস, জাহ্‌হাক, আবূ সালেহ্ এবং কাতাদার মতে তাসনীম জান্নাতের একটি নহরের নাম। তার পানির মিশ্রণে শরবত তৈরী করে জান্নাতবাসীদেরকে আপ্যায়ন করা হবে।

তাসনীম মিশ্রণের হেতু উল্লেখ করে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, তাসনীমের মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য হলো, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের মুশাহাদার স্বাদ অনুভূত হবে।

(২৯) নিশ্চয়ই অপরাধীরা মু'মিনদের সাথে উপহাস করত।	إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) যখন তারা তাদের নিকট দিয়ে গমন করত, তখন তারা পরস্পর চোখে টিপ্পনি মারত।	وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾	(৩১) তারা যখন স্বীয় পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেত, তখন হাসা-হাসি করে করে ফিরত।
وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।
وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾	(৩৩) অথচ তারা মু'মিনদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরিত হয়নি।
فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾	(৩৪) আজ মু'মিনগণ কাফেরদের উপহাস করছে।
عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾	(৩৫) সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে (কাফেরকে) অবলোকন করছে।
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾	(৩৬) কাফেররা তাদের কর্মকাণ্ডের বদলা পেয়েছে তো?

শব্দার্থ

اَلَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا অপরাধীরা, مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদের সাথে, يَضْحَكُوْنَ উপহাস করত, مَرُّوْا بِهِمْ তারা তাদের নিকট দিয়ে গমন করত, يَتَغَامَزُوْنَ তারা চোখ টিপে ইশারা করত, انْقَلَبُوْا তারা ফিরে আসত, اِلٰى اَهْلِهِمْ তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট, فَكِهِيْنَ তারা হাসাহাসি করে, فَالْيَوْمَ আজ, لَضَالُّوْنَ নিশ্চই এরা পথভ্রষ্ট, مَا اُرْسِلُوْا প্রেরিত হয়নি, حٰفِظِيْنَ তত্ত্বাবধায়ক, عَلَى الْاَرَآئِكِ সিংহাসনের উপর থেকে, يَنْظُرُوْنَ অবলোকন করবে, هَلْ ثُوِّبَ বদলা পেয়েছে তো? مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ যা কর্মকাণ্ড তারা করত।

শানে নুযূল

মুফাস্‌সির আলূসী, কুরতুবী, রাযী প্রমুখের মতে হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবাদের একটি জামাত কাফের ও মুনাফেকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা এরূপ উপহাসমূলক আচরণ করছিল। আবূ জাহেল, ওলীদ ইব্‌নে মুগীরা, আস ইব্‌নে ওয়ায়েল উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (রূহুল মাআনী- ৭/৬৩০) হযরত বেলাল, সুহায়েব রূমী এবং আম্মার ইব্‌নে ইয়াসেরসহ বিভিন্ন সাহাবীকে তারা উপহাসের পাত্র মনে করত। এরই প্রতিবাদে উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (কাবীর- ৩/৮৮৯)

ভাবার্থ

হাশরের ময়দানে কাফেরদের অবস্থা হবে খুবই দুঃখজনক। তারা হবে উপহাসের পাত্র। কেননা, তারা দুনিয়াতে মু'মিনদেরকে উপহাস করত, তিরস্কার করত। মু'মিনগণ যখন তাদের নিকট দিয়ে চলা ফেরা করত, তখন তারা পরস্পরে চোখে টিপ্পনি মারত, আর পরিবার পরিজনের নিকট গিয়েও মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসাহাসি এবং সমালোচনায় লিপ্ত হত। তারা মু'মিনদের দেখলেই বলতো এরা তো একেবারেই বোকা এবং পথভ্রষ্ট। অথচ এরূপ আচরণ কাফেরদের জন্য মোটেই সমীচীন ছিল না।

www.maktabatulabrar.com

কারণ, একদিকে তাদের এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন, অপরদিকে তাদেরকে মু'মিনদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা হয়নি। তাদের এহেন আচরণ এবং অনধিকার চর্চার পরিণাম এই যে, আজ ময়দানে হাশরে তাদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক এবং শোচনীয়। আজ তারা মু'মিনদের নিকট হাসির পাত্র। তাই মু'মিনগণ সুসজ্জিত সম্মানজনক সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে কাফেরদের অবস্থা অবলোকন করছে এবং বলছে, আজ তোমরা তোমাদের কর্মফল হাতে নাতে পেয়েছো তো?

যোগসূত্র

(ক) ইতিপূর্বের আয়াতে জান্নাতের নেয়ামত এবং ভোগসামগ্রীকে প্রতিযোগিতার বস্তু আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ কারণেই নেককার লোকেরা এগুলো অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে। কিন্তু কাফেররা এ সমস্ত নেয়ামত লাভ করে সৌভাগ্যশীল হতে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এর কী কারণ? আলোচ্য আয়াতসমূহে ঐ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) ইতিপূর্বের আয়াতসমূহে 'আবরার' অর্থাৎ, নেককারদের আদব-আখলাক এবং গুণাবলি ও তাদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে পাপাচারী এবং অপরাধী-দের হঠকারিতা, কপটতা এবং তাদের অশুভ পরিণামের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এতে রয়েছে অপরাধীদের প্রতি হুশিয়ারী এবং সতর্কবাণী, আর মু'মিনদেরকে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা।

তাফসীর

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের হঠকারিতা এবং ময়দানে হাশরে তাদের দুঃজনক পরিণামের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো- হাসাহাসি, টিপ্পনি, সমালোচনার আসর, অসার মন্তব্য ও অনধিকার চর্চা। এর এক একটি কারণই ভয়াবহ পরিণামের জন্য যথেষ্ট। এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে পাঁচটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ **(নিশ্চয়ই অপরাধীরা মু'মিনদের সাথে উপহাস করত।)**

হাদীছে পাকে বলা হয়েছে, বান্দার ভাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হেসে থাকেন। যে কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে অতঃপর ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়, সে জান্নাতী হয়ে যায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক হেসে থাকেন। (বোখারী শরীফ) সর্বশেষে যে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর আযাবের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান রব্বুল আলামীনের হাসির কথা বোখারী মুসলিমসহ হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম শরীফ) স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতেন- এরূপ বহু প্রমাণ বিশুদ্ধ সূত্রে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কখনো অট্টহাসি হাসতেন না এবং এরূপ হাসতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এরূপ হাসি একদিকে যেমন উদাসীনতা এবং বিবেকহীনতার পরিচায়ক, তেমনি অন্তরের অসারতারও বড় কারণ। যাদের অন্তরে ময়দানে হাশরের, কবরের ও জাহান্নামের অবস্থার অনুভূতি আছে, তারা কি কখনও হাসতে পারে? এ

কারণেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে থাকতেন, 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে কখনও হাসতে না।' পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা কাঁদবে বেশী বেশী, হাসবে কম।' এমতাবস্থায় কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উপহাস করে হাসাহসি করা যে কত বড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এভাবে হাসাহাসি করাই অপরাধ। এ তো বান্দার হকও নষ্ট হয় বটে। সুতরাং এটা শরীয়তসম্মত হবে কেমন করে? ইয়াহুদী খ্রিষ্টান এবং মুশরিকসহ সকলের মতাদর্শেই এরূপ আচরণ জঘন্য অপরাধ। এই ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেররা জঘন্য এ অপরাধে লিপ্ত ছিল।

وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ **(যখন তারা তাদের নিকট দিয়ে গমন করত, তখন তারা পরস্পর চোখে টিপ্পনি মারত।)**

ইশারা ইঙ্গিতে এবং চোখের টিপ্পনিতে কারো উপকার করা হলে যেমন পাওয়া যায় সম্মান, তেমনি পাওয়া যায় ছওয়াব। ফকীহগণ ইশারা ইঙ্গিতের দ্বারা সম্পন্ন হয়– এমন বহু মাসালা-মাসায়েল ফেকাহের কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এতো হলো উপকার এবং কল্যাণ সাধনের জন্য যদি ইশারা ইঙ্গিত হয় তার কথা। কিন্তু চোখের ইশারা এবং টিপ্পনিতে কারো ইজ্জতের উপর হামলা করা, কারও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা প্রকাশ্য গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। ৩০ নং আয়াতে কাফেরদের এরূপ জঘন্য অপরাধের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা মু'মিনদেরকে চোখের ইশারা ইঙ্গিতেও ভর্ৎসনা করত।

وَ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ **(তারা যখন স্বীয় পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেত তখন হাসা-হাসি করে করে ফিরত।)**

সমালোচনা তো মোটেই প্রশংসার বস্তু নয়। সমালোচনা শিষ্টাচারিতা বর্জিত বলেই ব্যক্তি পর্যায়ে কারও কোন দোষ সম্পর্কে কেউ অবগত হলে সেটা গোপন করাকে মহত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সমালোচনার আসর জমানো মোটেই ভদ্রতা নয়। এতে একদিকে নিজকে অপরাধপ্রবণ করে তোলা হয়, এর সাথে অপরকেও অপরাধের গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে একটি সমাজ পরস্পর আস্থাহীনতা ও ঝগড়া-কলহের মুখোমুখী হয়। কাফেরদের অবস্থা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তাদের সদাসর্বদা তৎপরতা ছিল এরূপ। তারা নিজেরা তো মু'মিনদের সমালোচনা করতই; উঠা-বসা, চলাফেরা, ঘরে-বাইরে, হাটে-বাজারে সর্বাবস্থায় এটা ছিল তাদের একপ্রকার অনিবার্য কাজ। তারা পরিবার পরিজনকে নিয়ে মু'মিনদের সমালোচনার আসর জমাতো। এতে কেবল তাদের নিজেদের অন্তরের জ্বালা নিবৃত করাই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে সমালোচনার এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এটাকে তারা উপায় এবং অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ৩১ নং আলোচ্য আয়াতে তাদের জঘন্য এ অপরাধের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে।

وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ **(যখন তারা মুমিনদেরকে দেখতো তখন বলতো নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।)**

আরবী প্রবাদে বলা হয়, 'মানুষ অপরকে নিজের উপর অনুমান করে।' পাতিলে যা থাকে তা-ই নির্গত করে।' বাতিলপন্থিরা নিজেদেরকে বলে থাকে হকপরায়ণ, আর যারা হকের উপর বিদ্যমান

থাকে তাদেরকে বলে বেড়ায় বাতিলপন্থি। যারা বেদআতে লিপ্ত থাকে, তারা সদা সর্বদা নিজেদেরকে বলে সুন্নী, আর সুন্নীদেরকে বলে বিদআতী। ফলে তাদের কোন দিন তওবাও নছীব হয় না। একই ধারায় কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে থাকত পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত (কুরতুবী–২৬৮/১৯)। মু'মিনদের আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবীপ্রেম, জান্নাতের সামগ্রীর কামনা অর্থাৎ, ইসলাম এবং শরীয়তের অনুশীলন সব কিছুই ছিল তাদের বিবেচনায় বাতুলতা এবং অর্থহীন। তাদের এরূপ উক্তির পিছনে ছিল মূলত দু-ধরনের কারণ। যারা অজ্ঞ এবং মূর্খ ছিল, তারা অজ্ঞতা এবং মূর্খতার কারণে সঠিক বিবেচনা এবং সত্যকে নির্ধারণে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের স্বার্থবাদী নেতৃত্বের অন্ধ অনুকরণ করত, আর যারা জ্ঞানী-গুণী এবং বিবেচক ছিল, তারা নেতৃত্ব, পদমর্যাদা এবং হীনস্বার্থের বশীভূত হয়ে সত্যকে গোপন করে রাখত। ৩২ নং আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এহেন ঘৃন্য হঠকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَ مَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ **(অথচ তারা মু'মিনদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরিত হয়নি।)**

অধিকার চর্চা না করা যেমন দায়িত্বহীনতার প্রতীক, তেমনি অনধিকার চর্চা করা মূর্খতার পরিচায়ক। জ্ঞানের স্বল্পতার ফলে ও চিন্তার গভীরতার অভাবে যে অহংকারী মনোভাব জন্ম নেয় সেখান থেকেই অনধিকার চর্চার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। নিজেকে পরিশোধনে সচেষ্ট না হয়ে বরং নিজেকে পরিপূর্ণ বাতিলপন্থি হওয়া সত্ত্বেও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা, আর যে হকের উপর বিদ্যমান তাকে বাতিলের উপর বিদ্যমান মনে করে তার সংশোধনের প্রয়াস গ্রহণ করা যে নেহায়েত বোকামী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মু'মিনগণ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল, তাঁর কালাম ও হুকুম আহকামে বিশ্বাসী, সে অনুপাতে তাঁরা জীবনযাপন করে, এজন্য মু'মিনগণ হচ্ছে পথভ্রষ্ট গোমরাহ, আর কাফেররা স্রষ্টার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিধানাবলি উপেক্ষা করেও তারা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ, সত্য ও হকের উজ্জ্বল প্রতীক! এরূপ বক্তব্য হাস্যকর নয়তো আর কি? ৩৩নং আয়াতে কাফেরদের এই অনাধিকার চর্চার অপরাধটির কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সারকথা, উপহাস, টিপ্পনি, হাসাহাসি, নিজে পথভ্রষ্ট হয়ে অপরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়া এবং অনধিকার চর্চা করা ইত্যাদি অপরাধসমূহের কারণেই কাফেরদের অন্তর জান্নাত এবং জান্নাতের ভোগ সামগ্রী ও নেয়ামতের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং এসবের জন্য প্রতিযোগিতার তো প্রশ্নই হয় না।

(৪) সূরা ইনশিকাক, মক্কী
২৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١	(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।
وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢	(২) এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর এরূপ করাই সমীচীন হবে।

www.maktabatulabrar.com

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣	(৩) এবং যখন জমিনকে সম্প্রসারণ করা হবে।
وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۝٤	(৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বের করে দিয়ে শূন্যগর্ভ হবে।
وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۝٥	(৫) এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর এরূপ করাই সমীচীন হবে।
يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦	(৬) হে মানব, তোমাকে তোমার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছতে কঠোর সাধনা করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।
فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧	(৭) অতঃপর যার আমলনামা দেয়া হবে তার ডানহাতে,
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨	(৮) অবশ্যই তার হিসাব-নিকাশ হবে সহজতর।
وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩	(৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রশান্ত মনে ফিরে যাবে।
وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠	(১০) আর যার আমলনামা পিছন দিয়ে দেয়া হবে,
فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١	(১১) নিশ্চয় সে সর্বনাশ, সর্বনাশ বলে বলে চিৎকার করবে।
وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢	(১২) এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।
اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣	(১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে বড়ই আনন্দে ছিল।
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤	(১৪) সে ধারণা পোষণ করতো, তাকে কোনদিন ফিরে যেতে হবে না।
بَلٰى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٥	(১৫) হ্যাঁ, ফিরে যেতে হবেই। তার প্রতিপালক তার ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।

শব্দার্থ

اَلسَّمَآءُ আকাশ, انْشَقَّتْ বিদীর্ণ হবে, اَذِنَتْ আদেশ পালন করবে, لِرَبِّهَا তার প্রতিপালকের, حُقَّتْ এরূপ করাই সমীচীন হবে, اَلْاَرْضُ পৃথিবী, مُدَّتْ সম্প্রসারিত করা হবে, اَلْقَتْ বের করবে, مَا فِيْهَا যা তার গর্ভস্থিত, تَخَلَّتْ শূন্য গর্ভ হবে, اِلٰى رَبِّكَ তোমার প্রভু পর্যন্ত পৌঁছতে, فَمُلٰقِيْهِ অতঃপর সাক্ষাৎ করবে, فَاَمَّا مَنْ অতঃপর যাকে, اُوْتِىَ দেয়া হবে, كِتٰبَهٗ তার আমলনামা, بِيَمِيْنِهٖ তার ডানহাতে, يُحَاسَبُ হিসাব নেয়া হবে, يَسِيْرًا সহজতর, يَنْقَلِبُ ফিরে

যাবে, اِلٰۤى اَهْلِهٖ তার পরিবার পরিজনের নিকট, مَسْرُوْرًا প্রশান্ত মনে, وَرَآءَ পিছনে, ظَهْرِهٖ তার পিঠে, يَدْعُوْا চিৎকার করে করে বলবে, ثُبُوْرًا সর্বনাশ, يَصْلٰى প্রবেশ করবে, سَعِيْرًا জ্বলন্ত আগুনে, ظَنَّ ধারণা পোষণ করত, اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ সে কখনই ফিরে যাবে না, بَلٰى হ্যাঁ ফিরে যাবে, اِنَّ رَبَّهٗ নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক, كَانَ بِهٖ তার ব্যাপারে আছেন, بَصِيْرًا সম্যক দ্রষ্টা।

ভাবার্থ

দ্বিতীয় ফুৎকারের মাধ্যমে যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেয়ামত কার্যকর করার ইচ্ছা পোষণ করবেন, তখন আকাশ তার নির্দেশে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং উপর থেকে মেঘের আরোহী হয়ে অসংখ্য ফেরেশতা অবতরণ করবে। তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করবে। ঠিক ঐ মুহূর্তেই পৃথিবীকে রাবার এবং চামড়ার ন্যায় টেনে লম্বা ও প্রসারিত করা হবে, কারণ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সমস্ত আত্মা এবং মৃত্যুদেহকে বের করে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে, তাই পৃথিবীর বর্তমান পরিধিতে সংকুলান হবে না। এসব কিছুই করা হবে হাশরের ময়দানে, যখন সকলে সেখানে সমবেত হবে। তখন তারা তাদের ছোট বড় সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করবে। এদিকে আলোকপাত করেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মানুষ, তোমরা বস্তুজগতে সর্বদা থাকার জন্য আসনি। একদিন অবশ্যই তোমাদেরকে এই ক্ষণস্থায়ী জগত ছেড়ে যেতে হবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে হবে, ক্লেশ-যাতনা এবং কষ্ট সহ্য করতে হবে। তোমরা অনেকে এরূপ করে যাচ্ছও বটে; তবে এ ব্যাপারে অনেকেই উদাসীন, তাই তারা পাপচারিতায় লিপ্ত। হ্যাঁ, যারা স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সচেতন, তারা সৎ কর্মপরায়ণ, তারা প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ পাক এই উভয় প্রকার লোকের কর্মকাণ্ড সম্বলিত আমলনামা তৈরি করে তার সংরক্ষণ করেছেন। হাশরের ময়দানে বিচারের মুহূর্তে ন্যায় পরায়ণদের আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে এবং অতিস্বল্প সময়ে সহজতরভাবে হিসাব গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর তারা তাদের আপনজনের সাথে মিলিত হয়ে চিরসুখী এবং সৌভাগ্যশীল হবে। আর পাপাচারীদের আমলনামা বামহাতে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় তারা হায় হায় সর্বনাশ সর্বনাশ, বলে চিৎকার করতে থাকবে। কিন্তু এতে তাদের মুক্তির কোন উপায় হবে না। তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। কারণ, তারা পার্থিব জগতে পাপাচারিতায় লিপ্ত ছিল, পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মহানন্দে বিভোর ছিল। আখেরাত, হাশরের ময়দান, বিচারাদালত তাদের নিকট ছিল বাতুলতা এবং ভিত্তিহীন কাহিনী মাত্র। তাদেরকে পুনর্জীবিত হতে হবে, তাদেরকে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে, ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে, এরপর পুরস্কার লাভে ধন্য হবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে– এরূপ ধারণা তাদের অনেকেরই ছিল না। আজ পিছন দিয়ে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ধারণার ভ্রান্তির অবসান হয়েছে। ফলে তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ হওয়া।

www.maktabatulabrar.com

যোগসূত্র

পূর্বের সাথে এ সূরার যোগসূত্র সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন। যথা:

(ক) মুফাস্‌সির সুয়ূতীর মতে পূর্বের সূরাটিতে হিসাব-নিকাশের জন্য লোকদের হাশরের ময়দানে মহান রব্বুল আলামীনের আদালতে হাজির হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর আলোচ্য সূরাটিতে হাজিরীর পর হিসাব-নিকাশের আমলনামা পেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী–৬৭/৩০)

(খ) যোগসূত্র সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে তিনটি সূরা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যথা সূরা ইনফিতারে ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড এবং আমল সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী সূরা মুতাফফিনের মধ্যে আমলনামাকে ইল্লিয়্যীন এবং সিজ্জীনে সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরা ইনশিকাকে হাশরের ময়দানে মহান রব্বুল আলামীনের আদালতে আমলনামা পেশ করার বিষয়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শুধু এতটুকুর মধ্যেই সূরাসমূহের যোগসূত্র সীমিত নয়। বরং এ সমস্ত সূরার মধ্যে যেহেতু কেয়ামতের অবস্থা এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বহু বিষয় বিদ্যমান রয়েছে, তাই নানাবিধ যোগসূত্রে সূরাসমূহ পরস্পর সম্পৃক্ত।

সূরা পরিচিতি

সূরাটির প্রথম আয়াতের দ্বিতীয় শব্দের অনুকরণে সূরাটির 'ইনশিকাক' নামকরণ করা হয়েছে, এতে রয়েছে সর্বমোট পঁচিশটি আয়াত। সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত ইবনে যুবায়ের সহ সাহাবা এবং তাবেয়ী থেকেও সূরাটি মক্কী হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়।

তাফসীর

জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জীবনের দর্শন

বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মেয়াদে কর্মচারী এবং অফিসারদের বিদেশে পাঠানোর সরকারী প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদেরকে বিদেশ পাঠানো থেকে শুরু করে বিদেশে অবস্থান, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থাপনা স্বয়ং সরকার করে থাকে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই করে থাকে। মেয়াদ শেষ হলে সরকারী নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে স্বদেশে ফিরতে হয় এবং অবশ্যই ফিরতে হয় এবং নির্ধারিত তারিখে সময় মতো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট হাজির হয়ে বিদেশ থাকাকালীন কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ দিতে হয়। সরকারের নিকটও তার কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি সব কিছু তথ্য সংরক্ষিত থাকে। তারা হিসাব-নিকাশে উত্তীর্ণ হতে পারলে এবং সফল সাব্যস্ত হলে তাদের চাকরী বহাল থাকে, প্রমোশন লাভ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পদমর্যাদার অধিকারী হতে পারে। আর যদি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের প্রচেষ্টার অবহেলা না থাকলে তারা ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ব্যর্থতার কারণ যদি অবহেলা, স্বার্থপরতা এবং কর্তব্যহীনতা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কেবল চাকরী, প্রমোশন, সুযোগ-সুবিধা এবং পদমর্যাদা থেকেই তারা বঞ্চিত হবে না, বরং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চরম ও পরম শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ

www.maktabatulabrar.com

করতে হবে। ঠিক তেমনি মানুষ স্বদেশ থেকে বিদেশরূপ পৃথিবীর বুকে এসেছে। এই আগমন তাদের স্বেচ্ছায় নয়, বরং সমস্ত সরকারের প্রধান, সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীন বিশেষ এক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন সমস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসহ সমস্ত সৃষ্টি মানুষের সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনারই প্রতীক। তিনি মানুষের মধ্যে রূহ এবং আত্মার সংযোজন করে তাদের শরীরকে সুঠাম ও সুন্দর প্রক্রিয়াশীল করেছেন। তাদের দেহকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে শোভনীয় ও মনোরম করেছেন। তাদেরকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দান করেছেন। চলাফেরার জন্য পা দিয়েছেন, ধরার জন্য হাত দিয়েছেন। আরো রকমারী উপকরণে স্বনির্ভর করে নির্ধারিত মেয়াদে উৎকর্ষ সাধন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠিয়েছেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্বীয় ব্যবস্থাপনায় স্বদেশ তথা পরকালে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ জারী করবেন। একদিন সমগ্র পৃথিবী মঞ্চই শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসবে। সেদিন নির্ধারিত তারিখ আসবে। হিসাব-নিকাশের জন্য তলব হবে এবং হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হবে। কারো হবে চরম ও পরম শান্তি এবং মর্যাদার ফলাফল। আর কারো হবে চরম ও পরম শান্তি এবং অমর্যাদার ফলাফল। এতে অযৌক্তিকতার কিছুই নেই। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সব বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।)

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৃথিবীর কার্যকাল শেষ হলে এই পৃথিবীকে ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং নতুন কার্যকাল শুরু হবে। এর জন্যই আসমান আল্লাহর নির্দেশে বিদীর্ণ হবে। আসমান ফেটে যাওয়ায় আল্লাহর কুদরাতের প্রকাশ পাবে। সাবী, অগ্নিপূজক এবং হিন্দুসহ যারা আসমান, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্যসহ সৃষ্টির পূজা-পাট করে থাকে, তাদের আকীদা বিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রকাশিত হবে। যখন আসমান ফেটে যাবে এবং চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়বে, তখন এ সব বস্তুর আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং আনুগত্যশীল হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১–২ নং আয়াতে এসব বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (এবং যখন যমীনকে প্রশস্ত করা হবে।)

আসমানের অবস্থা বর্ণনার পর যমীনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যমীনকে প্রশস্ত করা হবে। এখন মানুষ এবং সৃষ্টির অবস্থানের সুবিধার্থে যমিনকে যেরূপ গোলাকার করে রাখা হয়েছে, যমীনের এ অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে। কোন গোলাকার বস্তুকে খুলে দিলে এমনিতেও তা প্রশস্ত হয়ে যায়। আর এখানে আল্লাহ পাক স্বেচ্ছায় যমীনকে প্রশস্ত করে দিবেন। এর ফলে যমীনের উপর বিদ্যমান পাহাড় পর্বত, বৃক্ষলতা সবকিছুই উৎপাটিত হয়ে যাবে। এজন্যই মুফাস্‌সির জাহ্‌হাক বলেন, যমীনে বিদ্যমান পাহাড়-পর্বত ও ছোট বড় টিলাসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যমীনকে সমান ও প্রশস্ত করা হবে। ফলে যমীন সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। ইমাম রাযী এবং কুরতুবীও (কুরতুবী– ২৭০/২৯) এরূপ অর্থ করেছেন। মুফাস্‌সির মুকাতিল বলেন, 'চামড়ার মত টেনে যমীনকে প্রশস্ত করা হবে।' যেহেতু কোন বস্তুকে টেনে লম্বা করা হলে সেই বস্তুতে বিদ্যমান অন্যান্য বস্তু স্থির থাকে, খসে পড়ে না, তাই উল্লিখিত মত এবং পরবর্তী মতের মধ্যে মোটেই কোন বিরোধ নেই।

যমিন প্রশস্ত হবে কেন? এ সম্বন্ধে হাদীছের বর্ণনার সারমর্ম হলো, হাশরের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টিজীবের সমাগম ঘটায় ভীষণ ভীড় হবে (ইবনে জারীর- ১১৩/৩০), এমন ভীড় হবে যে, একজন মানুষ কোন ক্রমে তার পা দুটো রাখার স্থান পাবে। সুতরাং বর্তমান যমীনের পরিধিতে এত সৃষ্টিজীবের সংকুলান হবে না বিধায় তা প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিবে। ইমাম রাযী এবং মুফাস্সির কুরতুবীও এরূপ কারণ উল্লেখ করেছেন।

وَ اَ لْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ (এবং পৃথিবী গর্ভস্থিত সবকিছু বের করে দিয়ে শূন্যগর্ভ হবে।)

'পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বের করে দিবে' এর দ্বারা ভূগর্ভে গচ্ছিত সহায়-সম্পদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কি-না এ বিষয়ে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে ভূগর্ভের সম্পদকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। মুফাস্সির আলূসী এই মতটি উল্লেখ করেছেন বটে, তবে তিনি অসমর্থনের ভাব পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি মতটির পক্ষে-বিপক্ষে কোন প্রকার মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করেননি। কোন কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দাজ্জালের সময় যমীনে গচ্ছিত সম্পদ বের হয়ে পড়বে, সুতরাং কেয়ামতের সময় অথবা হাশরের সময় যমিনে গচ্ছিত সহায়-সম্পদ বের হওয়ার অবকাশ থাকে না। সম্ভবত ভিন্ন মতের কারণ এটিই। এ মতানুসারে চার নং আয়াতের অর্থ হচ্ছে যমীনকে পাহাড়-পর্বত এবং জীবন্ত সৃষ্টি থেকে শূন্য করা হবে। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, এই যমীনের স্বীয় গোলাকৃতি খুলে দিলে অথবা চামড়ার মত তাকে টেনে প্রশস্ত করা হলে স্বাভাবিকভাবেই তার উপরে স্থিত বস্তু থেকে যমীন শূণ্য হয়ে যাবে। তাহলে এ বিষটিকে পুনরায় বর্ণনা করার উপকারিতা এবং যৌক্তিকতা কী? দাজ্জালের সময় যমীনের গচ্ছিত সহায় সম্পদ অবশ্যই প্রকাশ পাবে, কিন্তু সমস্ত কিছুই প্রকাশ পাবে- এর কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। আর প্রকাশ পেলেও তা পাবে এক সীমিত সময়ের জন্য, অতঃপর পুনরায় তা ভূগর্ভস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং হাদীছের তথ্যের সাথে বিরোধ হয় না মোটেই। বস্তুত যারা অপর একটি মতে বলেছেন যে, চার নং আয়াতের দ্বারা ভূগর্ভের কেবল মৃত দেহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং দাজ্জালের হাদীছকে এর দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, এটাও সঠিক বলে মনে হয় না। এই দ্বিতীয় মতটি হযরত ইব্নে যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের শব্দ এবং বাক্যের দিকে লক্ষ্য করলে চূড়ান্তভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যমীনের উপর স্থিত এবং যমীনের ভূগর্ভে গচ্ছিত সব কিছুকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্যথায় আরবী ما শব্দের ব্যাপক অর্থ এবং القت ও تخلت ব্যবহারের যথাযথ অর্থ প্রকাশ পায় না। অর্থের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করেই মুফাস্সির মাজহারী বলেন, 'যমীন তার ভূগর্ভে গচ্ছিত মণি-মুক্তা, সহায়-সম্পদ এবং মৃত্যু দেহ সব কিছুই বের করে দিবে, কোন কিছুই তার ভিতর বিদ্যমান থাকবে না।' এ সম্পর্কে হযরত ইব্নে ওমরের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সর্বপ্রথম যমীন ফেটে আমার উপর থেকে সরে যাবে এবং প্রকম্পিত হতে থাকবে। আমি কবরে বসা থাকব এবং যমীনকে তার এহেন অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করব। যমীন বলবে, আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ করেছেন, যাতে আমি আমার ভূগর্ভের সব কিছু বের করে শূন্য হয়ে যাই। আমি আমার অবস্থায় বিদ্যমান থেকেই দেখব যমীন গর্ভশূন্য।' অতঃপর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার নং আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, এ হচ্ছে এ আয়াতের মর্ম কথা।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ (হে মানব, তোমাকে তোমার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছতে কঠোর সাধনা করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।)

মানুষ পৃথিবীতে থাকার জন্য আসেনি। অতীতের কেউ থাকেনি, সুতরাং বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও কেউ যে থাকবে না, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে চায় না। মানুষের এই বস্তুজীবন ঐ চলমান পথিকের ন্যায়, যে ট্রেনের কোন বগিতে বসে মনে করে যে, সে স্থির হয়ে বসে আছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি চলন্ত ট্রেনের বগির বাইরে পড়লে বুঝতে সক্ষম হয় যে, সে গন্তব্যস্থলের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এমনিভাবেই মানুষ মনে করে যে, সে যথাস্থলে স্থির আছে এবং স্বীয় কর্মস্থলেই বিদ্যমান রয়েছে, তার আয়ু ক্ষয় হচ্ছে না। অথচ মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে সক্ষম হবে যে, তার জীবন প্রবাহ চলমান। তার হায়াত কমে যাচ্ছে এবং গন্তব্যস্থল আখেরাতের দিকে, মৃত্যুর দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বস্তুজগতে অপরিচিত এবং পথিকের ন্যায় থাক। কারণ, পৃথিবী থাকার জায়গা নয়। সুতরাং এখানে নিজেকে নিমগ্ন করা সমীচীন নয়।

পৃথিবী হচ্ছে আখেরাতের কর্মস্থল। কর্ম যেমন হবে, তেমন হবে কর্মফল। নির্ধারিত দিনে হিসাব-নিকাশের পর কর্মফল ভুগতে হবে। যদি কর্মকাণ্ড ভাল হয়, তাহলে ফল হবে ভাল। আর কর্মকাণ্ড মন্দ হলে পরিণাম হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে এসব শ্রেণির মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের যে সংক্ষিপ্তসার কথা আমি বর্ণনা করলাম, অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত এটাই। কিন্তু এখানে আরও কিছু মতামত পাওয়া যায়। যথা:-

(ক) এই আয়াতে 'ইনসান' দ্বারা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, বলা হয়েছে যে, হে নবী, তুমি দাওয়াত-তাবলীগ এবং তালীম-তরবিয়তের জন্য যে মেহনত মুজাহাদা ও পরিশ্রম করছ তা বৃথা যাবে না। এর যথাযথ প্রতিফল দেয়া হবে। এ সম্পর্কে মুফাস্সির আলূসী বলেন, যারা বলে যে, এখানে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং দাওয়াত-তাবলীগ ও উম্মতকে তালীমের জন্য পরিশ্রম ও কাফেরদের নির্যাতন সহ্যের কারণে বিশ্বনবীকে উপযুক্ত ফলাফলের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাদের বক্তব্য নিতান্ত অনর্থক, আয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

(খ) কারও কারও মতে এই আয়াতে উবাই ইব্নে খল্ফ এবং আসওয়াদ ইব্নে হেলাল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই মতটি সাহাবী হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এবং মুফাস্সির মুকাতিল থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্সির মুকাতিল বলেন, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবী ইবনে আবী সালামার সাথে তার ভাই আসওয়াদ ইব্নে হেলাল মাখযূমীর তর্ক-বিতর্ক হয়। মাখযূমী বলে, তখন যমীন আসমান এবং মানুষের অবস্থা কী হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তাফসীরের বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেন, শানে নুযূল কোন ব্যক্তি ভিত্তিক হতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তু ব্যক্তি ভিত্তিক হওয়া জরুরী নয়।

(গ) কারও কারও মতে এখানে কাফের এবং মু'মিন গোনাহগারদেরকে তাদের পাপাচারিতা এবং পূর্বসূরিদের অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণের ব্যাপারে সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যাতে তারা তাদের

www.maktabatulabrar.com

কর্মকাণ্ডে সজাগ-সতর্ক হয়, চিন্তা–ভাবনা করে। কিন্তু সাত এবং এগারো নং আলোচ্য আয়াতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে এ মতামতের অসারতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, সাত নং আয়াতে যে নেককারদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, নেককারগণও 'ইনসান' (মানুষ) শব্দের আওতাভুক্ত।

(ঘ) এখানে সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মানুষ ভাল হোক অথবা পাপাচারী হোক, মুসলমান হোক অথবা বিধর্মী হোক সকলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ, তোমরা এরূপ ধারণা করো না যে, তোমরা পৃথিবীতে থেকে যাবে; তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে না। এরূপ ধারণা পোষণ করা নিতান্ত মূর্খতা এবং ভুল হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর মহান দরবারে হাজির হতে হবে, হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে। তোমরা মূলত পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে আল্লাহ পাকের দিকেই অগ্রসর হচ্ছ। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে এবং গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। রাত এবং দিন মানুষের জীবনের দুটি পায়ের মতো, এই দুই পায়ের মাধ্যমে মানুষ বাধ্যগতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। মাতৃগর্ভে মানুষ বিভিন্ন আকৃতিতে অবস্থান করে। অতঃপর অবুঝ শিশু হয়ে পৃথিবীতে তার আগমন হয়। শিশুকাল পার হয়ে যৌবনকালে উপনীত হয়। এ স্টেশন পার হয়ে বৃদ্ধকালে পদার্পণ করে। এরপর হয় তার মৃত্যু। এভাবেই সে স্বীয় সফর সমাপ্ত করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। অবশেষে মহান আল্লাহর আদালতে দাঁড়াতে হয়। এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের মূলকথা এবং তত্ত্ব ও রহস্য। আরবী 'কাদহুন' -এর অর্থ মেহনত-মুজাহাদা এবং প্রচেষ্টা। মানুষ তার জীবনে কত শ্রম-পরিশ্রম করছে, এর মধ্যে দিয়েই সে আল্লাহ পাকের আদালত এবং দরবারের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) 'কাদহান'-এর অর্থ করেছেন ফিরে যাওয়া। সেমতে যারা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত 'উতিয়া কিতাবাহু'-এর অর্থ করেছেন 'আমলনামা লাভ করেছে,' সে অর্থের অবকাশ আছে। তবে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজিরীর অর্থ এবং ফলাফল লাভের বিষয়টি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অর্থে পরবর্তী আয়াতের সাথেও গভীর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।

اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ . فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا **(অতঃপর যার আমলনামা দেয়া হবে তার ডান হাতে, তার হিসাব-নিকাশ হবে সহজতর।)**

শানে নুযূল

কারও কারও মতে এ আয়াতটি মক্কা থেকে মদীনায় প্রথম হিজরতকারী আবূ সালামা ইবনে আবূ আসাদের শানে নাযেল হয়। তবে অর্থের প্রশ্নে এতে ব্যাপকতা রয়েছে।

তাফসীর

ধন্য এবং সৌভাগ্যশীল তারা, যারা ডান হাতে আমলনামা নিয়ে আল্লাহ পাকের আদালতে হাজির হবে। কারণ, একদিকে এটাই তাদের নাজাত তথা মুক্তির সনদ হবে, অপর দিকে তাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই। যা-ও হবে তা খুবই সামান্য এবং অতি সহজভাবে। সহজ হিসাবের অর্থ হচ্ছে عرض তথা শুধু পেশ করা, কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করা।

এ আয়াতে সহজ হিসাবের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে কঠিন তথা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের

www.maktabatulabrar.com

কথা বলা হয়েছে। এ থেকে দু ধরনের হিসাব হবে বলে প্রমাণিত হয়। নিম্নে এই দু-ধরনের হিসাব সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হল।

হিসাবের প্রকারভেদ

ময়দানে হাশরে দু'ভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে

(ক) ছোট-বড় সমস্ত পাপ কাজ সম্পর্কে পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, নাফরমানী এবং পাপাচারিতার পুঙ্খনাপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করা হবে। হাদীছে পাকে এরূপ হিসাবকে 'মুনাকাশা' বলা হয়েছে। যাদের থেকে এরূপ হিসাব গ্রহণ করা হবে, তাদের মুক্তির কোন উপায় থাকবে না, তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

(খ) আরেক ধরনের হিসাব হচ্ছে তথা শুধু পেশ করা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাকের সম্মুখে বান্দার আমলনামা শুধু পেশ করা হবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দার গোনাহসমূহ পরিদর্শন করবেন, কিন্তু গোনাহ-খাতার জন্য কারণ দর্শাতে বলবেন না, বরং নেক আমলের উপর ছাওয়াব দান করবেন আর গোনাহ-খাতা ক্ষমা করে দিবেন। এটা হল সহজ হিসাব। বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদসহ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من حوسب عذب .

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই আযাবে আক্রান্ত হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করেন, আল্লাহ পাক 'সহজ করে হিসাব গ্রহণ করবেন,' বলেননি কি? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করেন,

وذالك العرض .

অর্থাৎ, সে তো হিসাব নয়, বরং শুধু পেশ করা মাত্র। যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই আযাবে আক্রান্ত হবে।

যে আমল দ্বারা হিসাব সহজ হবে

(ক) যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করা হবে তার রক্ষা নেই। আর যার হিসাব হবে সহজ অর্থাৎ, কেবল 'আরয' তথা শুধু পেশ করার পর্যায়ে, সে অত্যন্ত সৌভাগ্যশীল। এ জন্য রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সহজ হিসাবের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও নামাযের পর সহজ সরল হিসাবের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের পর এই দোয়া পড়তে শুনেছি– হে আল্লাহ, আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করুন। (ইবনে কাছীর– ৪৮৯/৪)

(খ) যারা আল্লাহ পাকের প্রতিপালনের স্বীকৃতি দেয়, হকের উপর দৃঢ়পদ হয়, মাতা-পিতার হক আদায় করে, নেক আমল করে এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞশীল থাকে, আল্লাহ পাক তাদের হিসাব-নিকাশ সহজ করেন। তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে নেক আমলের যথাযথ ছওয়াব প্রদান করেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاٰتِهِمْ .

আমি এমন লোকদের ভাল কাজসমূহ কবূল করি এবং অপকর্মসমূহ ক্ষমা করি।

أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ . فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا. وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا **(আর যার আমলনামা পিছন দিয়ে দেয়া হবে, সে সর্বনাশ, সর্বনাশ বলে বলে চিৎকার করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।)**

তাফসীর

যারা পাপাচারী তাদের আমলনামা বামহাতে এবং পিছন দিক থেকে দেয়া হবে। এটাই হবে তাদের জাহান্নামী হওয়ার নিদর্শন, যা তারা অতি সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে। তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠোর। ছোট-বড় সমস্ত গোনাহ্‌র বিস্তারিত হিসাব গ্রহণ করা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, কিন্তু তাদের কোন উত্তর দেয়ার থাকবে না, হতভম্ব এবং নতশীর হয়ে থাকবে। চরম অপমান এবং লাঞ্ছনা-বঞ্চনা দেখা দিবে। এমতাবস্থায় হায় হায় করে চিৎকার করবে এবং সবাই মাটি হয়ে যাওয়ার কামনা করবে। কিন্তু তাও সম্ভব হবে না। বরং তাদেরকে বন্দী করে জাহান্নামে দাখিল করা হবে।

বামহাতে আমলনামা প্রদানের কারণসমূহ

(ক) প্রথম কারণ হলো, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে– তারা এটা বিশ্বাস করত না। তাদের অনেকের ধারণা ছিল মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, আর কবরের মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করছেন। আর এসব কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের জন্য মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং তাতে তিনি সক্ষম। কেয়ামতের ময়দানে তা বাস্তব হয়ে প্রকাশ পাবে।

(খ) দ্বিতীয় কারণ হলো, তারা বস্তুজগতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভোগ-বিলাসিতায় নিমগ্ন ছিল। আনন্দ-উল্লাসে বসবাস করত; গানবাদ্য, নাচ, তামাশা ছিল তাদের জীবনের কর্মকাণ্ড, আখেরাতের কথা তাদের নিকট ছিল বাতুলতা এবং নিতান্ত বোকামী। এক কথায় পরিণাম সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾	(১৬) আমি শপথ করছি সন্ধ্যাকালীন লালবর্ণ আকাশের।
وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾	(১৭) এবং শপথ রাতের, আর রাত্রি যা কিছুর সমাবেশ ঘটায়।
وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾	(১৮) এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণতা লাভ করে।
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾	(১৯) নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবেই।

www.maktabatulabrar.com

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾	(২০) তাদের হলো কি যে, তারা ঈমান আনে না!
وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ السجدة	(২১) যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তারা সাজদা করে না।

শব্দার্থ

فَلَآ أُقْسِمُ আমি শপথ করছি, بِالشَّفَقِ লালবর্ণ আকাশের, وَمَاوَسَقَ এবং যা কিছুর সমাবেশ ঘটায়, وَالْقَمَرِ এবং (শপথ করছি) চন্দ্রের, لَتَرْكَبُنَّ আরোহণ করবেই, اِذَا যখন তা পূর্ণতা লাভ করে, طَبَقًا ধাপে ধাপে, عَنْ طَبَقٍ যে তারা ঈমান আনে না, وَاِذَا قُرِئَ যখন পাঠ করা হয়, عَلَيْهِمْ তাদের সম্মুখে, لَا يَسْجُدُوْنَ তারা সাজদা করে না।

ভাবার্থ

সন্ধ্যাকালীন লালবর্ণ আকাশ, রাতের আঁধার এবং পূর্ণিমার চাঁদের শপথ করে বলছি, মানুষ ধাপে ধাপে তার জীবনের সোপানগুলো অতিক্রম করে একদিন অবশ্যই আমার দরবারে হাজির হবেই এবং আমার আদালতে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব প্রদানে বাধ্য হবেই। যারা আমার প্রতি ঈমান স্থাপনে বিরত রয়েছে এবং পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ভয়াবহ। আর যারা আমার প্রতি ঈমান স্থাপনে সমর্থ হয়েছে এবং নেক আমলে ব্রতী হয়েছে, তাদের পরিণাম হবে খুবই নিরাপদ ও শান্তিময়। অতীব দুঃখের বিষয় যে, কাফেররা এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও কেন আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে না। তারা যাতে আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে এবং তাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে, সেজন্য আমি বিশ্বনবীকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁর প্রতি চিরন্তন বাণী পবিত্র কুরআন নাযেল করেছি। এতে মানবকল্যাণ ও মুক্তির সব বিষয় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এতে মনোনিবেশ করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন এবং সৎকর্ম করার পথ সুগম হয়। কিন্তু কাফেররা এর প্রতি আনুগত্য এবং সমর্থন পরিহার করে বিরোধ পোষণ করে যাচ্ছে। এমনকি তাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন পাঠ করা হলে, পবিত্র কুরআনের হুকুম-আহকাম তুলে ধরা হলে আনুগত্যের স্থলে তারা বিদ্রোহিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং মিথ্যা বলে প্রত্যাখান করে। তারা কি ভাবছে, আমি তাদের ব্যাপারে অবগত নই? না-না, আমি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত এবং স্বয়ং অবলোকন করছি। তাদের অস্বীকার ও বৈরিতা তাদের জন্য হবে কঠোর এবং বেদনাদায়ক আযাবের কারণ। হ্যাঁ, যদি তারা এরপরও তওবা করে নেয় এবং আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে তাদের তওবা গ্রহণ করা হবে এবং ঈমান স্থাপন ও নেক আমলের যথাযথ প্রতিদান তাদেরকে প্রদান করা হবে। কেননা, আমার বিধান ও নীতি হলো, যারা ঈমান স্থাপন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাদেরকে আমি দান করি অনন্ত ও অফুরন্ত পুরস্কার। তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত এবং অফুরন্ত পুরস্কার।

যোগসূত্র

ইতিপূর্বের আয়াতসমূহে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি অথবা পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের নিকট এসব বিষয় অবোধগম্য, তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক এসবের যথার্থতা সম্বন্ধে বর্ণনা পেশ করেছেন।

তাফসীর

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ **(আমি শপথ করছি সন্ধ্যাকালীন লালবর্ণ আকাশের।)**

কোন বিষয়ে শ্রোতাদের সংশয়-সন্দেহ দেখা দিলে শপথের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে জোরালো করে দেখানোর নীতি সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে আরব জাতির মধ্যে শপথের গুরুত্ব ছিল প্রচুর। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিভিন্ন বিষয় বলার সময় শপথ করে বলে থাকেন। সেমতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ভাল-মন্দ প্রতিফল লাভ সম্বন্ধে কাফেরদের সংশয়-সন্দেহ দুরীভূতকরণের তাগিদে আল্লাহ পাক তিনটি বিষয়ে শপথ করে বলেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হিসাব নিকাশ, শাস্তি এবং পুরস্কারের বিষয়ে যদি সংশয়-সন্দেহ থাকে, তোমাদের বুঝে না আসে, অথবা তোমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার আওতা বহির্ভূত মনে হয়, তাহলে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর। যদি স্বাভাবিকভাবে বলার দ্বারা তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে আমি শপথ করে বলছি।

شفق -এর অর্থ

شفق (শাফাক)-এর অভিধানগত অর্থ হচ্ছে নরম ও কোমল। আরবী ভাষায় দিলের নম্রতার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শরীয়তগত অর্থ সম্পর্কে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

(ক) ইমাম রাযী বলেন, اتفق العلماء على انه اسم للاثر الباقى من الشمس فى الافق بعد غروبها অর্থাৎ, সূর্য অস্তের পরক্ষণে আকাশে বিদ্যমান লাল বর্ণকে সর্বসম্মতভাবে শাফাক বলা হয়। (কাবীর- ৩৬২/৮) হযরত ইব্নে উমর, ইব্নে আব্বাস, শাদ্দাদ, উবাদা, মাকহুল, তাউস, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ছাওরী, ইব্নে আবী লায়লা, ইসহাক, দাউদ এবং বিশিষ্ট আভিধানিকরাও এরূপ মত পোষণ করেন বলে আল্লামা খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন। মুফাসসির কুরতুবীর মতে হযরত আলী, মুআয ইব্নে জাবাল, আবূ হুরায়রা, ইব্নে মাসউদ, আবূ কাতাদা, জাবের, ইব্নে যুবায়ের, সাঈদ, যুহ্রী, আওযায়ী, আবূ ছাওর, আবূ উবায়েদ প্রমুখের মত এরূপই। (কুরতুবী- ২৭৪/১৯) মুফাস্সির রাযীর বর্ণনা মতে কাল্বী, মুকাতিল, লাইছ ও মুজাজের মতও এটাই।

(খ) মুফাস্সির মাজহারী বলেন, البيضاء بعد الحمرة অর্থাৎ, সূর্য অস্তের পরক্ষণে আকাশে বিদ্যমান লালবর্ণ শেষ হওয়ার পর যে সাদা বর্ণ দেখা দেয় তাকে 'শাফাক' বলে। (মাজহারী- ২৩০/১০) এই মতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, মুআয, আয়েশা, আবূ হুরায়রা, ইব্নে আব্বাস, আনাস, ইব্নে যুবায়ের, উবাই, ওমর ইব্নে আব্দুল আযীয, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালেক, ইবনুল মুবারক, যুফার, আবূ ছাওর, মুযানী, ইবনুল মুনজির, খাত্তাবী, মুবাররাদ, ফার্রা, ছা'লাবা, আবূ আমর, আবুল আব্বাস প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুস সুনান- ১৪/২)

www.maktabatulabrar.com

(গ) হযরত আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ. বলেন, الشفق بين الحمرة والبياض অর্থাৎ, পুরা লাল বর্ণও না এবং পূর্ণ সাদা বর্ণও না, বরং মধ্যম অবস্থাকে 'শাফাক' বলা হয়। (ফয়যুল বারী-৩১৩১/২)

আল্লামা খাত্তাবী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শরহে মাআলিমুস সুনানয়ে বলেন,

وقال بعضهم الشفق اسم للحمرة والياض معا الاانه يطلق فى احمر ليس بقان والبيض ليس بنافع .

অর্থাৎ, অনেকের মতে শাফাক শব্দটি লাল এবং সাদা বর্ণ উভয়কেই বুঝায়, তবে নিরেট সাদা বর্ণকে বোঝায় না, বরং মধ্যবর্তী অবস্থাকে বুঝায়। (মাআলিমুস সুনান- ১২৫/১)

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, শাফাক-এর শরীয়তগত অর্থে সাহাবা, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং আভিধানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং মুফাস্সির রাযীর 'ক' এ উল্লিখিত ঐক্যমতের দাবী বোধগম্য নয়।

شفق কথা দিয়ে শপথের তাৎপর্য

শাফাক-এর অর্থ যাই হোক, শাফাকের শপথ গ্রহণ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর রহস্যময়। নিম্নে এ পর্যায়ে দুটি বিষয় তুলে ধরা হল।

(১) শাফাকের শপথ মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, মানুষের রূহ বা আত্মা সূর্যতুল্য। সূর্য অস্ত হলে যেমন দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় এবং রাতের কার্যক্রম আরম্ভ হয়, তেমনি মৃত দেহের সূর্যতুল্য আত্মার অস্ত সাধিত হলে দেহের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে নতুন কার্যক্রম শুরু হয়। সূর্য অস্তের পর আসে শাফাকের মুহূর্ত। এ মুহূর্ত না হয় দিবসের মত আলোকময়, না হয় রাতের মত পুরোপুরি অন্ধকারময়। তেমনি মৃত্যু পরবর্তী মুহূর্তটি মৃত ব্যক্তির জন্য না হয় পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতার, না হয় পুরোপুরী সম্পর্কের। কেননা, প্রথম প্রথম আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু ব্যক্তিকে বেশি বেশি স্মরণ করে, মৃত ব্যক্তি এসব কিছু অবলোকন করে এবং অনুভব করে থাকে, অপর পক্ষে আত্মীয়-স্বজন তাকে স্বপ্নেও দেখতে পায়। তবে এ পর্যায়ে পৃথক পরিস্থিতিও বিদ্যমান থাকে, তাই উভয় পক্ষের মিলন, সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বন্ধ থাকে। বস্তুত এ অবস্থার সাথে শাফাকের শপথের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এ শপথ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

(২) শাফাকের মুহূর্তে নূতন কার্যক্রম শুরু হয়। ইব্নে মাজার হাদীছে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু ব্যক্তি কবরে প্রশ্ন উত্তরের মুহূর্তে বলে থাকে, دعونى اصلى 'আমাকে নামায পড়তে অবকাশ দাও।' তিরমিযীর হাদীছে বলা হয়েছে, ارجع الى اهلى فاخبرهم 'আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে অবস্থা সম্পর্কে অবগত করাব।' এ মুহূর্তে যেমন শাফাকের সময় রাত্রের নিদর্শনাবলি প্রকাশ পায়, তেমনি মৃত্যু ব্যক্তির সম্মুখে তার ভাল মন্দ কৃতকর্মের অবস্থা প্রকাশ পায়।

وَ الَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ **(এবং শপথ রাত্রির, আর রাত্রি যা কিছুর সমাবেশ ঘটায়।)**

রাতের শপথের তাৎপর্য

এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা:

(ক) রাতের শপথ এবং রাতের কারণে সমবেত সব কিছুর শপথ।

(খ) রাতের শপথ, যখন সে অন্ধকারে সব কিছুর সমাবেশ ঘটায়। প্রথম অর্থের সাথে মৃত ব্যক্তির অবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কেননা, শাফাকের সময় শেষ হলে অন্ধকার নেমে আসে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রের আঁধারে মানুষ আরামে ঘুমায়। রাতের এ উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাত করেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- لتسكنوا فيها যাতে মানুষ রাতে আরাম করে। কিন্তু চোর-ডাকাত এবং পাপিষ্ঠরা আরামের পরিবর্তে রাতের পরিবেশকে আতংকিত করে তোলে। ফলে এক শ্রেণির লোক স্বীয় কর্মকাণ্ডের কারণে আতংকিত থাকে, শত্রুর ভয়ে শংকিত হয়। ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যু ব্যক্তির দুটি অবস্থা হয়- (১) আত্মীয় স্বজনের আর বেশি মনে পড়ে না, যিয়ারত ও ছওয়াব-রেছানী বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাদের সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটে। (২) নিজের কৃত আমল সম্মুখে আসে এবং মানুষ স্বয়ং নিজে তা প্রত্যক্ষ করে; আমল ভাল হলে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। হাদীছের আলোকে এরূপ লোককে বলা হয় نم كنومة العروس 'বাসরের রাতের মত আনন্দে ঘুমাও।' আর যদি আমল অসৎ হয়, পাপাচারিতা থাকে, তাহলে তার উপর নেমে আসে চরম অশান্তি এবং দুঃখের ছায়া, কষ্টের অন্ধকার।

(গ) রাতের আঁধারে যেমন বিক্ষিপ্ত সব সৃষ্টি আপন স্থলে সমবেত হয়, পশু পক্ষীরাও স্বীয় অবস্থানে একত্রিত হয় এবং সমস্ত কাজকর্মের ফল ভোগ করে, তেমনি মানুষকে একদিন তার জীবন রজনীর শেষে রাতের আঁধারে স্বীয় ঠিকানা কবরে সমবেত হতে হবে এবং স্বীয় কর্মকাণ্ডের ফল ভুগতে হবে। রাত এবং রাতের নিদ্রা তারই প্রতীক। এ কারণেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে আরাম এবং নিদ্রার পূর্বে এই আমল করতে তালীম করেছেন: اللهم باسمك اموت واحى অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই জাগ্রত হই।" জাগ্রত হয়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ পাঠ করতেন-

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। আর একদিন অবশ্যই তার দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

বোখারী মুসলিমসহ হাদীছের কিতাবে এরূপ ভিন্ন ধরনের আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, জাগ্রত এবং নিদ্রার অবস্থা আর বিশেষ করে রাতের বেলায় স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসা এবং ঘুমানোর মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন এ মুহূর্তে তাসবীহ-তাহলীল এবং যিকির-আযকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কারণ, এর মাধ্যমে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, আত্মা আলোকময় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উক্ত শপথে অবস্থারই পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতের দ্বিতীয় অর্থের সারমর্মও এরূপ।

وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ **(এবং শপথ চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণতা লাভ করে।)**

চন্দ্রের শপথের তাৎপর্য

এ আয়াতে পূর্ণিমার চাঁদের শপথ করা হয়েছে। اذا تسق শব্দের অর্থ হচ্ছে- যখন চাঁদ একত্রিত করে অর্থাৎ, আলো একত্রিত করে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। চৌদ্দ তারিখের রাতে চাঁদ এরূপ হয়ে থাকে। এর পূর্বে চাঁদ সরু এবং ধনুকের মত থাকে। ধীরে ধীরে চাঁদটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এমনিভাবে

www.maktabatulabrar.com

মানুষেরও পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ **(নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবেই।)**

তাফসীর

মুফাস্‌সির ইব্‌নে জারীর এবং ইব্‌নে কাছীরের মতানুসারে এ আয়াতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খেতাব করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবেই। এখানে বুঝানো হয়েছে যে,

(ক) হে নবী, যারা আজ কেয়ামত, হাশর-নশর ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করে তোমার বিদ্রোহিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠেছে, তারা অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে, এর মোকাবেলায় তোমার চরম ও পরম বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং তাদের এহেন কর্মকাণ্ডে বিচলিত না হয়ে তুমি তোমার সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রতীক্ষা কর।

(খ) হে নবী, তোমার এবং তোমার সমর্থকদের আজ বড় দুর্দিন। তোমরা কাফের মুশরিকদের নানান রকম নিপীড়ন ও নির্যাতনে জর্জরিত। এ অবস্থার অতি সত্বর অবসান ঘটবে এবং শান্তি ও নিরাপদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে, আর তাদের জীবনে নেমে আসবে চরম বিপর্যয় এবং অশান্তি। সুতরাং তুমি তোমরা আগত অবস্থার প্রতীক্ষায় প্রশান্ত থাক। মুজাহিদ, ইকরামাহ, হাসান, জাহ্‌হাক, আবূ সালেহ, সুদ্দী, আওফী এবং ইসহাক থেকে উপর্যুক্ত অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(গ) হে নবী, তোমার জীবনে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হবে, সপ্তাকাশ অতিক্রম এবং আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত ও নিদর্শনাবলি পরিদর্শনের মাধ্যমে মেরাজ লাভে ধন্য হবে। তুমি এ চূড়ান্ত সুসংবাদ গ্রহণ কর। আবুল আলিয়া, শাফী, মাসরূক এবং সাহাবী ইব্‌নে মাসউদ (রা.) এরূপ মন্তব্য করেছেন। মুফাস্‌সির রাযীর উদ্ধৃতি অনুসারে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ একটা মন্তব্য বর্ণিত আছে।

(ঘ) হে নবী, পর্যায়ক্রমে তোমার জীবনে সফলতা অর্জিত হবে এবং ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে আল্লাহর মহব্বত, নৈকট্য এবং মারেফাত লাভের মেরাজ সাধিত হবে।

এই ১৯ নং আয়াতে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এই মতের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আয়াতের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে যথা:-

(ক) মানবজাতি কেয়ামত, নবুয়ত এবং নবীদের অস্বীকারের ব্যাপারে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, তথা তাদের পূর্বসূরিদের পুরোপুরি অনুসরণ-অনুকরণ করবে। মুফাস্‌সির ইব্‌নে কাছীর আল্লামা সুদ্দীর এই মতটিকে উল্লেখ করে বলেন,

كانه اراد معنى الحديث الصحيح لتركبن سنن كان قبلكم وهذا محتمل .

অর্থাৎ, রসূলে পাকের বিশুদ্ধ হাদীছ, 'তোমরা পূর্বসূরিদের পথ অবশ্যই অনুকরণ-অনুসরণ করবে।' এর দ্বারা এই মতটির অবকাশ সাব্যস্ত হয়।

মুফাস্‌সির আলূসী এরূপ অর্থকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ, এর মধ্যে অবস্থার পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে, আর হাদীছের অর্থে পূর্বসূরিদের অনুকরণ-অনুসরণ বুঝায়। তাই উভয় অর্থে মোটেই সমতা রক্ষা হয় না। কামূসসহ অভিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়- 'তাবাকুন'-এর

অর্থ 'পূর্বের অনুকরণ' আরবী সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কবিতা আবৃত্তি করে হযরত আব্বাস (রা.) 'তাবাকুন'-এর এই অর্থ করেছেন। সম্ভবত অভিধানের অর্থের অবকাশ রয়েছে দেখে মুফাস্‌সির সুদ্দী উপর্যুক্ত অর্থ করেছেন। কিন্তু আয়াতের অর্থ নির্ণয়ে বিশুদ্ধ হাদীছ এবং সাহাবাদের মতামত আছে বিধায় অভিধানের উপর নির্ভর করে ভিন্নমুখী অর্থ গ্রহণ তাফসীরের মূল ধারার পরিপন্থি। আর পরিপন্থি বলেই আল্লামা আলূসী এই অর্থকে অবোধগম্য ও অসামঞ্জস্য বলে মন্তব্য করেছেন।

(খ) মানবজাতি অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে একের পর এক অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং প্রথম অবস্থার তুলনায় পরবর্তী অবস্থা অধিক কঠোরতর হয়ে থাকে। যথা জীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। মৃত্যুর সাকারাত, কবরের প্রশ্নোত্তর, ময়দানে হাশরের ভয়াবহতা ইত্যাদির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেই এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুহাদ্দিছ তীবী এরূপ অর্থ করেছেন এবং যা করেছেন এর অবকাশ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) মানব জীবনের একটি লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে তার জন্মকালের জীবন। জন্মের পর তার খাদ্যের পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতিপূর্বে গর্ভে তার খাদ্য ছিল কেবল রক্ত। খাদ্য গ্রহণের সাধারন রাস্তা পরিহার করে রগের সাহায্যে তাকে খাদ্য সরবরাহ করে মুখমণ্ডলীকে রক্ত খাওয়া থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। ৯/১০ মাস পর পৃথিবীতে আগমনের রাস্তা সুগম করা হয়। এবার তার খাদ্যের পরিবর্তন সাধন করে রক্তের স্থলে জননীর দুধকে খাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। দুনিয়ার প্রশস্ত স্থান ও অনুকূল আবহাওয়ার লালিত-পালিত হয়ে সুঠাম-সুন্দর হয়। দু-বৎসর পাড়ি দিয়ে চলাফেরা কথাবার্তার স্বাদ উপভোগ করে। এ বয়সে জননীর দুধের স্থলে আরো উন্নতমানের পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়। এরপর শুরু হয় শৈশবকালের খেলাধূলা। কিন্তু একটু জ্ঞানবুদ্ধির সূচনা হলেই মাতাপিতা এবং মুরুব্বীগণ তাকে শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও মনুষত্বের পরিপূর্ণতা অর্জনে মনোনিবেশ করায়। যৌবনের একপর্যায়ে তাকে শৈশবকাল ভুলে যেতে হয়। যৌবনের তাড়নায় তাকে এক নুতন জগতের পীড়ার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাকে সংযমশীল হতে হয়। তারপর এক সময় যৌবনকালের শক্তি সাহসের সব কিছুই দুর্বলতা এবং নিষ্ক্রিয়তায় পরিণত হয়। মানব জীবনের এ বাস্তবতা কোন গোপন ব্যাপার নয়। আলোচ্য আয়াতে অবস্থার এরূপ পরিবর্তনের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। মুফাস্‌সির ইকরামা থেকে এরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) মানব জীবনে কোন অবস্থার স্থিতিশীলতা নেই। কখনো হয় শান্তি, আবার কখনো হয় অশান্তি। এক সময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তো অন্য সময় রোগ-ব্যধির আক্রমণে শক্তিহীন, স্বাস্থ্যহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অবস্থাও স্থিতিশীল থাকে না। এক সময় অর্থ সম্ভারের অধিকারী হলে আরেক সময় পথের ভিখারী হতে হয়। এভাবে মানুষের জীবন প্রবাহ চলমান। হযরত হাসান বসরী (রহ.) এরূপ অর্থ করেছেন।

(ঙ) অনেক মানুষকেই দেখা যায় তারা বস্তুর আকর্ষণে, বস্তুর প্রলোভনে আত্মাহারা, বিলাসিতায় নিমগ্ন। উপার্জনে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের বালাই রাখে না। জুয়া চুরী, মদ, সুদ, ঘুষ, মারামারী, হানাহানি, কাটাকাটিসহ সর্বপ্রকার পাপাচারিতায় লিপ্ত। স্রষ্টা, তাঁর রসূল ও পিতা-মাতার হুকুম-আহকাম মেনে চলা তো দূরের কথা, ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পশ্চাদমুখীতা

মনে করে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্থলে ধর্মের বিরোধিতায় মগ্ন হয়। এসব লোকেরই দাপট এবং প্রতাপ। তাদের সম্মান, তাদের মর্যাদা, তাদের নেতৃত্বই সমাজে বলিয়ান। ভুলক্রমেও তারা মৃত্যু এবং আখেরাতের কথা মনে করে না। অথচ তাদের এ অবস্থার স্থায়িত্ব নেই। চাঁদের অবস্থার সাথে মৃত্যু ব্যক্তির অবস্থার সামঞ্জস্যতা হলো, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদিত হলে তিমিরাচ্ছন্নতা দূরীভূত হয় এবং আচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশ পেয়ে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে কেয়ামত প্রতিষ্ঠার পর হাশরের ময়দানে মানুষের ভালমন্দ কর্মকাণ্ড পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে, কোন কিছুই গোপন থাকবে না। বস্তুত তিনটি শপথের সাথে মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আয়াতের খেতাব তথা সম্বোধন প্রসঙ্গ

১৯ নং আয়াতে কাকে খেতাব করা হয়েছে অর্থাৎ, কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের বিভিন্ন ধরনের মত রয়েছে। যথা:

(১) আলোচ্য আয়াতে বিশ্বমানবকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মানুষের অবস্থার পরিবর্তন থেকে মূল বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে। যারা এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন হযরত সাঈদ ইব্‌নে যুবায়ের, হাসান বসরী, কাতাদা, মাকহূল, আবূ উবায়েদ এবং আবূ হাতিম প্রমুখ।

এই মতের প্রমাণ হল–

আলোচ্য সূরায় ছয়, সাত এবং দশ নং আয়াতের অর্থের সাথে এ মতের সমতা বিদ্যমান রয়েছে, কেননা ঐ সমস্ত আয়াতে বিশ্বমানবকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(২) আয়াতে বর্ণিত لَتَرْكَبُنَّ শব্দের কর্তা হল السماء তথা আসমান। অর্থাৎ, আসমান এক অবস্থা থেকে আরো অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হবে। আর বাস্তবেই কেয়ামতের মুহূর্তে আকাশের বিভিন্ন অবস্থার কথা পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে ইব্‌নে জারীরে মুররা এবং ইবরাহীমের সূত্রে হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.) থেকে এই মতটি উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) আলোচ্য আয়াতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর অবস্থার পরিবর্তন এবং পরিণামে উন্নত অবস্থার সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। মুফাস্‌সির ইব্‌নে জারীর এবং ইব্‌নে কাছীর এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (ইবনে জারীর- ১২৫/৩০)

এই মতের প্রমাণাদি হল–

(ক) এ মতের অগ্রাধিকারের প্রথম কারণ হচ্ছে প্রসিদ্ধকারী হামযাহ, কাসায়ীসহ মক্কা এবং কূফাবাসীদের কেরাত لَتَرْكَبُنَّ (লাতারকাবান্না) ['বা' বর্ণে যবর]। এ কেরাতে এ অর্থের অবকাশ প্রমাণ করে।

(খ) বোখারী, মুসনাদে তায়ালিসী, তাবারানী, বায্‌যার, মুস্তাদরক এবং বায়হাকীর হাদীছে এর সমর্থন রয়েছে। এ হাদীছসমূহ মারফূ' (مرفوع) অর্থাৎ, স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অর্থ করেছেন বলে মুফাস্‌সির ইব্‌নে কাছীর মন্তব্য করেছেন।

আমাদের মতে উপরোক্ত মতসমূহের ভিতর মৌলিক কোন তফাৎ নেই। কেননা, যদি আয়াতের সম্বোধনকে সমস্ত মানুষের জন্য ধরা হয়, তবে মানুষ হিসেবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আর যদি সম্বোধন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই করা হয়ে থাকে, তাহলে

www.maktabatulabrar.com

العبرة لعموم لا خصوص الالفاظ .

অর্থাৎ, খেতাবে খাছের অর্থ ব্যাপক হয়।

তাফসীরের এই নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রকারান্তরে মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হতে শুরু করে জান্নাত অথবা জাহান্নাম পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তনের বিস্তারিত আলোচনা করে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৯নং আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করত ইরশাদ করেন,

ان قدامكم الامرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم .

অর্থাৎ, তোমাদের সম্মুখে একটি মহা বিষয় রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তের বাইরের জিনিস। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থী হও। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, সমস্ত মানুষকেই এই আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইব্নে কাছীর এই হাদীছটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, هذا منكر واسناده فيه ضعفاء অর্থাৎ, হাদীছটি মুনকার এবং বর্ণনাসূত্রে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। অথচ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আবূ হাতিম এবং মুহাদ্দিছ আবূ নায়ীম এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং মুফাস্সির কুরতুবী এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে এর বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ আল্লামা তীবী এই হাদীছের সুবাদে শেষোক্ত মতটির অগ্রাধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সম্ভবত এই হাদীছের সূত্রে জাবের জু'ফী থাকায় ইব্নে কাছীর তার বক্তব্যের সুযোগ নিয়েছেন। জাবেরে জু'ফীকে ইমাম আবূ হানীফা এবং মুহাদ্দিছগণ অবশ্যই দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তার সূত্রের হাদীছ দ্বারা মুক্তাদীর উপর ক্বেরাত ফরয না হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, অনেক সময় হাদীছ সূত্রগতভাবে দুর্বল হলেও অর্থ এবং বিষয়গতভাবে বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। উপরন্তু এরূপ হাদীছের সমর্থনে অন্যান্য হাদীছ এবং শরীয়তের বিধান পাওয়া গেলে প্রমাণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সর্বসম্মত ব্যাপার। আলোচ্য হাদীছটি সূত্রগতভাবে দুর্বল হলেও উপর্যুক্ত নিয়ম অনুসারে অর্থগতভাবে বিশুদ্ধ বলে স্বয়ং ইব্নে কাছীরও মন্তব্য করে লিখেছেন, ولكن معناه صحيح অর্থাৎ, (বর্ণনাসূত্র দূর্বল হলেও) তার অর্থ সঠিক।

আয়াতের সারমর্ম

এই আয়াতের সারমর্ম কী এ সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, হাদীছেও বর্ণনা রয়েছে, যার কিছুটা আয়াতের খেতাব তথা সম্বোধন সম্পর্কিত আলোচনাতেও ব্যক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বিশেষত আলোচ্য সূরার আয়াতসমূহের উপর গভীর দৃষ্টি আরোপ করলে মনে হয় এ সম্পর্কিত হাদীছ, সাহাবাদের মতামত এবং মুফাস্সিরদের বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকের বর্ণনা আয়াতের উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বসমূহের আংশিক উল্লেখ মাত্র। মূলত এসব কিছুর অবকাশ একই সাথে আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে

www.maktabatulabrar.com

প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেন, মানবজাতি তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বড়ই উদাসীন। মহান আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাকে তার জীবিকার উপকরণ, তার বয়স, অবস্থা এবং মৃত্যুর সময় লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। নেক অথবা বদ হওয়ার বিষয়ও লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়। এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে এই ফেরেশতা চলে যায়। অতঃপর অন্য এক ফেরেশতা আসে। তার মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়। এরপর দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে তার নেক এবং বদ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। যখন মৃত্যুর সময় হয়, তখন এই দুই ফেরেশতা ফিরে যায় আর মালাকুল মওত অর্থাৎ, মৃত্যুর ফেরেশতা সম্মুখে আসে এবং তার আত্মা বের করে নিয়ে যায়। অনন্তর তাকে দাফন করার পরে আত্মাকে তার দেহের ভিতর পরিবেশন করা হয়। এরপর ফেরেশতা আসে তাকে প্রশ্ন করার জন্য। তারাও প্রশ্নোত্তর শেষ করে ফিরে যায়। এরপর সে তার আমল নামা কাঁধে ধারণ করে সাথে নিয়ে হিসাবের জন্য আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। এরপর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন,

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ .

তুমি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলে। আজ আমি তোমার দৃষ্টি আবরণ মুক্ত করে দিয়েছি। আজ তোমার সৃষ্টি কত প্রখর। (সূরা ক্বাফ: ২২)

এরপর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন, لتركبن طبقا عن طبق মুফাস্সির কুরতুবী এই হাদীছটি উদ্ধৃত করে বলেন,

فقد اشتمل هذا الحديث على احوال تعترى الانسان من حين يخلق الى حين يبعث وكله شدة بعد حياة ثم بعث ثم جزاء .

অর্থাৎ, এ হাদীছে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হাশর-নাশর এবং কর্মফলসহ দুঃখ-কষ্ট – এই সমস্ত অবস্থার বর্ণনাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বোখারী শরীফে এর সমর্থনে হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়াদিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে– হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছো। প্রথমে তোমরা অণু-পরমাণু থেকে নির্গত হয়ে শুক্রের আকারে জননীর গর্ভে অবস্থান করে থাক। এরপর জন্মের পর থেকে শুরু করে শৈশবকাল, যৌবনকাল এবং বৃদ্ধকাল পাড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ কর। এ সমস্ত পরিবর্তন মানুষের চোখের অগোচরে নয়, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যারা প্রকৃত বিষয়বস্তু অনুধাবনে উদাসীন, তারা মৃত্যু এবং কবরকে মনে করে শেষ ঠিকানা, এরপর আর কোন কিছু নেই। অথচ সৃষ্টির পরিবর্তন বিশেষত মানবজীবনের পরিবর্তন পরিবর্ধন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে পথিকের মতো কোথাও হতে তার ভ্রমণ শুরু হয়েছে, কেউ তার ভ্রমণকে বিরত করতে সক্ষম নয় এবং তাকে গন্তব্য স্থলে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। আল্লাহ পাক –যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে বিদিত, তিনি– তার প্রেরিত নবী রসূলগণের মারফত উদাসীন মানুষকে তার সামনে আগত বিষয়াদির ব্যাপারে

সতর্ক করছেন যে, 'হে মানব, কবর তোমার সর্বশেষ ঠিকানা নয়, বরং কবর হচ্ছে প্রতীক্ষা গৃহতুল্য। এরপর এক বিরাট জগত বিদ্যমান রয়েছে। কবরের প্রশ্নোত্তরের পর হবে সেই জগতের সূচনা। এ জগতেই হিসাব-নিকাশ এবং কর্মফলের অনুপাতে সর্বশেষ ঠিকানা জান্নাত বা জাহান্নাম স্থির হবে। আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ.

অর্থাৎ, হ্যাঁ আমার রবের শপথ, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আমল সম্পর্কে খবর দেয়া হবে। (সূরা তাগাবুন: ৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মানবজীবনের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের মধ্যে চলাফেরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ সর্বাবস্থায় সে নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু ট্রেনের বগীতে বসা অবস্থায় দৃষ্টি ভিতরে নিবদ্ধ থাকলে যেমন তার গতিশীলতা বোঝা যায় না, তেমনি মানুষ তার জীবনের গতিকে অনুভব করতে সক্ষম হয় না। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل.

অর্থাৎ, তুমি দুনিয়াতে অপরিচিত এবং পথিকের মত হয়ে থাক।

কারণ, তুমি মূলত দুনিয়াতে থাকার জন্য আসনি, বরং পথিকের মতো সর্বদা গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছো। কিন্তু দুনিয়ার মোহে নিমগ্ন মানুষ তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এজন্য অপর এক হাদীছে ইরশাদ করেন,

اذكروا ذكرها اللذات اى الموت.

অর্থাৎ, সমস্ত স্বাদ মেটায় যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুকে সদা-সর্বদা স্মরণ কর, তাহলে বস্তুর স্বাদ মিটে যাবে। পরবর্তী আয়াতেও তাই ইরশাদ হয়েছে,

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ **(তাদের হলো কি যে, তারা ঈমান আনে না!)**

এ আয়াতে ঈমান আনয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল ঈমান আনয়নের উপায় কী? নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

ঈমান আনয়নের উপায়

ঈমানের চেতনা সৃষ্টি ও ঈমান আনয়নের দুটো পন্থা রয়েছে। যথা:

(ক) আল্লাহর প্রতি ঈমানের চেতনা সৃষ্টি ও ঈমান আনয়নের একটা উপায় হল তাঁর সৃষ্টি ও মহা শক্তি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। কারও শক্তি এবং কৃতিত্বের বাস্তব নমুনা সম্মুখে থাকলে তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় থকে না, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের দাবী এটাই। সুতরাং দিনের আলোর সমাপ্তি, রাতের আঁধার, উভয়ের মধ্যভাগে না আলো না আঁধার, সূর্যের অস্ত যাওয়া, চন্দ্রের উদয়, আবার চন্দ্রের অবস্থার পরিবর্তন মহান রব্বুল আলামীনের অসীম শক্তি এবং কৃতিত্বের জ্বলন্ত নির্দশন। এ কারণেই ফিছাগোরাস, (আল-মিলাল ওয়ান্নাহল- ৮৩/২) সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, নিউটন,

www.maktabatulabrar.com

(দায়েরাতুল মাআরিফ- ৪৯৪/১) লেনিন, আইনস্টাইন এবং অগণিত গবেষক ও বৈজ্ঞানিকগণ (আকায়েদে ইসলামিয়া- ৪৯) পৃথিবী, সৃষ্টির কারুকার্য ও মহা জগতের মহা ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং এ নিয়ে গবেষণা করে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তার সীমাহীন শক্তির স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং তোমাদের বিবেকশক্তি এবং জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছো না কেন? অসীম শক্তির মালিক পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষে কেয়ামত কায়েম করা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও হাশর-নাশর ইত্যাদি ঘটানো মোটেই অসম্ভব বা কঠিন ব্যাপার নয়। তাই তো তোমাদের এ বিষয়ে ঈমান স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) আল্লাহর প্রতি ঈমানের চেতনা সৃষ্টি ও ঈমান আনয়নের একটা উপায় হল সঠিক সংবাদ দাতার সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বুদ্ধি নেই অথবা জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে সঠিক তত্ত্ব নিরূপণে অক্ষম, তাদের জন্য সঠিক সংবাদদাতার সংবাদই হচ্ছে সঠিক তত্ত্ব নিরূপণের অন্যতম উপায়। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের নিকট চরম সত্যবাদী এবং আমীন হিসেবে স্বীকৃত। তিনি মিথ্যুক নন, সকলে তা ভাল করেই অবগত আছে। সুতরাং তার বক্তব্য এবং সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত কেয়ামত, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাকার বিষয়ে ঈমান স্থাপন করা বাঞ্ছণীয়। তাই আল্লাহ পাক বলছেন, তাদের হলো কি যে, তারা ঈমান আনছে না?

وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ **(যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তারা সাজদা করে না।)**

এখানে বোঝানো হয়েছে, তোমাদের জন্য সর্বশেষ উপায় হচ্ছে নির্ভুল গ্রন্থ এবং আসমানী কিতাব থেকে সঠিক তত্ত্ব গ্রহণ করা এবং ঈমান স্থাপন করা। মানব রচিত কিতাব এবং মানুষের বিবেচনা প্রসূত মতাদর্শ না নির্ভুল হতে পারে, না সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেননা, মানুষ বর্তমান সম্পর্কেই সুনিশ্চিত নয়, সুতরাং সে অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব কীরূপে পরিবেশন করবে? মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার গতি বস্তুজগতের পরিধি ভেদ করতে অক্ষম। সুতরাং মানুষ তোমাদেরকে পরকালের বিষয়ে কীরূপে দিক-নির্দেশনা করবে? তাই সঠিক তত্ত্ব নিরূপণে প্রয়োজন ঐশীবাণীর এবং আসমানী সহীফা ও আসমানী কিতাবের। পূর্বকালের তাওরাত, যবূর, ইনজীল এবং আসমানী সহীফাসমূহ অবশ্যই পরে নির্ভুল থাকেনি, তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, তা থেকে অনেক কিছু বাদ এবং তাতে অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন সুসংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। এতো কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়, কোন সাহিত্যিকের অবতারণা নয়, কোন জ্যোতিষীর বক্তব্য অথবা যাদুকরের যাদু মন্ত্র নয়। এগুলো তোমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছ। মূলত পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, আসমানী কিতাব, ঐশীবাণী। সঠিক তত্ত্ব নিরূপণের এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক মাধ্যম ও উপায়। কিন্তু তোমাদের কী হলো, কেন তোমরা এই কিতাবের প্রতি আনুগত্যশীল এবং নতশির হচ্ছো না?

সাজদার অর্থ

(ক) সাজদার অভিধানগত অর্থ হচ্ছে 'ঝুকে পড়া'। আনুগত্য এবং স্বীকৃতির মধ্যে ঝুঁকে পড়ার অর্থ বিদ্যমান আছে বিধায় পবিত্র কুরআনে সাজদার অর্থ আনুগত্য এবং স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে রূপক অর্থে।

(খ) সাজদার মাধ্যমে নতশির হয়ে স্বীয় দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা হয়। প্রবৃত্তির তাড়না ও পাপচারিতা বর্জনের অঙ্গীকার করা হয়। সুতরাং সাজদার অর্থ পরিশুদ্ধিকরণের অবকাশ আছে।

(গ) সাজদা নামাযের একটি ফরয এবং রোকন। নামাযের একটি বিশেষ অঙ্গ। এ হিসাবে সাজদার অর্থ নামায ধরা যেতে পারে।

(ঘ) সাজদার শরীয়তগত অর্থ হচ্ছে যমীনে নতশির হওয়া। এ অর্থেই নামাযে এবং সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সাজদা করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, আলোচ্য আয়াতে সাজদার কোন অর্থকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

তানতাভীর মতে উপর্যুক্ত অর্থসমূহের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই বিধায় আলোচ্য আয়াতে যে কোন অর্থকেই উদ্দেশ্য করা যেতে পারে (তানতাভী- ১-১/২৫)। আমাদের পর্যালোচনায় 'ক' এবং 'খ'-য়ে বর্ণিত অর্থের বেলায় মুফাস্সির তানতাভীর মত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কেননা, যেমন আনুগত্য এবং স্বীকৃতি পরিশুদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি পরিশুদ্ধি আনুগত্য এবং স্বীকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু 'গ' এবং 'ঘ'-য়ে বর্ণিত অর্থের বেলায় তানতাভীর মত নিম্নোক্ত কারণে বোধগম্য নয়।

(ক) নামায এবং সাজদার সুনিশ্চিত শরীয়তগত অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। আর অভিধানগত অথবা রূপক অর্থ সে অর্থ বুঝায় না। এমতাবস্থায় শরীয়তগত অর্থ উপেক্ষা করা শরীয়তের মূল ধারার পরিপন্থি বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) অলোচ্য আয়াতে সাজদার শরীয়তগত অর্থ গ্রহণ করা হলে পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াত তেলাওয়াত করা হলে সাজদা করা বাঞ্ছণীয় হবে। কেননা, সাজদা না করার দরুণই কাফেরদের সমালোচনা করা হয়েছে, অথচ এরূপ মত ইজমার খেলাফ। (মাজহারী- ৩৩১/১০)

(গ) নামায এবং তেলাওয়াতে সাজদা মূলত ইবাদত। আর ইবাদত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। কাফেরদের সাজদার শরীয়তগত অর্থ করা হলে কাফেরদের জন্য ইবাদত সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াতে অভিধানগত এবং রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। (কাশশাফ- ২৩৬/৪)

সাজদা এবং মালেকী মাযহাব

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে আলোচ্য আয়াতে সাজদার হুকুম নেই। (মুদাওয়ানা- ১০৫/১, শারহুছ ছাগীর- ৪১৮/১, কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা- ২৯০) তাদের মতে,

(ক) আলোচ্য আয়াতে কোন নির্দিষ্ট আয়াতকে লক্ষ্য করা হয়নি, বরং সমস্ত কুরআনকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবুদ্দার সূত্রে আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজার হাদীছে মুফাচ্ছালে সাজদা নেই বলা হয়েছে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা- ৭৫) আর আলোচ্য আয়াত

মুফাচ্ছালেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমস্ত হাদীছে সাজদার কথা আছে সেগুলো রহিত হয়েছে। এ কারণেই মদীনাবাসীদের তাআমুলও এরূপই। তাদের নিকট মুফাচ্ছালে কোন সাজদা নেই, আলোচ্য আয়াতেও সাজদা নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে منذ تحول الى المدينة বাক্যটি এই মতের পক্ষ্যে সমর্থন যোগায়। (কাশফুল গুম্মা- ১২৩/১)

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে القرآن এর আলিফ লাম 'আহদী' ধরা হলে আলোচ্য সাজদার অবকাশ সৃষ্টি হয় (মাআরিফুল কুরআন- ৭৪৮/৮)। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কেবল অবকাশের সুবাদে সাজদার মত গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সাব্যস্ত করা নিয়মতান্ত্রিক উপায় নয় বলে মুফাস্সির মাজহারী মন্তব্য করেছেন এবং যথার্থই করেছেন। তবে এই আয়াতের দৃষ্টিতে সাজদার হুকুম সাব্যস্ত না হলে সাব্যস্ত করার প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে আলোচনা পরে আসছে।

মালেকী মাযহাবের প্রধান ভীত হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছ। কিন্তু এই হাদীছ সম্পর্কে ইবনে আব্দুল বার, ইমাম নববী, ইমাম আহমদ, ইবনে মুঈন, ইমাম নাসায়ী, আবূ হাতিম প্রমুখ মন্তব্য করে বলেছেন, 'হাদীছটি মুনকার, হাদীছের সূত্র আবূ কুদামা এবং মাতার (مطر) মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, তারা ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করে থাকে বিধায় তাদের বর্ণনা প্রমাণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের হাদীছ লেখার অনুপযোগী এবং মুরসাল অর্থাৎ, সূত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, 'নির্ভরযোগ্য সকলেই এই হাদীছকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।' (ফাতহুল মুলহিম- ১৬৭/২) অনুরূপভাবে আবুদ্দর্দার হাদীছের সূত্রে বিদ্যমান উসমান ইবনে কায়েদকে ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আদী সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (নাছবুর রায়াহ- ১৮২/২) এমতাবস্থায় এই হাদীছটি মোটেই প্রমাণযোগ্য নয়। সুতরাং এর সুবাদে অন্য হাদীছসমূহকে রহিত বিবেচনা করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা বিন্নুরী বলেন, 'সাজদার সমর্থনে আবূ হুরায়রার পরিশুদ্ধ হাদীছটি বেশি উপযুক্ত। কারণ, বর্ণনা করা ব্যতীত কেবল সম্ভাবনার অবকাশে রহিত বলে বিবেচনা করা মোটেই প্রমাণযোগ্য নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে তার সাহচর্য অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতে দেখেছি। সুতরাং এই হাদীছকে রহিত বলা অযৌক্তিক বৈ আর কী হতে পারে? (মাআরিফুস সুনান- ৬২/৫) এমনিভাবে সাজদা না করার হুকুমকে মদীনাবাসীদের তাআমুল এবং মদীনাবাসীদের ঐকমত্য বলে দাবী ইবনে রুশ্দ করেছেন। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ) অথচ হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং হযরত ইবনে উমর প্রমুখ বহু সাহাবী সাজদার সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাভী বলেন,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বহু হাদীছ সাজদার সমর্থনে বিদ্যমান রয়েছে। (তাহাভী- ২১০/১) এ কারণেই হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) মদীনাবাসীর ঐক্যমত্য থাকাকে অস্বীকার করেছেন। (কিতাবুল উম্ম- ১৬২/১)

আমাদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছকে দুর্বল অবশ্যই বলা যেতে পারে, কিন্তু ভিত্তিহীন বলা সমীচীন নয়। কেননা,

www.maktabatulabrar.com

(ক) এই হাদীছের দুটি সূত্র- আবূ কুদামা এবং মাতারের সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম মুসলিম দুজনকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

(খ) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে তাউসের সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাজদার অসমর্থনে হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এই হাদীছের সূত্রকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। (নাছবুর রায়াহ- ১৮২/২) ইবনে কা'ব থেকেও অনুরূপ একটি হাদীছ পাওয়া যায়। (মাজহারী) এতে মনে হয় হাদীছটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। এমতাবস্থায় এই হাদীছ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে:

(ক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের সাজদা সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি, যেমন হযরত ইবনে উমর (রা.) প্রথম অবগত হতে পারেননি বিধায় এখানে সাজদাকে তিনি অস্বীকার করতেন: (নাছবুর রায়াহ- ১৮২/২) কিন্তু অবগত হওয়ার পর তিনি সাজদার সমর্থন করেন। (মুছান্নাফ- ৩৪২/২)

(খ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে সাজদার অস্বীকৃতি বিদ্যমান আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছে সাজদার স্বীকৃতি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় হাদীছের মূলধারা-

المثبت مقدم على النافى .

অর্থাৎ, স্বীকৃতি জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য অস্বীকৃতি জ্ঞাপনমূলক বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার রাখে।

এই নীতি অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছের অগ্রাধিকার সাব্যস্থ হয়। ইমাম নববীও এরূপ মন্তব্য করেছেন।

(গ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের তুলনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ বিশুদ্ধ বিধায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেননা, অগ্রাধিকারের কারণ পাওয়া গেলে অগ্রাধিকার দেয়াই সর্বসম্মত মত। এজন্যই ইবনুল আরাবী মালেকী এই মতটিকেই বিশুদ্ধ বলে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (কুরতুবী- ২৮১/১৯)

হানাফী, শাফিয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব

উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতেই হানাফী, শাফিয়ী এবং হাম্বলী মাজহাবে আলোচ্য আয়াতে সাজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই মতের সমর্থনে উপরোক্ত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছসহ আমর ইবনে আছ, ইবনে উমর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, বুরায়দা (দুররুল মানছুর- ৩২৯/৬) প্রমুখ থেকে বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুয়াত্তা, তাহাবী ইত্যাদি কিতাবসমূহে হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। (নাইলুল আওতার- ৯৮/৩) হযরত আনাস (রা.) বলেন,

صليت خلف ابى بكر وعمر وعثمان فسجدوا .

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমানের পিছনে আমি নামায পড়েছি, তারা সকলেই আলোচ্য আয়াতে সাজদা করেছেন। (কাবীর- ৩৬৪/৮)

সুতরাং একজন নবী, একজন ছিদ্দীক এবং দুজন শহীদ থেকে আলোচ্য আয়াতে সাজদা সাব্যস্ত হয়। তারা অতি উত্তম বন্ধু এবং আদর্শ। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেন,

www.maktabatulabrar.com

ثبت ياجبل فان عليك نبى وصديق وشهيدان .

হে পাহাড়, স্থির হও। কেননা, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুজন শহীদ বিদ্যমান আছেন।

সুতরাং আমাদের পক্ষেও তাদের সিদ্ধান্ত এবং আমলের উপর স্থির থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম

হযরত ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত ও হযরত ইমাম শাফিয়ীর মত হল সাজদায়ে তেলাওয়াত সুন্নাত। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতও এরূপই। অবশ্য তিনি নামাযের ভিতরের সাজদাকে ওয়াজিব বলেন বলে কেউ কেউ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যারা সাজদায়ে তেলাওয়াতকে সুন্নাত বলেন, তাদের অন্যতম প্রমাণ তিনটি। যথা:-

(ক) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সাজদা করেছেন আবার অনেক সময় করেননি। যদি ওয়াজিব হতো তাহলে সর্বদা করতেন এবং করার আদেশ করতেন অথচ তা সাব্যস্ত নেই।

(খ) হযরত উমর (রা.) এক জুমুআয় খুতবার সময় সাজদার আয়াত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সাজদা করেননি। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যার ইচ্ছা করবে, যার ইচ্ছা না হয় না করবে, তিলাওয়াতের সাজদা ফরয নয়।

(গ) তেলাওয়াতের সাজদা ওয়াজিব অথবা ফরয না হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অর্থাৎ, ঐক্যমত্য রয়েছে।

প্রমাণাদির পর্যালোচনা

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) থেকে বোখারী, (১৪৬/১) মুসলিম, (২১৫/১) তিরমিযী (১০২/১) এবং অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় তেলাওয়াতের সাজদা করেননি। কিন্তু এ কারণে সুন্নাতের উপর প্রমাণ পেশ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কেননা, বিশেষ কারণে হয়তো করেননি। যথা,

(ক) তখন তিনি জরুরী মনে করতেন না, পরে জরুরী মনে করেছেন। যেমন সূরায়ে ছাদের সাজদাকে প্রথমে জরুরী মনে করেননি অতঃপর জরুরী মনে করে সর্বদা সাজদা করতেন। আবূ দাউদ (২০০/১), মুসনাদে আহমদ (৮৪/৩), বায়হাকী (৩১৮/২), মুস্তাদরক (৪৩২/২), দারিমী, দারাকুতনী, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং তাহাভীতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে এর বিস্তারিত বিবরণে হাদীছ রয়েছে। মুহাদ্দিছ হাইছামী বলেন, ইমাম আহমদের হাদীছের সূত্র অত্যন্ত বিশুদ্ধ, মুস্তাদরাকের সূত্র মুসলিমের শর্তের মোতাবেক। ইমাম নববী খুলাছাতে বলেন, বোখারীর শর্ত মোতাবেক। ইবনে কাছীর অবশ্য বলেছেন (ইবনে কাছীর- ২৯২/৮) যে, এর একটি সূত্র থেকে ইমাম আহমদ একা বর্ণনাকারী, তার সমর্থনকারী নেই। কিন্তু ইবনে কাছীরের এই মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা, বায়হাকী এবং মুস্তাদরকে এর সমর্থনে অন্যান্য সূত্র রয়েছে। (মাআরিফ- ৭৭/৫)

(খ) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো তখন সাজদা এজন্য করেননি যে, সাজদায়ে তেলাওয়াত সাথে সাথে করা ভাল বটে, কিন্তু পরেও করা যেতে পারে। (উমদাতুল কারী- ৫১৫/৩) এতে পরে

করার বৈধতা সাব্যস্ত করাও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হতে পারে। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাজদায়ে তেলাওয়াত পরে আদায় করা যায় বলে রায় দিয়েছেন। (দুররুল মুখতার) আর তাতারখানিয়া এবং এনায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট সাথে সাথে সাজদা করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে, যদি পরে সাজদা না করার আশংকা দেখা দেয় তাহলে দেরী করা যাবে না, অন্যথায় দেরী করা যাবে। হযরত আনোয়ার শাহ্ কাশমীরী রহ. এরূপ মন্তব্য করেছেন। অথবা নামাযের ভিতরের তেলাওয়াতে সাজদার কথা বলা হয়েছে, কেননা সেখানে দেরী করা চলে না।

(গ) হাদীছে যে বলা হয়েছে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে তেলাওয়াতের সাজদা করেননি-এর অর্থ হচ্ছে ভিন্নভাবে সাজদা করেননি, বরং রুকু অথবা সাজদার নিয়ত করে নিয়েছেন, আর এরূপ নিয়ত দ্বারা তেলাওয়াতের সাজদা আদায় হয়ে যায়, সুতরাং 'সাজদা করেননি' এ অর্থ হচ্ছে ভিন্নভাবে সাজদা করেননি। (মারাকিউল ফালাহ) ইমাম তহাভী সাজদা না করার আরো চারটি কারণ বর্ণনা করেছেন। (তহাভী) হযরত ইমাম শাফিয়ী সাজদায়ে তেলাওয়াত সুন্নত হওয়ার পক্ষে যেমাম ইবনে ছা'লাবার হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। (বোখারী শরীফ– ১১/১) সেই হাদীছে যে সমস্ত ফরযের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাজদায়ে তেলাওয়াতের কথা নেই। সাজদায়ে তেলাওয়াত ফরয হলে তা বলা হতো। যেমাম ইবনে ছা'লাবা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বর্ণিত বিষয়াদি ব্যতীত আরও কোন কিছু কি আমাদের উপর বাধ্যতামূলক আছে? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'না, তবে যদি তুমি নফল কোন কিছু কর তাহলে তোমার ইচ্ছা। (কিতাবুল উম্ম) কিন্তু এ হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। উপরন্তু হাদীছে ইছতিছনার শব্দ ব্যবহার হয়েছে; ইছতিছনা যেখানে মুত্তাছিল ধরা যায় সেখানে মুত্তাছিল ধরা বাঞ্ছণীয়। কারণ, এটাই আসল। এ ধারা অনুপাতে হাদীছের অর্থ হয়, 'তোমার উপর আর ফরয নেই, তবে তুমি যদি স্বয়ং ফরয করে নাও ফরয হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাজদায়ে তেলাওয়াতের যেমন এ হাদীছে উল্লেখ নেই, তেমনিভাবে সদকায়ে ফিতর, কুরবানী এবং আরো অনেক কিছুর হুকুম-আহকামের বর্ণনা এই হাদীছে নেই, অথচ সেসব ক্ষেত্রে এই হাদীছ প্রয়োগ করা হয় না।

হযরত উমর (রা.)-এর আমল

হযরত উমর (রা.)-এর আমলের কারণেও সাজদায়ে তেলাওয়াতকে ওয়াজিব না বলে সুন্নাত বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লামা আইনী বলেন, 'মূলত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হযরত উমর (রা.)-এর এই বক্তব্য–

انما لم تكتب علينا الا ان نشاء .

অর্থাৎ, এর অর্থ তেলাওয়াতে সাজদা আমাদের উপর ফরয নয়, তবে যদি আমরা সাজদার ইচ্ছা পোষণ করি। এতে বোঝা যায় যে, সাজদা ঐচ্ছিক। (ফাতহুল বারী– ৪৬১/২)

কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর এই বাক্যের তিনটা জওয়াব দেয়া যেতে পারে। যথা:

(১) এই বাক্যে আর একটি অর্থের অবকাশ আছে, তা এই যে, 'সাজদা করা আমাদের উপর ফরয নয়, তবে যদি আমরা সাজদার আয়াত তেলাওয়াতের ইচ্ছা পোষণ করি তাহলে সাজদা ফরয হবে।

www.maktabatulabrar.com

আল্লামা আইনী বলেন, বাক্যটিতে যেহেতু দুই ধরনের অর্থ করার অবকাশ বিদ্যমান, সুতরাং এ কারণে দ্বিতীয় অর্থটিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে, তাতে সাজদায়ে তেলাওয়াত ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। (উমদাতুল কারী– ৫২৩/৩) কিন্তু আল্লামা আইনীর এই বক্তব্য সঠিক মনে হয় না। কারণ, এই হাদীছে আরেকটি বাক্য রয়েছে, ومن لم يسجد فلا اثم عليه অর্থাৎ, আর যে সাজদা না করবে তার কোন গোনাহ হবে না। এতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, তেলাওয়াতের সাজদা ওয়াজিব নয়।

(২) হযরত উমর (রা.)-এর বক্তব্যে ঐ সকল অর্থের অবকাশ রয়েছে, যা ইতিপূর্বে যায়েদ ইবনে ছাবিতের হাদীছের বেলায় করা হয়েছে। যথা: তিনি প্রথম প্রথমে সাজদা করেননি পরবর্তী সময়ে করেছেন, অথবা সাথে সাথে করেননি, পরে হয়তো করেছেন। অথবা ভিন্নভাবে সাজদা করাকে জরুরী মনে করেননি, নামাযের সাজদা এবং রুকুর সাথে করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। এরূপ বক্তব্যের যথার্থতা এজন্যই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর (রা.)-এর বিশিষ্ট সহচর আব্দুর রহমান সুলামী বলেন,

انه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيومي...الماء .

অর্থাৎ, হযরত উমর (রা.) অনেক সময় চলমান অবস্থায় সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং ইশারা করে সাজদা আদায় করতেন।

এমনিভাবে হযরত উমর (রা.) একদিন খুতবার সময় সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করে দেখতে পান যে, অন্যান্য উপস্থিতবৃন্দ সাজদার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন অথচ তিনি খুতবায় ছিলেন, যা তাদের জন্য শোনা প্রয়োজন। তাদের এরূপ বাধ্যবাধকতা বোধ ও প্রস্তুতি দেখে তিনি বলেন, সাজদা করা ফরয নয় অর্থাৎ, সাথে সাথে করা বাধ্যতামূলক নয়, পরে করলেও চলবে।

(৩) হযরত উমর (রা.)-এর বাক্য থেকে বোঝা যায়, তিনি সাজদায়ে তেলাওয়াতকে ফরয মনে করেন না, বাকি ওয়াজিব হওয়াকে তিনি অস্বীকার করেননি। ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাত পরিভাষা প্রসঙ্গ

শরয়ী হুকুমের স্তর এবং শ্রেণি বুঝানোর জন্য হানাফী ফেকাহে এই তিনটি পরিভাষা বহুল প্রচলিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ এবং উসূলে ফেকাহের কিতাবে রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে 'ওয়াজিব' পরিভাষা ততটা ব্যবহার করা হয় না। তাদের নিকট ফরযের পরের স্তর হচ্ছে সুন্নাত। এ কারণেই তারা ফরয বলা না গেলে সুন্নাতের হুকুম লাগিয়ে থাকেন। এজন্যেই তারা বিতরের অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও বিতরকে ওয়াজিব বলেন না, বরং সুন্নাত বলে থাকেন। অথচ বিতর তরক করলে ফরয তরককারীর অপরাধের শাস্তির বিধান চূড়ান্ত করে থাকেন এবং বিতর তরককারীকে ফাসেক বলে থাকেন। সম্ভবত এ কারণেই তারা সাজদায়ে তেলাওয়াতকে ওয়াজিব বলেননি, বরং সুন্নাত বলেছেন।

ইজমার দাবীর পর্যালোচনা

যারা সাজদায়ে তেলাওয়াতকে সুন্নাত বলে থাকেন তারা এ ব্যাপারে ইজমা অর্থাৎ, সাহাবিদের ঐক্যমতের দাবী করে থাকেন। অথচ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফে, হযরত

আনাস (রা.) থেকে মুসনাদে বাজ্জারে, হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বায়হাকীতে, হযরত ইব্নে মাসউদ (রা.) থেকে তাবারানীতে, হযরত উকবা ইব্নে আমের (রা.) থেকে এবং উসমানগনী প্রমুখ থেকে ওয়াজিব হওয়ার হাদীছ এবং বক্তব্য রয়েছে। হযরত নাফে, সাইদ ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখ্য়ী, হাসান বসরী, হাম্মাদ, হাকাম ও ইমাম আহমদের এক মতানুসারে সাজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। সুতরাং ইজমার দাবী আশ্চর্য বৈ অন্য কিছু নয়। যদি বলা হয়, হযরত উমর (রা.) খুৎবার সময় সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে তেলাওয়াতের সাজদা করেননি অথচ সাহাবাগণ নীরবতা পালন করেছেন, এটা সাহাবাদের ইজমার প্রমাণ বহন করে, তা হলে বলা হবে, ইজমার জন্য এই বক্তব্য যথেষ্ট নয়। এর কারণ হযরত উমর (রা.)-এর বক্তব্যের পর্যালোচনায় আমরা বর্ণনা করেছি।

সাজদায়ে তেলাওয়াতকে সুন্নাত বলে ইজমার দাবী করা সমীচীন নয়। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা,

(ক) পবিত্র কুরআনে কারীমে বেশ কিছু আয়াতে সাজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য 'আম্র' অর্থাৎ, সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর 'আমর' তথা নির্দেশ ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। হযরত ইমাম শাফিয়ী এবং আবূ মানছুর মাতুরীদীও এরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু শেখ আবুল মাআলী এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, 'কুরআনে পাকে সাজদার সাধারণভাবে হুকুম করা হয়েছে, কিন্তু ঐ আয়াত তেলাওয়াত করলেই নামায পড়তে হয় না, বরং নামাযের সময় হলে যার উপর নামায ফরয এবং নামাযের যোগ্য, কেবল তার উপরই নামায ফরয। তেমনিভাবে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেই সাজদা করা ওয়াজিব হওয়া বুঝায় না, বরং সাজদার সময় যথা নামাযের সময় সাজদা করা বুঝায়, সাজদায়ে তেলাওয়াত বুঝায় না। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে আবুল মাআলীর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (এক) তেলাওয়াতের সময় সাজদা করার মতো মুসলিম উম্মাহের ঐক্যমত। আয়াতে সাজদার হুকুম এবং 'আমর' স্থান কাল এবং শর্তবিহীন হলেও তেলাওয়াতের সময়ের সাথেই সাজদা করার হুকুম সম্পৃক্ত মেনে নিতে হবে। পবিত্র কুরআনে এর অসংখ্য নজীর রয়েছে। (দুই) নামায আদায় করার জন্য অন্যান্য শর্তাবলি রয়েছে, যেমন সময় হওয়া ইত্যাদি। এরূপ শর্ত সাজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য নেই। সুতরাং উভয়কে একপর্যায়ের গণ্য করা যায় না। হাদীছে পাকে তেলাওয়াতের সময় সাজদার কথা আছে, সুতরাং আয়াতের বেলাও সাজদার কথা আছে ধরে নিতে হবে।

(খ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে, 'যখন বনী আদম সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সাজদা করে, তখন শয়তান বিলাপ করতে করতে দূরীভূত হয় এবং হায় হুতাশ করে বলতে থাকে যে, নবী আদম সাজদার হুকুম পালন করছে বিধায় সে জান্নাতী আর আমি পালন করিনি বিধায় আমি জাহান্নামী।' আল্লামা সারাখ্সী এই হাদীছ দ্বারা সাজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। (মুস্তাদরাক- ২২১/১) কিন্তু আল্লামা নববী বলেন, শয়তানের কথা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। হযরত কাশমীরী (রহ.) বলেন, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে অস্বীকার করেননি বিধায় হাদীছের

www.maktabatulabrar.com

দলীল হতে বাধা নেই। হযরত বানুরী (রহ.) বলেন, 'উদ্ধৃতিকারী স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সুতরাং নববীর বক্তব্য বিস্ময়কর বৈ আর কিছু নয়। এখানে একথাও বলার অবকাশ আছে যে, বিভিন্ন আয়াতে সাজদার নির্দেশ রয়েছে, সুতরাং ইমাম নববীর বক্তব্য সত্যিই বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে ইব্নে হুমামের উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সাজদার আয়াতসমূহ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার আয়াতে সাজদার হুকুম সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে সাজদার নির্দেশ অমান্যকারী কাফেরদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় প্রকার আয়াতে নবীগণের সাজদা করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত 'আম্র' অর্থাৎ, নির্দেশকে মান্য করা, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুকরণ-অনুসরণ করা এবং কাফেরদের বিরোধিতা করা ওয়াজিব। এখানে ওয়াজিব না হওয়ার কোন দলীল নেই। সাজদার অবস্থানকে বিবেচনা করলেও ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। কেননা, নামাযের মধ্যে সাজদার হুকুম সর্বজন স্বীকৃত এবং ফরয হওয়াও স্বীকৃত। সুতরাং নামাযের অঙ্গ হিসেবে তেলাওয়াতের সাজদা ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ইবনে রুশদের বক্তব্য

ইব্নে রুশদ বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, 'সাজদা আমাদের উপর ফরয নয়।' আর তিনি এই কথাটি বলেছেন সাহাবিদের উপস্থিতিতে আর তাদের কেউ হযরত উমরের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি, এতে তাদের মধ্যে ঐকমত্য বুঝায়।

ইবনে রুশদ আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন আর হযরত ইমাম মালেক এবং শাফিয়ী সাহাবাগণ যে অর্থ করেছেন তা গ্রহণ করেছেন। কেননা, সাহাবাগণ শরয়ী নির্দেশকে অধিক বুঝতে সক্ষম ছিলেন।

ইব্নে রুশদের উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো,

(ক) সাহাবিগণ সাজদায়ে তেলাওয়াত সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। আমাদের পূর্বের বক্তব্যের মাধ্যমে ইবনে রুশদের এই দাবীর অসারতা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরায় কোন কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।

(খ) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আয়াতের গভীরতায় পৌঁছতে পারেননি। তাই তিনি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে সাহাবিদের বিরোধিতা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাহাবী নন, তিনি আয়াতের গভীরতায় পৌঁছতে পারেননি, কিন্তু হযরত আবূ হুরাইরা, ইবনে উমর, আনাস, উসমান গণী প্রমুখ কি সাহাবী নন? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাহাবিদের অনুসরণ করে আয়াতের গভীরতায় না পৌঁছার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে উপরিউক্ত সাহাবিদেরকে বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত করার অপরাধে স্বয়ং ইবনে রুশদ দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন তা কি তিনি তলিয়ে দেখেছেন? সর্বোপরি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাজদা করে প্রকাশ্য অর্থকেই আয়াতের মূল অর্থ বিবেচনা করলেন, যারা সাজদা করতে ইচ্ছুক নয় তাদেরকে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করতে নিষেধ করলেন, তবে কি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আয়াতের গভীরতায় পৌঁছতে পারেননি?

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾	(২২) বরং কাফেররা মিথ্যা আরোপ করে থাকে।
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) তারা মনে মনে যা পোষণ করে থাকে আল্লাহ পাক তা বিশেষভাবে অবগত আছেন।
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾	(২৪) সুতরাং তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾	(২৫) তবে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে, তাদের জন্য আছে অনন্ত প্রতিদান।

শব্দার্থ

بَلِ الَّذِيْنَ বরং যারা, كَفَرُوْا অস্বীকার করে, يُكَذِّبُوْنَ তারা মিথ্যারোপ করে, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এবং আল্লাহ পাক ভালভাবেই পরিজ্ঞাত, بِمَا يُوْعُوْنَ তারা যা সংরক্ষণ করে, মনে মনে পোষণ করে, فَبَشِّرْهُمْ তাদেরকে সুসংবাদ দাও, بِعَذَابٍ কঠোর আযাবের, اَلِيْمٍ যন্ত্রণাদায়ক, اَجْرٌ পুরস্কার, مَمْنُوْنٍ অনন্ত।

ভাবার্থ

পবিত্র কুরআনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ছিল কাফেরদের জন্য নাজাতের অন্যতম পথ। কিন্তু আনুগত্য তো দূরের কথা, বরং তারা পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উক্তি করে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত এবং ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মনে মনে অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্র করে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক তাদের এসব কিছু সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাই আল্লাহ পাক তাদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করে তাদেরকে পাপাচারিতার জন্য কঠোর শাস্তি দিবেন। হে নবী, তুমি তাদেরকে তাদের পাপাচারিতার কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। আর এটাও জানিয়ে দাও যে, অতীতে যা-ই করেছে, যদি তারা এখনো ঈমান নিয়ে আসে এবং নেক আমল শুরু করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন এবং ঈমান ও নেক আমলের কারণে দয়া করে পুরস্কারে সৌভাগ্যশীল করবেন।

তাফসীর

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, কাফেররা কুফ্‌রীর কারণে হক এবং সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে আছে। বস্তুজগতে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত, আর মৃত্যুর পর রয়েছে তাদের জন্য কঠোর ও অনন্ত আযাব। তারা তাদের ষড়যন্ত্রে কামিয়াব হতে পারবে না। কারণ, তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন অবগত আছেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকর করবেন। আর তাঁর সিদ্ধান্তের মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারো নেই। অবশ্য আল্লাহ পাক অতি মহান এবং করুণাময়, তাই অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে

www.maktabatulabrar.com

আসলে এবং ঈমান এবং নেক আমলে ব্রতী হলে তিনি ক্ষমা করে দেন। দিয়ে থাকেন যথাযথ পুরস্কার। এটাই কাফেরদের জন্য শেষ অবকাশ।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ **(বরং কাফেররা মিথ্যা আরোপ করে থাকে।)**

কুফ্‌রির পরিণাম

কুফ্‌রী অন্তরের রোগ, মনের ব্যাধী। এখান থেকে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং সত্যকে মিথ্যা বলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যার প্রতিফল হয় ধ্বংস এবং গোমরাহী। এই প্রবণতা মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বিবেচনাকে অকেজো করে তোলে। পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন মক্কার কাফেররা এই রোগে আক্রান্ত ছিল। তাই তারা তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেনি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো নবীকে পেয়েও তারা তাঁকে মূল্যায়ন করতে পারেনি। পবিত্র কুরআনের মত আসমানী কিতাব লাভ করেও নিজেদের জীবনকে পশুত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। এসবই কিছু অভিশাপ ও কুফ্‌রীর পরিণাম। এখানে যেমন রয়েছে কাফেরদের প্রতি ধিক্কার, তেমনি রয়েছে মু'মিনদের প্রতি সতর্কবাণী। উভয়ের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক কিছু।

পরশ্রীকাতরতা

কুফ্‌রীর পরিণামে কাফেররা নিজেরা ধ্বংস হয়ে ক্ষান্ত হয় না, বরং তারা পরশ্রীকাতর হয়ে মুসলমানদেরকে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার পায়তারা করে থাকে। এরূপ আচরণ শোভনীয় নয়। কিন্তু কুফ্‌রীর পরিণাম এরূপই হয়ে থকে। ওরা মানুষ রূপী পশু এবং জানোয়ার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

بَلْ هُمْ اَضَلُّ.

অর্থাৎ, তারা পশু বরং পশুর চেয়েও অধম এবং গোমরাহ। (সূরা আ'রাফ: ১৭৯)

তাই দেখা যায় কাফেররা ইসলাম এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে সদা সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই কাফেররা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধে রত হয়। আর অদ্যাবধি তাদের এ আচরণ অব্যাহত রয়েছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ **(তারা মনে মনে যা পোষণ করে থাকে, আল্লাহ পাক তা বিশেষভাবে অবগত আছেন।)**

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহান রব্বুল আলামীন সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত। তিনি যেমন তাদের প্রকাশ্য দূরভিসন্ধি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তেমনি অন্তরের গোপন ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধি সম্পর্কেও অবগত। তাই তিনি তাদের বেলায় স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করে থাকেন, যার মুকাবেলা করার ক্ষমতা কারো নেই। বদর, উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বে অন্যান্য নবী রসূলগণের যুগের ঘটনাবলিতেও এর যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। যদি মুসলমানগণ তাদের আদর্শ– ঈমান ও আমলের উপর দৃঢ় থাকে, তাহলে আজও আল্লাহ পাকের একই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ **(সুতরাং তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।)**

ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। তারা মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের শত্রু। এরূপ যারা করে তাদের ভাগ্যে রয়েছে আযাব, ভীষণ শাস্তি। এ শাস্তি বস্তুজগতেও ভুগতে হয়, কিন্তু অনেক সময় তা অনুভূত হয় না। মদ্যপরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন তাদের অবস্থা অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি কাফের বেদীনরা কুফ্‌রীর নেশায় নেশাগ্রস্ত থাকাবস্থায় আযাব অনুধাবনে অক্ষম হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময়, বরযখী জীবনে, ময়দানে হাশরে এবং জাহান্নামে সব নেশার ইতি ঘটবে এবং সব কিছুই দৃশ্য হয়ে সম্মুখে আসবে, অন্ধ চক্ষু উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন কঠোর আযাবে আক্রান্ত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন এবং ঈমান আমলের ওয়াদা অঙ্গীকার করবে, কিন্তু তখন তাদের আবেদনের উত্তর এই ভাবে দেয়া হবে–

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ .

অর্থাৎ, ওখানেই তোমরা লাঞ্ছিত হও, আমার সাথে কোন কথা বল না। (সূরা মুমিনূন: ১০৮)

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (তবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্য আছে অনন্ত পুরস্কার।)

আল্লাহ পাক বড় মহান, অতি দয়ালু। পাপাচারী কাফেরদেরকেও দয়া করে থাকেন। শুধু দয়া করেই বস্তুজগতের শারীরিক এবং ভিতর বাইরের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না বরং তিনি তাঁর দয়ার তাগিদেই ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি কাফের-মুনাফেকরা তাদের অপকর্ম ছেড়ে দেয় এবং ঈমান-আমলের পথে ফিরে আসে, তাহলে পূর্বের সব কিছুই ক্ষমা করে দেন। আর ঈমান-আমলের যথাযথ পুরস্কার দিয়ে থাকেন। যার ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতে পরম সুখ-শান্তি লাভে ধন্য হতে পারে।

আল্লাহর রহমত লাভের উপলক্ষ্য

তবে যেমন মানুষ মানুষের প্রতি দয়া-মায়া করে থাকে কোন উপলক্ষের ভিত্তিতে, তেমনি আল্লাহ পাকের করুণা এবং দয়া লাভের জন্যও প্রয়োজন হয় উপলক্ষের। আর সেই উপলক্ষ হচ্ছে ঈমানও নেক আমল। এ দুয়ের ভিত্তিতেই আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অনুকম্পা এবং রহমত করে থাকেন। ঈমান এবং নেক আমল– এই উভয় কাজ সমন্বয়কারীর প্রতি আল্লাহর দয়া এবং কৃপা বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়।

নেক আমল বলতে কী বুঝায়?

নেক আমল বলতে দুটি জিনিসকে বুঝায়। ইখলাছ এবং সুন্নাত। অর্থাৎ, যে আমল ইখলাছের সাথে সুন্নাত তরীকায় করা হয় তাকে নেক আমল বলা হয়। এই দুয়ের সম্পর্ক আত্মা এবং শরীরের সম্পর্কের ন্যায়। যেমন আত্মার কার্যকারিতার জন্য দেহের প্রয়োজন, তেমনি করে আমলের কার্যকারিতার জন্য ইখলাছ এবং সুন্নাতের প্রয়োজন; একটি ব্যতীত অপরটির কার্যকারিতা নেই। যখন মানুষের আমল ইখলাছ এবং সুন্নাত ভিত্তিক হয়, তার পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাক তাঁর রহমত এবং মহব্বতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। আলোচ্য সূরার শেষ আয়াতে এই সত্যের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

(৪) সূরা বুরূজ, মাদানী
২২ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ①	(১) বুরূজ (গ্রহ-নক্ষত্র) বিশিষ্ট আসমানের কসম।
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ②	(২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (কসম)।
وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ③	(৩) এবং সে দিনের, যে উপস্থিত হয় এবং যাতে উপস্থিত হয় (তার কসম)
قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ④	(৪) ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা।
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑤	(৫) জ্বালানী কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগকারীরা।
اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⑥	(৬) যখন তারা সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল।
وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ⑦	(৭) এবং মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা স্বচক্ষে দেখছিল।

শব্দার্থ

وَالسَّمَآءِ আসমানের কসম, ذَاتِ الْبُرُوْجِ গ্রহ বিশিষ্ট, الْمَوْعُوْدِ প্রতিশ্রুত, شَاهِدٍ উপস্থিত হয়, مَشْهُوْدٍ যাতে উপস্থিত হয়, قُتِلَ অভিশপ্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, الْاُخْدُوْدِ গর্ত, খাই, النَّارِ অগ্নি, ذَاتِ الْوَقُوْدِ জ্বালানী কাষ্ঠে, هُمْ তারা, عَلَيْهَا সম্মুখে, قُعُوْدٌ উপবিষ্ট হয়ে, مَا يَفْعَلُوْنَ যা করছিল, شُهُوْدٌ দেখছিল।

সূরা পরিচিতি

এই সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা শব্দের অনুকরণে সূরার নামকরণ কর হয়। সূরাটি মক্কী। এতে রয়েছে ১টি রুকূ, ২২ টি আয়াত, ১০৯ টি বাক্য এবং ৪৬৫টি অক্ষর।

এর পূর্বে সূরায়ে শাম্‌স এবং পরে সূরা ওয়াত্‌তীন অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ হুরাইরা এবং হযরত জাবের (রা.) বলেন, 'রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহর, আছর এবং ইশার নামাযে এই সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।'

ভাবার্থ

চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহাদি বিশিষ্ট আকাশের, কেয়ামতের এবং বিচার দিনের শপথ, যারা গভীর গর্ত করে তাতে জ্বালানী কাষ্ঠ জমা করে অগ্নি সংযোগ করার পর মু'মিনদেরকে নিক্ষেপের আয়োজন করেছিল

এবং তাতে নিক্ষেপ করে এহেন নৃশংস কাণ্ড স্বচক্ষে দেখছিল, তারা অভিশপ্ত এবং ধ্বংস হয়েছে। এই নির্যাতনের পেছনে কোন অপরাধ কারণ ছিল না? হ্যাঁ, এ অপরাধ যে, তারা আসমান ও যমীনের অধিপতি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আনুগত্যের প্রকাশ করেছিল। এই নির্যাতনকারীদের জন্য রয়েছে চরম ভোগান্তি। তাদেরকে এ অপরাধের শাস্তি ভুগতেই হবে। তাদেরকে বিচারের জন্য নির্ধারিত সময় হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাকের আদালতে অবশ্যই হাজির হবে এবং চির জাহান্নামের কঠোর আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। আল্লাহর এই বিধানের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত।

যোগসূত্র

(ক) এর পূর্বের সূরা ইনশিকাকে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আর এই সূরাতে বিদীর্ণ হওয়ার বস্তু বুরুজের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উভয় সূরার মধ্যে সামঞ্জস্যও প্রমাণিত হয়।

(খ) উভয় সূরায় আলোচিত বিষয়বস্তুর ভিতর পূর্ণ সমতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা পূর্বের সূরায় পবিত্র কুরআনের মর্যাদা, মু'মিনদের কামিয়াবী এবং কাফেরদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য সূরাতেও এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

(ক) যখন মক্কায় নবুয়তের সূর্য উদিত হয় আর কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হতে শুরু করে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের শীতল ছায়ার নীচে আশ্রয় নেয়, তখন কাফেররা অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হয় এবং চরম শত্রুতায় মেতে ওঠে। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করে, অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, গরম এবং তপ্ত পাথরে চাপা দিয়ে রাখে, শরীর উলঙ্গ করে দেহে আঘাত করে প্রভৃতি। মোটকথা অসহনীয় নির্যাতনে মুসলমানদেরকে অস্থির করে তোলে।

(খ) নির্যাতিত মুসলমান সাহাবীগণ অনেক সময় রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতেন। এতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর ব্যথায় ফেটে যেত। অশ্রুশিক্ত নবী তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন, ধৈর্য ধরতে বলতেন। 'একদিন আল্লাহ পাক জালেমদের খবর নিবেন, তাদের শক্তি ও অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের বিজয় সাধিত হবে, তাদের জীবনে চরম ও পরম শান্তি এবং নিরাপত্তা কায়েম হবে, অবশ্যই হবে।'– এভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন।

(গ) কাফেররা মুসলমানদেরকে দেয়া রসূলের সান্ত্বনা বাণী শোনে আরো অধিক হাসাহাসি করত, ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, আর বলত, আরে তোমাদের নবী তোমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, তোমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে, যদি সে সত্যই নবী হত, যদি তাকে আল্লাহ পাঠিয়ে থাকতেন, তাহলে কি তিনি তোমাদের অবস্থা দেখেন না এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন না?

(ঘ) মক্কার কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার এবং তাদের ধৃষ্টতার জবাবে আল্লাহ পাক এই সূরাটি নাযেল করেন। এর মর্ম কথা হলো, কাফেরদের উক্তি একান্ত ভিত্তিহীন। তারা সম্পূর্ণ বাতিলের উপর বিদ্যমান। তাদেরকে তাদের ধৃষ্টতা এবং জুলুম-অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত ভুগতে হবে। এর জন্য রয়েছে

www.maktabatulabrar.com

নির্ধারিত সময়, নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা। এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে সময় দেয়া হচ্ছে। যদি তারা এর ভেতর বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে সক্ষম হয় এবং পাপাচারিতার পথ পরিহার করে সঠিক সরল পথ অবলম্বনে ব্রতী হয়, তাহলে ভাল, অন্যথায় নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে তাদের ধৃষ্টতা এবং পাপাচারিতার সমীচীন শাস্তি অবশ্যই ভুগতে হবে। এটাই আল্লাহ পাকের বিধান। আর আল্লাহর অটল বিধানের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারও নেই।

তাফসীর

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ **(বুরূজ [গ্রহ-নক্ষত্র] বিশিষ্ট আসমানের কসম।)**

بروج (বুরূজ)-এর অর্থ

প্রসিদ্ধ আভিধানিক আল্লামা রাগিব ইছফাহানী বলেন, بروج শব্দটি আরবী برج এর বহুবচন। কক্ষ, দুর্গ এবং প্রাচীর- এর মূল অর্থের অন্তর্ভুক্ত। চন্দ্র এবং সূর্যের প্রদক্ষিণ পথের কল্পিত দ্বাদশ কক্ষপথ বা রাশিকেও বুরূজ বলা হয়।

আলোচ্য সূরায় বুরূজ সমন্বিত এবং বুরূজবিশিষ্ট আকাশের অর্থ কী হতে পারে, এ নিয়ে মুফাস্সিরগণ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিকদেরও রয়েছে এ ব্যাপারে মতামত। নিম্নে এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মত ও মুফাসসিরগণের মত বিস্তারিত তুলে ধরা হল।

بروج (বুরূজ) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মতামত

বুরূজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মত পর্যালোচনার পূর্বে আকাশের অস্তিত্ব এবং পৃথিবী ও সূর্য গতিশীল কি না এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের প্রয়োজন। কেননা, এ ব্যাপারে প্রাচীন এবং আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একশ্রেণির বৈজ্ঞানিকদের মতে আসলে পৃথিবী গতিশীল, সূর্য গতিশীল নয়। তবে সাধারণের দৃষ্টিতে সূর্যও গতিশীল মনে হয়। আরেক শ্রেণির বৈজ্ঞানিকদের মতে চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবী সবই গতিশীল। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দুই প্রকার গতি দেখা যায়।

(১) উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। এই আবর্তন দ্বারা একটি বৃত্ত হয়, যে বৃত্তটি ১২ ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলোকে কক্ষ, রাশি চক্র বা বুরূজ বলা হয়। এর শুরু এবং শেষেই সৌর মাসের শুরু এবং শেষ হয় এবং যখন সম্পূর্ণ বৃত্তটি অর্থাৎ, সমস্ত রাশিসমূহের প্রদক্ষিণ হয়ে যায় তখন সৌর বৎসর শেষ হয় এবং নতুন বৎসর আরম্ভ হয়।

(২) পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এর দ্বারা দিবারাত্র হয়, যা সাধারণভাবে দেখা এবং বোঝা যায়। আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে আকাশের অস্তিত্ব অদ্যাবধি অজ্ঞাত। তারা উর্ধ জগতের নীলাবরণকে আকাশ মনে করে বটে, কিন্তু সৌর জগতের অবশ্য স্বীকৃতি দেয়। তাদের মতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার কক্ষ পথে গতিশীল এবং ঘুরে থাকে। এরই আবর্তনে পৃথিবীতে শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতু হয়ে থাকে।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের মতামত

প্রাচীন গ্রীক, রোমান এবং মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের মতে আকাশে ১২টি বুর্জ রয়েছে, বাংলা ভাষায় যাকে রাশি বলা হয় তা নিম্নরূপ:

১. হামাল (حمل) তথা মেষ রাশি: ২৩টি নক্ষত্র সমন্বয়ে মেষের আকৃতি ধারণ করে।
২. ছাওর (ثور) তথা বৃশ রাশি: ৩২টি নক্ষত্র সমন্বয়ে বৃশের আকৃতি ধারণ করে।
৩. জাওযা (جوزاء) তথা মিথুন রাশি: ১৮টি নক্ষত্র সংযুক্ত হয়ে দুজন মানুষের আকৃতি ধারণ করে।
৪. সারতান (سرطان) তথা কর্কট রাশি: ৯টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত হয়।
৫. আসাদ (اسد) তথা সিংহরাশি: ২৭টি নক্ষত্র সমন্বয়ে সিংহরূপ ধারণ করে।
৬. সুম্বুলাহ (سنبله) তথা কন্যা রাশি: ২৬টি নক্ষত্র সমন্বয়ে কন্যার আকৃতি ধারণ করে।
৭. মীযান (ميزان) তথা তুলারাশি: ৮টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।
৮. 'আকরাব (عقرب) তথা বৃশ্চিক রাশি: ২১টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।
৯. কাউস (قوس) তথা ধনুক রাশি: ৩১টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।
১০. জাদয়ী (جدى) তথা মকর রাশি: ২৮টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।
১১. দালভ (دلو) তথা কুম্ভ রাশি: ৪২টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।
১২. হুত (حوت) তথা মীন রাশি: ২৬টি নক্ষত্র সমন্বয়ে গঠিত।

এই রাশিগুলোর মধ্যে প্রথম ছয় রাশিতে সূর্য অবস্থানকালে গ্রীষ্মকাল দেখা দেয় এবং হামাল অর্থাৎ, মেষ রাশি থেকে সারতান অর্থাৎ, কর্কট রাশি পর্যন্ত দিন বৃদ্ধি পায় এবং এরপর থেকে কমতে থাকে। মেষ এবং তুলা রাশি অবস্থানকালে দিন রাত সমান হয়। আর শেষের ছয় রাশিতে সূর্য অবস্থান কালে শীতকাল আরম্ভ হয়।

মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতামত

আলোচ্য আয়াতে বুরূজ দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। যথা:

(ক) একশ্রেণির মুফাস্‌সিরীন কোন প্রকার মন্তব্য ব্যতীত বৈজ্ঞানিকদের বুরূজ সম্পর্কীয় মতামত উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

(খ) কারও কারও মতে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত ১২টি বুর্জকে আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের মতে আল্লাহ পাক কালের পরিবর্তন ইত্যাদির কসম করে দৃষ্টান্ত এবং সাক্ষ্য পেশ করে ইরশাদ করেন যে, 'যেমন দিন রাতের পরিবর্তন বা মাস ও ঋতুর পরিবর্তনে অসংখ্য ঘটনাবলির পরিবর্তন ঘটে, যথা তাঁরই শক্তি এবং ক্ষমতার প্রক্রিয়া, তেমনিভাবে আরও বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন নতুন ঘটনাবলি ঘটবে, অবশ্যই ঘটবে। যারা আজ ধনসম্ভারের অধিকারী ও ভোগ-বিলাসিতায় জীবনযাপন করছে, আর মু'মিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নে জর্জরিত করে তুলছে, তারা পাষণ্ড এবং নিষ্ঠুরতায় লিপ্ত; একদিন অবশ্যই তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে, চরম হতাশা এবং কঠোর আযাবে আক্রান্ত হতে হবে। আর মু'মিনগণ হবে পুরস্কৃত, পরম সুখী এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত এবং কল্পিত বুরূজকে আয়াতের লক্ষ্যবস্তু স্থির করা নিম্নোক্ত কারণে সঠিক বলে মনে হয় না:

(১) বুরূজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ তাদের দেয়া তত্ত্বে সন্দেহের পথ সুগম করে, আর অনিশ্চিত তত্ত্বকে পবিত্র আয়াতের মূল লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা সঠিক নয়।

(২) বৈজ্ঞানিকদের মতামতের ভিত্তি হচ্ছে আকাশের সার্বক্ষণিক গতিশীল হওয়া এবং গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতিশীলতার উপর, অথচ এটা একেবারেই অবাস্তব। কেননা, পবিত্র কুরআন এবং হাদীছ দ্বারা গ্রহাদি এবং নক্ষত্র গতিশীল বলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। সুতরাং আকাশে স্থিতিশীল গ্রহাদিকে বুরূজ বলার মোটেই অবকাশ নেই। এ কারণেই মুফাস্‌সির রাযী এবং মাজহারী বুরূজ-এর বৈজ্ঞানিক অর্থ সম্পূর্ণ অগ্রহণীয় বলে মন্তব্য করেছেন। মুফাস্‌সির আলূসী বলেন, কতিপয় মুসলিম বৈজ্ঞানিক বুরূজ-এর অর্থকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য ভিত্তিহীন পথ অবলম্বন করেছেন। শরীয়ত মোটেই এর সমর্থন করে না।

(৩) স্বভাব শক্তি বহির্ভূত, ইন্দ্রীয় বহির্ভূত ও সাধারণ জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়ে সঠিক তত্ত্ব নিরূপণের মূল উৎস হচ্ছে ওহী। আর ওহীর বর্ণনা ও বিশদ বিবরণকারীদের প্রধান সূত্র হচ্ছে সাহাবা, তাবিয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস, হযরত জাবের, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, হাসান, জাহ্‌হাক, আবূ সালেহ এবং সুদ্দীসহ বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণ বুরূজ এর অর্থ করেছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অর্থের সাথে তাদের বক্তব্যের কোন মিল নেই।

بروج (বুরূজ)-এর সঠিক অর্থ

(ক) হযরত ইব্‌নে আব্বাস, মুজাহিদ, জাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা প্রমুখের মতে বুরূজ দ্বারা বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রদিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত জাবের ইব্‌নে আব্দুল্লাহর হাদীছ দ্বারা এর সমর্থন লাভ হয়।

(খ) আউফী এবং জাহ্‌হাকের মতে বুরূজ এর দ্বারা আকাশে বিদ্যমান বিরাট বিরাট দুর্গ এবং প্রাচীরসমূহকে বুঝানো হয়েছে। মুহাদ্দিছ সুলাইমান ইব্‌নে মেহরান বলেন, 'হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রা.)-এর সকল ছাত্রই এই মত পোষণ করতেন। বোখারী এবং মুসলিমের হাদীছে আকাশে বাইতুল মামূরের কথা রয়েছে এবং মুহাদ্দেছ ইব্‌নে ওয়াহাব বলেন, সমস্ত আকাশে জান্নাতীদের আত্মার সমাবেশ স্থান– দারুল বাইযা বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে,

او المراد بالبروج ابواب السماء .

অর্থাৎ, বুরূজ এর দ্বারা আকাশের দরজাকে বুঝানো হয়েছে।

(ঘ) ইব্‌নে জারীর বিভিন্ন অর্থ সমূহ উদ্ধৃত করে বলেন,

اوفى الاقوال منازل ... الشمس...فى كل برج منها شهرا .

অর্থাৎ, বুরূজ দ্বারা চন্দ্র সূর্যের কক্ষপথকে বুঝানো হয়েছে। চন্দ্রের জন্য ২৮টি, (দুই দিন চন্দ্র অদৃশ্য থাকে।) আর সূর্যের জন্য ১২টি।

মূলত উপরোক্ত মতামতসমূহে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আকাশে নক্ষত্র, দরজা এবং চন্দ্র সূর্যের কক্ষপথ সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে, এসব কিছুর কসমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত হওয়ার প্রতি আলোকপাত করেছেন।

وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ **(এবং প্রতিশ্রুত দিবসের কসম।)**

প্রতিশ্রুত দিবস

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুত দিবসের শপথ করেছেন। এখানে প্রতিশ্রুত দিবস বলতে কোন দিনকে বুঝিয়েছেন, এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা, আবূ মালেক আশ্আরীর সূত্রে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, يوم القيامة 'কেয়ামতের দিন' এই দিন হল মানুষের কৃতকর্মের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত দিন।

وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ **(এবং [কসম] সে দিনের, যে দিন উপস্থিত হয় এবং যাতে উপস্থিত হয়।)**

شاهد و مشهود (শাহিদ ও মাশহুদ)-এর অর্থ:

আল্লামা কাফ্ফালের মতে شاهد -এর দুটি অর্থ করা যেতে পারে:

(১) অন্যের উপর যে কোন ধরনের অধিকার এবং হক সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষদাতার অর্থে। মুফাস্সির রাযীর মতে এখানে এ অর্থের অবকাশ নেই। কেননা, এ অর্থের জন্য 'আলাইহি' অথবা 'লাহু' صلہ -এর প্রয়োজন, অথচ এখানে এরূপ হয়নি। কিন্তু বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আলাইহি' অথবা 'লাহু' উহ্য রয়েছে। পবিত্র আয়াত– ان العهد كان عنه مسؤلا এর নজীর। কেননা, مسئولا -এর পর عنه উহ্য রয়েছে।

(খ) শাহিদ এবং মাশহুদ-এর আরেক অর্থ উপস্থিতি। মুফাস্সির রাযী এ অর্থকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন।

মূলত শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থ রাখে। যে কারণে আলোচ্য আয়াতে শাহিদ এবং মাশহুদের ত্রিশের অধিক অর্থ করা হয়েছে। যথা:–

১. শাহিদ-এর দ্বারা কেয়ামতের ময়দানে সমগ্র সৃষ্টির উপস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। আর মাশহুদ-এর অর্থ কেয়ামতের দিন। হযরত ইবনে আব্বাস এবং জাহ্হাক থেকে এরূপ মতের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। (হাসান ইবনে আলী, ইবনুল মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ, ইকরামা এবং ইবনু আবী নাজীহ থেকেও এরূপ মত পাওয়া যায়।) এই মতটির সমর্থনে বলা যায় যে,

(ক) আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে ফেরেশতা, নবী-রসূল, মানুষ এবং জীনকে ময়দানে হাজির করবেন। ফলে এটা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশ, যার কসম খাওয়া যুক্তিপূর্ণ এবং গুরুত্ব রাখে।

(খ) পূর্বের আয়াতে কেয়ামতের উল্লেখের পর এই আয়াতে শাহিদ-এর অর্থ 'ময়দানে কেয়ামতে হাজির হবে'– ধরে নিলে উভয় আয়াতের অর্থ অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত হয়। এমতাবস্থায় مشهود (মাশহুদ)-এর অর্থ হবে কেয়ামতের ময়দানে পরিদৃশ্যমান আশ্চর্যজনক অবস্থা ও ঘটনাবলি।

(গ) অনেক আয়াত এবং হাদীছে মাশহুদ-এর অর্থ কেয়ামত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এখানে মাশহুদ-এর অর্থ কেয়ামত ধরা হলে ঐ সমস্ত আয়াত এবং হাদীছের সাথেও সমতা রক্ষা হয়। কিন্তু

শাহিদ এবং মাশহুদ-এর এই অর্থ দুটি কারণে বোধগম্য নয়। প্রথম কারণ হচ্ছে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামত দিবসের উল্লেখ রয়েছে বিধায় এ আয়াতে মাশহুদ-এর অর্থ কেয়ামত করার অবকাশ নেই। মুফাস্সির মাজহারী এরূপ উক্তি করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অনেক আয়াত এবং হাদীছে মাশহুদ-এর অর্থ কেয়ামত করা হয়েছে বলে এখানেও একই অর্থ হতে হবে– এরূপ বাধ্যবাধকতার কোন কারণ এখানে নেই। তা ছাড়া অনেক আয়াত এবং হাদীছে মাশহুদ-এর আরো অর্থ বর্ণিত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ আমরা পেশ করব। সুতরাং এটাও কোন উপযুক্ত কারণ নয়।

২. মাশহুদ-এর দ্বারা জুমুআর দিনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর, ইবনুয যুবায়ের, ইব্নে আব্বাস, হাসান ইব্নে আলী এবং ইকরামা থেকে এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। এই মতটির সমর্থনে দুটি হাদীছ ও একটি নজীর বিদ্যমান রয়েছে। যথা:–

اكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فانه يوم مشهود .

তোমরা জুমুআর দিন আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে, কেননা এই দিন ফেরেশতাদের উপস্থিতির দিন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تحضره الملئكة ابواب المسجد فيكتبون الناس .

জুমুআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আগত লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করে, আর ইমাম খুৎবার জন্য বের হলে খাতা বন্ধ করে ফেলে।

ফজরের নামাযে ফেরেশতাগণ হাজির হয় বলে ফজরকে পবিত্র কোরআনে মাশহুদ বলা হয়েছে, সুতরাং জুমুআকে মাশহুদ বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

৩. মাশহুদ দ্বারা আরাফার দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, ইব্নে আব্বাস, ইব্নে ওমর, আবূ মালেক আশআরী, ইব্নে মুত্ইম, ইবনুল মুসাইয়্যেব, হাসান বসরী, রবী ইব্নে আনাস, কাতাদা এবং ইবরাহীম নাখ্য়ী থেকে এরূপ মত উদ্ধৃত রয়েছে। আর শাহিদ-এর অর্থ উপস্থিত হাজীবৃন্দ।

৪. মাশহুদ দ্বারা يوم النحر অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, এই দিনে মুযদালিফা এবং মীনায় বিরাট জমায়েত হয়। হযরত আলী (রা.) এবং ইবরাহীম নাখ্য়ী থেকে এই মত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫. শাহিদ শব্দটি সাক্ষী অর্থে এর দ্বারা আল্লাহ পাকের সত্তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ মতটি হযরত ইব্নে আব্বাস, হাসান বসরী এবং সাঈদ ইব্নে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। পবিত্র কোরআনে শাহিদ শব্দটি বহু স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় মাশহুদ-এর অর্থ হবে 'তাওহীদ'।

৬. শাহিদ অর্থ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত ইব্নে আব্বাস ও হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে এই মতটি বর্ণিত। এবং মাশহুদ-এর দ্বারা সমস্ত নবী-রসূলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের দ্বারা এই মতের সমর্থন লাভ হয়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا .

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, আমি তোমাকে শাহিদ, মুবাশশির এবং নাযীর করে পাঠিয়েছি। (সূরা আহযাব: ৪৫)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا .

তাহলে কী অবস্থা হবে, যখন আমি উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষ্যদাতা আর তোমাকে তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত করব? (সূরা নিছা: ৪১)

৭. শাহিদ দ্বারা সমস্ত নবী রসূলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর মাশহুদের অর্থ হচ্ছে সমস্ত উম্মত। হাসান ইব্নে ফজল, আব্দুল আজীজ এরূপ মত পোষণ করেছেন।

৮. শাহিদ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং মাশহুদের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৯. শাহিদ অর্থ ফেরেশতা, আর মাশহুদ অর্থ মুকাল্লাফ তথা যারা শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনে আদিষ্ট। আল্লাহ পাকের ইরশাদ,

جَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ .

প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে আর তার সাথে থাকবে একজন চালক ও কর্মের সাক্ষী। (সূরা নাজম: ২১)

১০. শাহিদ ফেরেশতা আর মাশহুদ মানুষ, যাদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেয়ামতের দিন সাক্ষী হবে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

যেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে কাজ তারা করত সে সম্বন্ধে। (সূরা নূর: ২৪)

হযরত ইব্নে যুবায়ের, মুকাতিল এবং আতা খুরাসানী এরূপ মত পোষণ করেছেন।

১১. শাহিদ হল জুমআর দিন আর মাশহুদ আরাফার দিন। এ ব্যাপারে হযরত আবূ মূসা আশআরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য এই হাদীছের সূত্র ইব্নে উবায়দাকে ইবনে সাঈদ এবং কোন কোন মুহাদ্দিছ দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু শু'বা এবং ছাওরীর মত মুহাদ্দিছগণ তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। কারণ, তার এরূপ দুর্বলতার কোন প্রক্রিয়া নেই। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে 'হাসান' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর 'হাসান' হাদীছ প্রমাণযোগ্য। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠ তাবিয়ী সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যেবের মুরসাল হাদীছেও এর সমর্থন বিদ্যমান। হযরত আলী, ইব্নে মুত্ইম, আবূ মালেক আশআরী, ইব্নে আব্বাস, ইব্নে ওমর, হাসান বসরী, রবী' ইব্নে আনাস ও কাতাদা থেকে এরূপ মত উদ্ধৃত আছে।

www.maktabatulabrar.com

১২. শাহিদ হল আরাফা আর মাশহুদ হল যিলহজের দশ তারিখ। হযরত আলী ও ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

১৩. শাহিদ হযরত ঈসা। ইরশাদে রব্বানী,

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ .

আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। (সূরা মায়েদা: ১১৭)

১৪. শাহিদ আল্লাহ, মাশহুদ কেয়ামতের দিন। কালামে রব্বানী يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن (অর্থাৎ, তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করল আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। [সূরা ইয়াছীন: ৫২]) এর সমর্থন করে।

১৫. শাহিদ মানুষ, মাশহুদ তাওহীদ। কালামে ইলাহী واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى (অর্থাৎ, তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? [সূরা আ'রাফ: ১৭২]) এর সমর্থন করে।

১৬. শাহিদ মানুষ, মাশহুদ কেয়ামতের দিন। আয়াতে পাক– ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين (অর্থাৎ, যাতে তোমরা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে গাফেল ছিলাম। [সূরা আ'রাফ: ১৭২]) এর সমর্থন করে। মুজাহিদ, ইব্নে আবী নাজীহ, ইব্নে আব্বাস, মুহাম্মাদ ইব্নে কাআব, জাহ্হাক ও ইকরামা থেকে এ মতটি বর্ণিত।

১৭. শাহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য কেয়ামত আর মাশহুদ দ্বারা উদ্দেশ্য যারা কেয়ামতে সমবেত হবে। হযরত ইব্নে আব্বাস, হাসান ইব্নে আলী, সাঈদ, মুজাহিদ, ইকরামা, নাখয়ী, ছাওরী ও জাহ্হাক এ মতের পক্ষে।

১৮. শাহিদ হল যিলহজ্জের আট তারিখ আর মাশহুদ হল হাজীগণ। ইবনুল মুসাইয়্যেব ও আবূ বকর আততার-এর মত এরূপ।

১৯. শাহিদ হল আদম আলাইহিস সালাম ও বনী আদম আর মাশহুদ হল কেয়ামতের দিন। মুজাহিদ, ইকরামা, আতা ইব্নে ইয়াসার এ মতের পক্ষে।

২০. শাহিদ হল উম্মতে মুহাম্মাদী আর মাশহুদ হল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাসান ইব্নে ফজল, আব্দুল আজীজ এমতের পক্ষে।

২১. শাহিদ হল হাজরে আসওয়াদ আর মাশহুদ হল চুম্বনকারীগণ। আবূ বকর আত্তার এই মত পোষণ করেন।

২২. শাহিদ সম্পদ, যমীন আর মাশহুদ মালিক।

২৩. শাহিদ জুমআর দিন আর মাশহুদ নাজমের দিন।

২৪. শাহিদ মাশহুদ জুমআ ও সোমবার।

২৫. শাহিদ মাশহুদ দেহ এবং দেহের মালিক।

২৬. শাহিদ মাশহুদ আগত এবং প্রত্যাগত ফেরেশতা।

২৭. শাহিদ মাশহুদ নক্ষত্র এবং রাত-দিন।

২৮. শাহিদ আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মুজতাহিদীন আর মাশহুদ তাওহীদ।

২৯. শাহিদ রাত দিন এবং মাশহুদ বনী আদম।

৩০. শাহিদ গর্তে নিক্ষিপ্ত মাতার সন্তান এবং মাশহুদ তার জননী।

৩১. শাহিদ মাশহুদ উম্মতে মুহাম্মাদী এবং অন্যান্য উম্মত।

চূড়ান্ত মত

মূলত উপরিউক্ত অর্থসমূহে কোন বিরোধ নেই, বরং শাহিদ মাশহুদের অর্থে এর অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। তার দুটি কারণ। যথা:-

(ক) সাহাবী ও তাবিয়ীগণের হাদীছে এর প্রমাণাদি রয়েছে। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুস্তাদরক, বায়হাকী, তাবারানী, ইব্নে জারীর, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকসহ হাদীছ এবং তাফসীরের কিতাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যার বিশদ বিবরণে বিজ্ঞ মুহাদ্দিছীন এবং ফকীহগণ মন্তব্য করেছেন।

(খ) শাহিদ এবং মাশহুদ শব্দ দুটি 'নাকিরা' ব্যবহারের কারণে অর্থের ব্যাপকতার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে মুফাস্সির মাজহারী রহ. এবং বিশিষ্ট মুফাস্সিরীনে কেরাম শাহিদ এবং মাশহুদ-এর ব্যাপক অর্থের অবকাশকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য হাদীছ শরীফের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে শাহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য জুমুআ আর মাশহুদ দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফা- এই মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

কসমের উদ্দেশ্য

মোটকথা আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বুরুজ সম্বলিত আকাশ, প্রতিশ্রুত দিন এবং শাহিদ মাশহুদের কসম করেছেন। কসম করে তিনি কী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কসমের জবাব কোন্‌টি, এ নিয়ে মুফাস্সিরীনে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা:

(ক) কোন কোন মুফাস্সিরের মতে যে বিষয়ে কসম করা হয়েছে, সে বিষয়টিকে উহ্য রাখা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ হয়ে থাকে। কারণ, শ্রোতাগণ তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা বুঝতে সক্ষম হয়। তাই উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। তবে এখানে সে বিষয়টি কী, যা উহ্য রয়েছে? তিনটি বিষয় হতে পারে যা উহ্য রাখা হয়েছে। যথা:

ملعنون . لمقتولون . لتبعثن .

প্রথমটির অর্থ, গর্ত খোদাইকারীদের মতো অবশ্যই কুরাইশের কাফেররা অভিশপ্ত। দ্বিতীয়টির অর্থ হবে, কুরাইশের কাফেরদের হত্যার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয়টির অর্থ হবে, মৃত্যুর পর সকলকেই পুনর্জীবিত করা হবে। তখন কাফেররা তাদের জুলুমের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে, আর আজ মু'মিনগণ মজলুম, অতএব কাল তারা পুরস্কৃত হবে। আল্লামা যামাখশারী এবং আম্বারী এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কিন্তু মুফাস্সির আলূসী ليس بشئ অর্থাৎ, 'এটা কোন বিষয়ই না।' বলে এর খণ্ডন করেছেন।

(খ) আল্লামা যুজাজ এবং মুবাররাদ বলেন, পরবর্তী বাক্য ان بطش ربك لشديد হল কসমের জবাব। সাহাবী হযরত ইব্নে মাসউদ (রা.) এবং কাতাদা (রহ.) থেকেও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কসম এবং কসমের জবাবে দীর্ঘ দূরত্ব থাকায় মুফাস্সির কুরতুবী মতটিকে অপছন্দ করেছেন।

(গ) কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, قتل اصحاب الاخدود থেকে কসমের জবাব শুরু হয়েছে। অবশ্য পূর্বে "লাম" শব্দ ধরে নিতে হবে। এর নজীর পবিত্র কুরআনে বিরল নয়। আখ্‌ফাশ এবং ফার্‌রাও এরূপ মত পোষণ করেছেন।

(ঘ) কারো কারো মতে ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات থেকে কসমের জবাব শুরু হয়েছে।

আসলে কালামে ইলাহীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য ব্যাপক হয় বিধায় উপরিউক্ত সবগুলো অর্থের অবকাশই বিদ্যমান রয়েছে। এই অর্থসমূহে মূলত কোন বিরোধ নেই। আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনদেরকে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা ও ঈমানের উপর মজবুত থাকার প্রতি আকৃষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা পূর্বসূরি মু'মিনদের প্রতি কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের কথা ও মু'মিনদের ধৈর্য সহ্য এবং ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন, যাতে মু'মিনগণ তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পদাংক অনুসরণ করে এবং মক্কার কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সহ্যকরণে ব্রতী হয়। মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী সেই কাফেরদের যে দুঃখজনক পরিণাম হয়েছিল, তারা যেমন কঠোর শাস্তি এবং আযাবে আক্রান্ত হয়েছিল, মক্কার কাফেরদের ভাগ্যেও রয়েছে তেমন চরম ভোগান্তি এবং কঠোর আযাব, আর মু'মিনদের জন্য রয়েছে চরম ও পরম শান্তি এবং নিরাপত্তা।

قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْد (ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা।)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল- পূর্বসূরি মু'মিনদের প্রতি কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের কথা উল্লেখ ও পূর্বসূরি মু'মিনদের তা সহ্য করার কথা বর্ণনা করে এই জমানার মু'মিনদেরকে ঈমানের উপর মজবুত থাকার প্রতি আকৃষ্ট করা। এই জমানার মু'মিনগণ যেন এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পদাংক অনুসরণ করে এবং মক্কার কাফেরদের জুলুম অত্যাচার সহ্যকরণে ব্রতী হয়। এতে এও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী আগের যুগের কাফেরদের যে দুঃখজনক পরিণাম হয়েছিল, তারা যেমন কঠোর শাস্তি এবং আযাবে আক্রান্ত হয়েছিল, তেমনি মক্কার কাফেরদের ভাগ্যেও রয়েছে চরম ভোগান্তি এবং কঠোর আযাব, আর মু'মিনদের জন্য রয়েছে চরম ও পরম শান্তি এবং নিরাপত্তা।

হকের সাথে বাতিলের সংঘাত

হক ও বাতিলের সংঘাত কোন নতুন বিষয় নয়। আবহমান কাল থেকে তা চলে আসছে। সেমতে মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের নির্যাতনমূলক অমানসিক আচরণও কোন নতুন ঘটনা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যখন থেকে হক ও বাতিলের সংঘাত শুরু হয়েছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে মু'মিনদের নির্যাতনের ইতিহাস। এই জুলুম-নির্যাতন যেমন হয়েছে সাধারণ কাফের এবং প্রভাবশালী কাফের নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে, তেমনি হয়েছে রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকেও। এই সংঘাতে একদিকে ছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল মু'মিন-মুসলমান, যাদের নিকট কোন বস্তুশক্তি ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রে তারা

www.maktabatulabrar.com

ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তবে তারা ঈমানী শক্তি এবং হকের অধিকারী ছিল, অপরপক্ষে বাতিলপন্থি রা ছিল বস্তুশক্তিতে বলিয়ান, কিন্তু ঈমানী ও হকের শক্তি থেকে তারা ছিল একেবারেই মাহরূম ও বঞ্চিত। এমতাবস্থায় কাফের শক্তি মু'মিনদেরকে ঈমানী শক্তি বর্জন করে কাফেরদের আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানায়, অন্যথায় ধ্বংস ও কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়। কিন্তু মু'মিনগণ তাদের ঈমানী শক্তিতে বলিষ্ঠ হয়ে কাফেরদের আনুগত্যের প্রতি প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জানায়।

মু'মিনদের অস্বীকৃতির কারণে কাফেরশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তির জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে গর্ত খনন করে জ্বালানি কাষ্ঠ ভরে অগ্নিকুণ্ডতে পরিণত করে। মুমিন নর-নারী, ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে পাকড়াও করে আনা হয় এবং ঈমান বর্জন করে কুফর গ্রহণ না করলে এই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপের ভয় প্রদর্শন করে। এর জবাবে আত্মমর্যাদার অধিকারী মু'মিনগণ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, 'জাহান্নামে অগ্নির মোকাবেলায় তোমাদের তৈরী অগ্নিকুণ্ড যেন তামাশা বৈ আর কিছু নয়।' তাই তারা জাহান্নামের মোকাবেলায় সন্তুষ্ট চিত্তে কাফেরদের শাস্তি বরণে সম্মত হয়। কিন্তু তাদের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাদেরকে একের পর এক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে আর মু'মিনগণ অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। আর এভাবে কাফেরী শক্তির পরাজয় এবং ঈমানী শক্তির বিজয় সাধিত হয়। কেননা, প্রকৃত বিজয় হল সত্য ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, অন্যায়ের সম্মুখে নতশির না হওয়া, অন্যায়ের হাতে আত্মসমর্পণ না করা। মুমিনগণ তা-ই করে জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় মু'মিনগণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে আর এভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দগ্ধ হয়নি, মৃত্যুও বরণ করেনি, বরং চিরঞ্জীব হয়ে জান্নাতের চির সুখশান্তি লাভে সৌভাগ্যশীল হয়েছে। আর যারা তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে তারা পরিণামে চির জাহান্নামকে প্রাধান্য দিয়েছে। আজ হোক অথবা কাল হোক তাদের শক্তির পাহাড় অবশ্যই চুরমার হবে এবং তাদেরকে তাদের ধৃষ্টতা ও জুলুমের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভুগতে হবে। তাদের অহংকার এবং অপরাধের পরিণাম জাহান্নাম এবং জাহান্নামের দগ্ধশীল অগ্নি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আর মু'মিনদের আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য তাদের চরম বিজয় ও জান্নাতের রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, যে জান্নাতের তলদেশে রয়েছে প্রবাহমান নদীসমূহ।

গর্ত খননের ঘটনা

কাফেররা মু'মিনদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছে। দেশান্তর, লুটতরাজ ও হত্যা থেকে শুরু করে এমন কোন কষ্ট জ্বালাতন নেই যা তারা মু'মিনদের সাথে করেনি। দেহকে টুকরো টুকরো করা, অগ্নিদগ্ধ করা, পাথরের নীচে চাপা দেয়া, উলংগ করে পাশবিক নিষ্ঠুর আচরণ করা কোনটাই তারা বাদ দেয়নি। মোটকথা সর্ববিধ অমানসিক নির্যাতন-নিপীড়নে মুসলমানদেরকে অতিষ্ট করে তুলেছে। এমনকি বিরাট বিরাট গর্ত খনন করত তাতে অগ্নি জ্বালিয়ে মু'মিনদেরকে নির্দয়ভাবে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আলোচ্য সূরার চার নং আয়াতে অগ্নিভর্তি কুণ্ডলীতে মু'মিনদেরকে নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হল।

মুফাস্সিরীনে কেরাম এবং ঐতিহাসিকগণ সূরায়ে বুরূজের চার নং আয়াতের তাফসীরে গর্ত খননের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা হলো, সিরিয়াতে একজন ক্ষমতাশীল

www.maktabatulabrar.com

বাদশাহ ছিল। বাদশাহদের মধ্যে স্বীয় প্রয়োজনে নিজের কাছে যাদুকর রাখার প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। এই বাদশার নিকটও একজন যাদুকর ছিল। যাদুকর তার বৃদ্ধ বয়সে বাদশাহকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন মেধাবী যুবক নিযুক্ত করার কথা জানালে বাদশাহ একজন মেধাবী যুবককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করে।

যুবকটি যথারীতি যাদুবিদ্যা শেখার জন্য যাদুকরের নিকট আসা যাওয়া শুরু করে। যুগটি ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়তের যুগ। যুবকের যাতায়াত পথে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ইনজীলের বিশিষ্ট আলেম এবং বিরাট বুযুর্গের খানকাহ্ ছিল। যেখনে অনেক লোক সমাগত হত এবং বুযুর্গের সান্নিধ্যে দ্বীনী শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করত। যুবকটি ঐ খানকায় অনেক লোকের সমাগম দেখে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এতো লোকের সমাগম কেন? লোকেরা জানাল যে, এখানে একজন আল্লাহর ওলী থাকেন, তিনি আল্লাহর সত্য নবী হযরত ঈসা (আ.) এবং আল্লাহর সত্য কিতাব ইনজীলের হুকুম-আহকামের উপর নিজেও আমল করেন এবং অন্যান্য লোকদেরকেও শিক্ষা দেন। মানুষকে তিনি বস্তুজগতের সহায় সম্পদ এবং ক্ষমতার লোভ বর্জন করে আল্লাহর ইবাদত ও আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ করেন। যুবক তাদের কথা শোনে মনে মনে বুযুর্গের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন সময় সুযোগে বুযুর্গের হাত ধরে তার ধর্ম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশীল হয়। এখন প্রতিদিন যাদুকরের নিকট যাওয়ার সময় যুবকটি বুযুর্গের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটায়। ফলে যাদুকরের নিকট যেতে বিলম্ব হয়। যাদুকর এজন্য যুবকটিকে নানারূপ তিরস্কার করে এবং ধমক দেয়। অবশেষে বাদশাহকে জানায় যে, যুবকটি ঠিকমত পড়াশোনা করে না, সময় মতো আসে না। একথা শুনে বাদশাহও তাকে যথাযথভাবে পড়াশোনা করার জন্য তাকীদ করে। কিন্তু যুবকের মন ঐ বুযুর্গের সাথে লেগে যাওয়ার ফলে সে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্বীন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে ধন্য হয়।

একদিনের ঘটনা, যুবকটি বাড়ি ফিরার সময় দেখল, একটি বিরাট সাপ রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। সে কারণে মানুষ অস্থির হয়ে ছোটাছুটি এবং দৌড়াদৌড়ি করছে। কিন্তু সাপকে কোনক্রমেই হটানো সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় যুবকটি পাথরের একটি টুকরো হাতে নিয়ে এই বলে সাপের প্রতি নিক্ষেপ করল, 'হে প্রভু, হে আমার মাতা-পিতা এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রভু! যদি যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরের তুলনায় ইনজীল এবং ইনজীলের শিক্ষাদাতা বুযুর্গ সত্যবাদী এবং সত্যের উপর বিদ্যমান থাকে তা হলে তার প্রমাণস্বরূপ পাথরের আঘাতে সাপটিকে ধ্বংস করে লোকদেরকে বিপদমুক্ত করে দাও।' এই বলে পাথর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে পাথরের আঘাতে সাপটি মারা যায় এবং লোকেরা বিপদ মুক্ত হয়। লোকদের মধ্যে যুবকের কেরামতী এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে। যুবক স্বয়ং গিয়ে তার উস্তাদ বুযুর্গকে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। বুযুর্গ বলেন, ইনজীলের উপর আমল, সত্য নবীর প্রতি স্বীকৃতি এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান মুজাহাদার বদৌলতে তোমার মর্যাদা এবং উচ্চ মাকাম লাভ হয়েছে। এই মাকামে সমাসীন হলে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এতে বিচলিত এবং ধৈর্যহারা হবে না, সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করে দৃঢ় থাকবে, সতর্ক থাকবে। সাবধান! আমার কথা আমার নাম কখনও কারো নিকট প্রকাশ করবে না। কেননা, নাম আর প্রসিদ্ধি মূল জিনিস নয়, মূল জিনিস হচ্ছে আমল।

অল্প সময়ের মধ্যে যুবকের সুখ্যাতি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ায় লোকেরা তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য তার নিকট ভীড় করতে শুরু করে। যুবকের দোয়ার বরকতে অনেক কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করে, অনেক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বাদশাহর এক মন্ত্রী অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অবসর জীবনযাপন করছিল। সেও যুবকের দরবারে হাজির হয়ে বিরাট অংকের হাদিয়া পেশ করে এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দুআ কামনা করে।

মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যুবক বলল, আমার চক্ষু ভাল করার কোন ক্ষমতা নেই, এই ক্ষমতা কেবল আল্লাহ পাকের, যিনি আমার আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। যদি আপনি তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন করেন, একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি দেন, অগ্নি এবং মূর্তি উপাসনা বর্জন করতে পারেন, তাহলে আমি আপনার জন্য তাঁর দরবারে মুনাজাত করতে পারি। প্রয়োজন হলো ঈমানের। মন্ত্রী ঐ মজলিসেই ঈমান গ্রহণ করে এবং খাঁটি মনে তওবা করত মুসলমান হয়ে যায়। আর মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে বরকত জাহির হয় এবং মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ফলে পুনরায় মন্ত্রীত্বের কাজে যোগদান করে।

বাদশাহ আশ্চর্যের সুরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন কীরূপে? মন্ত্রী উত্তর দিলেন, আমার প্রভু আমাকে বিনা ঔষুধে ভাল করে দিয়েছেন এবং দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। বাদশাহ আরো অধিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, আপনার বড় প্রভু তো আমি, তবে কি আমি আপনাকে ভাল করেছি? মন্ত্রী বললেন, না-আপনি না, আমার এবং আপনার উভয়ের যিনি প্রভু তিনি আমাকে ভাল করেছেন। বাদশাহ বলল, তবে কি আমি ছাড়াও আপনার আরেকজন প্রভু আছে? মন্ত্রী বললেন, আপনি আমার প্রভু নন, আপনি এবং আমি উভয়ই একজন প্রভুর গোলামীতে বাধ্য।

মন্ত্রীর বক্তব্য শোনে বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাঁকে কুফরীতে ফিরে আসতে এবং বাদশাহকে প্রভূ বলে স্বীকার করতে আহ্বান জানায়। অন্যথায় কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়। মন্ত্রী বাদশাহর আনুগত্যের ব্যাপারে প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাদশাহ আদেশ দেন যে, মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হোক এবং তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে এই তথ্য বের করা হোক যে, এই মন্ত্র কোথা হতে শিখল যে, আমি ব্যতীত আরেকজন প্রভু আছে? আর আমিও নাকি সেই প্রভুর গোলামীতে বাধ্য? বাদশাহর নির্দেশ মোতাবেক মন্ত্রীকে চরম শাস্তি দেয়া হল এবং শাস্তির মুখে একপর্যায়ে মন্ত্রী ঐ যুবকের কথা প্রকাশ করে দেয় এবং বলে, আমি ঐ যুবকের ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং সেই ধর্ম বিশ্বাস অনুপাতে আমাকে আমার প্রভু দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমার জীবন যেতে পারে, কিন্তু আমি আমার ধর্মকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে সম্মত নই।

মন্ত্রীর মুখে যুবকের কথা শোনে বাদশাহ তাঁকে শাহী দরবারে হাজির করার নির্দেশ দেয়। কথামত যুবককে হাজির করা হলে বাদশাহ তাকে বলে, আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি যাদুর সাহায্যে অন্ধকে দৃষ্টি দানে এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থকরণে সক্ষম হয়েছ? যুবক উত্তর দিল, এরূপ ক্ষমতা আমার নেই, হ্যাঁ এই ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক। বাদশাহ বলল, তুমি বড় নিমকহারাম! আমি তোমাকে লালন-পালন করলাম, তোমার শিক্ষা দীক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করলাম, তার নিকট থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করলে, অন্ধকে দৃষ্টি দানে সক্ষম এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থকরণে অভিজ্ঞ হলে, আর এখন তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকজনকে প্রভু স্বীকার করছ? অতিসত্বর এরূপ ধৃষ্টতা থেকে ফিরে

www.maktabatulabrar.com

এস, অন্যথায় তোমাকে সমীচীন শাস্তি দেয়া হবে। যুবক বলল, 'হে বাদশাহ, রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা না আপনার আছে, না আমার, না যাদুকরের, না বৈজ্ঞানিকের, এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমার আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং লালন-পালন কর্তা। আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীয় সত্য ধর্ম এবং সত্য আদর্শ বর্জন করতে সম্মত নই।' যুবকের এরূপ বক্তব্য শোনে বাদশাহ তাঁকে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেয় এবং বলে যে, এই যুবক এরূপ কথাবার্তা কোথা হতে শিখেছে, যে কারণে প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিতে পারে। তাই যেভাবেই হোক প্রকৃত রহস্য বের করতে হবে। যাদুকরের নিকট পড়াশোনাকালে সময় মাতা উপস্থিত হতো না, বোঝা গেল তখন অবশ্যই তার অন্যত্র যোগাযোগ ছিল। সুতরাং অনুসন্ধান করে রাষ্ট্র এবং ধর্মদ্রোহীদের চিহ্নিত করে আমার নিকট পেশ কর।

বাদশাহর নির্দেশ মোতাবেক যুবকের উপর চরম নির্যাতন চালানো হল। অবেশেষে শাস্তি, জ্বালা যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে যুবকের মুখে বুযুর্গের কথা প্রকাশ হয়ে গেল, যার সন্নিধ্যে যুবক ঈমান এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করে বিরাট মাকামের অধিকারী হয়েছিল। বাদশাহর নির্দেশ মোতাবেক বুযুর্গকে শাহী দরবারে হাজির করা হল।

বাদশাহ বুযুর্গের কথাবার্তা শোনে তাঁকে একত্ববাদের আকীদা বর্জন করে বাদশাহর প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানায়, অন্যথায় হত্যা করার হুমকি দেয়। বুযুর্গ বাদশাহর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে একত্ববাদের উপর মজবুত থাকার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলে বুযুর্গকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এর পর মন্ত্রীকেও একত্ববাদ বর্জন করে বাদশাহর প্রতি আনুগত্যের জন্য আহ্বান করা হয়, অন্যথায় একই করাতে তাকেও হত্যার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু এতে মন্ত্রী বিচলিত না হয়ে ঈমানের উপর অটল থাকার কথা ব্যক্ত করলে বাদশাহর হুকুমে করাত দ্বারা তাকেও দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

এরপর বাদশাহ যুবককে বলল, তোমার প্রতি আমার স্নেহ-মায়া রয়েছে, আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি, তোমার ভবিষ্যৎ আছে, তাই আমি তোমাকে নছীহত করছি, তুমি একত্ববাদকে বর্জন কর, নতুবা তোমার পরিণতিও ঐ দুইজনের মতই হবে, যা তুমি স্বচোখে অবলোকন করেছ। যুবকটি অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে উত্তর করল, হে বাদশাহ! জীবন-মরণের মালিক আপনি নন, আল্লাহ! তাঁর ইচ্ছা না হলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা হয় তা করুন, আমি আমার ধর্মকে পরিহার করতে মোটেই সম্মত নই।

বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে তার কর্মচারীদেরকে নির্দেশ করল, তাঁকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাও এবং সেখানে গিয়ে বুঝাতে চেষ্টা কর। যদি সে একত্ববাদ বর্জন করে, তাহলে আমি তাকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করব। সে অতি সম্মানে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করবে। আর যদি সম্মত না হয়, তাহলে তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে এমনভাবে নীচে নিক্ষেপ করবে, যাতে তার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর ভবিষ্যতে এরূপ কোন কিছু করার কেউ সাহস না পায়। যুবককে যখন পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে তার দুহাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে বলল, হে রব্বুল আলামীন! তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা কর। যুবকের মুনাজাত কবুল হল। পরিণামে পাহাড়ে ভীষণ প্রকম্পন শুরু হল। এতে বাদশাহর কর্মচারীরা পাহাড়ের চূড়া থেকে ছিটকে পড়ে সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হল, আর যুবক নিরাপদে বাদশাহর দরবারে ফিরে এলো। বাদশাহ যুবকের

অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে যুবক বলল, 'আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের সকলকেই ধ্বংস করেছেন।' এখান থেকে বাদশাহর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয় যারা, তাদের ভাগ্যে তা জোটে না।

বাদশাহ অধিক রাগান্বিত হয়ে তার অন্যান্য কর্মচারীদেরকে নির্দেশ করল যে, তাকে নৌকা যোগে সমুদ্রের মধ্যস্থানে নিয়ে যাও। যদি একত্ববাদ বর্জন করে তাহলে ভাল, অন্যথায় তাকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিবে। বাদশাহর নির্দেশ মোতাবেক তাকে সমুদ্রের মধ্য ভাগে নিয়ে যাওয়া হল। যুবক সেখানে দুহাত তুলে কাকুতি-মিনতির সাথে প্রার্থনা করল, 'হে বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী আল্লাহ! তুমি সর্বশক্তিমান, এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। যুবকের প্রার্থনা গৃহীত হল। সাথে সাথে তুফান শুরু হল এবং নৌকা ডুবে বাদশাহর সকল কর্মচারী মৃত্যুবরণ করল আর যুবক আল্লাহর রহমতে নিরাপদে ফিরে এল। বাদশাহ অত্যন্ত হতভম্ব হল এবং তার সমস্ত কলাকৌশল অকৃতকার্য দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে উঠল।

তখন যুবক বাদশাহকে বলল, 'হে বাদশাহ! আমার প্রতি আপনার ইহসান রয়েছে। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। আপনার ইহসানের দিকে তাকিয়ে আমি আপনাকে পৌত্তলিকতা বর্জন করে একত্ববাদের ঝান্ডার নীচে আশ্রয় গ্রহণ এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী হওয়ার জন্য আহ্বান করছি। অন্যথায় জেনে রাখুন, আপনার বাদশাহী ক্ষণস্থায়ী, একদিন অবশ্যই তা শেষ হয়ে যাবে এবং কুফর ও পাপাচারিতার কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে বাদশাহ, জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে, আপনি হাজার কৌশল করেও আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। যদি একান্তই আপনি আমাকে মারতে চান, তাহলে এর জন্য একটি মাত্র উপায় হলো, আপনি এক ময়দানে আপনার রাজ্যের সর্বশ্রেণির লোকদেরকে জমায়েত করুন এবং 'বিইসমি রব্বি হাযাল গোলাম, (যুবকের প্রভুর নামে) এই বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন, তাহলে আমার মৃত্যু হবে। অন্য কোন উপায়ে আমাকে মারা সম্ভব হবে না। বাদশাহ এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ কতে পারল না, সতর্কও হল না, বরং যুবকের কথামত ঘোষণা দিয়ে সব শ্রেণির লোকদের উপস্থিতিতে 'বিইসমি রব্বি হাযাল গোলাম' (যুবকের প্রভুর নামে) বলে যুবকের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি যুবকের কান পটিতে লেগে যায়। ঐস্থানে যুবক স্বীয় হাত ধারণ করে আনন্দ চিত্তে বলে উঠল, 'আমি ধন্য, আমার জীবন সফলকাম। কারণ, আমি জুলুম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের সাথে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি।'

যুবকের মৃত্যুর দরুণ অবস্থায় বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। যুবকের শাহাদাতের মুহূর্তের কথা এবং ধ্বনি শোনে সমবেত বিশাল জনতার মুখে এক সাথে উচ্চারিত হল, 'আমরা সকলেই এই যুবকের প্রভুর প্রতি ঈমান স্থাপন করলাম।' এভাবে একজনের বদলে অসংখ্য জনতা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল। বাদশাহর মন্ত্রীপরিষদ বাদশাহকে বলল, যে পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আপনি চেষ্টা করছিলেন, এখন তো সেই পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল। রাজ্যের সমস্ত লোক আপনার ধর্ম ত্যাগ করে যুবকের ধর্ম গ্রহণ করেছে। কারণ আপনি যুবককে হত্যা করায় অক্ষম হয়েছেন। যুবকের কথামত যুবকের প্রভুর নাম নিয়ে তাঁকে শহীদ করতে পেরেছেন। এতে জনগণ বুঝে নিয়েছে যে, আপনার উপরও একজন প্রভু রয়েছেন, যুবকের প্রভু তিনি-ই এবং তিনি সকলের উপর ক্ষমতাবান।

এ মুহূর্তে অন্তত বাদশাহর সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু ক্ষমতার বড়াই এবং অহংকার মানুষের সত্য অনুধাবনে এবং তা গ্রহণে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই হতভাগ্য বাদশাহর ভাগ্যেও তাই ঘটল।

www.maktabatulabrar.com

সত্যের প্রতি তার দৃষ্টি আরোপিত হল না। জনগণের ঈমান গ্রহণের কারণে বাদশাহ আরও অধিক ক্ষিপ্ত হয়ে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করত অগ্নিকুণ্ডলি জ্বালিয়ে যারা ঈমান এবং একত্ববাদ বর্জনে অসম্মত হতো তাদেরকে নির্মমভাবে ঐ অগ্নিকুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করতে শুরু করে। কিন্তু এতে করেও বাদশাহর উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ, লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু কেউই ধর্ম ত্যাগে সম্মত হয় না। এভাবে অসংখ্য মুসলমান নর-নারীকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর বাদশাহ এবং তার সহচারীরা পার্শ্বে বসে বসে তামাশা দেখতে থাকে, এতে কারও মনে একটু দয়ার উদয় হয়নি।

অবশেষে একজন মহিলা তার ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে হাজির হল। মহিলা শিশু বাচ্চার মহব্বতে এক পা আগুনের দিকে আর এক পা পিছনের দিকে- এরূপ ইতস্তত করছিল। এমন সময় বাদশাহ বলল, মহিলাটিকে সময় দেয়া হোক এবং তার শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক। বাদশাহর হুকুমে তাই করা হল। শিশুটি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'আম্মা'! মোটেই পিছ পা হবেন না, আপনি হকের উপর আছেন এবং হকের উপর বিদ্যমান থেকে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এটা আগুন নয়, দেখতে দেখা যায় আগুন, আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে এখানে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন।' জননী তার সন্তানের মুখের আহ্বান শোনে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চীর সুখের গৌরব অর্জন করে। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে জারীর, মুছান্নাফ, মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবসমূহে হযরত সুহায়েব রুমীর সূত্রে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۸﴾	(৮) তারা তাদেরকে কেবল এজন্য কষ্ট দিয়েছিল যে, তারা পরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেছিল।
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۹﴾	(৯) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, আর আল্লাহ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।
اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿۱۰﴾	(১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে নির্যাতন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿۱۱﴾	(১১) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলসমূহ করে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। এটা মহা সাফল্য।

শব্দার্থ

فَتَنُوْا তারা কষ্ট দিয়েছিল, الْعَزِيْزِ পরাক্রমশালী, الْحَمِيْدِ প্রশংসিত, شَهِيْدٌ (শাহীদ) - সম্মুখে, فَتَنُوْا নির্যাতন করেছে, ثُمَّ অতঃপর, لَمْ يَتُوْبُوْا তারা তওবা করেনি, فَلَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে, عَذَابُ শাস্তি, الْحَرِيْقِ জ্বলন্ত আগুনের, مِنْ تَحْتِهَا যার তলদেশ দিয়ে, تَجْرِىْ প্রবাহিত থাকবে, الْاَنْهٰرُ নহরসমূহ, الْفَوْزُ সাফল্য, الْكَبِيْرُ মহা, বিরাট।

ভাবার্থ

কাফেররা মু'মিনদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের কারণে অসহনীয় নির্যাতন করেছিল, অথচ ঈমান কোন অপরাধ নয়, যে কারণে নির্যাতন করা সমীচীন ছিল, বরং ঈমান স্থাপন না করাই হচ্ছে বড় অপরাধ। কারণ, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বগুণে গুণান্বিত ও প্রশংসিত, আসমান- যমীনের সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তিনিই। এরূপ ক্ষমতাবান আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করা কি মহাঅপরাধ? বরং এরূপ ক্ষমতাবান আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন না করাই অপরাধ। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেনি তারাই অপরাধী, অত্যাচারী। তাদের অপরাধও আল্লাহর সম্মুখে এবং ঈমান স্থাপনকারী মু'মিন নর-নারীদের প্রতি তাদের নির্যাতন এবং অসহনীয় নিপীড়নও আল্লাহর সম্মুখে। অপরাধী এবং অত্যাচারীকে অবশ্যই শাস্তি ভুগতে হবে, ইহকালে অথবা পরকালে। পক্ষান্তরে মাজলুমদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্য করবেন অবশ্যই। তবে যদি তারা তওবা করে নেয়, তা হলে ক্ষমা পেতে পারে। আর যদি খাঁটি মনে তাওবা না করে, তা হলে তাদের ইহকালেও শাস্তি হতে পারে আর পরকালে বিভিন্ন শাস্তি হওয়াটা নিশ্চিত। যেমন, সাপ বিছুর আক্রমণ, আগুনের জিঞ্জিরে আবদ্ধকরণ, পানাহারের জন্য বিষাক্ত, তপ্ত পুঁজ ও দুর্গন্ধ জাতীয় খাদ্য প্রদান, বিশেষ করে কঠোর অগ্নিতে দাহন যন্ত্রণা দান ইত্যাদি। অপরদিকে মু'মিন নর-নারীগণ নিরাপরাধ বরং তারা ঈমান স্থাপন করে সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে মানবজাতির লাজ রক্ষা করেছে। এ কারণে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। আর তারা আল্লাহর জন্য এসব কিছু নীরবে সহ্য করেছে। এর ভিতর দিয়ে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুশীলন এবং নেক আমল করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে। তাই তাদের জন্য রয়েছে পরম শান্তি ও আনন্দের স্থায়ী জান্নাত, যে জান্নাত হচ্ছে রকমারী সামগ্রী দ্বারা ভরপুর সুসজ্জিত। বিশেষ করে জান্নাতের তলদেশে প্রবাহিত থাকবে অসংখ্য ঝর্নাসমূহ। শান্তির পুরীতে তারা চিরস্থায়ীভাবেই বসবাস করবে। সত্যি তারা কতোই না সৌভাগ্যশীল, তাদের জীবন সফল, ফলপ্রসূ!

তাফসীর

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ **(তারা তাদেরকে কেবলমাত্র এ জন্য কষ্ট দিয়েছিল যে, তারা পরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেছিল।)**

প্রত্যেক মানুষ চায় শান্তি ও নিরাপত্তা এবং এর জন্য মানুষ সর্বদা স্বচেষ্ট হয়। সুতরাং একে অপরকে কেন কষ্ট দেয়, কেন নির্যাতন করে? এরূপ আচরণ কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মনুষ্যত্ববোধ এবং স্বভাব চেতনারও বিরোধী বটে। গর্ত খননকারীরা কেন মু'মিনদের প্রতি এতো

নির্যাতন করেছিল, তাদের এরূপ নির্যাতনের কোন যুক্তিকতা আছে কি না। থাকলে তাদের অনিবার্য পরিণাম কী হয়েছিল এবং হতে পারে। আর যারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, কেন ধৈর্যধারণ করলেন, তাদের ধৈর্যের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল এবং হতে পারে– এসব বিষয়াদির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে। বাস্তবে এই আয়াতসমূহ অত্যন্ত তত্ত্বশীল এবং এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় বহু কিছু। উম্মতে মুসলিমার শিক্ষা এবং সবক গ্রহণের মানসেই এই আয়াতসমূহ নাযেল করা হয়েছে-নিছক পঠন বর্ণনার জন্য নয়।

মূর্খতা এবং অহংকার মানুষকে মনুষ্যত্বহীন পশু করে তোলে এবং এ দুটি বস্তুই সত্যকে স্বীকৃতি দানে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে স্বয়ং সত্য পরিহারে ব্রতী হয় এবং অসত্যের প্রয়াসে আক্রান্ত হয়। এরূপ মন-মানসিকতার লোকজন ন্যায়পরায়ণদের প্রতি হয় পরশ্রীকাতর এবং হিংসুক। আর পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা মানুষকে প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে যা কিছু করে তাতে তার উপকার হয় না মোটেই। তার অন্তরের জ্বলনও দূরীভূত হয় না, বরং বৃদ্ধি পায় এবং অশান্তির কারণ হয়। গর্ত খননকারীরা ছিল বে-দ্বীন এবং মূর্খ, এর সাথে ক্ষমতার বড়াই এবং অহংকার স্বভাব তাদেরকে স্বীয় স্রষ্টার স্বীকৃতি এবং তার প্রতি আনুগত্যের পথকে জটিলতর করে তুলে ছিল, তাই তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনে সক্ষম হয়নি। আর যারা এরূপ হয়, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনে সক্ষম হয় না। অপরপক্ষে যারা তাদের আনুগত্যের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে তাদের প্রতি তারা হয় বেপরোয়া। গর্ত খননকারীরা এ কারণেই মু'মিনদেরকে বরণ করতে পারেনি। বরং তাদের প্রতি হয়েছে বেপরোয়া। অথচ মু'মিনগণ যে পথ অবলম্বন করেছিল আসলে এটাই যে সহজ সরল এবং মুক্তির পথ তা অনুধাবনের যথেষ্ট অবকাশ বিদ্যমান ছিল।

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ **(যিনি আসমান-যমিনের ক্ষমতার মালিক।)**

গর্ত খননকারীরা যদি চিন্তা করত, যদি সঠিক অনুধাবনে ব্রতী হত, তাহলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা অনুভূত হওয়ার পথ সুগম হত। তারা বুঝতে সক্ষম হত যে, আমরা সৃষ্টি, আমাদের রয়েছেন একজন পরাক্রমশালী স্রষ্টা। তাঁর শক্তি অপরিসীম, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারো নেই। যারা জুলুম করে, তাদেরকে তিনি সমীচীন শাস্তি দিতে সুসক্ষম এবং দিয়ে থাকেন। এরূপ অনুভূতি তাদের জন্য মুক্তিপথের পাথেয় হতে পারত, কিন্তু তারা এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

তারা চিন্তা করতে পারত যে, আল্লাহ পাক ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বগুণে গুণান্বিত। আর জালেমদের প্রতিকার না করা ত্রুটির পরিচায়ক। সুতরাং জালেমদের প্রতিকার তিনি অবশ্যই করবেন এবং করতে সক্ষম। আর মজলুমদের সহায়তা করবেন, তাদের প্রতি অনুকম্পা এবং করুনা করবেন। এরই নাম ইনছাফ এবং ন্যায়বিচার। যে ন্যায়বিচারক হয়, সে প্রশংসার পাত্র। গর্ত খননকারী জালেমরা এ বিষয়টিও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

তারা আল্লাহর ক্ষমতার পরিধি মূল্যায়ন করেনি। যিনি আসমান-যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি, জালেম নিরীহ সবাই তাঁর শক্তির আওতাভুক্ত। কৃতকর্মের পরিণামের জন্য একদিন তো অবশ্যই তাঁর ইনছাফী আদালতে দাঁড়াতে হবে, এর বিকল্প নেই। এরূপ চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু গর্ত খননারীরা তা করেনি, বরং যারা এই সুযোগ গ্রহণ করে

www.maktabatulabrar.com

সফলতার দার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা তাদের ষড়যন্ত্রে এবং রকমারি নির্যাতনে লিপ্ত হয়েছে। মু'মিনগণ আল্লাহ পাকের উক্ত গুণাবলি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে, তাই দ্বিধাহীন চিত্তে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং অবিচল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে প্রাণের বাজিতে বিজয় এবং চরম সফলতা অর্জনে ধন্য হয়েছে এবং হতে থাকবে।

وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (সবকিছুই তাঁর সম্মুখে।)

আল্লাহ পাক হাজির-নাজির

মু'মিন এবং কাফেরদের ভূমিকা এবং অবস্থান আল্লাহর সম্মুখে সুস্পষ্ট, কোন কিছুই তাঁর অগোচর নয়। আর কেমনে অগোচর থাকবে, তিনি তো হাজির-নাজির তথা সর্বজ্ঞ, সর্বস্থানে বিদ্যমান। সব কিছুই অবলোকন করেন। সুতরাং মু'মিন বা কাফের কার অবস্থা তার অগোচরে থাকবে? বস্তুত তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলেই স্বীয় ইল্‌ম ও জ্ঞানের নিরিখে ইনছাফের তাগীদে যারা জালেম তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং করবেন। আর যারা মজলুম অত্যাচারিত, তাদের প্রতি সহায়ক হন এবং হবেন। তাদেরকে তাদের ধর্ম, ধৈর্য-সহ্য এবং ত্যাগের যথাযথ বিনিময় দানে সৌভাগ্যশীল করবেন। হতে পারে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই অথবা পরকালে অবশ্যই হতে হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (যারা মু'মিন পুরুষ এবং নারীদেরকে নির্যাতন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।)

মানুষকে নির্যাতন করা, কষ্ট দেয়া কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং স্বভাবগত এবং মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকেও ঘৃণ্য ও দূষণীয় কাজ। তাই এহেন অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে লজ্জা অনুতাপ আসে। এমতাবস্থায় সে ক্ষমার উপযুক্ত হতে পারে। আল্লাহ পাকের দরবারে খাঁটি মনে তওবা করলে আল্লাহ পাক ক্ষমার বিধান কার্যকর করে থাকেন। বস্তুত যে সমস্ত কাফেররা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় এবং দিয়েছে, তাদের বেলায়ও আল্লাহ পাকের একই বিধান। কিন্তু যারা এই সুযোগ গ্রহণেও ব্যর্থ হয়, তারা বাস্তবিকই অধম এবং হতভাগ্য। তারা রূপে মানুষ, কিন্তু তাদের মধ্যে মানবতা ও সভ্যতার কোন কিছু নেই। তারা সম্মান, শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাই তাদের বেলায় আল্লাহ পাক তাঁর কঠোর শাস্তি এবং অপমানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে থাকেন।

আল্লাহ পাক তাদের বেলায় শাস্তি কার্যকরণে স্বাধীন এবং সুসক্ষম; আর তা কার্যকর করেন বিভিন্ন ভাবে। যথা:

(ক) দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি ঢিল দেয়া হয়। এই অবকাশে হয় তারা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং মুক্তির পথ ধরে।

(খ) যদি এই অবকাশেও তারা পরিশুদ্ধ হয় না এবং মুক্তির পথ না ধরে অনবরত পাপাচারিতায় লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের মুক্তির কোন উপায় থাকে না এবং তাদের পক্ষে কোন কারণ দর্শানো অথবা ন্যায়সংগত হেতু পেশ করার সুযোগ থাকে না। এমতাবস্থায় পরকালের জীবন হয় তাদের জন্য অশান্তির। আল্লাহ পাকের কঠোর আযাবে আক্রান্ত হয় তারা।

www.maktabatulabrar.com

(গ) আর অনেকের বেলায় আল্লাহ পাকের শাস্তি বিধান ইহকাল বা পরকাল উভয় জগতেই কার্যকর হয়।

গর্ত খননকারীদের শাস্তি বিধান

আলোচ্য ১০ নং আয়াতে গর্ত খননকারী এবং মু'মিনদেরকে যারা অত্যাচার করেছিল, তাদের উপর আল্লাহ পাকের শাস্তি বিধানের কার্যকারিতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে তাদের উপর আল্লাহ পাকের শাস্তি বিধান ইহকাল পরকাল উভয় জগতেই কার্যকর হয়েছে- না কেবল আখেরাতে কার্যকর হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

(ক) কেবল আখেরাতে কার্যকর হয়েছে, তবে আখেরাতে তাদের উপর শাস্তি বিধানের কার্যকারিতা দুভাবে হয়েছে। তাদেরকে কুফ্‌রীর জন্য বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর এ শাস্তি 'যামহারীর' অর্থাৎ, অসহনীয় শীতের শাস্তি এবং মু'মিনদের প্রতি অত্যাচারের পরিণামে তাদেরকে হারীকের শাস্তি তথা কঠোর অগ্নি শাস্তিও দেয়া হচ্ছে। আয়াতের মধ্যে উভয় শাস্তির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আবার হারীক নামের একটি জাহান্নামও রয়েছে, যার মাধ্যমে এ ধরনের পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়।

(খ) অপর আর একটি মতানুসারে গর্ত খননকারীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, আর তা এভাবে যে, গর্ত খননকারীরাও ঐ গর্তের অগ্নিতে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে। প্রবাদে বলা হয়েছে,

من حفر بئرا لاخيه فقد وقع فيه.

যে তার ভাইকে নিক্ষেপ করার জন্য কূপ খনন করে, সে নিজেই তাতে পড়ে ধ্বংস হয়।

গর্ত খননকারীদের বেলায় এ বিধানই কার্যকর হয়েছে। আর মৃত্যুর পর কুফ্‌রীর কারণেও তারা শাস্তির মধ্যে আছে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করছে। 'জাহান্নামের আযাব' এর মধ্যে পরকালের আযাবের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের মতে, 'খ'–য়ে বর্ণিত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা,

(ক) হযরত ইব্‌নে আব্বাস, রবী, কাতাদা এবং মুকাতিলসহ অনেকের সূত্রে বলা হয়েছে যে, গর্ত খননকারীরাও ঐ গর্তের আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে।

(খ) অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(গ) সঠিক তথ্যানুসারে জাহান্নামে কেবল অগ্নির শাস্তিই হচ্ছে মূল শাস্তি। যামহারীর দ্বারা অগ্নিতাপের নিম্নচাপকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ, শাস্তি কার্যকরণকে আখেরাতের শাস্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হলে একই বিষয় দুবার বলার অনর্থক প্রয়াস সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে পরকাল এবং ইহকালের আযাবকে মেনে নিলে অনর্থকতার প্রশ্ন দেখা দিবে না।

(ঘ) গর্ত খননকারীদের ঘটনাটিকে মক্কার কাফেরদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে নাযেল করা হয়েছে। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে তাদের আচরন গর্ত খননকারীদের আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মক্কার কাফেররা মু'মিনদের প্রতি অসহনীয় নির্যাতন শুরু করলে এই ঘটনা দ্বারা তাদেরকে ধৈর্যধারণের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয় এবং মক্কার কাফেরদেরকে

সতর্ক হতে শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু মক্কার কাফেররা সতর্কতা অবলম্বন না করায় তারা স্বীয় অপরাধ এবং মু'মিনদের প্রতি নির্যাতনের শাস্তিতে দুনিয়াতেই আল্লাহর শাস্তি বিধানের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাখ্যা মতে 'খ'-য়ে বর্ণিত মতটি অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

আবূ হাইয়্যানের উক্তি ও তার খণ্ডন

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি গর্ত খননকারীরাও ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে থাকে, তা হলে 'অতঃপর তওবা না করে' কথাটি বলার কোন অর্থ হয় না। কারণ, তাদের জন্য তওবার সুযোগ কোথায়, তারা তো জ্বলে পুড়ে শেষই হয়ে গেল। আর বাস্তবেও তাদের কেউ তওবা করেছে বলে সাব্যস্ত নেই। দ্বিতীয়ত যদি 'হারীক' দ্বারা দুনিয়ার শাস্তিই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আয়াতে একে প্রথমে উল্লেখ করা বাঞ্ছণীয় ছিল। কারণ, দুনিয়ার আযাব অবশ্যই আখেরাতের আযাবের পূর্বে হয়েছে। মুফাস্সির আবূ হাইয়্যান এরূপ উক্তি করে প্রথম মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে আবূ হাইয়্যানের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

(ক) আয়াতের শেষ অংশে মিল রক্ষার্থে 'হারীক' শব্দকে পরে আনা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর যথেষ্ট নজীর রয়েছে। তাই এ কারণে উপরোক্ত উক্তি যুক্তযুক্ত নয়। বিশেষ করে সাহাবা এবং অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ হারীক দ্বারা দুনিয়ার আযাবকে বুঝানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

(খ) আয়াতের অর্থ ব্যাপক। এর মধ্যে গর্ত খননকারীদের সাথে অন্যান্য আরো দুই শ্রেণির লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এক শ্রেণি হলো তারা, যারা গর্ত খননকারী নয় বটে, কিন্তু কাফের এবং অন্যভাবে মু'মিনদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং দিয়ে থাকে। আরেক শ্রেণির লোক যারা কাফের নয় বরং মু'মিনই বটে, কিন্তু পাপাচারিতায় লিপ্ত হয় এবং অন্য মু'মিনদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে এবং নির্যাতন করে থাকে। এই দুই শ্রেণির লোকেরাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুফাস্সিরীনে কেরাম লিখেছেন, আয়াতটি বিশেষ শ্রেণি প্রসঙ্গে নাযেল হলেও অর্থের ব্যাপকতার দিক দিয়ে অন্যরাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। অতএব গর্ত খননকারীদের কেউ তওবা না করে থাকলে অথবা তাদের তওবা সাব্যস্ত না হলে কোন বাধা নেই। অন্যদের ক্ষেত্রে 'তওবার সুযোগ' আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তবে যদি কাফেররা তওবা না করে আর মু'মিনদেরকে নির্যাতন করে, তাহলে কুফ্রীর আযাবের উর্দ্ধে তাদেরকে অতিরিক্ত আযাব দেয়া হবে, আর তা দেয়া হবে মু'মিনদের প্রতি নির্যাতনের পরিমাণ অনুযায়ী। তাদের কুফ্রীর কারণে মুক্তির কোন আশা নেই। পক্ষান্তরে মু'মিনদের যারা অন্য মু'মিনদেরকে অহেতুক কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে, তাদের জন্য নিম্নোক্ত মুক্তির পথ বিদ্যমান রয়েছে।

(ক) খাঁটি মনে তওবা করবে। খাঁটি তওবার উপাদান দুটি। (এক) নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হওয়া আর যাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা। যদি সে পৃথিবীতে না থাকে তা হলে তার কুশল কামনা করা, তার জন্য সদকায়ে জারিয়া করা এবং দুআ করা। (দুই) আর একটি উপাদান হচ্ছে আল্লাহর নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা, আল্লাহর কোন বান্দাকে কষ্ট দিলে এবং নির্যাতন করলে আল্লাহ পাকও অসন্তুষ্ট হন। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এভাবে তওবা করলে মুক্তির আশা করা যায়। অন্যথায় এরূপ

মু'মিনকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে যেহেতু সে কাফের নয়, তাই ঈমানের বদৌলতে শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পেয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ (যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। এটা মহাসাফল্য।)

এ আয়াতে জান্নাত ও সফলতা লাভের দুটি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যথা:-

(১) একটি শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও অবিচল বিশ্বাস। রসূলের প্রতি এবং রসূলের আদর্শের প্রতিও ঈমান-বিশ্বাস জরুরী। কেননা, এছাড়া আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আছে বলে স্বীকৃত হয় না।

(২) অপর শর্তটি হচ্ছে নেক আমল। শুধু ঈমান আনলেই যথেষ্ট নয়, পরিপূর্ণ সফলতার জন্য নেক আমল একান্ত প্রয়োজন। পাপাচারিতা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক সময় ঈমানকেই বিপন্ন করে দেয়। তাই ঈমানের সংরক্ষণ এবং হেফাজতের জন্যও নেক আমল অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ জন্যই এ আয়াতে ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

নেক আমলের সংজ্ঞা

কেবল আমল লক্ষ্যবস্তু নয়, বরং নেক আমলই হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু। দুই শর্তে আমল নেক হয়:

(১) আমল আল্লাহর জন্য করা। আমলে রিয়া থাকতে পারবে না, ইখলাস থাকতে হবে। পার্থিব হীনস্বার্থ যথা: পার্থিব অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সম্মান অর্জন ইত্যাদির জন্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর হুকুম মনে করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে আমল করা। একেই ইখলাছ বলা হয়। ইখলাছ অন্তরের আমল। আমলে ইখলাছের স্থান শরীরে আত্মার সমতুল্য।

(২) আমল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বমানবতার জন্য আদর্শ। তিনি উম্মতের জন্য আমলের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছেন এবং আমলের বাস্তবতাও শিক্ষা দিয়েছেন। সে মোতাবেক আমল করাকে সুন্নাত মোতাবেক আমল বলে। সুন্নাতের অধিকাংশ সম্পর্ক শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। ইখলাছ আত্মা স্বরূপ হলে সুন্নাত হচ্ছে দেহস্বরূপ। তাই ইখলাছ এবং সুন্নাতসম্মত আমলকে নেক আমল বলা হয়। এরূপ আমলওয়ালা ব্যক্তি হবে পুরস্কৃত, ইহকাল এবং পরকালের জীবনে সফল ।

গর্ত খননকারীদের এবং মক্কার কাফেরদের নির্যাতন ও জুলুম সহ্যকারী মুমিনগণ ছিলেন এরূপ মু'মিন মুসলমান। তাদের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। তারা এবং তাদের পদাংক অনুসারীগণই সফলকাম এবং মহান। উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এটাই। বস্তুত মুসলিম উম্মাহ এবং বিশ্বমানবকে তাদের জীবনাদর্শ অনুসরণ অনুকরণ ও পাথেয় হিসেবে গ্রহণের প্রতি এই আয়াতে দিক-নির্দেশনা করা হয়েছে।

এ আয়াতে সফলতা লাভের জন্য ঈমান ও আমলের কথা বলা হয়েছে। আর পরকালে জান্নাত লাভকেই বলা হয়েছে সফলতা। যদিও আমরা সফলতা বলতে অন্য কিছু বুঝে থাকি। আমরা যাকে

www.maktabatulabrar.com

সফলতা মনে করি আসলেই কি সেটা সফলতা? প্রকৃত সফলতা কী? নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

প্রকৃত সফলতা

হযরত আলী (রা.)-কে এক লোক বলেছিল, আখেরাতের জীবন অমূলক এবং ভিত্তিহীন। এর উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন, 'যদি তোমার কথাই সত্য হয় আর যদি আমি ইসলামের অনুশীলন করি, তা হলে কোন ক্ষতির আশংকা নেই মোটেই। কিন্তু যদি তোমার কথা অসত্য হয় আর তুমি ইসলামের অনুশীলন না করে মৃত্যু বরণ কর, তা হলে তোমার কী উপায় হবে তা একটু ভেবে দেখ তো! হযরত আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যদি তুমি ধর্মের অনুশীলন কর, তবে তোমার কিছু কষ্টও হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ এ কষ্ট অস্থায়ী দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ জীবন অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। এরপর আসবে অনন্তকালের জীবন, যে জীবনের কোন শেষ নেই। যদি তোমার কথা অসত্য হয়, তাহলে তোমাকে অনন্তকাল কঠোর শাস্তি ভুগতে হবে। আর যদি ইসলামের অনুশীলন ঈমান এবং আমল নিয়ে মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তোমার সে জীবন হবে আনন্দের মহা সাফল্যের, এটাই হবে প্রকৃত সফলতা। বোঝা গেল–

(ক) পরকালে জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করাই হল মূলত সফলতা। সফলতা চির শান্তির অধিকারী হওয়ার নামান্তর।

(খ) এ শান্তির অধিকারী হবে তারাই, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছে এবং হয়। পক্ষান্তরে জান্নাত লাভে ধন্য যারা, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেও ধন্য। কেননা জান্নাত লাভ করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের অনিবার্য ফলাফল। ১১নং আয়াতে মহাসাফল্য এবং বিরাট সফলতার এটাই অর্থ।

(১২) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾
(১৩) অস্তিত্বের সূচনাও তিনিই করেন এবং পুনরাবর্তনও তিনিই ঘটান।	اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾
(১৪) তিনিই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত স্নেহময়।	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾
(১৫) আরশের অধিপতি অত্যন্ত মহান।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾
(১৬) তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾
(১৭) তোমার নিকট সৈন্যবাহিনীর খবর-বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾
(১৮) ফিরআউন ও ছামূদের?	فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾
(১৯) বস্তুত যারা কাফের তারা মিথ্যারোপে রত রয়েছে।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾

(২০) আল্লাহ তাদেরকে সব দিক দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছেন।	وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
(২১) বস্তুত এই কুরআন অতি মহান।	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾
(২২) লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

শব্দার্থ

اِنَّ নিশ্চয়, بَطْشَ পাকড়াও, رَبَّكَ তোমার প্রতিপালকের, لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত কঠোর, اِنَّهٗ هُوَ নিশ্চই তিনিই সূচনা করেন, يُبْدِئُ পুনরাবর্তন ঘটান, اَلْغَفُوْرُ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, اَلْوَدُوْدُ অত্যন্ত স্নেহময়ী, ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি, اَلْمَجِيْدُ অতি মহান, فَعَّالٌ করেন, لِمَا يُرِيْدُ যা ইচ্ছা তার, هَلْ اَتٰىكَ তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? حَدِيْثُ খবর, বৃত্তান্ত, اَلْجُنُوْدِ সৈন্যবাহিনীর, بَلِ الَّذِيْنَ বরং যারা, تَكْذِيْبٍ فِيْ মিথ্যারোপে রত রয়েছে, وَرَائِهِمْ তাদের সব দিক দিয়ে, مُحِيْطٌ ঘেরাও করে রেখেছেন, পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, مَّجِيْدٌ অতি মহান, فِيْ لَوْحٍ লওহে মাহফূজে, مَّحْفُوْظٍ লিপিবদ্ধ।

ভাবার্থ

কাফের, মুশরিক ও জালেমদের প্রতি আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর, ইহকালে এবং পরকালে। তবে তিনি অতি মহান এবং মহান আরশের অধিপতি। যারা অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও স্নেহময়ী। তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন এবং করতে সুসক্ষম। ফিরআউন এবং ছামূদের ঘটনাবলি এর বাস্তব প্রমাণ। এ সমস্ত ঘটনাবলি যেমন মু'মিনদের জন্য সান্ত্বনার বাণী, তেমনি কাফেরদের জন্য সতর্ক সংকেত। কিন্তু তারা সতর্কবাণী ও পবিত্র কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপে রত রয়েছে। অথচ এই কুরআন অতি মহান, সুসংরক্ষিত লওহে মাহফূজ থেকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত রসূলের প্রতি নাযেল হয়েছে, যাতে মিথ্যা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কাফেররা এত মূর্খ যে, এই কুরআনকে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে। তাই তাদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। আল্লাহ পাক তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।

শানে নুযূল

মক্কার কাফের-মুশরিক দল বিশ্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর প্রতি নাযেলকৃত পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা বলে সমালোচনা করত। তারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসহনীয় নির্যাতন চালাত। তাই সাহাবাদেরকে সান্ত্বনা দান এবং কাফের মুশরিকদেরকে সতর্ক করার তাগিদে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযেল হয়। অর্থের ব্যাপকতার মূলধারা মতে পরবর্তীকালের মু'মিন এবং কাফেররাও এর অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ **(নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।)**

www.maktabatulabrar.com

যারা ঈমান গ্রহণের কারণে নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ পাক ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতেই তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হন। তারা জান্নাত এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি লাভে সৌভাগ্যশীল হয়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান স্থাপনে উদাসীন এবং মু'মিনদের প্রতি জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ পাক উভয় জগতেই অত্যন্ত কঠোর হন। তারা জাহান্নামের কঠোর আযাবে আক্রান্ত হবে। আল্লাহর পাকড়াও এবং আযাব অত্যন্ত কঠোর– ইতিপূর্বের আয়াতসমূহে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অধিক বিবরণ দিয়ে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে।

আযাবের কঠোরতার বিবরণ

আল্লাহ পাকের গুণ হচ্ছে 'কাহ্হার' ও 'জাব্বার'। এই গুণদ্বয় তাঁর আযাবের কঠোরতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কাফের মুশরিক, মুনাফেক ও পাপাচারীদের প্রতি পর্যায় বিশেষে আল্লাহ পাকের এই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নিম্নে আল্লাহ পাকের আযাবের কঠোরতার দিকগুলো তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) আল্লাহ পাকের আযাবের কঠোরতার একটি দিক হচ্ছে পাপের অনুপাতে কারো প্রতি অধিক আযাব প্রদান করা।

(খ) কঠোরতার আর একটি দিক হচ্ছে কাউকে তিনি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতে আযাব দেন।

(গ) কঠোরতার আর একটি দিক হচ্ছে যাকে আযাব দেন, তার ব্যাপারে কোন শাফাআত গ্রহণযোগ্য হয় না, ইচ্ছা হলে শাফাআত কবূল করেন, ইচ্ছা না হলে নির্ধারিত পরিমাণ আযাব প্রদান করেন।

(ঘ) কঠোরতার আর একটি দিক হচ্ছে অনন্ত কালের আযাব। এরূপ আযাব কেবল কাফের, মুশরিক, মুনাফেক এবং বিধর্মীদের জন্য প্রযোজ্য।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ **(অস্তিত্বের সূচনাও তিনি করেন এবং পুনরাবর্তনও তিনিই করেন।)**

এ আয়াতে একশ্রেণির লোকদের সমর্থন এবং আরেক শ্রেণির লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ঐ শ্রেণীর লোকদের সমর্থন করা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম। অতএব আমাদের জন্য সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল থাকাই বাঞ্ছণীয়। আর ঐ শ্রেণির লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা কাফের, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে যে, এই দেহ পচে-গলে শেষ হয়ে গেলে তাতে আত্মার পুনঃসংযোজন তথা পুনরুত্থানের আকীদা একান্ত অবাস্তব। অতএব বস্তুজগতের সুখ-শান্তি ছাড়া পুনর্জীবনের চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত পরকালের আকীদা তাদের দৃষ্টিতে নেহায়েত গর্হিত।

আসলে যিনি সূচনায় সক্ষম তিনি পুনর্বার ও সক্ষম না হওয়ার ধারণা অত্যন্ত মূর্খতারই পরিচায়ক। এরূপ মূর্খদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা এবং গলদ আমলের কারণে আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এজন্যই পুনর্জীবনের আকীদা-বিশ্বাস এক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

www.maktabatulabrar.com

এ পর্যন্ত এ আয়াতের তাফসীরে যা কিছু বলা হল, তা বলা হল অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতানুসারে। এখানে মুফাস্সিরীনে কেরাম হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর আর একটি মত উল্লেখ করেছেন। তা হল– একশ্রেণির লোকদেরকে আযাবে দগ্ধ করে শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাদের দেহ সৃষ্টি করা হবে। এভাবে অনন্তকাল তাদের আযাব অব্যাহত রাখা হবে। আলোচ্য আয়াতে 'পুনরাবর্তন ঘটাবেন' দ্বারা পুনঃদেহ সৃষ্টি এবং আযাব দেয়ার কথা বলা হয়েছে বলে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে। মুফাস্সিরগণ আলোচ্য এই মতটিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রূপক অর্থ বলে অবোধগম্য হিসেবে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ আযাবের অবকাশ নেই। এরূপ আযাবের কথা পবিত্র আয়াতেও স্পষ্টভাবেই বর্ণিত রয়েছে, আর গর্ত খননকারীদের বেলায়ও কঠোরতার জন্য এমন পদক্ষেপ নেয়া অবোধগম্য নয়।

وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ **(তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত স্নেহময়ী।)**

আল্লাহ পাকের দুটি গুণ হচ্ছে 'গাফূর' এবং ওয়াদূদ। এই গুণদ্বয় মানুষের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ক্ষমা এবং স্নেহের ইঙ্গিত বহন করে। কাফেরদের প্রতি কঠোরতার বিবরণের পর ঈমানদারদের জন্য এই গুণের উল্লেখ আশা সঞ্চার করে বিধায় আয়াতটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এ আয়াতে উল্লেখিত 'ওয়াদূদ' গুণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা:–

ودود (ওয়াদূদ)-এর ব্যাখ্যা

(ক) মুবাররাদের সূত্রে কাজী ইসমাঈল ইব্নে ইসহাকের মতে 'ওয়াদূদ' শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের নিঃসন্তান হওয়ার গুণকে বুঝানো হয়েছে। পিতা-মাতা সন্তানের থেকে পাওয়ার আশাবাদী হয়, তাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসাকে নিঃস্বার্থ বলা যায় না। কিন্তু আল্লাহ পাক নিঃসন্তান, তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি, তার থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি, তাই তার সমস্ত ভালোবাসা তার প্রিয়জনদের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে হয়। এ হিসাবে তিনি 'ওয়াদূদ'। কিন্তু আল্লামা আলূসী এই ব্যাখ্যা অবোধগম্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(খ) বিশিষ্ট আভিধানিক আয্হারী বলেন যে, 'ওয়াদূদ' 'মাওদূদের' অর্থে অনেকে মত পোষণ করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অসংখ্য গুণের অধিকারী। তিনি মানুষের প্রতি দয়া-মায়া, ক্ষমা এবং অপরিসীম ইহসান করে থাকেন। এ কারণে সমগ্র সৃষ্টি এবং মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন করে থাকে এবং তাঁর আনুগত্যশীল হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল আর খাঁটি বান্দাগণ তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদানকারী। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর চিন্তা করলে এ অর্থও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

(গ) কাফ্ফাল এবং ইব্নে যায়েদের মতে, 'ওয়াদূদ' এখানে 'রাহীমের' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অসীম করুণাকে বুঝানো হয়েছে। এ মতে আয়াতের অর্থ হবে– আল্লাহ পাক মু'মিনদের প্রতিই বড়ই ক্ষমাশীল আর এই ক্ষমার কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত করুণাময়ী, এই করুণার কারণেই তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

(ঘ) মুফাস্সির কাল্বীর মতে, 'ওয়াদূদ'-এর মাধ্যমে খাঁটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ কারণে যে স্নেহ এবং ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় সেটাই এ আয়াতে উদ্দেশ্য। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।

(ঙ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে 'ওয়াদূদ' এখানে বিশেষ প্রেমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং ইবাদত রিয়াযতে তাঁর প্রতি দাসত্বের স্বীকারোক্তি করে, তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, আল্লাহ পাক তাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ভালবাসেন– এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর খাঁটি বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেন, তাদের প্রতি ইহসান এবং ইজ্জত ও সম্মানের আচরণ অব্যাহত রাখেন, স্বীয় মারেফত এবং নৈকট্যদানে সৌভাগ্যশীল করেন, ফলে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সফলকাম হয়। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

غفور (গাফূর) গুণ কাদের বেলায় কার্যকর হয়?

ঈমান এবং ইসলামের দাবীদার একটি ফেরকা হচ্ছে মু'তাযিলা। তাদের মতে যারা তওবা করে, কেবল তাদের বেলায় আল্লাহ পাকের ক্ষমার গুণ কার্যকর হয়, অন্যদের বেলায় নয়। তাদের এই উক্তির কারণ হচ্ছে, তাদের ধারণা, যারা ঈমান আনার পর গোনাহ্ করে, তারা ইসলামের গণ্ডিভুক্ত থাকে না। সুতরাং তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের ক্ষমার বিধান কার্যকর হয় না। তবে যদি গোনাহ থেকে তওবা করে নেয়, তাহলে ক্ষমার উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে। এমতাবস্থায় এই আয়াতে কেবল তওবাকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মু'তাযিলারা তাদের উপরিউক্ত মতের পক্ষে কিছু প্রমাণাদিও পেশ করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তাদের প্রমাণাদি তাদের মতের পক্ষে যৌক্তিকতার জন্য অকাট্য এবং যথেষ্ট নয় বিধায় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই মতটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে যারা তওবা করে, তারা আল্লাহ পাকের ক্ষমার উপযুক্ত হতে পারে, প্রয়োজন কেবল আল্লাহর ইচ্ছার। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে গোনাগারদের প্রতি তওবা ব্যতীতও ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য তওবাকারীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের সংকেত হলেও প্রসঙ্গত যারা তওবাকারী নয়- এমন মু'মিন গোনাহগারও আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, তাদেরকে অপদস্ত করেন না, চাই তারা তওবা করুক অথবা না করুক। হ্যাঁ, আল্লাহর ইচ্ছা করা আবশ্যক। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই মতের সমর্থনে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে প্রদান করা হল–

(ক) একটি হচ্ছে এই আয়াত:

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন। (সূরা নিছা: ৪৮)

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, শিরক না করার শর্তে আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি ক্ষমার প্রকাশ্য ঘোষণা দান করেছেন, তওবা করার প্রশ্ন আরোপ করেননি। তবে আল্লাহর ইচ্ছার শর্ত এই আয়াত থেকেও প্রস্ফুটিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

(খ) যে তওবা করে তাকে ক্ষমা করার কথা আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তওবাকারী এই ঘোষণার কারণেই বিশেষ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। আর মু'মিন গোনাহগারকে তওবাবিহীন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে সেটা হল আল্লাহ পাকের বিশেষত্ব এবং তার বিশেষ গুণ। 'গাফ্‌ফার' শব্দটিও আরবী অলংকারশাস্ত্রের প্রশ্নে বিশেষ ক্ষমার প্রতি আলোকপাত করে। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যথা:

এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত স্নেহময়ী। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও স্নেহময়ী হয়ে থাকলে তিনি শাস্তি দেন কেন? তাহলে তিনি কঠোর কেন? যেমন এই সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে। তদুপরি কঠোরতা কোন শুভ গুণ নয়। ক্ষমা, উদারতা, কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শন করাই হচ্ছে মহত্ত্বের লক্ষণ। সুতরাং আল্লাহ পাকের এই কঠোরতার রহস্য কী? নিম্নে এ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হল।

আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও স্নেহময়ী, তাহলে শাস্তি কেন?

এ প্রশ্নের জবাব বুঝতে হলে মানুষ কত প্রকার এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও স্নেহ কাদের জন্য তা বুঝতে হবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:–

(ক) এমন মানুষ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ধারণ রাখে, সাধ্যানুসারে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মোতাবেক জীবনযাপনে সচেষ্ট থাকে, তাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় অথবা পারিপার্শ্বিকতার চাপে আল্লাহ পাকের হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি অনীহা অথবা বৈরিতা প্রকাশ পায় না। যেমন নবী রসূলগণ।

(খ) যারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল এবং সাধ্যানুসারে আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিধি-নিষেধের অনুশীলনে কঠোর পরিশ্রমী, তবে জ্ঞাত-অজ্ঞাত অবস্থায় অথবা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অন্যায় আনাচারে পড়ে যায় কিন্তু তার জন্য অনুতপ্ত, লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

(গ) যারা সৃষ্টি হয়েও স্রষ্টার প্রতি ঈমান রাখে না, আনুগত্যের স্থলে বিদ্রোহ করে, তাদের মধ্যে কোন প্রকার অনুতাপ-অনুশোচনা এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায় না, বরং উগ্রতাই প্রকাশ পায়।

এখন মূল বক্তব্যে আসা যাক। তা হল আল্লাহ পাকের ক্ষমার বিধান কেবল প্রথম দুই প্রকার লোকের জন্য। তৃতীয় প্রকার লোকদের জন্য নয়। তাদের জন্য আল্লাহর কাঠোরতার বিধান সূচিত হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে দুনিয়ার নিয়ম শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাগিদেই। এই বিধানের বিকল্প মোটেই কল্যাণকর নয়। বস্তু জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিষয়ে মনোনিবেশ করলেই এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে কঠোরতাই হচ্ছে মহত্ত্বের পরিচায়ক। বিদ্রোহীর প্রতি নম্রতা মহত্ত্বের লক্ষণ নয়, বরং দুর্বলতার লক্ষণ, আর আল্লাহ পাক দুর্বল নন, বরং তিনি হচ্ছেন ক্ষমতার অধিকারী ও পরাক্রমশালী।

যারা দয়া মায়া এবং উদারতার গুণে গুণান্বিত, তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া ও স্নেহ তাদের জন্য হয় কল্যাণকর ও সফলতার উপায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার মূল্যায়নে অক্ষম, যারা আল্লাহর স্নেহ-মমতার আড়ালে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে, মূলত এরূপ স্বভাবের মানুষের জন্য গজব, ক্রোধ ও ক্ষোভই বাঞ্ছণীয়।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের অপরাধের কারণে অনন্তকালীন শাস্তি কেন?

এখানে আরও একটা প্রশ্ন হয়, যদি জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে শাস্তি দিতেই হয়, তাহলে শাস্তি অপরাধ পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল। সেমতে কাফেরদেরকে অনন্তকাল কঠোর আযাবে না রাখাই উচিত ছিল। তাদেরকে অনন্ত আযাবে রাখা হবে কেন, তারা তো ক্ষণস্থায়ী জগতের সীমিত সময়ে অপরাধ করেছে? এমতাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী সময়ের অপরাধের কারণে চিরস্থায়ী সময়ের আযাবে আক্রান্ত করা জুলুম নয় কি? তদুপরি হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে, رحمتي سبقت غضبي অর্থাৎ, 'আমার দয়া গযবের উপর প্রবল'। তাহলে কাফেরদেরকে অনন্তকাল কঠোর আযাবে আক্রান্ত রাখা কি দয়ার উপর কঠোরতা প্রবল হওয়া নয়?।

এই প্রশ্নের উত্তর হল– শাস্তি ও প্রতিবিধানের পরিমাণ এবং সময় সীমা ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী হয়, সে যেন দেশের নাগরিকত্বের অধিকার হারায়, দেশের সুখ-শান্তি ও স্বার্থ লাভের অযোগ্য বিবেচিত হয়। সেজন্য তার শাস্তি হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা হত্যা। যদিও সে যাবজ্জীবন অপরাধ করেনি, তবুও তার শাস্তি হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এটাকে অযৌক্তিক ভাবা হয় না। ঠিক অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করে না, তারা হয় খোদাদ্রোহী, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও একচ্ছত্র মালিকানার বিরোধী। এরূপ লোকেরা আখেরাতের শাস্তি এবং জান্নাতের অধিকারী হতে পারে না। তাদের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বরূপ স্থায়ী জাহান্নাম এবং জাহান্নামের কঠোর আযাব হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কাফেরদের জীবন অস্থায়ী এবং সীমিত, সেমতে তারা সীমিত সময়েই কুফরী করে থাকে, কিন্তু এ কারণে অনন্তকালীন শাস্তি হওয়াটা অযৌক্তিক কিছু নেই। ডাকাতরা যদি দু'ঘন্টা ডাকাতি করে, তাহলে কি তারা কেবল দু'ঘন্টাই শাস্তির উপযুক্ত হয়? আসলে শাস্তি দানের অন্যতম ভিত্তি দুটি:

(১) অপরাধের জঘন্যতার ভিত্তিতে শাস্তি হয়ে থাকে। অপরাধ যত অধিক জঘন্য হয়, শাস্তিও তদ্রূপ জঘন্য এবং অধিক হয়। এ জন্যেই রাষ্ট্রদ্রোহী এবং হত্যাকারীর শাস্তি অধিক হয়ে থাকে। কুফরী মূলত এমন জঘন্য অপরাধ, যে অপরাধের শাস্তি কঠোর ও জঘন্য হয়।

(২) শাস্তি এবং প্রতিদানের অন্যতম আরেকটি ভিত্তি হচ্ছে 'নিয়ত'। কাফেরদের কুফরী দীর্ঘ নিয়তের ভিত্তিতে হয়। মৃত্যুর কারণে অপরাধ অব্যাহত রাখতে পারে না। সুতরাং তাদের নিয়তের দীর্ঘতার ভিত্তিতে আযাবের মেয়াদ বৃদ্ধি হয় এবং হতে পারে। এ বক্তব্যের সারকথা হল, কাফেরদের শাস্তির স্থায়িত্ব দুনিয়ায় পাপাচারীতার স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং এ প্রেক্ষিতে যে, তারা অনন্ত জীবন পেলেও অনন্ত জীবনই অপরাধ করে যেত। সুতরাং তাদের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা এবং সেই শাস্তিকে স্থায়ী করা অযৌক্তিক কোন কিছু নয়।

রয়ে গেল হাদীছে কুদছীর বক্তব্য। এ ক্ষেত্রে কথা হল মু'মিনশ্রেণির লোকদের বেলায় হাদীছে কুদছীর বক্তব্য প্রযোজ্য, দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের বেলায় নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গজব এবং ক্ষোভের প্রকাশ দয়ার প্রবলতার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহর ক্ষমা ও স্নেহ গুণ কি পাপাচারিতাকে অনুপ্রাণিত করে?

আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং স্নেহময়ী, সুতরাং কী করে তিনি তাঁর সুন্দর সৃষ্টি মানুষকে কঠোর এবং অনন্তকালের আযাব দিতে পারেন? তিনি কি শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে অক্ষম?

www.maktabatulabrar.com

প্রকারান্তরে আল্লাহ পাকের মায়া-মমতা এবং ক্ষমার গুণ মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। কারণ, আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল বলে মানুষের মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল এবং স্নেহময়ী, সুতরাং অবশ্যই তিনি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করবেন। এরূপ চিন্তার ফলে পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে পারে, পাপাচারিতা বর্জনের মানসিকতা হ্রাস পেতে পারে। কাফের এবং বিধর্মীরা অনেক সময় এরূপ উক্তি করে থাকে, এর সাথে সুর মিলিয়ে কিছু মু'মিন মুসলমানকেও এ ধরনের কথাবার্তা বলতে শোনা যায়।

এরূপ বক্তব্যের জবাব হল– যারা এরূপ উক্তি করে থাকে, তাদের উক্তির অসারতা একদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন জীবনের গতি বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাদের বোঝা উচিৎ যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং স্নেহময়ী, কিন্তু তাঁর ক্ষমা ও স্নেহ লাভের জন্য ঈমানের শর্তও আরোপিত হয়েছে। সুতরাং যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও স্নেহের পাত্র হতে পারে না। শ্রমিক যদি মুনিবের প্রতি আনুগত্যশীল হয় আর ভুল করে অনুতপ্ত হয়, তাহলে অবশ্যই সে মুনিবের ক্ষমার পাত্র হতে পারে, কিন্তু যদি সে তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত না হয়, বরং মনিবকে মনিব হিসেবেই অস্বীকার করে, কিংবা হটকারিতার সাথে মনিবকে অমান্য করে চলে, তাহলে সে মোটেই মনিবের ক্ষমা এবং স্নেহের উপযুক্ত হতে পারে না। তেমনি কাফেররা ঈমান না থাকার কারণে আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও স্নেহের উপযুক্ত হতে পারে না।

আর যারা বলে, আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও স্নেহ গুণ মানুষকে অপরাধ প্রবণতায় অনুপ্রাণিত করে তোলে, তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, যদি আল্লাহর ক্ষমা ও স্নেহ গুণ অপরাধ প্রবণতার কারণ হয়, তাহলে তাঁর কঠোর আজাব দেয়ার গুণ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার কারণ নয় কেন? আল্লাহ তাআলা যদি নিজেকে ক্ষমাশীল ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে তিনি নিজকে কাহ্হার এবং জাব্বারও তো ঘোষণা করেছেন। মূলত আল্লাহ পাকের ক্ষমা এবং আযাব দেয়ার মধ্য কোন বিরোধ নেই। কেননা,

(ক) আল্লাহ পাক অসীম, সুতরাং তাঁর গুণাবলিও অসীম। তাই তাঁর প্রতি অসমর্থন ও আনুগত্যহীনতা এমন অপরাধ যার শাস্তিও সীমাহীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি ক্ষমা করে দেন, এটা তাঁর পরম দয়ালু হওয়ার প্রমাণ।

(খ) আল্লাহ পাকের অসীম গুণাবলির কারণে বান্দা অনন্তকাল শাস্তির উপযুক্ত হয়, কিন্তু তিনি কাউকে কাউকে সীমিত সময়ে শাস্তি দিয়ে তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে স্বীয় দয়ার প্রকাশ করে থাকেন।

(গ) পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি ক্ষমাশীল এবং দয়াবান হয়, কিন্তু সন্তানের পরিশুদ্ধি এবং ইসলাহের জন্য তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই শাস্তি প্রদান ক্ষমা এবং দয়ার বিরোধী নয়, বরং শাস্তি না দিলে সন্তানের জীবন বিপন্ন হবে, সুতরাং এই শাস্তিও মূলত ক্ষমা এবং দয়ারই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাকের ক্ষমা এবং শাস্তিকেও অনুরূপ মনে করতে হবে।

(ঘ) অপরাধীদেরকে সাথে সাথে শাস্তি প্রদানের বিধান ন্যায়সংগত, কিন্তু আল্লাহ পাক অনেকের ক্ষেত্রে শাস্তিকে বিলম্বিত করে আবার অনেকের প্রতি শাস্তিকে তরান্বিত করে ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

(ঙ) কাফেরদের কুফ্‌রীর কারণে তারা কোন ধরনের নেয়ামতের উপযুক্ত নয়, কিন্তু আল্লাহ পাক কর্তৃক তাদের প্রতি স্বীয় অসংখ্য নেয়ামত এবং ইহসান অব্যাহত রাখা তার দয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শনেরই নামান্তর।

(চ) চরম কাফেরদের তুলনায় নরম কাফেরদের প্রতি আযাবের পরিমাণ কম করে আল্লাহ পাক স্বীয় ক্ষমা এবং দয়ার গুণ প্রকাশ করে থাকেন। মোটকথা– আল্লাহ পাকের ক্ষমা এবং আযাবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তার এই দয়া এবং ক্ষমা মুমিনদের জীবনে অধিক আর কাফেরদের জীবনে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হয়।

(ছ) ক্ষমা এবং দয়া মানুষকে আনুগত্য এবং সমর্পনের প্রতি আকৃষ্ট করে। পক্ষান্তরে যারা ক্ষমা এবং দয়ার কারণে অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে, তার হতভাগ্য। এ ধরনের মানুষ ক্ষমার উপযুক্ত নয়, তাদের জন্য আল্লাহ পাকের কঠোর আযাবের বিধান কার্যকর হয় এবং তা যথার্থই হয়।

(জ) পাপাচারিতায় নিমগ্ন থাকা ঈমানের জন্য আশংকাজনক। কেননা, নেক আমল দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর অসৎকাজের কারণে ঈমানী শক্তি হ্রাস এবং নফ্‌সে আম্মারার তাড়না বৃদ্ধি পায়। হাদীছে রয়েছে, পাপের কারণে অন্তরে কালো দাগ পড়ে, যদি তওবা না করে এবং পাপ কাজ বর্জন না করে, তা হলে পাপের কালিমা বৃদ্ধি পেতে পেতে সমস্ত অন্তরকে কালিমায় পরিবেষ্টিত করে ফেলে। এমতাবস্থায় ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্ষমার যোগ্যতা থাকে না। তাই ঈমান রক্ষার তাগিদেও পাপাচারিতা থেকে মুক্ত থাকা বাঞ্ছণীয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়ার আশ্রয়ে পাপাচারিতায় লিপ্ত হওয়া নেহায়েত বোকামী বৈ অন্য কিছু নয়।

(ঝ) ক্ষমার পাত্র হওয়ার জন্য ক্ষমা পাওয়ার উপায়-উপকরণ অবলম্বনের খোদায়ী বিধান রয়েছে। সুতরাং সেসব উপায়-উপরকণ অবলম্বন না করে ক্ষমার আশা পোষণ করা নেহায়েত মূর্খতা ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই যেমন কাফেরদের এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন, তেমনি মু'মিনদেরও তা বিবেচনা করতে হবে।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ **(মহান আরশের অধিপতি।)**

আল্লাহ পাক অতি মহান। তিনি কঠোর, আবার তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াবানও। তিনি আরশের অধিপতি। এখান থেকেও তাঁর মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের দিক আলোকিত হয়। এ আয়াতে আরশের দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়।

আরশ পরিচিতি

(ক) আরশের দ্বারা আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে বোঝানো হয়েছে। কাফ্‌ফাল এরূপ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু আরশের এই অর্থ রূপক বলে বিবেচিত, অথচ আরশের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে এখানে কোন বাধা নেই।

(খ) এখানে আরশের দ্বারা ঐ আরশকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে আরশের কথা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। এই আরশের পরিচয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, 'যদি পৃথিবীর সমুদ্র সাগরসহ সমস্ত পানি একত্রিত করে আরশের ছাদে প্রবাহিত করা হয়, তাহলে তার সামান্য অংশে পানি প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। আল্লামা আলূসী বলেন, আরশের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া মানুষের শক্তির

বাইরে। আরশের পরিচয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয়। আয়াতে আরশের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বাধা নেই বিধায় অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছেন। এই আয়াতে 'আরশ'-এর পরবর্তী শব্দ 'মাজীদ' আরশের গুণ (বিশেষণ) হিসেবে নেয়া যায়। 'মাজীদ' অর্থ মহান। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে 'মহান আরশের অধিপতি'। অনেকের মতে মাজীদ শব্দটি আল্লাহ পাকের গুণ হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। তাহলে অর্থ হবে– 'তোমার পালনকর্তা অতি মহান, তিনি আরশের অধিপতি'। আয়াতে উভয় অর্থের অবকাশ আছে, তবে প্রথম অর্থ অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ **(তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।)**

আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়েই সুসক্ষম। তিনি যা ইচ্ছা করতে সক্ষম। তবে সক্ষম বলেই সব কাজ করেন তা জরুরী নয়, বরং ন্যায়সংগত কাজ করেন এবং যখন ইচ্ছা তখন করেন। তিনি কাফেরদেরকেও ক্ষমা করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি তাদেরকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন না। কেননা, ক্ষমার জন্য তিনি ঈমানের শর্ত আরোপ করেছেন, শর্ত পূরণ না হলে ক্ষমা করা অন্যায় হবে, আর আল্লাহ পাক অন্যায় করেন না। সুতরাং কুফ্‌রীর কারণে কাফের ক্ষমা পাবে না।

আল্লাহ পাক অতি মহান, পরাক্রমশালী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী, মহান আরশের অধিপতি, যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁকে বাধ্য করার অথবা বাধা দেয়ার কেউ নেই। যাকে ইচ্ছা কঠোরভাবে পাকড়াও করেন, আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, দয়া করেন। তবে তিনি জালেম নন, তাই জুলুম করেন না এবং জুলুমকে প্রশ্রয় দেন না। তিনি অন্যায় করেন না এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, তাই কেবল যা ন্যায়সংগত তা-ই করে থাকেন। এ কারণেই তিনি সুমহান এবং প্রশংসিত। তিনি স্বেচ্ছাচারী নন এবং স্বেচ্ছাচারীতাকে পছন্দ করেন না। যাকে শক্তি দেন, সে শাস্তির উপযুক্ত বলেই তাকে শক্তি দেন। পক্ষান্তরে যাকে নিরাপদে রাখেন সে নিরাপদের উপযুক্ত বলেই তাকে নিরাপদে রাখেন। উভয় অবস্থার পিছনে রয়েছে এক গোপন রহস্য ও বিরাট হেকমত। এ আয়াতের এটাই মর্মকথা।

একটি শিক্ষণীয় কথা

সাঈদ হামদানীর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অসুস্থ হলে লোকেরা চিকিৎসক আনার প্রস্তাব করে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন যে, চিকিৎসক আমাকে দেখেছেন। লোকেরা বলল, চিকিৎসক কী বলেছেন? তিনি বললেন, চিকিৎসক বলেছেন فعال لما يريد হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) 'চিকিৎসক' বলে আল্লাহ পাককে বুঝিয়েছেন।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ. فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ **(তোমার নিকট সৈন্য বাহিনীর খবর-বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? ফিরআউন এবং ছামূদের?)**

ফিরআউন এবং ছামূদের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ পাকের বিধান তিনি কাফেরদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে থাকেন। গর্ত খননকারী ও ফিরআউন ছামূদের ঘটনাবলি এর জন্য জ্বলন্ত প্রমাণ। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে বিরোধের কারণে

www.maktabatulabrar.com

ফিরআউন ও তার সহচরদেরকে এবং হযরত সালেহ (আ.)-এর সাথে বিরোধের কারণে ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। অপরপক্ষে নবীদের আনুগত্যকারী নির্যাতিত মু'মিনদের প্রতি মহান রব্বুল আলামীন দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন, তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের নেয়ামত এবং সম্মানে ভূষিত করেন। এরূপ অগণিত ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য ১৭নং এবং ১৮নং আয়াতে পর্যায়ক্রমে 'জুনূদ' (বাহিনী) শব্দ বহুবচন ব্যবহার করত ফিরআউন এবং ছামূদকে বিশেষভাবে এ জন্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের ঘটনাবলি আরবদের মধ্যে ছিল প্রসিদ্ধ এবং বহুল প্রচারিত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন। তাই বিশেষভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'হে নবী, তোমার নিকট কি তাদের খবর পৌঁছেনি।' অর্থাৎ, অবশ্যই পৌঁছেছে।

এসব ঘটনাবলি অবতারণার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। যথা:–

(ক) একটি উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ও মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও নির্যাতনমূলক আচরণ পরিহার করে।

(খ) যাতে নির্যাতিত মু'মিনগণ ধৈর্যধারণ করার প্রেরণা পায়, সান্ত্বনা পায় এবং আল্লাহ পাকের দয়া-মায়া লাভের অপেক্ষা করে।

(গ) যাতে উভয় পক্ষের লোকেরা বোঝে যে, আল্লাহ পাকের এরূপ ব্যবস্থাপনা অতীতের ন্যায় বর্তমান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ **(বস্তুত যারা কাফের তারা মিথ্যারোপে রত রয়েছে।)**

এখানে মক্কার কাফেরদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তারা মিথ্যারোপে রত রয়েছে। তারা অতীতের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে শ্রেষ্ঠনবীর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং মু'মিনদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করেছে, তাদেরকে অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে স্বদেশ ভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছে, তাদের সহায়-সম্বল ও বাড়ি-ঘর লুটপাট করে নিয়েছে। এমনকি হিজরতের পরও শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। নিম্নে কাফেরদের মিথ্যারোপের নমুনা পেশ করা হল।

কাফেরদের মিথ্যারোপের নমুনা

একশ্রেণির কাফের মুশরিকরা উক্তি করত যে, আমরা তো আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং আমরা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর অটল আছি, অথচ তাদের কেউ অগ্নির পূজা করত, কেউ মূর্তির পূজা করত, কেউ অন্যান্য সৃষ্টির পূজা করত। এই মিল্লাতে ইবরাহীমীর দাবী ছিল মিথ্যা। অপর একটি শ্রেণি ঈর্ষান্বিত এবং পরশ্রীকাতর হয়ে নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করে স্বার্থবাদী, যাদুকর, কবি, পাগল নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টিকারী ইত্যাদি অপবাদ করত। এগুলোও ছিল মিথ্যা।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফের মুশরিকদের প্রতিবাদ করে বলেন, এরা বড্ড মিথ্যাবাদী। কেননা, তারা যদি আমার প্রতি আনুগত্যশীল হতো, যদি মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হত –যেমন তারা মুখে বলে– তাহলে তারা ইবরাহীমের বংশধর শেষ নবী বিশ্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবশ্যই আনুগত্যশীল হত। কেননা, তিনি আমার পক্ষ হতে নির্বাচিত নবী। যারা নবীর প্রতি

www.maktabatulabrar.com

বিভিন্ন অপবাদ রটাচ্ছে, তারাই তাকে 'আল-আমীন' তথা 'সত্যবাদী' বলে ভূষিত করেছে। কিন্তু যখনই তিনি ঈমান-আমলের আহ্বান জানালেন, তখন তাঁকে বিভিন্ন ধরনের গালি-গালাজ শুরু করে এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাই এরা মিথ্যাবাদী বরং পূর্বসূরিদের তুলনায় অধিক মিথ্যাবাদী। কেননা:

(ক) এরা এমন নবীকে অস্বীকার করেছে, যিনি স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ নবী।

(খ) এরা এমন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, যার প্রতি অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় কিতাব নাযেল হয়েছে, যে কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সুসংরক্ষিত কিতাব। তাই এরা পূর্বসূরিদের তুলনায় অধিক মিথ্যাচারী।

সুবিচারের অন্যতম গুণাবলি

নেক আমলের শুভ পরিণাম যেমন সুনিশ্চিত এবং সর্বজন স্বীকৃত, তেমনি পাপাচারিতার অশুভ পরিণতিও সুনিশ্চিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। কেননা, সুবিচারের জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলির প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সঠিক অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সুবিচারে এবং ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ হওয়া, সুবিচার কার্যকর করার ব্যাপারে বিবেচনা পারদর্শী হওয়া। সুবিচারের এই অন্যতম গুণাবলি আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই এবং হতেও পারে না।

وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ **(আল্লাহ্ তাদেরকে সব দিক দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছেন।)**

মু'মিনগণ যেমন আল্লাহ পাকের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে, তেমনিভাবে কাফের মুশরিকরাও আল্লাহ পাকের ক্ষমতার অধীনে ও তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যদি একজন মানুষকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রাখা হয়, তাহলে তার আর পালাবার সুযোগ থাকে না। তেমনি কাফের সমাজ আল্লাহ পাকের অশেষ ক্ষমতার বেষ্টনীতে এমনভাবে আবদ্ধ রয়েছে যে, এর বাইরে আত্মাগোপন করার অথবা পলায়নের কোন সুযোগ নেই। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার এমন পরিবেষ্টন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন অর্থাৎ, তাদেরকে সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। অতএব যে কোন সময় তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করা এবং ধ্বংস করায় তিনি সুসক্ষম। সেমতে আল্লাহ পাক মক্কার কাফেরদের হটকারিতা, মিথ্যাচার এবং মু'মিনদের প্রতি দুরূহ আচরণ ও নির্যাতন-নীপিড়নের কারণে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণতি ভোগ করতেই হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ অবশ্যই আল্লাহ পাকের প্রতিদানে ধন্য হবে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, আল্লাহ পাক যেমন মু'মিনদের নেক আমল ও ধৈর্য-সহ্য সম্পর্কে অবগত আছেন, তেমনি কাফেরদের কুফ্রী এবং মু'মিনদের প্রতি তাদের জুলুম-নির্যাতন সম্বন্ধেও অবগত আছেন। কারা অপরাধী এবং কারা ফরিয়াদী উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ পাক সমানভাবেই অবহিত। সেমতেই তিনি উভয় পক্ষকে বদলা দিবেন।

এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মক্কার কাফের মুশরিক এবং তাদের সহযোগীদের উপর আল্লাহর কঠিন পাকড়াও ও কঠোর শাস্তির বিধান কার্যকারিতার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেননা, তাদেরকে বারংবার সতর্ক করা হয়েছে এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য সময়-সুযোগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা

সতর্কতা অবলম্বন এবং শিক্ষা গ্রহণ থেকে বরাবর বৈরিতা ও অনীহা প্রকাশ করেছে। শুধু তা নয়, সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে, তাই তাদের ধ্বংস অতি নিকটে। বস্তুত বদর, উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে, আর আল্লাহ পাক স্বীয় নবী ও মু'মিনদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতা দানে সৌভাগ্যশীল করত বিশ্ব মানবতার জন্য আদর্শ ও পাথেয় হিসেবে স্থাপন করেছেন।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ (বস্তুত এই কুরআন অতি মহান।)

মক্কার কাফের মুশরিক সমাজ ছিল অত্যন্ত মিথ্যাচারী বরং গর্ত খননকারী, ফিরআউন এবং ছামূদসহ অতীত মিথ্যাবাদীদের তুলনায়ও অধিক মিথ্যাচারী। কেননা, এরা নবীর উপর মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সর্বশ্রেষ্ট কুরআনকেও মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন প্রলাপ বলে অভিহিত করেছে। অথচ পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের বাণী, যা তাঁর নবীর উপর সংরক্ষিতভাবে নাযেল করা হয়েছে। এই কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপের কোন যৌক্তিকতা নেই।

কুরআনকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার অবকাশ এই জন্য নেই যে, এটা মহান রব্বুল আলামীনের কালাম। আর তাঁর কালামে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ পাক কারো অধীনস্ত নন যে, তার ভয়ে অথবা তার সাথে তিনি মিথ্যা বলতে বাধ্য। তিনি সুমহান, নিষ্পাপ, প্রশংসিত। সুতরাং বক্তার বক্তব্য তার অনুপাতেই হয়ে থাকে। ومن اصدق من الله حديثا

কুরআনকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার অবকাশ এই জন্যও নেই যে, কোন বাণী এবং বক্তব্যে যে সমস্ত কারণে মিথ্যা এবং সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয় অথবা হতে পারে, সে সমস্ত কারণের অন্যতম হচ্ছে যার বাণী তার মধ্যে মিথ্যা এবং সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান থাকা, বাণী অসংরক্ষিত হওয়া, বাণীর মাধ্যম নির্ভরযোগ্য না হওয়া, স্বয়ং বাণী নির্ভুল না হওয়া। আর পবিত্র কুরআনে এর কোনটির অবকাশই বিদ্যমান নেই। সুতরাং কুরআনকে মিথ্যা বলার কোনই অবকাশ নেই। এই কুরআন প্রকৃতপক্ষেই মহান কালাম।

فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।)

পবিত্র কুরআন সুসংরক্ষিত

সত্যবাদীর বাণী সংরক্ষণে অনিয়ম এবং ত্রুটি দেখা দিলে তাতে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়। তাওরাত যাবূর বিকৃতির মূলত কারণ এটাই। আর এই কিতাবসমূহ সাময়িক তথা স্থান-কাল-পাত্র ভিত্তিক হওয়ার কারণে তার স্থায়ী সংরক্ষণের প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু পবিত্র কুরআন সাময়িক নয়, বরং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একটি শাশ্বত কিতাব, স্থায়ী কিতাব। তাই স্থায়ী সংরক্ষণের তাগিদে স্বয়ং আল্লাহ পাকই এই কিতাব সংরক্ষণ করেছেন। এই কিতাবকে লওহে মাহফূজে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই কিতাব লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

ইব্নে মুনযিরী এবং আব্দ ইব্নে হুমাইদের সূত্রে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে সূরা ওয়াকেয়ায় বর্ণিত 'কিতাবুম্মাকনুন'-এর দ্বারা 'লওহে মাহফূজ'কেই বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে সূরা যুখরুফে বর্ণিত 'উম্মুল কিতাব' দ্বারাও 'লওহে মাহফূজ' কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মুজাহিদ এবং আব্দুল্লাহ ইব্নে বুরায়দা মত পোষণ করেছেন। আলোচ্য সূরায় স্পষ্ট শব্দে লওহে মাহফূজের কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

মুফাস্সির কাতাদাসহ অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে লওহে মাহফূজে সরাসরি আল্লাহ পাকের তত্ত্বধান বিদ্যমান। আর যে সমস্ত ফেরেশতা এর আশেপাশে প্রহরী হিসেবে আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন সাতরিয়োন অথবা মাতরিয়োন। আর একজন হচ্ছেন ইস্রাফিল। তারা সেখানে নতশির হয়ে আছেন। লওহে মাহফূজের প্রতি দৃষ্টি আরোপের অনুমতি নেই মোটেই।

لوح (লওহ)-এর পরিচয়

ইব্নে জারীর, ইব্নে মুনযির, ইব্নে হুমাইদ, আবূ ইয়ালা, বায়হাকী, বাগাভী, আব্দুর রাজ্জাক, তাবারানী প্রমুখ কর্তৃক হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, ইব্নে আব্বাস, আনাস, কাতাদা, মুকাতিল, হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইব্নে বুরাইদা, ইব্নে সালমান প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত হাদীছ এবং মতামতানুসারে 'লওহে মাহফূজ' আল্লাহ পাকের এক বিশাল সৃষ্টি। যবরজদ, মণি-মুক্তা এবং ইয়াকূত পাথরের তৈরী এই সৃষ্টির স্বাভাবিক রং সবুজ, আংশিক লাল বর্ণের। মতান্তরে এর দৈর্ঘ প্রস্থ আসমান যমীন সমতুল্য। পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর তিনশত অথবা শতাধিক বছরের পথ। এসব বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার আয়তনের বড়ত্ব বর্ণনা করা। সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনায় কোন বিরোধ নেই। এই লওহে মাহফূজ সপ্তাকাশের উপর আরশে আযীমের সাথে সম্পৃক্ত এবং তার ডান পাশে অবস্থিত।

محفوظ (মাহফূজ)-এর ব্যাখ্যা

'মাহফূজ'-এর অর্থ হচ্ছে সুসংরক্ষিত। কীসের সংরক্ষণ এবং কোথায় সুসংরক্ষিত-এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান রয়েছে। যথা:

(ক) এখানে কুরআনের সংরক্ষণ এবং তা মু'মিনের অন্তরে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। মুফাস্সির কাতাদা থেকে তাফসীরে দূররে মানছূরে এই মতটি উদ্ধৃত রয়েছে। এক আয়াতে স্পষ্টত রূহুল আমীন অর্থাৎ, জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে বিশ্ব রসূলের অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াও তা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সংরক্ষণের কুদরতী এই ধারাবাহিকতা উম্মতের মধ্যে অব্যাহত আছে এবং থাকবে। লক্ষ কোটি হাফেজে কুরআনদের অস্তিত্ব এরই বাস্তব প্রমাণ। তবে আলোচ্য আয়াতে প্রাসঙ্গিক ও হেকমতস্বরূপ এই অর্থের অবকাশ মেনে নিলেও মূল অর্থ এবং মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করার অবকাশ মেনে নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনকে 'লওহে' সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর মানুষের অন্তরকে রূপক অর্থে অবশ্যই 'লওহ' বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নেই। এখানে যেহেতু লওহের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নেই, তাই রূপক অর্থ গ্রহণ করা তাফসীরের মূল নিয়মের বহির্ভূত বিধায় পরিহারযোগ্য।

(খ) ইবনে মুহাইছেন এবং প্রসিদ্ধ কারী ইমাম নাফে' মাদানীর মতেও এখানে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তবে মানুষের অন্তরে নয় বরং লওহে মাহফূজে। এই মতানুসারে 'মাহফূজ' শব্দটি ২১নং আয়াতে বর্ণিত 'কুরআনুন' এর বিশেষণ হিসেবে বিবেচিত। এই মতের অন্যতম একটি উৎস হচ্ছে সূরা হিজ্রের নিম্ন আয়াতটি–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ .

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন নাযেল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষণকারী। (সূরা হিজর: ১৯)

এই আয়াতে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাফসীরের মূল ধারা অনুপাতে আয়াতের অর্থ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সেমতে অলোচ্য আয়াতে কুরআন সংরক্ষণের অর্থই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমাদের মতে উল্লিখিত তাফসীরের মূলধারা এবং প্রমাণস্বরূপ সূরা হিজ্‌রের যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিষয়বস্তু সঠিকই বটে, কিন্তু সূরা বুরূজের আলোচ্য এই আয়াতে কুরআনের সংরক্ষণের কথাই বলা হয়েছে– এই বাধ্যবাধকতা সূরা হিজ্‌রের সে আয়াতে নেই, বরং এর বিপরীত অর্থের অবকাশও বিদ্যমান রয়েছে, যা আমরা সামনে জুমহুরের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

লওহে মাহফূজে সংরক্ষণের অর্থ

দ্বিতীয় মতানুসারে লওহে মাহফূজে কুরআন সংরক্ষণের অর্থ এবং পদ্ধতি কী– এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

(ক) 'লওহে মাহফূজ' মূলত আয়না সদৃশ একটি ফলক। আল্লাহ পাকের বাণী এবং হুকুম আহকাম সমূহের প্রতিকৃতি এই ফলকে অংকিত ও সংরক্ষিত হয় আর তা ফেরেশতাগণ অবলোকন করে থাকে। কিন্তু আয়নার ভিতর প্রতিকৃতি প্রকাশের জন্য আয়নার সম্মুখে মূলবস্তুর অবস্থান অত্যাবশ্যকীয়, অথচ আল্লাহ পাক স্থান-কাল-পাত্র থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। তার কালাম তথা বাণীও তদ্রূপ স্থান-কাল-পাত্র থেকে মুক্ত। সুতরাং এ অর্থ মোটেই বোধগম্য নয়।

(খ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ যা কিছু শেখে এবং অনুধাবন করে থাকে, তা যেভাবে মানুষের মেধায় অংকিত ও সংরক্ষিত হয়, ঠিক এইভাবে আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন লওহে মাহফূজে অংকিত ও সংরক্ষিত হয়। কিন্তু মেধা দেহ সংশ্লিষ্ট বস্তু, দেহেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবিচ্ছেদ্য বলেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুধাবিত বিষয়াদি অংকন ও সংরক্ষণে সক্ষম হয় অন্যথায় সক্ষম হতো না। এ কারণেই এক জনের মেধা অন্যজনের ইন্দ্রিয়ে অনুভূত বিষয়াদি আকর্ষণ ও সংরক্ষণে সক্ষম হয় না। ঠিক একইভাবে লওহে মাহফূজ আল্লাহ পাকের বাণী অংকন ও সংরক্ষণ করে থাকে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে লওহে মাহফূজ কি আল্লাহর সত্তা ও বাণী থেকে অবিচ্ছেদ্য? নতুবা আল্লাহর বাণী অংকন ও সংরক্ষণ করল কীরূপে? বস্তুত লওহে মাহফূজ এবং আল্লাহর সত্তা ও তাঁর বাণী অবিচ্ছেদ্য নয়। কারণ, আল্লাহর বাণী তাঁর অন্যান্য গুণাবলির মতই একটি গুণ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহ পাকের গুণাবলি তাঁর নিজ সত্তা ও জাত থেকে কোন সময় পৃথক হয় না। সুতরাং এই গুণ তথা বাণী লওহে মাহফূজে অংকিত এবং সংরক্ষিত মেনে নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। আর যদি লওহে মাহফূজে অংকিত ও সংরক্ষিত বাণীকে স্বরূপ বাণী ধরে নেয়া হয়, তাহলে তা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কারণ, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রকৃত বাণী নিয়ে, স্বরূপ বাণী নিয়ে নয়।

(গ) পবিত্র কুরআন লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। মুফাস্‌সির কুরতুবীসহ অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এখানেও প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধকরণ বিষয়টি

www.maktabatulabrar.com

মেনে নিলে আল্লাহর বিষয় মাখলূকের বিষয় সদৃশ হয় বিধায় এটা আল্লাহ পাকের জন্য অশোভনীয়। তাই এ অর্থ পরিহারযোগ্য। এর উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ পাকের লিপিবদ্ধকরণের ব্যাপারটি মানুষের মতো নয়, বরং এটা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আমাদের জন্য ঈমান স্থাপন করাই বাঞ্ছণীয়। এখানে অধিক চর্চার অনুমতি নেই এবং প্রয়োজনও নেই। হাদীছে পাকে বলা হয়েছে যে, এই লিপিবদ্ধকরণের বিষয়টি সম্পন্ন হয় নূরের কলম ও কালি দ্বারা। আর নূরের কলম ও কালি এবং তার লেখা মানুষের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বিষয়। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ঈমান স্থাপনের বিধান সর্বজনস্বীকৃত। যদি বলা হয়, মুতাশাবিহাতের সুবাদে 'ক' এবং 'খ'–য়ে উল্লেখিত অর্থ কেন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না? তা হলে বলা হবে যে, ঐ অর্থ গ্রহণের কোন প্রমাণ নেই, আর এই অর্থ গ্রহণের প্রমাণাদি রয়েছে। যথা সূরায়ে ওয়াকিয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ .

অর্থাৎ, অবশ্যই এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত কিতাবে রয়েছে। (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৭৭–৭৮)

এই আয়াতে 'কিতাব' শব্দটি লিপিবদ্ধতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এমনিভাবে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে লিপিবদ্ধকরণের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে এ মতটি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে।

জুমহুরের মতামত

'মাহফূজ' শব্দের তাফসীরে এ পর্যন্ত আমরা দুটি মতের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই দুইটি মত জুমহুরের মত নয়। জুমহুর তথা অধিকাংশের মতে 'মাহফূজ' শব্দটি ২২নং আয়াতে 'লওহ'-এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। ইব্‌নে ইয়া'মুরের মতে এই শব্দটি লামের পেশের সাথে 'লুহুন' পড়া বাঞ্ছণীয়। তর্কশাস্ত্রবিদগণ এই কেরাতের উপর ভিত্তি করেই আয়াতের অর্থ 'লওহ' আয়না সদৃশ করেছেন। কিন্তু এর সমর্থনে কোন উপযুক্ত প্রমাণাদি না থাকার দরুণ অন্যান্য কারী ও মুফাস্‌সিরগণ লওহ শব্দের লামের উপর যবর পড়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই মতানুসারে আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের কথা নয়, বরং লওহের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। জুমহুরের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি প্রণিধানযোগ্য।

(ক) এই দুই জনের মতের তুলনায় অধিকাংশের মতের অগ্রাধিকারের দাবী সর্বজন স্বীকৃত।

(খ) 'মাহফূজ' শব্দটিকে 'কুরআনুন' এর صفت (বিশেষণ) ধরা হলে موصوف এবং صفت -এর মধ্যে অধিক দূরত্বের প্রয়াস সৃষ্টি হয়। এরূপ দূরত্বের বিধান আরবী গ্রামারে আছে বলে ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে এবং ইব্‌নে মালেক তাসহীল নামক কিতাবে মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রামার বিশেষজ্ঞ ইব্‌নে হাজিব এরূপ দূরত্বকে অপ্রচলিত এবং আরবী গ্রামারের প্রশ্নে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। অনেক মুফাস্‌সির অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত এরূপ দূরত্বকে তাফসীরের মূলধারা বিরোধী বলে প্রত্যাখান করেছেন।

(গ) পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের মহান একটি গুণ। মাখলূক অর্থাৎ, সৃষ্টির মত নশ্বর নয়, বরং অবিনশ্বর। সুতরাং এই গুণের সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে 'লওহ' একটি বিরাট সৃষ্টি বটে, তবে সৃষ্টি হিসেবে এর সংরক্ষণের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণেই সন্দেহ নিরসনে আল্লাহ পাক কর্তৃক সংরক্ষণের নিশ্চয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের তাগিদে মাহফূজ শব্দটি 'লওহ'-এর বিশেষণ হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

(ঘ) অনেক সময় موصوف -এর সাথে কোন صفت -এর বিশেষত্বের কারণে ঐ বিশেষ صفت টি موصوف -এর অংশ বিশেষ পরিগণিত হয়। পবিত্র কুরআনে এর নজীর সূরায়ে ওয়াকিয়াতে 'কুরআনুন কারীমুন' এবং হাদীছে পাকে كبة تشامية বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় الفوز الكبير এরই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে লওহ-এর সাথে 'মাহফূজ' صفت টি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বযুগে এবং বর্তমানেও প্রসিদ্ধ রয়েছে।

(ঙ) সর্বোপরি সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া, ইমাম বসরী ও ইবনে সালমান থেকে অংশ বিশেষ এবং নাম হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব কারণে এই মতটি অগ্রাধিকারের উপযুক্ত।

মুফাস্সির রাযীর বক্তব্য

মুফাস্সির রাযী শেষোক্ত মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর প্রমাণ হিসেবে সূরায়ে ওয়াকিয়ার আয়াত لا يمسه الا المطهرون কে পেশ করেছেন। তার মতে এই আয়াতে يمسه এর ضمير (সর্বনাম) في كتاب مكنون এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, আর 'কিতাব' দ্বারা লওহে মাহফূজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। দ্বারা লওহে মাহফূজকে উদ্দেশ্য করার সমর্থনে দুটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। যথা:-

(১) المطهرون এর الف لام আহ্দী। বিশেষ একটি শ্রেণিকে বুঝানোর জন্য الف لام আহ্দী আনা হয়েছে। আর ঐ শ্রেণি ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে লওহে মাহফূজকে স্পষ্ট করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং المطهرون এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করার মতটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

(২) দ্বিতীয়ত আরবীতে المطهرون সৃষ্টিগত পবিত্র আর المتطهرون স্বীয় উদ্যোগে পবিত্রতা অর্জনকারী-দের জন্য ব্যবহার করা হয়। সৃষ্টিগত পবিত্র কেবল ফেরেশতা জাতি, অন্য কোন জাতি সৃষ্টিগত পবিত্র নয়। সুতরাং এই আয়াতে ফেরেশতাগণই উদ্দেশ্য হতে পারে। যেহেতু يمسه এর ضمير দ্বারা লওহে মাহফূজ আর المطهرون দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ জন্যেই ইমাম মালেক ও ইমাম বোখারীর নিকট কুরআনকে নাপাক অবস্থায় তেলাওয়াত এবং হাতে স্পর্শ করায় শরীয়তগত কোন বাধা নেই।

রাযীর মতামতের পর্যালোচনা

আমাদের মতে 'মাহফূজ' শব্দটি 'লওহ'-এর গুণ বিশেষ হওয়া বিষয়ক ইমাম রাযীর মতটি অগ্রাধিকারের দাবী রাখে এবং দাবীর সমর্থনে উপরে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদির উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সূরায়ে ওয়াকিয়ার বর্ণিত আয়াত দ্বারা পেশকৃত ইমাম রাযীর প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, উক্ত প্রমাণের জন্য উল্লিখিত দুটি কারণই অত্যন্ত দুর্বল।

www.maktabatulabrar.com

(ক) কেননা, الف لام আহ্দী হলে ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করার দাবীর বাধ্যবাধকতা নেই, বরং এর দ্বারা নাপাক এবং পাক মানুষের মধ্যে পাক শ্রেণীর মানুষকে উদ্দেশ্য করার অবকাশ আছে। এমনি-ভাবে المطهرون ও المتطهرون এর পার্থক্য সঠিক নয়। কেননা, পবিত্র কুরআনে মহিলাদের ঋতুস্রাব অবস্থায় স্বামী স্ত্রী মিলনের বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ .

তোমরা তাদের নিকটবর্তী যেও না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। অতঃপর যখন তারা ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেয়, তখন তাদের সাথে সমাগত হও। (সূরা বাকারা: ২২২)

এখানে উভয় শব্দকে মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মানুষ সৃষ্টিগত পবিত্র নয়। এ কারণেই لا يمسه এর জমীরকে পবিত্র কুরআনের জন্য এবং المطهرون দ্বারা সৃষ্টি মানুষকে উদ্দেশ্য করার অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফী এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব মোতাবেক এই অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই তাদের নিকট নাপাক মানুষের জন্য পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা এবং স্পর্শ করা জায়েয নয়। তদুপরি পবিত্র কুরআনের মর্যাদা এবং আজমতের চাহিদাও এটাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং মাসআলা ফেকাহর কিতাবসমূহে রয়েছে।

সারকথা, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র 'কুরআন' অথবা 'লওহে মাহফূজ' যেটিই উদ্দেশ্য করা হোক না কেন, মূলত উভয়টিই সংরক্ষিত। উভয়টিই শয়তানের নাগালের বাইরে, পরিবর্তন পরিবর্ধনমুক্ত এবং উভয়ের পরিপূর্ণ তথ্যাদি সম্পর্কে সমগ্র সৃষ্টি অজ্ঞাত। এসব কিছু বর্ণনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একদিকে পবিত্র কুরআন এবং লওহে মাহফূজের বড়ত্ব ও মহত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অপর দিকে কাফেরদের মিথ্যাচারিতার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। অথবা তারা যে একে মিথ্যা অপলাপ ও ভিত্তিহীন কাহিনী বলে রটনা করত আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এর প্রতিবাদ করেছেন।

কুরআন সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে শিয়াদের ভিন্নমত প্রসঙ্গ

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, ইসলামের দাবীদার শিয়া নামক একটি সম্প্রদায় যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উছমান (রা.)-সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে, তেমনি পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করে এবং পবিত্র কুরআনকে অসংরক্ষিত মনে করে। উসূলে কাফী ইত্যাদি শিয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি অনুসারে পবিত্র কুরআনে সর্বমোট চল্লিশ পারা ছিল, যা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ত্রিশ পারায় পরিণত করা হয়েছে। তাই বর্তমান প্রচলিত কুরআনকে তারা বীজে উসমানী বলে মন্তব্য করে আর আসল কুরআন নিয়ে তাদের ১২জন ইমাম কোথাও লুকায়িত আছে, শিয়ারা যার আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। শেষ যুগে এক নিরাপদ মুহূর্তে আসল কুরআন নিয়ে সেই প্রতীক্ষিত ইমাম আত্মপ্রকাশ করবে। শিয়াদের এরূপ আক্বীদা কেবল মূর্খতারই পরিচয় বহন করে না, বরং এটা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য বিরোধী কুফরী আক্বীদা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই মতবাদ এবং আক্বীদার বাতুলতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লওহে মাহফূজের বিষয়বস্তু

লওহে মাহফূজে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে। আছে আরো বহু কিছু। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীছের সঠিক সূত্রে যা কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম কয়টি এই–

(ক) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির বিষয় লিখতে নির্দেশ দেন, আর কলম কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির ইতিবৃত্তান্ত সবকিছু লিখে নেয়। সর্বপ্রকার সৃষ্টি, সৃষ্টির স্বভাব, কর্মকাণ্ড, জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু, জীবনোপকরণ, তাদের কর্মফল এবং পরিণাম সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(খ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে অপর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, লওহে মাহফূজের প্রথমে লেখা রয়েছে, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আমার বিশেষ বান্দা এবং রসূল। আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করে, আমার সিদ্ধান্তের উপর সুস্পষ্ট থাকে, বিপদে ধৈর্যধারণ করে, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আমি তাকে সিদ্দীকীনদের মাকামে রাখব এবং তাকে আমি অবশ্যই জান্নাত দানে সৌভাগ্যশীল করব। আর যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তের আনুগত্য করে না, বিপদে ধৈর্যধারণ করে না, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আমি ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ মেনে নিতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাক তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন, ফলে তাকে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে।

(গ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক লওহে মাহফূজে তিনশত পনেরটি আমলের উল্লেখ করেছেন। এর যে কোন একটি আমল করে শির্কবিহীনভাবে বান্দা আমার কাছে হাজির হলে আমি তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করব। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছেও এরূপ বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আবুদ্দুনিয়ার 'মাকারিমে আখলাক', ইমাম বায়হাকীর 'শুআবুল ঈমান' এবং অন্যান্য হাদীছ তাফসীরের কিতাবসমূহে এ সমস্ত হাদীছ রয়েছে।

হাজ্জাজ ইব্নে ইউসুফ মুহাম্মাদ ইব্নে হানাফিয়াকে সতর্ক করে ধমকের সুরে যে চিঠি লিখেছিল, তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, 'বিশ্বস্ত সূত্রে আমি অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ পাক দৈনিক লওহে মাহফূজে তিনশত ষাট বার দৃষ্টি আরোপ করে থাকেন এবং ইজ্জত-সম্মান, অপমান-অপদস্ততা, শান্তি-অশান্তি, যা ইচ্ছা তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের দৃষ্টি তোমার দিকেও হতে পারে। তাই উদাসীন না হয়ে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন কর। চিঠির মর্মকথা এই যে, আজ তুমি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, কাল রাস্তার পথিক হয়ে যেতে পার, সবই আল্লাহর ইচ্ছা, তাই ক্ষমতার মোহে জুলুম-নির্যাতনের পথ অবলম্বন না করে আল্লাহর গজবের ভয় কর এবং ন্যায়পথ অনুসরণ কর। এই চিঠি সকলের জন্যই আদর্শ এবং পাথেয় হোক।

www.maktabatulabrar.com

(৪) সূরা ত্বারিক, মক্কী
১৭ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ①	(১) আসমান এবং রাতের অন্ধকারে আগমনকারীর কসম!
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ②	(২) তুমি জানতে চাও কি অন্ধকারে আগমনকারী বস্তুটি কি?
النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③	(৩) অতি উজ্জ্বল তারকা।
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④	(৪) প্রত্যেক আত্মার রয়েছে হেফাজতকারী।
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤	(৫) মানুষের চিন্তা করা উচিৎ কোন্ বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑥	(৬) উচ্ছ্বসিত পানি বিন্দু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ⑦	(৭) যা মেরুদণ্ড এবং বক্ষপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়।
اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ⑧	(৮) নিশ্চয় তিনি তাকে পুনর্জীবিত করতে সুসক্ষম।
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ⑨	(৯) যেদিন রহস্যাদির যাচাই করা হবে।
فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ⑩	(১০) যেদিন মানুষের কোন জোর খাটবে না, কোন সাহায্যকারীও জুটবে না।

শব্দার্থ

وَالسَّمَآءِ আসমানের কসম করছি, وَالطَّارِقِ এবং অন্ধকারে আগমনকারীর (কসম করছি), النَّجْمُ তারকা, নক্ষত্র, الثَّاقِبُ অতি উজ্জ্বল, اِنْ كُلُّ نَفْسٍ প্রতিটি আত্মার, حَافِظٌ হেফাজতকারী, তত্ত্বাবধায়ক فَلْيَنْظُرِ অতএব, চিন্তা করা উচিৎ, مِمَّ خُلِقَ কি বস্তু থেকে তৈরী, مِنْ مَّآءٍ পানি থেকে, دَافِقٍ উচ্ছ্বসিত, يَخْرُجُ বের হয়, নির্গত হয়, مِنْ بَيْنِ মধ্য থেকে, صُلْبِ মেরুদণ্ড, وَالتَّرَآئِبِ এবং বক্ষ পাজর, عَلٰى رَجْعِهٖ পুনর্জীবিত করনে, لَقَادِرٌ সুসক্ষম, تُبْلَى যাচাই করা হবে, السَّرَآئِرُ গোপন রহস্যাদি, فَمَا لَهٗ তার জন্য জুটবে না, مِنْ قُوَّةٍ কোন জোর, কোন শক্তি, وَّلَا نَاصِرٍ কোন সাহায্যকারীও না।

ভাবার্থ

আমি আসমান এবং রাতের আঁধারে উদীয়মান নক্ষত্রের কসম করে বলছি, যেমন তারকাসমূহ আসমানে বিদ্যমান ও সুসংরক্ষিত রয়েছে, দিনের বেলায় দেখা যায় না, কিন্তু নির্ধারিত সময় রাতে দেখা যায়, এমনিভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রহরী এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। যে প্রহরী তার পাহারা দেয়, তত্ত্বাবধান করে, তারা মানুষের আমল আখলাক সবকিছুই সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে। নির্ধারিত দিন নির্ধারিত সময়ে সব কিছুই প্রকাশ পাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ হবে, সেদিন প্রত্যেকের সম্মুখে স্বীয় কর্মফল প্রকাশ পাবে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিৎ। কারো মনে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করে পচে গলে বিলীন হয়ে যায়, তাই পুনর্জীবন সম্ভব হবে কীরূপে, তা হলে চিন্তা করা উচিত, মানুষ এক বিন্দু বীর্য দ্বারা তৈরী হয়েছে। যিনি এরূপভাবে সৃষ্টিকরণে সক্ষম, তিনি কি পুনর্জীবনে সক্ষম হতে পারেন না? অবশ্যই সক্ষম। কবরে পচে গলে যাওয়াতে কিছু আসে যায় না। কারণ, পঁচে গলে বিলুপ্ত হয় না, বরং মাটির সাথে মিশে থেকে যায়। আর আত্মা তো কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হয় না। ঐ মিশ্রিত অংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কেয়ামতের দিন মাটিতে মিশ্রিত পদার্থকে একত্রিত করে হাশরের ময়দানে হাজির করা হবে। যারা নেক তারা হবে পুরস্কৃত, আর যারা পাপী তাদের সমস্ত পাপ কাজ প্রকাশ পাবে। কেননা, দুনিয়াতে শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্য সহযোগিতায় অনেক সময় নিজের পাপাচারিতাকে গোপন করা সম্ভব হয়, কিন্তু সেখানে স্বীয় ক্ষমতার বলে পাপাচারিতা গোপন করা যাবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি অযৌক্তিক নয় বরং জ্ঞানে ধরে। তা ছাড়া এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণও রয়েছে। কেননা, এই বিষয়টির সংবাদ যিনি দিয়েছেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ পাক, যিনি আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন যা যমিনে বর্ষিত হয়। এত কুদরতশালী আল্লাহর মিথ্যা সংবাদ দেয়ার কী প্রয়োজন? তাঁর বাণী হচ্ছে কুরআন। যে কুরআন হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য স্থাপনকারী এবং চূড়ান্ত সত্য। এর মধ্যে না আছে মিথ্যার অবকাশ, না আছে সন্দেহের অবকাশ। এই কুরআনেই পুনর্জীবন এবং আখেরাতের কথা সংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আশ্চর্য যে, কাফেররা এ সত্যটিকে মিথ্যাচারে পরিণত করার জন্য অবিরাম চক্রান্তে লিপ্ত। তাই আমি আল্লাহ তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করা এবং তাদেরকে কঠোর আযাব দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করছি। আমার আযাব, আমার বিলম্ব কৌশলগত ব্যাপার। এখন বোঝা প্রয়োজন যে, তাদের চক্রান্ত টিকবে না আমার কৌশলের বিজয় হবে। সুতরাং হে নবী, তোমার ভীতি অথবা চিন্তার কোন কিছু নেই, তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর থাকতে দাও, বেশি দিন নয়, মাত্র গণনার কয়টি দিন। এরপর মৃত্যুর পূর্বে অথবা পরে আমার আযাব অবশ্যই তাদেরকে গ্রাস করবে।

সূরার নামকরণ ইত্যাদি

এই সূরার নাম 'সূরাতুত তারিক'। এক নং আয়াতের 'আত-তারিক' শব্দের মাধ্যমেই সূরাটির নামকরণ হয়েছে। শব্দটির অর্থ এবং ব্যাখ্যা পরে আসছে। এক রুকূ বিশিষ্ট এই সূরার আয়াতের সংখ্যা

www.maktabatulabrar.com

১৭টি। বাক্য ৬১, শব্দ ২৩৯ অথবা ২৫৪। সুরাটি মক্কায় নাযেল হয়েছে বলে একে মক্কী সূরা বলা হয়েছে। এই সূরার পূর্বে সুরাতুল বালাদ এবং পরে সূরাতুল কামার নাযেল হয়।

শানে নুযূল

তাফসীরে কাবীর, মুরাদিয়া ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব রসূলের চাচা আবূ তালেব একদিন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাতে আসেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আপ্যায়নে খানা খাওয়ার সময় একটি তারকা ছুটে অতি নিকটে এসে পড়ে। যার চমকে ঘর আলোকিত হয়ে যায়। আবূ তালেব তাতে আশ্চর্যান্বিত হন এবং বিশ্ব রসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের কারণে রসূলে পাকের নিকট এর হাকীকত সম্পর্কে জানতে চান। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এটি একটি তারকা, আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন, এর মাধ্যমে শয়তানকে আসমান থেকে বিতাড়িত করা হয়।' আবূ তালেব রসূলের বাণী শুনে খুবই অবাক হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সূরার বিষয়বস্তুর সাথে শানে নুযূলের তেমন সামঞ্জস্য প্রস্ফুটিত নয়। তাছাড়া এর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। তাফসীরে মাজহারীতে মুফাস্সির কালবীর সূত্রে এ ঘটনাটির উল্লেখ আছে, কিন্তু সনদের উল্লেখ নেই।

যোগসূত্র

(ক) আল্লামা তানতাভীর মতে পূর্বের সূরায় আসমান, বুরূজ, ফেরেশতা, তাদের গুণাবলি এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমলের সংরক্ষণ ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে, এই সূরাতেও এ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

(খ) আল্লামা আলূসীর মতে পূর্বের সূরায় পবিত্র কুরআনের প্রতি কাফেরদের মিথ্যারোপের আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরায় আল্লাহ পাক কুরআনের আজমত বর্ণনা করে কাফেরদের প্রতিবাদ করেছেন আর বিশ্ব রসূলকে তাদের প্রতি অবকাশ দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

(গ) চিন্তা করলে অন্যান্য দিক দিয়েও যোগসূত্র উদ্ভাবন করা যায়। যথা: পূর্বের সূরায় পুনর্জীবনের পর কাফেরদের প্রতি কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, আর এই সূরায় তাঁর কুদরত এবং পুনর্জীবনের যথার্থতার উপর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। পূর্বের সূরায় শাস্তি দেয়ার জন্য অপরাধীর উপর আল্লাহ পাক স্বীয় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে তার 'ঘেরাও' এর কথা বলেছিলেন। এই সূরায় ঘেরাও সর্বস্থানে পরিদৃষ্ট রয়েছে। স্থলে, পানিতে যেখানেই যাও, সেখানে আসমান ঘেরাও করে আছে, এই আসমান থেকেই হুকুম-আহকাম চূড়ান্ত হয়। জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, জয়-পরাজয় সম্মান-অসম্মান, ধনী হওয়া গরীব হওয়া সবকিছু সেখান থেকেই চূড়ান্ত করা হয়, এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। মানুষ এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রতিকূল বিষয়াদি থেকে মুক্তির জন্য অনেক কিছু চেষ্টা-তদবীর করে থাকে– ভাল এবং মন্দ লক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, ঝাড় ফুঁক করে থাকে, তাবীজ লাগায়, পীর বুজুর্গদের মাজারে নজর-নেয়াজ পেশ করে থাকে, আরো কত কিছু করে থাকে। কিন্তু যখন সময় হয়, তখন তা-ই ঘটে, যা আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত খণ্ডানো যায় না, খণ্ডানোর ক্ষমতা কারো নেই। আলোচ্য সূরায় পূর্বের সূরার এ সমূহ বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

তাফসীর

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ **(আসমান এবং রাত্রির অন্ধকারে আগমনকারীর কসম!)**

আসমান আল্লাহ পাকের কুদরতের বিরাট নিদর্শন। ইতিপূর্বে বহুবার এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ পাক কেবল এই আসমানকেই সৃষ্টি করেননি, বরং একে সুসংরক্ষণ করে রেখেছেন। তার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আরো অসংখ্য সৃষ্টি। একদিন আল্লাহর কুদরতে এরও সমাপ্তি ঘটবে। এই আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই আসমানে অসংখ্য বুরূজ বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহর কুদরতে তাও সুসংরক্ষিত, কিন্তু একদিন বুরূজসমূহেরও সমাপ্তি ঘটবে। সূর্য উদিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে, সূর্য কত বিরাট সৃষ্টি, কিন্তু সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে সূর্যের উপরও আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ পায়। এতো বৃহৎ আকৃতির তারকাসমূহ দিনের বেলায় পরিদৃষ্ট হয় না। যেই সূর্য অস্ত যায়, ধীরে ধীরে রাতের গভীর আঁধারে তারকারাজী সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শোভিত হয় আকাশমণ্ডলী। কুদরতের কি নমুনা! মানুষ কি তা অনুধাবনের চেষ্টা করে? আল্লাহ পাক কসমে বিশ্বাসী আসমান এবং তারকারাজির পূজারীদেরকে স্বীয় শক্তির পরিধি ও অকাট্যতা সম্পর্কে সজাগ করে তোলার উদ্দেশ্যে এই দুয়ের কসম দিয়ে স্বীয় বক্তব্য পেশ করেছেন।

طارق -এর বিশদ বিবরণ

طارق (ত্বারিক) শব্দটি طرق (ত্বরক) ধাতু থেকে নির্গত। এর অভিধানগত অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে টোকা এবং ধাক্কা দেয়া। টোকা এবং ধাক্কা দেয়ার জন্য আগমন করতে হয়। এই হিসেবে প্রত্যেক আগমনকারীকে ত্বারিক বলা হয়, চাই দিনে আগমন করুক অথবা রাতে। এই অর্থেই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই মুনাজাত করতেন।

اعذبك من شر الطارق الليل والنهار ... يا رحمن.

হে দয়াময়, রাত এবং দিনে আগমনকারীর অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

রাতের বেলা বাড়িতে এলে দরজায় টোকা এবং ধাক্কা দেয়া হয়, এই সুবাদে রাতের আগমনকারীকে 'তারিক' বলার প্রচলন হয়। এমনকি রাতে নির্জনে মনে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা এবং ধারণা জন্মে থাকে- এগুলোকেও তারিক বলার প্রচলন আরবীতে রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق المسافر اهله ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة.

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন যেন ভ্রমন থেকে ফিরে কেউ রাতের বেলা পরিবার-পরিজনের কাছে না যায়, যাতে স্ত্রী গোপন অঙ্গের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে এবং চুল পরিপাটি করে নিতে পারে।

যাহোক আলোচ্য আয়াতে তারিক দ্বারা রাতের আগমনকারীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তবে রাতে আগমনকারী যে কাউকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড়ত্বের অধিকারী আগমনকারীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বাস্তবে এই আগমনকারীর সঠিক পরিচয় সে-ই দিতে পারেন, যিনি তাকে স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তারিক সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারিক সম্বন্ধে আল্লাহ কর্তৃক পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হযরত সুফইয়ান ইব্নে

www.maktabatulabrar.com

উয়াইনা বলেন, পবিত্র কুরআনে 'মারূফ' ছীগার মাধ্যমে প্রশ্নের সূরে যেখানেই রসূলকে সম্বোধন করা হয়েছে, সেখানে সম্বোধনের বিষয়ে বিশ্ব রসূলকে অবহিত করা হয়েছে। তবে তার বিস্তারিত বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে,

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا.

তোমার কী জানা আছে হয়তো কেয়ামত নিকটবর্তী। (সূরা আহযাব: ৬৩)

এ থেকে বোঝা যায়- কেয়ামত সম্বন্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হয়েছে, তবে কেয়ামতের বিস্তারিত বিষয় তথা কেয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হয়নি।

বস্তুত যে বিষয়ে রসূলকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং উম্মতকে বারণ করা হয়নি, বরং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উম্মত উপকৃত হতে পারে, সঠিক নিয়তের শর্তে সেই জ্ঞান অর্জনে কোন বাধা নেই। তাই তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা এবং গবেষণা করা শরীয়ত বহির্ভূত নয়, বরং শরীয়ত সম্মত।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ (অতি উজ্জ্বল তারকা।)

النجم (নাজ্ম)-এর বিশদ বিবরণ

'তারিকের' পরিচয়ে আল্লাহ পাক স্বয়ং الثاقب النجم বাক্য নাযেল করেছেন। 'নাজমুন' অর্থ তারকা, আর 'ছাক্বিব' অর্থ করা হয়েছে 'উজ্জ্বল'। পূর্ণ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, 'উজ্জ্বল তারকা'। উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য এই পরিচয়ই যথেষ্ট। কেননা, তারকা একটি আল্লাহর বিরাট সৃষ্টি, অথচ আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এতেই আল্লাহ পাকের ক্ষমতার পরিধি আঁচ করা যায়। তবে এমনও তারকা রয়েছে, যার আলো অদ্যাবধি পৃথিবীতে পৌঁছেনি। এখানে তারকার গুণ হিসেবে 'উজ্জ্বল' শব্দটি উল্লেখ করায় অনুমিত হয় যে, এখানে এমন তারকাকে বুঝানো হয়েছে, যা রসূল এবং উম্মতের নিকট পরিদৃষ্ট।

আয়াতে বর্ণিত 'নাজ্ম' (তারকা) দ্বারা কোন তারকাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

১. এটি হল যুহল (زُحَل/saturn) তথা শনিগ্রহ। মুফাস্সিরীন এবং মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতে যুহল নামক গ্রহটি অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী, আভিধানিক ফার্‌রা, মুফাস্সির ইবনে যায়েদ-এর মতে আলোচ্য আয়াতে এই তারকাটিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্নে হাসান আত্তার, মুফাস্সির ইবনে জারীর প্রমুখ তাদের তাফসীরের কিতাবে এই মতটি উদ্ধৃত করেছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবে লেখা আছে যে, হযরত জাফর সাদেক এক ইয়ামানীকে এ গ্রহটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ইয়ামানী বলে যে, যুহল গ্রহটি আমাদের নিকট অত্যন্ত অশুভ এবং ঘৃণ্য। এর উত্তরে তিনি বলেন, সাবধান! আর কোন দিন এরূপ মন্তব্য করো না। কেননা, এই গ্রহটি হযরত আলী এবং সমস্ত ওলীগণের গ্রহ। আর আল্লাহ পাক এই গ্রহটিকেই উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু এরূপ বাধ্যবাধকতা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয় না, আর শিয়াদের উক্তির কোন ভিত্তি নেই বিধায় তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কারও কারও মতে এটি হল সুরাইয়া (الثريا/pleiads) তথা কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রপুঞ্জ। আরবীতে সুরাইয়াকে 'নাজ্‌ম' বলা হয়, আর আয়াতেও 'নাজ্‌ম' শব্দ বিদ্যমান রয়েছে, তাই এই নক্ষত্রপুঞ্জই উদ্দেশ্য। ইব্‌নে যায়েদ এরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই নক্ষত্রপুঞ্জকে উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করার জন্য এতটুকু প্রমাণ মোটেই যথেষ্ট নয়।

৩. কারও কারও মতে এটি হল চন্দ্র। প্রসিদ্ধ আভিধানিক ফার্‌রা বলেন, চন্দ্র রাতের সর্বাধিক আলোকময় উপগ্রহ, দিনের বেলায় যেমন সূর্যের প্রধান্য বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি রাতের বেলায় চন্দ্রের আলোর প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। আয়াতে চন্দ্রকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কিন্তু একে তো কেবল চন্দ্র উদ্দেশ্য হওয়ার বাধ্যবাধকতার কোন প্রমাণ নেই, দ্বিতীয়ত কামার অর্থাৎ, চন্দ্রকে নাজ্‌ম অর্থাৎ, তারকা বলার প্রচলন নেই। এ কারণেই মুফাস্‌সির আলূসী এই মতটিকে অবোধগম্য বলে মন্তব্য করেছেন।

৪. কারও কারও মতে এটি হল শিহাব নামক তারকা। আয়াতে এটাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে শিহাবের গুণ হিসেবে ছাক্বিব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ পাক আগত আয়াতে স্বীয় হেফাজতের কথা বর্ণনা করেছেন। শিহাব তারকার মাধ্যমেও হেফাজতের কাজ নেয়া হয়। শয়তানরা আসমানে বিচরণ করে গায়েবী রহস্যাদি সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সমাজে চালু করতে চায়। এভাবে শয়তানরা মানুষের ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট করার জন্য এবং কুরআনকে সন্দেহযুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় সেই শয়তানদের প্রতি শিহাব তারকা নিক্ষেপিত হয়, ফলে শয়তানরা সেখান থেকে পলায়ন করে। এখান থেকে আল্লাহ পাকের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতীয়মান হয়। এই তাফসীরটি উপর্যুক্ত তাফসীরসমূহের তুলনায় অধিক যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু এটাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। বরং অন্যান্য তারকাও উজ্জ্বল হয় বিধায় সেগুলোও আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং কেবল শিহাব তারকাকেই আয়াতের উদ্দেশ্য বলে স্থির করার কোন উপায় নেই।

৫. রাতের বেলায় আলোকিত হয়– এমন সব তারকাই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে জুমহুর অর্থাৎ, অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ মত পোষণ করেছেন এবং যথার্থই করেছেন। কেননা, আয়াতে বর্ণিত 'নাজম' শব্দটি সমস্ত তারকাকেই বুঝায়, কোন একক তারকাকে উদ্দেশ্য করার জন্য বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। উপরন্তু তারিক শব্দটি রাতে উদিত সমস্ত তারকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তাফসীরে ইব্‌নে জারীরে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তারিকের অর্থও এর সমর্থন করে।

প্রতিটি তারকাই আল্লাহ পাকের অসীম শক্তির নিদর্শন। তারকারাজির মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেক কিছু ঘটিয়ে থাকেন। ভূমিকম্প, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি আল্লাহ পাকেরই কর্মকাণ্ড। এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীছসমূহে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এসব বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরাও গবেষণা করে এগুলো বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকে, কিন্তু এ ব্যাপারে প্রাচীন এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধের কারণে কোন মতকেই সুনিশ্চতভাবে স্থির করা যায় না। বিজ্ঞানীদের বর্ণিত কারণকে সঠিক মেনে নিলেও মূল কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় কুদরত প্রকাশ করে থাকেন। অতএব সমস্ত তারকার সংরক্ষণ এবং সমস্ত তারকার মাধ্যমে কুদরতের প্রকাশ এমন একটি ধ্রুব সত্য, যা মোটেই অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মূল

www.maktabatulabrar.com

উদ্দেশ্য আল্লাহর অসীম কুদরতের বর্ণনা বিধায় 'নাজ্‌ম' দ্বারা সমস্ত তারকাকে উদ্দেশ্য করা বিষয়ক জমহুরের মতটিই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

আয়াতে বর্ণিত 'নাজ্‌ম' (তারকা) দ্বারা কোন তারকাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে উপর্যুক্ত ৫টি মত ছাড়াও আরো মত রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায় মুফাস্‌সিরগণ তা গ্রহণ করেননি।

الثاقب (ছাক্বিব)-এর অর্থ

ثاقب (ছাকিব) শব্দটি ثقب (ছাক্বাব) হতে নির্গত। এর মূল অর্থ হল 'ছিদ্র'। সুতরাং ছাক্বিব অর্থ ছিদ্রকারী। অতঃপর এই শব্দ আলো এবং উজ্জ্বল অর্থে প্রচলিত হয়। কারণ,

(ক) তারকার আলো অন্ধকারকে ছিদ্র করে তাতে প্রবিষ্ট হয়ে অন্ধকারের স্থলে আলো প্রকাশ করে। এ হিসেবেই ছাক্বিব শব্দটিকে শিহাব এবং নাজ্‌মের গুণ হিসেবে ব্যবহার হওয়ার প্রচলন হয়।

(খ) তারকার আলো বায়ুকেও ভেদ করে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকে। এ হিসেবেও আলো অর্থে এবং তারকার গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যৌক্তিকতা আছে।

(গ) তারকার আলো শয়তানের উপর পড়ে এবং প্রবিষ্ট হয়, ফলে শয়তানের নাপাক স্বভাবে তারকার আলো পড়ায় তার স্বভাবে ভীতি জাগে, ফলে সে পলায়ন করে। এ হিসেবেও এরূপ ব্যবহারের প্রচলন যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) আভিধানিক ফার্‌রার মতে ছাক্বিব শব্দের মূল ধাতুতে উর্দ্ধতার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে, আর বাস্তবে তারকাসমূহ উর্দ্ধে অবস্থান করে বিধায় আলোর গতিও উর্দ্ধমুখী এ হিসেবেও তারকার গুণ হিসেবে ছাক্বিব শব্দ ব্যবহার হওয়ার যৌক্তিকতা আছে।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (প্রত্যেক আত্মার রয়েছে হেফাজতকারী।)

আল্লাহ পাক একক এবং লা শারীক স্রষ্টা। জামাদাত তথা জড় জাতীয় সৃষ্টি, নাবাতাত তথা উদ্ভিদ জাতীয় সৃষ্টি এবং হাইওয়ানাত তথা জীব জাতীয় সৃষ্টি– এসব কিছুই আল্লাহরই সৃষ্টি, এতে কারো অংশীদারিত্ব নেই। তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হেফাজত করে থাকেন এবং তিনিই এককভাবে তত্ত্বাবধায়ক।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে আত্মা। এই আত্মা আল্লাহ পাকের তাসবীহ ও তাহলীল করে থাকে। কিন্তু অনেক সৃষ্টির মধ্যে আত্মার ক্রিয়া অত্যন্ত স্বল্প হওয়ার কারণে সেগুলোকে জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় না। নতুবা সেগুলোও জীব তথা সেগুলোর মধ্যেও জীবন ও আত্মা রয়েছে। কেবল চার প্রকার সৃষ্টির উপর জীব পরিভাষাটির প্রচলন আছে। মাটির তৈরী মানবজাতি, নূরের তৈরী ফেরেশতা জাতি, আগুনের তৈরী জিনজাতি এবং মাটির তৈরী জানোয়ার পশুপাখি ইত্যাদি, যাদেরকে হাইওয়ান (জীব) বলার প্রচলন প্রসিদ্ধ। এই সব সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ পাক এবং মূল তত্ত্বাবধায়কও তিনিই।

نفس (নফ্‌স) তথা আত্মা দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

চার নং আয়াতে 'নফ্‌স'-এর হেফাজত ও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু স্বল্পমাত্রায় ক্রিয়াবিশিষ্ট হলেও প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান রয়েছে, তাই অধিক ক্রিয়াশীল এবং স্বল্প ক্রিয়াশীল উভয় প্রকার সৃষ্টিই 'নাফ্‌স' শব্দের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে পারে। সেমতে আয়াতের অর্থ হবে

আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, তাদের অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তাদের কল্যাণ সাধন করে থাকেন এবং অকল্যাণ দুরীভূত করে থাকেন। এক কথায় তিনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর বাস্তবেও সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক এবং সংরক্ষক আল্লাহ পাকই। তবে সম্ভাবনা আছে যে, এখানে 'নফ্স' দ্বারা কেবল পরিভাষাগত হাইওয়ান তথা জীবজগতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মুফাস্সির রাযী তাফসীরে কাবীরে এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ফেরেশতা জাতি শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়। জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রশ্ন তাদের বেলায় নেই, এ কারণে তাদের জন্য কোন বিচারাদালতের বিধানও নেই। এ হিসেবে ফেরেশতা এ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর জিন জাতি অবশ্য শরীয়তের আওতাভুক্ত এবং মুকাল্লাফ, কিন্তু এ আয়াতের আগে পিছের বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, জিন জাতি এখানে মূল উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত নয়, যদিও তারা 'নাফ্স'-এর আওতাভুক্ত।

نفس (নফ্স) -এর হেফাযত দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে চারটি জিনিস বিদ্যমান রয়েছে। আত্মা, দেহ, অন্তর এবং আকল বা মেধা। তবে এর মধ্যে অন্যতম আত্মা। আত্মার বদৌলতেই দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল হয়। এ কারণেই আত্মা বের হয়ে গেলে দেহের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষকে মৃত ঘোষণা করে মাটিতে দাফন করা হয়, অথবা আগুনে জ্বালিয়ে বায়ু ও পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আত্মার ব্যাপারটি এমন নয়; সে অমর। দেহ থেকে বের হয়ে আত্মা আখেরাতের জগতে চলে যায়। আর যত দিন দেহে বিদ্যমান থাকে, ততদিন আত্মা এবং দেহকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়া হয়।

কিন্তু মানুষের ভাল মন্দ অনুধাবনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার অন্তর। যদি অন্তর অশুদ্ধ এবং কালো হয়, তা হলে তাতে পরিমাণ মতো মন্দ অনুভূত হয়। আর যদি অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং বিদ্যমান থাকে, তা হলে পরিমাণ মোতাবেক তাতে ভালো এবং উত্তম বিষয় অনুভূত হয়। এজন্যেই শরীয়তে অন্তরের পরিশুদ্ধি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক। বোখারী শরীফের হাদীছেও এদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্তরের পরিপূরক এবং সহায়ক হচ্ছে আকল। অন্তর এবং আকল মানুষের আত্মা ও দেহের কর্মক্রিয়ায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মূলত এই চারটি জিনিসই মানুষের মূল পরিচয়। অতএব, এই চারটির প্রত্যেকটিই আলোচ্য আয়াতে 'নফ্সের' অন্তর্ভুক্ত পরিগণ্য। সুতরাং নফ্সকে সংরক্ষণের অর্থ মূলত এই চারটির প্রতেকটির সংরক্ষণ এবং হেফাজত।

চার নং আয়াতে আর একটি শব্দ রয়েছে 'হাফিজ'। এ শব্দটি মূলধাতু 'হিফজুন' থেকে নেয়া হয়েছে। সেমতে 'হাফিজ' অর্থ সংরক্ষণকারী। এখন জানার বিষয় হল এই 'হাফিজ' তথা সংরক্ষণকারী কে? কী সংরক্ষণ করা হয়? কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? এবং কেন সংরক্ষণ করা হয়? এই চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে এগুলো সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

حافظ (হাফিজ) তথা সংরক্ষণকারী কে?

চার নং আয়াতে উল্লেখিত حافظ (হাফিজ) তথা সংরক্ষণকারী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, সংরক্ষণকারী কে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা:

(১) কারও কারও মতে حافظ (হাফিজ) তথা সংরক্ষণকারী দ্বারা আকল, মেধা-জ্ঞান-বুদ্ধিকে

www.maktabatulabrar.com

বুঝানো হয়েছে। আকল, মেধা-জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর সৃষ্টি। এটা মানুষের ভিতরেই বিদ্যমান। এই আকল বুদ্ধি মানুষের হেফাজতের জন্য বিদ্যমান। এই আকল বুদ্ধি মানুষের হেফাজতের জন্য মাধ্যম হয়ে থাকে। আকলই মানুষকে আগুনে এবং পানিতে ঝাঁপ দিতে দেয় না। এই আকলই মানুষকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলার গোনাহ থেকে সংরক্ষণ করে থাকে। আলোচ্য আয়াতে এই আকলকেই হাফিজ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মুফাস্সির আলূসী কোন কোন মুফাস্সিরের মত উদ্ধৃত করেছেন।

(২) কারও কারও মতে حافظ (হাফিজ) তথা সংরক্ষণকারী দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। মানুষের সার্বিক সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতাগণও মাধ্যম হয়ে থাকেন। ফেরেশতা কর্তৃক মানুষের আমল লিপিবদ্ধকরণের কথা এবং অন্য অনেক বিষয়ে ফেরেশতাদের হেফাজতের মাধ্যম হওয়ার কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে রয়েছে। বদর, উহুদসহ ইসলামী জেহাদে ফেরেশতাদের আগমন এবং মৃত্যুর সময় কবরে-হাশরে, সিরাতে ফেরেশতাদের সংরক্ষণের মাধ্যম হওয়ার কথা শরীয়তসম্মত। আলোচ্য আয়াতে সাধারণ সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কোন বিশেষ এবং নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। ইব্নে সীরীন এবং কাতাদা থেকে এরূপ মত উদ্ধৃত রয়েছে। অপরদিকে আয়াতে নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলেও অনেকে মত পোষণ করেছেন। আর বাস্তবেও প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন কাজের জন্য একশত ষাটজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে বলে বর্ণিত আছে। কিরামান কাতিবীন, মুনকার নাকীরসহ নির্দিষ্ট কাজে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকার কথাও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা এ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। মুফাস্সির ইব্নে জারীর ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করার মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে এই আয়াতে শব্দটি দুইভাবে পড়া হয়েছে। আরবী গোত্র হুজাইলদের ভাষায় এই শব্দটিকে (লাম্মা) তাশদীদের সাথে পড়া হয়, কিন্তু ইব্নে সীরীন তাশদীদকে অস্বীকার করেছেন। কেননা নির্ভরযোগ্য আরবীগণ এই শব্দটিকে তাশদীদ বিহীন 'লামা' পড়ে থাকে। আর লামা গ্রামারের প্রশ্নে এই আয়াতে হাফিজের দ্বারা ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা বুঝায়।

মুফাস্সির ইব্নে জারীরের মতে ﻟ শব্দটি এখানে তাশদীদের সাথে হতে পারে না। কারণ আরবদের মধ্যে এরূপ প্রচলন নেই। এ কারণেই ইব্নে সীরীন তাশদীদকে অস্বীকার করেছেন। আভিধানিক আখফাস, আবূ উবাইদ, কারী কাসায়ী, জাওহারীর মতও এরূপই এবং মদীনার প্রসিদ্ধ কারী নাফে' মাদানী এবং বসরার প্রসিদ্ধ কারী আবূ আমরের কেরাতও এরূপই। অথচ অন্যান্য কারীগণ থেকে তাশদীদের সাথে পাঠ করা সাব্যস্ত রয়েছে। আর আবূ হাইয়ানের উদ্ধৃতি অনুসারে 'লাম্মা'তাশদীদের সাথে কেবল হুজাইল নয়, বরং অন্যান্য আরবদের মধ্যেও প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ।

(৩) 'হাফিজ' তথা সংরক্ষণকারী বলে আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ কারী হামযাহ, নাখয়ী এবং আসেম ﻟ শব্দটিকে তাশদীদসহ পড়েছেন। এই কেরাত অনুসারে আয়াতে 'ইন' শব্দটি নফীর জন্য আর লাম্মা শব্দটি 'ইল্লা'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কেরাতের অর্থ অনুসারে 'হাফিজ'-এর প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর জাতকে মেনে নেয়ার অবকাশ আছে। অনেক মুফাস্সির এই মতটিকেই প্রধান্য দিয়েছেন। আর প্রাধান্য দেয়ার উপযুক্ত কারণও রয়েছে। যথা:

(ক) হাফিজ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর জাত ধরা হলে শব্দের আসল অর্থ হয় আর অন্যান্য সৃষ্টি তথা আকল এবং ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য ধরা হলে 'হাফিজের' অর্থ হয় রূপক।

(খ) অন্যান্য সৃষ্টি প্রকৃত সংরক্ষণকারী নয়, বরং মাধ্যম, আর আল্লাহ পাক হচ্ছেন প্রকৃত সংরক্ষণকারী। সুতরাং আল্লাহর জাতকে উদ্দেশ্য করা হলে বাস্তবতার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(গ) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতের নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছেন, মাধ্যম সমূহের গুণাবলির কথা বর্ণনা করেননি। এতেও শেষোক্ত মতের অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয়। তাই হাফিজের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর জাত হওয়াই যুক্তিযুক্ত আর অন্যান্য সৃষ্টি সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে প্রসঙ্গত উদ্দেশ্য।

বস্তুত সবকিছুর প্রকৃত সংরক্ষণকারী হচ্ছেন আল্লাহ পাক। তবে এই সংরক্ষণ কখনও সরাসরি হয়, কখনও কোন সৃষ্টির মাধ্যমে হয়। এই মাধ্যমে কখনও মানুষের বাইরে বিদ্যমান থাকে, কখনও ভিতরে। আবার কখনও উভয় তরীকায় সংরক্ষণ বিধান কার্যকর করা হয়। বাইরের আলো, বাতাস, খাদ্য দ্রব্য দ্বারা মানুষের সংরক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। ফেরেশতাও মানুষের সংরক্ষণের মাধ্যম হয়ে থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকে সংরক্ষণকারী আল্লাহ পাক স্বয়ং। এজন্যেই কোন সৃষ্টিকে আসল সংরক্ষণকারী বিশ্বাস করা, আসল সংরক্ষণকারী আল্লাহ পাককে মনে না করা কুফরী আকীদা। এরূপ বিশ্বাসের কারণে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয় ও মানুষ কাফের হয়ে যায়। যেমন আমরা রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে আরোগ্য হাসিল হলে বলে থাকি অমুক ডাক্তার আমাকে ভাল করেছে অথবা অমুক ঔষধ আমাকে সুস্থ করেছে। ডাক্তার এবং ঔষধকে আমরা মাধ্যম হিসেবে যদি এরূপ বলে থাকি আর আসল আরোগ্যদাতা আল্লাহ পাককেই বিশ্বাস করি, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাক্তার এবং ঔষধকেই আসল আরোগ্যদাতা বিশ্বাস করে এবং এরূপ আকীদা পোষণ করে, তা হলে তার ঐ আকীদা শিরক বলে গণ্য হবে। তাকে মুশরিক বলা হবে।

কী সংরক্ষণ করা হয়?

(ক) বান্দার ছোট বড় সমস্ত আমলের সংরক্ষণ করা হয়, লিপিবদ্ধ করা হয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا .

এর মধ্যে বান্দার ভাল মন্দ সবকিছুই সংরক্ষণ করা হয়। (সূরা কাহ্‌ফ: ৪৯)

(খ) বান্দার রিযিকের হেফাজত করা হয়, রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন সন্তান জননীর রেহেমে থাকা অবস্থায় রেহেমের মুখ বন্ধ করে রক্তকে সংরক্ষণ করে সেই রক্ত দ্বারা সন্তানের রিযিক পরিবেশন করা হয়, সন্তানের দেহে শক্তি ও ভিটামিন সঞ্চার করা হয়। কিন্তু এমতাবস্থায় স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া সম্ভব নয় বলে গ্রন্থির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। জন্মের পর জননীর স্তনে দুগ্ধ সংরক্ষণ করা হয়। যখন বয়স্ক হয় তখনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ পাকের অদ্ভুত সংরক্ষণ বিধান ও ব্যবস্থাপনা কার্যকর থাকে।

(গ) বান্দার জন্য মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্ট, যার চুল পরিমাণ এদিক সেদিক হওয়ার উপায় নেই। ঐ সময় পর্যন্ত তাকে ধ্বংসকর বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত থেকে সংরক্ষণ করা হয়।

www.maktabatulabrar.com

কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?

(ক) ফেরেশতাদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দিয়ে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়।

(খ) অসংখ্য সৃষ্টি এবং বস্তুকে মাধ্যম করা হয়। কোনটা ঔষধের কাজে আসে, কোনটা বিষাক্ত বস্তুর ক্রিয়া নিরসনের দায়িত্ব পালন করে, কোনটা ভিটামিনের কাজ দেয়, কোনটা আলোর কাজে আসে, কোনটা অন্ধকারের প্রয়োজন মেটায়। এভাবে পানি, বাতাস, মাটি, আকল আরো কতকিছু রয়েছে যেসবের মাধ্যমে মানুষের হেফাজত তথা সংরক্ষণ করা হয়।

(গ) অনেক আমল, ইচ্ছা, নিয়ত, অনুধাবন, কল্পনা যেগুলো কোন সৃষ্টির শক্তির আওতাভুক্ত নয়, সেগুলোর স্বয়ং আল্লাহ পাক হেফাজত করে থাকেন।

কেন সংরক্ষণ করা হয়?

বান্দা নিজ ইচ্ছায় দুনিয়াতে আসেনি, নিজ ইচ্ছায় থাকতে পারবে না, যখন সময় হবে, তখন তাকে যেতেই হবে। এর পর রয়েছে অনন্তকালের জীবন। সেই জীবনের শান্তি-অশান্তি বান্দার কর্মকাণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। ন্যায়পরায়ণদের জন্য শান্তি ও সুখের জীবন হবে। তারা হবে পুরস্কৃত। পক্ষান্তরে অসৎ পাপাচারীদের জন্য হবে অশান্তি এবং কষ্টের জীবন। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যই এসব কিছুর সংরক্ষণ প্রয়োজন-এটাই এর উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا .

আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তাদের গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৩)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ **(মানুষের চিন্তা করা উচিৎ কোন্ বস্তু হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)**

এই পাঁচ নং আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে তার সৃষ্টি-পদার্থ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহবান এজন্য জানিয়েছেন যে, মানুষ তার সৃষ্টি পদার্থে গবেষণা ও বিবেচনার দৃষ্টি আরোপ করলে অবশ্যই বুঝে আসবে যে, আল্লাহ পাক কত মহান, কত বড় শক্তির অধিকারী। এই অসীম শক্তির অধিকারীর জন্য বান্দার সবকিছুর হেফাজত ও সংরক্ষণ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আল্লাহ পাক মানুষকে এরূপ গবেষণা এবং শিক্ষা গ্রহণের উপায় হিসেবেই জ্ঞান এবং মেধাশক্তি দান করেছেন। এই মেধাকে কাজে লাগালে চির সত্য অনুধাবনের পথ সুগম হতে পারে। এখান থেকে পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা করার গুরুত্ব বুঝে আসে এবং বুঝে আসে যে, এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কীরূপ হওয়া চাই।

পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে গভীর রহস্য। তাই তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথা বলা হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানে পারদর্শী ও ডাক্তার এক ব্যক্তি মনে মনে ভাবছিল যে,

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই মানুষের জন্য উপকারী– এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পায়খানার কীটের দ্বারা মানুষের কী উপকার হয়? কিছুদিন পর তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা তদবীর করেও কোন ফল হয় না। কিন্তু একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত কবিরাজের এ চিকিৎসায় পারদর্শিতার কথা শোনে অবশেষে তার শরণাপন্ন হয়। গ্রাম্য কবিরাজ তাকে অভয় দিয়ে বললো যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ আমার ঔষধে আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। লোকটি তার বক্তব্য শোনে অবাক হয় বটে, তবে তার ঔষধ ব্যবহার করে বাস্তবিকই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। লোকটি কবিরাজকে বললো, আমি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, পদার্থ বিজ্ঞানে পারদর্শী, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তুমি এমন কী পদার্থের দ্বারা ঔষধ তৈরি করে আমাকে দিলে, যার ওছীলায় আল্লাহ পাক আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন? গ্রাম্য কবিরাজ উত্তর করল জনাব! সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। আমি যে পদার্থ দ্বারা ঔষধ তৈরি করেছি তা বলার মতো নয়, বিশ্বাসের কথাও নয়। কিন্তু আল্লাহর কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়, প্রয়োজন হচ্ছে অভিজ্ঞতার। আমি যে ঔষধ তৈরি করে আপনাকে দিয়েছি, এই ঔষধের মূল উপাদান হচ্ছে পায়খানার কীট, অন্য কিছু নয়। এ কথা শোনার পর ডাক্তারের বুঝে আসল যে, আসলে আমার সন্দেহের অবসানের উপায় হিসেবেই আল্লাহ পাক আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করেছিলেন। সুতরাং এখন থেকেই আল্লাহর সৃষ্টি পদার্থের কথা অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ পাক এই পদার্থসমূহকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং হবে, হতে থাকবে। অতএব পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা শরীয়তসম্মতই বটে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে পদার্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু বস্তুকেন্দ্রিক উদ্ভাবন হতে পারবে না, এই চিন্তা-গবেষণা শুধু পদার্থকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে পারবে না। বরং পদার্থের বাইরে এসব কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করা, এসবের সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবন করে তার স্রষ্টাকে চেনা– এও থাকতে হবে উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, বরং এটাই হবে মূল উদ্দেশ্য। অথচ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীদের মূল আলোচনা-গবেষণা হয়ে থাকে কেবল পদার্থকে কেন্দ্র করেই। তাদের চিন্তা-গবেষণা আবর্তিত হয় শুধু বস্তুকে কেন্দ্র করেই। বস্তুর বাইরে তারা অন্ধ। একজন মানুষ জননীর রেহেমে আসার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু এবং কাফন-দাফন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু মানুষের দেহে বিদ্যমান আত্মা কোত্থেকে এল? তার সৃষ্টি উপাদান কী? সে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চুপ। যদি কেউ কথা বলেছে, তাহলে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা তাকে বেওকুফ এবং বোকা বলে আখ্যা দিয়েছে। বস্তুত আত্মার বিশদ বিবরণ কেবল স্রষ্টারই স্বতন্ত্র ব্যাপার, আত্মার বিষয়ে কোন মানুষ অবগত নয়, এ বিষয়টি তাদের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা যদি যথার্থভাবে চিন্তা-গবেষণা চালাত, তাহলে তারা স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হতো। মানুষের সৃষ্টি পদার্থ ও তার জন্ম মৃত্যু নিয়ে নিরপেক্ষ গবেষণা চালালে সুস্পষ্টভাবেই বুঝে আসবে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে কোথা হতে এসেছে, কেন এসেছে এবং মৃত্যুর পর কোথায় চলে যাবে। বুঝে আসবে যে, এসব কিছুর মূলে রয়েছেন মহাশক্তির অধিকারী লা-শরীক আল্লাহ। মানুষ তাঁর ইচ্ছায় তার কাছেই চলে যাবে। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে এসব বিষয় বুঝে আসে বলেই বিজ্ঞানীদের অনেকেই নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার

www.maktabatulabrar.com

করেনি। আর একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে নবী-রসূল, আখেরাত, হাশর-নশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কিত বিষয়াদিও তাদের সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। যারা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছে, তাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে। এজন্যই আলোচ্য পাঁচ নং আয়াতে অস্বীকারকারীদেরকে সৃষ্টির সূচনার বিষয়সমূহে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আর পুনর্জীবন যেহেতু জন্ম সদৃশ, যিনি কারও সূচনা করতে সক্ষম, তিনি তার পুনর্জীবন ঘটাতেও সক্ষম। এজন্যে সূচনা বিষয়ে চিন্তা করলে পুনর্জীবন বোঝাও কঠিন থাকে না। তাই সর্বপ্রথম সূচনার বিষয়ে গবেষণার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদার্থসমূহকে জড়ো করে মানুষ অত্যাধুনিক আবিষ্কারের গৌরব বোধ করে, কিন্তু পদার্থগুলো কার সৃষ্টি তা কি মানুষ কখনও চিন্তা করে? যদি আল্লাহর সৃষ্ট পদার্থগুলোর সমন্বয়ে আবিষ্কার করার কারণে মানুষ সম্মান-মর্যাদা এবং অন্য মানুষের উপর স্বীয় আনুগত্যের দাবীকে ন্যায় সংগত মনে করে, তাহলে পদার্থের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য কেন ন্যায়সংগত হবে না? অতএব আল্লাহর অবমাননা কি বিজ্ঞানী এবং অস্বীকারকারীদের জন্য শোভা পায়? অস্বীকারকারীরাও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি পদার্থ থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারা যদি তাদের সৃষ্টি পদার্থ এবং জন্ম সূচনার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, মানুষ খুবই দুর্বল এবং আল্লাহ পাক মহান শক্তিশালী স্রষ্টা, অতএব তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ খুবই বাঞ্ছণীয়।

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ **(উচ্ছসিত পানিবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা মেরুদণ্ড এবং বক্ষপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়।)**

মানুষ তৈরির প্রধান উপাদন বীর্য কোথা হতে কীভাবে নির্গত হয়ে রেহেমে প্রবিষ্ট হয়- এদিকে আলোকপাত করে আল্লাহ পাক সাত নং আয়াতে দুটি শব্দ নাযেল করেছেন। একটি হল الصلب (ছুল্‌ব)। এর অর্থ হচ্ছে মেরুদণ্ড। আর একটি হল الترائب (তারাইব)। এর নিম্নোক্ত অর্থ করা হয়েছে:

(ক) ইব্‌নে যায়েদের মতে 'তারাইব' অর্থ বক্ষ আর ছুল্‌বের অর্থ মেরুদণ্ড।

(খ) সুফইয়ান ছাওরীর মতে 'তারাইব' বক্ষের উপরিভাগ।

(গ) মা'মার ইবনে আবী হাবীবা মাদানীর মতে 'তারাইব' হৃৎপিণ্ড সংশ্লিষ্ট শিরাসমূহ।

(ঘ) মুজামের মতে 'তারাইব' বক্ষের ডান ও বাম পার্শ্বের চার-চারটি হাড়।

(ঙ) ইবনুস সাকিত, আ'মাশ এবং ইকরামার মতে 'তারাইব' বক্ষের হাড়সমূহ। প্রসিদ্ধ অভিধান কামূস, সেহাহ, জাওহারী প্রভৃতিতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(চ) ইব্‌নে যুবায়ের এবং মুজাহিদের মতে 'তারাইব' বক্ষ এবং গলদেশের মধ্যস্থল।

(ছ) জাহ্‌হাক, ইকরামা, মুজাহিদ এবং ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর মতে 'তারাইব" দ্বারা দু'হাত, দু'পা এবং দু'চক্ষুকে বুঝানো হয়েছে।

(জ) সাঈদ ইব্‌নে যুবাইরের অপর মতে 'তারাইব' নারীর দুই স্তনের মধ্যভাগ।

(ঝ) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-এর অপর মতে 'তারাইব' নারীদের মালা পরিধানের স্থল। আরবী ভাষায় এই অর্থের প্রচলন আছে বিধায় মুফাস্‌সির এই অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

স্থূল দৃষ্টিতে উল্লিখিত অর্থসমূহের পরস্পরে যথেষ্ট বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত হাত, পা এবং চক্ষুতে বীর্য সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো থেকে বীর্য নির্গত হয় মেনে নিলে এসব অঙ্গ নেই এমন স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে বীর্যপাত এবং সন্তান জন্ম হয় কী করে? বিষয়টি জ্ঞানের কষ্টিপাথরে ধরে না বিধায় 'তাফহীমুল কুরআনে' এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি একটি বৃক্ষে অসংখ্য ফল ধরে, বৃক্ষটির মূলে রয়েছে অসংখ্য শিকড়, অসংখ্য শিকড়ের মাধ্যমেই বৃক্ষে জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়, তাতে ফল ধরে। কিন্তু দু'চারটি শিকড় কেটে গেলে বৃক্ষে জীবনী শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং ফল ধরায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। অবশিষ্ট শিকড়ের সাহায্যেই প্রয়োজনীয় জীবনী শক্তির সঞ্চার হতে পারে। তবে কোন শিকড় কাটা না গেলে সব কয়টিকেই জীবনী শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং ফলের জন্য সহায়ক মেনে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে হাত, পা, চক্ষু ইত্যাদির বিষয়টি চিন্তা করা যায়। মূলত বীর্য সৃষ্টির এবং নির্গত হওয়ার স্থল এবং মূল সূত্র যা-ই হোক, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সহযোগী বিধায় বীর্যের উৎস বিবেচিত হতে পারে। সহযোগী অঙ্গ কেটে গেলে অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ এই ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাই হাত-পা কাটা অঙ্গহীন স্বামী স্ত্রীর মিলনেও বীর্যপাত হতে পারে এবং সন্তান জন্ম নিতে পারে। অতএব তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থকারের উপর্যুক্ত উক্তি নিতান্ত যুক্তিহীন।

আলোচ্য আয়াতের বীর্য সংক্রান্ত তত্ত্বকে যারা অবাস্তব বলে

বীর্য সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে যে তা 'ছুলব' (মেরুদণ্ড) এবং 'তারাইব' (বক্ষপিঞ্জর)-এর মধ্য থেকে নির্গত হয়। উপরে ছুলব ও তারাইবের বিভিন্ন অর্থও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো অর্থের সার নির্যাস বের করতে চাইলে বীর্য সংক্রান্ত আলোচ্য আয়াতের অর্থে নিম্নোক্ত সম্ভাবনার অবকাশ দেখা দেয়–

(ক) মেরুদণ্ড এবং বক্ষ হল বীর্যের মূল কেন্দ্র।

(খ) মেরুদণ্ড এবং বক্ষ থেকে বীর্যের সূত্রপাত হয়।

(গ) মেরুদণ্ড এবং বক্ষ থেকে বীর্য নির্গত হয় এবং মেরুদণ্ড ও বক্ষই হল বীর্যের স্থিতিস্থল।

কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে এই কয়টি সম্ভাবনা নিয়ে বিবেচনা-পর্যালোচনা করলে এর কোনটিই বাস্তবমুখী মনে না হতে পারে। কেননা, খাদ্যদ্রব্যের ভিটামিন সমস্ত দেহে প্রবিষ্ট হয়ে বীর্যের সূত্রপাত ঘটায় এবং প্রত্যেক অঙ্গ স্বীয় শক্তি অনুপাতে তা আকর্ষণ করে এবং সেই পরিমাণ নির্গত করে থাকে। এ কারণেই উচ্ছ্বসিত বীর্য নির্গত হলে সমস্ত দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং 'ক'–য়ে বর্ণিত সম্ভাবনা যথাযথ নয়। কেননা, মেরুদণ্ড এবং বক্ষকে বীর্যের মূল কেন্দ্র হিসেবে আয়াতে উল্লেখ হয়েছে বলে মেনে নেয়ার কোন উপায় নেই। বরং বীর্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। এ কারণেই উচ্ছ্বসিত বীর্য অধিক পরিমাণে নির্গত হলে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দেখা দেয় আর মস্তিষ্কের সাথে চক্ষু সম্পৃক্ত হওয়ায় দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়। সুতরাং 'খ'–য়ে বর্ণিত সম্ভাবনাকেও সঠিক বলা যায় না। এমনিভাবে মেরুদণ্ড এবং বক্ষকে বীর্য নির্গত হওয়ার ও বীর্যের স্থিতিস্থলও ধরা যায় না। কেননা বীর্য নির্গত হয় অণ্ডকোষ থেকে এবং তার স্থিতিস্থলও হচ্ছে অণ্ডকোষ, যা সর্বজন স্বীকৃত এবং বাস্তব। সুতরাং 'গ'–য়ে বর্ণিত অর্থও গ্রহণযোগ্য নয়। উপর্যুক্ত কারণে এ শ্রেণির মুলহিদ তথা ধর্মবিরোধী ও শরীয়তের অপব্যাখ্যাকারীরা আলোচ্য আয়াতে পরিবেশিত বীর্য সংক্রান্ত তত্ত্বকে অবাস্তব ও সঠিক নয় বলে মন্তব্য করে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় আমাদের সামনে রাখতে হবে।

(ক) মানুষের দেহের অন্যতম দিক হল দুটি। একটি হচ্ছে পিছনের দিক অপরটি হচ্ছে সম্মুখের দিক। আয়াতে পিছন দিকের মেরুদণ্ড আর সম্মুখের বক্ষ উল্লেখ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত দেহ। তবে যেহেতু বীর্য নির্গত হওয়ার মূল পথ হচ্ছে এই দুটি, তাই পবিত্র কুরআনে কেবল দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অন্যতম অংশের উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অংশ উদ্দেশ্য করার নজীর যেমন রয়েছে কুরআন হাদীছে, তেমনি অন্যান্য ভাষার প্রচলনেও এর নজীর বিরল নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে অন্যতম দুটি অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য অঙ্গের অস্বীকৃতি নেই। (খ) আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে নির্গত মিশ্রিত বীর্যে সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। তবে বীর্যের সিংহভাগ সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকেই তা নির্গত হয়। মস্তিষ্ক থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের পথে অণ্ডকোষে স্থিতি লাভ করে। এতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, মেরুদণ্ড এবং বক্ষ বীর্যের নির্গত হওয়ার স্থল নয়, বরং নির্গত হওয়ার অন্যতম পথ। আয়াতের يخرج শব্দ এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। অপরপক্ষে من خلق বাক্যটি সমস্ত দেহকে বীর্যের সৃষ্টিস্থল বোঝায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, অপব্যাখ্যাকারীদের মন্তব্য সঠিক নয়। দেহ বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমতও এরূপই। মোটকথা, দেহের সমস্ত অঙ্গ বীর্য সৃষ্টি হওয়া ও নির্গত হওয়ার স্থল। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বীর্যের প্রভাব এবং অণ্ডকোষ বীর্য নির্গত হওয়ার কেন্দ্র– এ বিষয়ে আয়াতে কোন অস্বীকৃতি নেই। আয়াতে কেবল বীর্য নিষ্কাশনের অন্যতম পথের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কাজেই অপব্যাখ্যাকারীদের সমালোচনা অবান্তর এবং মূর্খতার পরিচায়ক।

সন্তান কার বীর্যে সৃষ্টি হয় পিতার না পিতা-মাতা উভয়ের?

এখানে এই বিষয়টিও আলোচনার দাবী রাখে যে, সন্তান কেবল পুরুষের বীর্যে সৃষ্ট, না এতে নারীর বীর্যেরও দখল রয়েছে। কারো কারো মতে সন্তান কেবল পুরুষের বীর্যেই সৃষ্ট। আর কেউ কেউ মত পোষণ করেছেন যে, নারীর বীর্যই নেই, বরং আছে ভিন্ন ধরনের কোন পানি জাতীয় বস্তু। এই মতের পক্ষে দুইটি প্রমাণেরও উদ্ধৃত করা হয়। যথা:

(ক) আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তারাইব' এবং 'ছুলবের' মধ্যে হয়ে বীর্য নির্গত হয়। অথচ পুরুষের বীর্য নির্গত হয় 'ছুলব' হয়ে। আর স্ত্রীর পানি নির্গত হয় কেবল 'তারাইব' হয়ে। এমতাবস্থায় 'ছুলব' এবং 'তারাইব' উভয়টি পুরুষের ধরে নিতে হবে, তাহলেই আয়াতের অর্থ সংগত হবে। আর এ কারণেই পানি শব্দটিকে একবচন আনা হয়েছে- অর্থাৎ, এক জনের পানি দ্বারা সৃষ্ট। যদি স্ত্রীর পানির দখল থাকত, তাহলে শব্দটিকে দ্বিবচন আনা হতো।

(খ) আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ উচ্ছ্বসিত পানি থেকে সৃষ্ট, আর বাস্তব এই যে, উচ্ছ্বসিত হয়ে নির্গত হয় কেবল পুরুষের বীর্য, নারীর বীর্য নয়।

কিন্তু এই মতের নিশ্চয়তার জন্য উপর্যুক্ত প্রমাণাদি যথেষ্ট মনে হয় না। কেননা, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্ভরযোগ্য আভিধানিক এবং অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে 'তারাইব'-এর সম্পর্ক নারীর সাথে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এই মতটিই উদ্ধৃত হয়েছে। আর এ কারণেই 'ছুল্‌ব'শব্দটি একবচন আর 'তারাইব' শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে। কেননা, 'ছুলব' কেবল মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর নারীর বীর্যের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নারীর বীর্য নেই– এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। পানি শব্দটি অবশ্য একবচন আনা হয়েছে, কিন্তু এর কারণ এই যে, পুরুষ এবং নারী থেকে নির্গত পানি মিশ্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে যায়। তাই একবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ নজীর ভাষাগতভাবে বিরল নয়। এমনিভাবে পুরুষের শুক্র মেরুদণ্ড হয়ে নির্গত হয় বিধায় তারাইব এবং ছুল্‌ব হয়ে নির্গত হয় বলাতে কোন বাধা নেই। এ কারণেই ডান এবং বামের কথা বলা হয়নি। কেননা, ঐ দুইটির দূরত্ব এই দুইটির তুলনায় অধিক।

'খ' এ বর্ণিত যুক্তিটিও বোধগম্য নয়। কেননা,

(ক) হতে পারে, পুরুষের বীর্য অধিক উচ্ছ্বাসে নির্গত হয় আর নারীর বীর্য তুলনামূলকভাবে কম উচ্ছ্বাসে নির্গত হয়। নারীদের বীর্যে মোটেই উচ্ছ্বাস নেই-এ উক্তি যথাযথ নয় এবং বাস্তব বিরোধী। পক্ষান্তরে পুরুষের উচ্ছ্বসিত বীর্য নির্গত হয়ে নারীর বীর্যের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে উভয়টিকে উচ্ছ্বসিত বলা যায়। কেননা, উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়ে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে পুরুষের বীর্য থেকে নির্গত শুক্রটি এত ক্ষুদ্র যে, এই ক্ষুদ্রতম শুক্রের দ্বারা সন্তান ধারণ সম্ভব হয় না, বরং নারীর বীর্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এ মতানুসারেও উভয়ের বীর্যে সন্তান সৃষ্টি হওয়ার মতটির অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয়।

(খ) সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় হলো, আলোচ্য আয়াতে বিষয়টি অস্পষ্ট হলেও পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে, সন্তান উভয়ের বীর্যের ফল। যথা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى .

হে মানবজাতি, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পুরুষ এবং নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা হুজুরাত: ১৩)

এখানে পুরুষ দ্বারা হযরত আদম এবং নারী দ্বারা হযরত হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য পুরুষ-নারীদের বেলায় একই বিধান কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে হযরত আয়েশা এবং সাহাবী ছাওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ইরশাদ করেন যে, পুরুষের বীর্য হয় সাদা এবং নারীর বীর্য হয় হলুদ বর্ণের। আর সন্তান-সন্ততির গঠন-গাঠন ও আকৃতিতে উভয়ের বীর্যের প্রভাব থাকে। এতে প্রমাণিত হয়, সন্তান ধারণে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের বীর্যের দখল রয়েছে। মুফাস্‌সিরগণ এই মতটিকেই চূড়ান্ত মত বলে মন্তব্য করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

সন্তানের আকৃতি গঠনে কার বীর্যের প্রভাব পড়ে?

প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ইবনুল আরাবীর মতে নারী পুরুষের মিলনে নির্গত বীর্যের অবস্থা নিম্নরূপ হয়:

(ক) স্বামীর বীর্য প্রথম এবং অধিক নির্গত হলে পুরুষ সন্তান জন্ম নেয় এবং পিতা ও পিতার বংশধরের সাদৃশ্য হয়।

(খ) স্ত্রীর বীর্য প্রথম এবং স্ত্রীর বীর্য অধিক নির্গত হলে নারী সন্তান জন্ম নেয় এবং মা ও তার বংশধরের সাদৃশ্য হয়।

(গ) স্বামীর বীর্য প্রথম এরপর স্ত্রীর বীর্য অধিক নির্গত হলে পুরুষ সন্তান মা এবং তার বংশ ধরের আকৃতি ধারণ করে।

(ঘ) স্ত্রীর বীর্য প্রথম এবং পরে স্বামীর বীর্য অধিক নির্গত হলে নারী সন্তান পিতা এবং পিতার বংশধরের আকৃতি ধারণ করে। ফাতহুল বারী, আইনী এবং লামিউদ্দারারীতে এ সম্পর্কে আরো অনেক বিস্তারিত তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

আত্মা কি বীর্যের তৈরী?

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানবসন্তান বীর্যের তৈরী। এতে প্রতীয়মান হয়, আত্মাও বীর্যের তৈরী। কেননা মানুষের মূল বস্তু হচ্ছে আত্মা। অথচ এই তত্ত্ব কুরআন এবং হাদীছ সম্মত নয়। এর সমাধান হলো, মূলত আত্মা বীর্যের তৈরী নয়, বরং 'খোদায়ী নির্দেশ'-এর সূত্রে আত্মা মানব দেহে পরিবেশিত হয়। কিন্তু আত্মার অবস্থানস্থল মানবের দেহ। দেহের মাধ্যমেই আত্মার ক্রিয়া কার্যকারিতা প্রকাশ পায়। তাই আয়াতে কেবল দৃশ্য দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আত্মার হাকীকত মানুষের জ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। এ কারণে আয়াতে তার বিষয় অনুল্লেখিত রয়েছে। অবশ্য অন্যান্য আয়াত এবং হাদীছসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম জাওযিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'কিতাবুর রুহ'-য়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়াদি

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যথা:–

(১) আল্লাহ পাক মানুষকে অপূর্ব যোগ-সংযোজনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

(২) মানুষ স্বীয় সৃষ্টির বিষয়ে গভীর দৃষ্টি আরোপ করতে পারে। এই আয়াতে মানুষকে এ বিষয়ে আহ্বান করা হয়েছে। অন্যের বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের নিদর্শন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রেখেছেন।

(৩) প্রয়োজনে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সৃষ্টি কৌশলে মনোনিবেশন করলে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কেননা, বংশ পরিক্রমার এ বিধান জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

(৪) মানুষকে আল্লাহ পাক যেমন প্রথম সূচনা করতে সক্ষম হয়েছেন, তেমনি মৃত্যুর পর পুনঃ সূচনায়ও সুসক্ষম। কেননা, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে থাকা পদার্থ এবং অংশকে কেন সৃষ্টি এবং

একত্রিত করতে সক্ষম হবে না, অথচ তিনি তো ইতিপূর্বে অনস্তিত্ব থেকেই পদার্থকে সৃষ্টি ও তাতে সংযোজন সাধনে সক্ষম হয়েছেন।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ **(নিশ্চয় তিনি তাকে পুনর্জীবিত করতে সুসক্ষম।)**

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সূচনার ব্যাপারে সক্ষমতার কথা বর্ণনা করার পর এ আয়াতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে সক্ষম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এভাবে সূচনার ব্যাপারে সক্ষমতার বর্ণনা দ্বারা পুনরুত্থিত করার ব্যাপারে সক্ষম হওয়ার যুক্তির অবতারণা করেছেন।

আয়াতে পাকে رجعه (তাকে পুনর্জীবিত করতে)-এর জমীর তথা সর্বনাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ, "তাকে" বলে কাকে বোঝানো হয়েছে– এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনদের মতানৈক্য রয়েছে। যথা:–

(ক) মুজাহিদ, ইকরামা এবং জাহ্হাকের মতে জমীর বীর্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রীর মিলনে যে বীর্য নির্গত হয়, আল্লাহ পাক সে বীর্যকে সেখানে ফেরৎ করতে সুসক্ষম।

(খ) মুজাহিদের অপর এক মতে জমীর দ্বারা মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেমতে অর্থ হচ্ছে, মানুষকে পুনরায় বীর্যে পরিণত করতে আল্লাহ পাক সুসক্ষম।

(গ) ইব্নে যায়েদের মতে জমীর দ্বারা বীর্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেমতে অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাক বীর্যকে নির্গত না করে আবদ্ধ করণে সুসক্ষম, যাতে সন্তান সৃষ্টি না হয়।

(ঘ) মুকাতিল, ইব্নে হাইয়ান এবং জাহ্হাকের অপর এক মতে জমীর দ্বারা মানুষকে উদ্দেশ্য করা রয়েছে। সেমতে অর্থ হলো, মানুষকে বৃদ্ধ করার পর বৃদ্ধ থেকে পুনরায় যুবক করে তোলায় আল্লাহ পাক সুসক্ষম।

(ঙ) মাওয়ারদীর মতে জমীরের দ্বারা মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তার মতে আয়াতের অর্থ হলো মানুষকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ পাক সুসক্ষম।

তাফসীরে হক্কানীতে উপরোক্ত অর্থসমূহের সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসলে আল্লাহ পাক অসীম কুদরতের মালিক, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সুসক্ষম, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে উপর্যুক্ত কোন অর্থই বোধগম্য নয়, বরং সঠিক অর্থে জমীরের দ্বারা ইনসান অর্থাৎ, মানুষকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেমতে সঠিক অর্থ হলো, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জীবনে সুসক্ষম। এ অর্থটি সঠিক হওয়ার দুটি যুক্তি রয়েছে। যথা:–

(১) কাফের মুশরিকদের বিরোধিতা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে কেন্দ্র করেই ছিল। বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জড়ো করে পুনর্জীবনের বিষয়ে তাদের আপত্তি ছিল। আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদের প্রতিবাদ করেছেন।

(খ) পরবর্তী আয়াতের মর্ম দ্বারা এ অর্থের সমর্থন হয়। কেননা, তাতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন সমস্ত রহস্যাদি যাচাই করা হবে। যাচাইয়ের জন্য মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন জরুরী। এতে শেষোক্ত অর্থই সঠিক সাব্যস্ত হয়। মুফাস্সির কুরতুবী, রাযী, আলূসী, ইব্নে জারীর সহ মুফাস্সিরগণ এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী, কাতাদা এবং হযরত ইব্নে আব্বাস থেকেও এরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ (যেদিন রহস্যাদি যাচাই করা হবে।)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সমস্ত রহস্যাদি যাচাই করা হবে। যাচাইয়ের জন্য মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন জরুরী। অতএব এ আয়াতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। কেয়ামতের দিন সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া হবে।

জগতে মানুষ অপরাধ করে। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের চরম নাফরমানী করে। দুর্বলদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে। যার অনেক সময় প্রতিকার হয় না অথবা প্রতিকার হলেও তা দেখা যায় না, গোপন থাকে স্বয়ং মানুষও তা গোপন করে রাখে। তাই এগুলোর প্রতিকার ও সঠিক বিচার হওয়া ন্যায়ের দাবী। এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষকে পুনর্জীবন দান করে আল্লাহর বিচারাদালতে হাজির করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে ও উপযুক্ত বিচার করা হবে। যারা নির্দোষ সাব্যস্ত হবে তারা হবে পুরস্কৃত, আর যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তারা হবে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন। ৯ নং আয়াতের মর্মকথা এটাই। সারকথা কেয়ামত হল গোপন বিষয়াদি প্রকাশের দিন। এখন জানার বিষয় হল, সেই গোপন বিষয়াদি কী, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

সেই গোপন বিষয়াদি কী, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেয়া হবে ?

আল্লাহ পাক মানুষকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বরযখী যিন্দেগীতে প্রতিপালনের পর কেয়ামত সংঘটিত হলে তাদেরকে হাশরের ময়দানে হাজির করবেন। তখন সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করবেন। এখানে গোপন বিষয়াদি বলতে কী বোঝানো হয়েছে– এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম বিভিন্ন ধরনের মতামত পেশ করেছেন। যথা:

(ক) ইবনুল মুনযির আতার সূত্রে ইবনে আবী কাছীর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, গোপন বিষয় দ্বারা রোযা, নামায এবং ফরজ গোসলকে বুঝানো হয়েছে। বায়হাকী শুআবুল ঈমানে হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর সূত্রে এর সমর্থনে একটি হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। তবে ঐ হাদীছে 'যাকাত'কেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে ছা'লাবীতে এর সমর্থনে হযরত ইব্নে উমর (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। যায়েদ ইব্নে আসলাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীছেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

(খ) আশ্হাবের সূত্রে ইমাম মালেক উযুকেও এর অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনুল আরাবীও এর সমর্থন করেছেন। তিনি আমানতকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

(গ) সুফইয়ান ছাওরী-এর মতে মহিলাদের ঋতুস্রাব এবং গর্ভধারণও এর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) হযরত ইব্নে উমর (রা.) বলেন,

يبدى الله يوم القيامة كل شى خفى فيكون زينا فى الوجوه وشينا فى الوجوه والله عالم بكل شيى .

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমস্ত গোপন ভেদকে প্রকাশ করবেন এবং ভাল মন্দের আলামত চেহারায় ফুটে উঠবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।

সহীহ বোখারী এবং মুসলিমের ঝাড়া সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা এর সমর্থন লাভ হয়। আসলে উল্লিখিত মতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ কারণে একটা অংশ বিশেষকে উল্লেখ করেছেন, উক্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা কারো উদ্দেশ্য নয়।

কেয়ামতের দিন মূলত সমস্ত গোপন বিষয়ই প্রকাশ পেয়ে যাবে। এই গোপনীয় বিষয়াদি মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) ভাল এবং নেক বিষয়াদি। যেমন মানুষ গোপনে ইবাদত করে থাকে, তাহাজ্জুদ আদায় করে, দান-খয়রাত করে থাকে ইত্যাদি। এরূপ অনেক নেক আমল মানুষ গোপনে করে থাকে, যা অন্য কেউ জানে না অথবা প্রকাশ পায় না।

(খ) গোনাহ এবং পাপাচারিতা। যেমন অনেক সময় মানুষ গোপনে গোনাহের কাজ করে থাকে, যা অন্য কেউ জানে না।

অতঃপর এই ভাল মন্দ কাজসমূহ কতগুলো দৃশ্যময় আর কতগুলো অদৃশ্য। দৃশ্যময় কাজগুলো সর্বদা প্রকাশ্যে হয়ে থাকে। যেমন কেউ একটি মসজিদ নির্মাণ করল, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল, দ্বীনী বই-পুস্তক রচনা করল। আবার কতগুলো করার পর অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করার পর আর দেখা যায় না, গোপন হয়ে যায়। পাপাচারিতার মধ্যেও এরূপ অবস্থা রয়েছে। যথা কেউ সিনেমা হল তৈরী করল, যা দৃশ্যময় হয়ে থাকে। চুরি, ডাকাতী, সুদ ঘুষ ইত্যাদি করার পর অদৃশ্য হয়ে পড়ে, গোপন হয়ে যায়। আবার এ সমস্ত ভাল মন্দ কর্মকাণ্ডের তাছীর অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া দৃষ্টি গোচর হয় না। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড আবার দুই প্রকার। কতগুলো নিজের জাত তথা সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কতগুলো নিজের জাত তথা সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যান্য সৃষ্টির সাথেও সম্পৃক্ত হয়। নিজের জাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বিষয়াদি তিন ভাগে বিভক্ত। কতগুলোর সম্পর্ক অন্তর এবং আত্মার সাথে। যেমন ঈমান, ইখলাছ, দ্বীনতা-হীনতা, মহব্বত, কুফরী, নেফাক, অহংকার, হিংসা, রিয়া, শত্রুতা ইত্যাদি। আর কতগুলোর সম্পর্ক চিন্তা এবং মেধার সাথে। মেধার মাধ্যমে মানুষ ভাল মন্দ চিন্তা করে থাকে। আর কতগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে। মানুষের স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস, মনের সংকল্প, আমল, আখলাক সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির মধ্যে লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিকতা, মুআশারাত, মুআমালাত, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। অনেক বিষয় এমনিতেই গোপন হয়ে থাকে, যা স্বয়ং সে নিজেও জানে না। এই সমস্ত গোপন বিষয়াদি কেয়ামতের দিন প্রকাশ করা হবে এবং যাচাই বাছাই করা হবে। যেখানে দেহের প্রভাব লোপ পাবে, আত্মার প্রভাব বিস্তার হবে, অদৃশ্য বিষয়াদি দৃশ্যময় হয়ে উঠবে। সবকিছুই গোপন পর্দা ফাক করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গোপন বিষয়াদি প্রকাশের পদ্ধতি

এসব কিছু প্রকাশ করা হবে যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এবং সঠিক পুরস্কার ও শাস্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এর তরীকা হবে নিম্নরূপ-

(ক) মানুষের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ড ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়। সেই সংরক্ষিত লিপি জনসম্মুখে পেশ করা হবে। একদিকে থাকবে ফেরেশতাদের সংরক্ষিত লিপি, অপর দিকে মানুষের কৃত আমলের আকৃতি পেশ করা হবে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবেচনা করা হবে যে, গড়মিল আছে কি না। দেখা যাবে যে, কোন গড়মিল নেই।

(খ) অনেক সময় মানুষের জাহেরী আমল নেক মনে হয়, কিন্তু নিয়ত দুরুস্ত থাকে না, রিয়ার বশীভূত হয়ে করে থাকে। আবার অনেকের আমল দেখতে অপছন্দনীয় হয় অথচ ইখলাছ ভিত্তিক হয়ে

www.maktabatulabrar.com

থাকে। আবার অনেক আমল ইখলাছ ভিত্তিক হয় কিন্তু সুন্নাতের বরখেলাফ হয়, আবার অনেক আমল সুন্নাত মোতাবেক হয়, কিন্তু তাতে ইখলাছ থাকে না। এই সব কিছু সেদিন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

(গ) অনেক এমন বিষয়ও সেদিন প্রকাশ পাবে, যা ফেরেশতাদের সংরক্ষিত কিতাবে নেই। কেবল আল্লাহ পাকই তা জানেন। তা ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে। তাও সেদিন প্রকাশ পাবে।

(খ) মানুষ অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করে থাকে, সংকল্প করে থাকে, মানুষের অন্তরে অনেক কিছু অনুভূত হয়, কল্পনা করে, মনে থাকে, আবার ভুলেও যায়, এসব কিছু আল্লাহ পাকের কাছে সংরক্ষিত আছে। তাও সেদিন প্রকাশ পাবে।

সমস্ত গোপন বিষয়ের বিচার হবে কি?

সমস্ত গোপন বিষয় বিচারের আওতায় আনা হবে না। যেগুলো বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনার প্রয়োজন এবং আনার ইচ্ছা হবে, কেবল সে বিষয়সমূহই বিচারের জন্য পেশ করা হবে। অনেক বিষয় কেবল মানুষের সম্মুখে পেশ করে ক্ষমার কথা কানে কানে বলে দেয়া হবে। এর বিভিন্ন কারণ হাদীছে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন ছগীরা গোনাহের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা পাবন্দীর সাথে জামাতে নামায আদায় করবে, উযুর সাথে থাকবে, তাদের কবীরা গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কানে কানে উল্লেখ করে ক্ষমার কথা জানিয়ে দিবেন। এমনিভাবে যে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে না বরং গোপন করবে, আল্লাহ পাক তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন।

(১১) চক্রশীল আকাশের কসম!	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
(১২) এবং বিদারণশীল পৃথিবীর (কসম)	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
(১৩) নিশ্চয় এটা চূড়ান্ত সত্য কথা।	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
(১৪) এটা অবশ্যই বাজে কথা নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
(১৫) তারা ভীষণ চক্রান্তে লেগে আছে।	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
(১৬) তাই আমিও কৌশল অবলম্বন করছি।	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
(১৭) সুতরাং তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, আরো কিছুকাল অবকাশ দাও।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

শব্দার্থ

وَالسَّمَآءِ আসমানের কসম! ذَاتِ الرَّجْعِ চক্রশীল, وَالْاَرْضِ এবং পৃথিবীর (কসম), ذَاتِ الصَّدْعِ বিদারণশীল, لَقَوْلٌ فَصْلٌ চূড়ান্ত সত্য কথা, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ এবং এটা বাজে কথা নয়, يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا তারা চক্রান্ত করছে, وَاَكِيْدُ كَيْدًا আমিও কৌশল অবলম্বন করছি, فَمَهِّلْ সুতরাং তুমি অবকাশ দাও, رُوَيْدًا অল্প সময়।

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তাঁর একক শক্তি এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বিষয়ের দৃঢ়তার উপর কসম করেছেন। বিষয়টি জ্ঞান ও যুক্তি বহির্ভূত নয়, তবুও অধিক দৃঢ়তার জন্য জ্ঞান ও যুক্তির উর্ধ্বে ওহীর মাধ্যমেও বিষয়টি সাব্যস্ত করার তাকীদে ১১ নং এবং ১২ নং আয়াতে পূর্ণ কসমের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করেছেন।

সারমর্ম

কাফের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের অসীম শক্তির অনুধাবনে ভুলের শিকার হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ পাক এ আয়াতসমূহে তাঁর বাণী দৃঢ়, চিরসত্য ও অখণ্ডনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। আর তা করেছেন শপথ এবং কসমের মাধ্যমে। কেননা, বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য কসম একটি অন্যতম উপায়। মক্কার কাফের মুশরিকরাও এ কারণেই কসমের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকত।

তাফসীর

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (চক্রশীল আসমানের কসম!)

এ আয়াতে দুটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। একটি হল السماء (আস-সামা') আর একটি হল ذات الرجع (যাতুর রজয়ি)। শব্দ দুইটি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থের অবকাশ রয়েছে। যথা:

(ক) 'আস-সামা' দ্বারা প্রকৃত এবং প্রচলিত অর্থে আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর পরবর্তী 'যাতুর রজয়ি' অর্থ চক্রশীল। এ শব্দটি আসমানের গুণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হল– আসমানের কসম, যে আসমান চক্রশীল। কিন্তু আসমান চক্রশীল– এই মতটি চূড়ান্ত মত নয়। যাদের মতে আসমান এবং 'ফালাক' তথা কক্ষপথ অভিন্ন বস্তু, তাদের মতে আসমান চক্রশীল। একশ্রেণির বিজ্ঞানী এরূপ মত পোষণ করে থাকে। তবে মুসলিম মনীষীগণের মতে ফালাক এবং আসমান অভিন্ন নয়। তাদের মতে ফালাক চক্রশীল বটে, কিন্তু আসমান চক্রশীল নয়। মুফাস্সির আলূসী এরূপ মত পোষণ করেছেন।

(খ) আসমান দ্বারা প্রকৃত আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে আসমান স্বয়ং চক্রশীল নয়, কিন্তু অনেক চক্রশীল বস্তু যথা সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বৃষ্টি, জীবনোপকরণ, ফেরেশতা ইত্যাদি আসমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় আসমানকে চক্রশীল বলা হয়েছে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, আসমানের কসম, যে আসমানের সাথে চক্রশীল বস্তুসমূহ সংশ্লিষ্ট।

(গ) আসমান দ্বারা প্রকৃত আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং মেঘকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমতে আসমান শব্দটি আয়াতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী পরিভাষায় এই অর্থের প্রচলন রয়েছে। সাহাবী হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এবং তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, মেঘের কসম, যে মেঘ চক্রশীল। বস্তুত মেঘ যে চক্রশীল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব এ অর্থ নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ রূপক অর্থ গ্রহণের কারণে ইসলামের কোন অকাট্য বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি না হলে এরূপ অর্থ গ্রহণে কোন

বাধা নেই। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে এর যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমর্থন এ অর্থকে অধিক যুক্তিযুক্ত করে তোলে। প্রকারান্তরে এ অর্থ আসমান স্থির থাকা সম্পর্কিত মুসলিম মনীষীদের মতামতের সাথেও গড়মিল থাকে না। কেননা, এ হিসেবে আসমান চক্রশীল নয়, বরং আসমান বলে মেঘকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর মেঘ অবশ্যই চক্রশীল।

وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (এবং বিদারণশীল পৃথিবীর (কসম)

এ আয়াতে কসমের দ্বিতীয় অংশকে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যমীনের কসম করা হয়েছে। আর যমীনের গুণ হিসেবে ذات الصدع (যাতুস-সাদ্য়ি) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ বিদীর্ণ, ছিদ্র, ফাটল। এই বিদীর্ণশীল বা ফাটলযুক্ত বলে কী বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যথা:

(ক) বিদীর্ণশীল বা ফাটলযুক্ত বলে নদী-নালা, সমুদ্র সাগরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এগুলো যমীনে বিদ্যমান রয়েছে। এই মতটিকে মুফাস্সির আলূসী অবোধগম্য বলেছেন বটে, কিন্তু অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে।

(খ) অনেকে যমিনে বিদ্যমান রাস্তা এবং পথসমূহকে বুঝানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। আর বাস্তবেই যমীনে পথসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। বিদীর্ণ দ্বারা পথের নির্ধারিত সীমারেখাকে বুঝানো হয়েছে।

(গ) এই যমীনে অসংখ্য ও অগণিত মৃত দেহকে সমাহিত করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এসব একদিন যমীন বিদীর্ণ হয়ে বের হবে এবং আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। আয়াতে এদিকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

(ঘ) যমীন সৃষ্ট হওয়ার পর প্রথমে তা বসবাসের উপযোগী ছিল না। আল্লাহ পাক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে যমীনে প্রথিত করত যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। এ সমস্ত পাহাড়-পর্বত যমীনের বিভিন্ন এলাকার প্রোথিত করা হয়েছে। আল্লাহর কুদরতের অসীম খেলা, এই পাহাড়সমূহের মধ্যভাগে রয়েছে ফাটল তথা উন্মুক্ত এলাকা। দুই পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি আরোপ হলে, ফাটল দেখা ও ছিদ্র লক্ষ করা যায়। আয়াতে 'সাদ্য়ি' দ্বারা এই ফাটল ও ছিদ্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুফাস্সির মুজাহিদ কর্তৃক এই মতটি বর্ণিত হয়েছে।

(ঙ) এই যমিন বিদীর্ণ হয়ে তাতে রকমারী বৃক্ষলতা সৃষ্টি হয়। এতে ধরে কত ধরনের ফল মূল। উৎপন্ন হয় খাদ্য দ্রব্যাদি, যা মানুষ আহার করে, মানুষের দেহে শক্তি সঞ্চার হয়। যাতুস সাদয়ি দ্বারা এই রকমারী অন্ন ও ফল-মূলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মুফাস্সির ইকরামা মত পোষণ করেছেন।

(চ) 'সাদয়ি' দ্বারা যমীন থেকে উৎপন্ন বৃক্ষলতা, শস্যাদি ও কৃষি দ্রব্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মত পোষণ করেছেন সাহাবী হযরত ইব্নে আব্বাস, মুজাহিদ, জাহ্হাক, কাতাদা, হাসান বসরী, ইবনে যায়েদ, লাইছ এবং আতিয়্যাহ।

উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। কেননা, যমীনে যা কিছু রয়েছে এবং যমীনের মাধ্যমে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সব কিছুই আল্লাহ পাকের মহিমা এবং অসীম কুদরতের নিদর্শন। এই সবকিছুর কসমের মাধ্যমে স্বীয় অসীম শক্তি এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বাস্তবতার বিষয়টিকে আরো অধিক যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ (নিশ্চয় এটা চূড়ান্ত সত্য কথা। এটা অবশ্যই বাজে কথা নয়।)

পূর্বের আয়াতসমূহে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এবং যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বিষয়টি সত্য ও যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আর এই আয়াতদ্বয়ে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বিষয়টি সত্য ও যথার্থ– এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য যে সত্যতা বুঝানোর জন্য বলা হচ্ছে যে, এই কুরআন চূড়ান্ত সত্য কথা। এটা অবশ্যই বাজে কথা নয়। এই নির্ভুল ও চির সত্য কুরআন বারংবার মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বিষয়টি বর্ণনা করেছে। সুতরাং ঐতিহাসিক এই কিতাবের বর্ণনার পর কাফের মুশরিকদের সন্দেহ করার আর কিছু থাকে না। তদুপরি পবিত্র কুরআন একটি চূড়ান্ত নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ– এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং রসূল কর্তৃক পেশকৃত চ্যালেঞ্জের সম্মুখে তারা হারও মেনেছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তবুও তারা এই কিতাবটিকে অসত্য এবং ভিত্তিহীন বলে চলেছে। তাদের এই মিথ্যা অপলাপ এবং পবিত্র কুরআনের অকাট্যতা ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।

১৩ নং আয়াতের -এর জমীর (সর্বনাম) এবং ১৪ নং আয়াতের জমীর দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। যথা:–

(১) উভয় জমীর দ্বারা কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ মত অনুসারেই পূর্বের তাফসীর পেশ করা হয়েছে। মুফাস্‌সিরীনে কেরামও তদনুযায়ী তাফসীর করেছেন। ইবনে জারীর তার প্রসিদ্ধ তাফসীরে এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অনেকে এর সমর্থনে একটি হাদীছেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের আজমত এবং বিশেষত্ব বর্ণনা করে একদিন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الا انها ستكون فتنة... ومن حكم به عدل ومن دعا الى اليه هدى الى صراط مستقيم.

অতি সত্বর এক ফিৎনা সংঘটিত হবে। হযরত আলী আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ফিৎনা থেকে মুক্তির উপায় কী? রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, মুক্তির উপায় 'আল্লাহর কিতাব' যাতে রয়েছে তোমাদের পূর্বসূরিদের সংবাদ এবং তোমাদের পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের সংঘটিত বিষয়াদির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তাবলি। এই কিতাব সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য স্থাপনকারী। এতে অনর্থক কোন কিছু নেই। যে অহংকারী এই কিতাবকে বর্জন করে, আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করে দিবেন। আর যে এই কিতাব বাদ দিয়ে অন্যত্র হেদায়াত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন। এই কিতাব আল্লাহ পাকের সুদৃঢ় রজ্জু, হেকমত ও নছীহত পূর্ণ কিতাব এবং সঠিক সরল পথ। এর অনুসরণ করলে কেউ বিপদগামী হয় না। আলেমগণ এই কিতাব থেকে জ্ঞান আহরণে পরিতৃপ্ত হয় না। অধিক তেলাওয়াতের কারণে পুরনো হয় না। তার তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব শেষ হয় না। এ কিতাব শোনে জিন জাতিও স্থির থাকতে পারেনি, বরং বলেছে 'আশ্চর্য এই কুরআন' যা আমরা শুনেছি, সত্যের প্রতি দিক-নির্দেশনা করে তাই আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। যে কুরআন মোতাবেক কথা বলে সত্য বলে, যে কুরআন মোতাবেক আমল করে সে ছওয়াব পায়। যে কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করে, সে সঠিক ফায়সালা করে, আর যে কুরআনের দিকে আহ্বান করে, সে সীরাতুল মুস্তাকীমের দিকে পথ দেখায়।

হাদীছটি হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে দারিমী এবং তিরমিযীতে বর্ণিত আছে। তবে ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীছের সূত্র সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, বরং কোন কোন অংশে সূত্রবিহীনতার দোষ রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

অনেক সময় হাদীছের সূত্র দোষমুক্ত না হলেও তার বিষয়বস্তু গৃহীত হওয়ার বিধান সর্বজন স্বীকৃত। ফিরাসাতে ঈমানী তথা মু'মিনের কলুষমুক্ত অর্ন্তদৃষ্টি এবং হাদীছশাস্ত্রের গভীর চর্চা ও অভিজ্ঞতাও হাদীছ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রাখে বলে ইবনে হাজার আসকালানী এবং মুহাদ্দিছগণ উক্তি করেছেন। আসলে উক্ত হাদীছের বাক্য রচনা প্রণালী এবং অলঙ্কার বিধি সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে হাদীছটি অস্বীকারের অবকাশ প্রতীয়মান হয় না। আর উক্ত হাদীছে বর্ণিত বিষয়ের অকাট্যতা তো সর্বজনস্বীকৃত। বহু হাদীছ দ্বারা এ হাদীছের বিষয়বস্তুর পুরাপুরি সমর্থন হওয়ার কারণে হাদীছের বিধান মতে এর অর্থ ও বিষয়বস্তু গ্রহণে কোন বাধা নেই।

তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ নিরূপণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে বলে কোন সঠিক সূত্র জানা নেই। কেবল বাক্য এবং অর্থগত মিলের কারণে এই বক্তব্য দেয়া হয়ে থাকতে পারে। অতএব শুধু এতটুকুর ভিত্তিতে আয়াতদ্বয়ের জমীরের উদ্দেশ্য কুরআনকে সাব্যস্ত করার মত বোধগম্য নয়। এ মতটি যে তেমন গ্রহণযোগ্য নয় তার কারণ পরবর্তী বক্তব্যেও লক্ষ্য করুন।

(২) উভয় জমীর দ্বারা পূর্বে বর্ণিত কথা ও সংবাদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বস্তুত আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিরূপণের বেলায় সিয়াক্ব-সাবাক্ব তথা আগে পিছে বর্ণিত বিষয়বস্তু এবং পূর্বাপর ভাবভঙ্গির দিক-নির্দেশনা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। আর আলোচ্য আয়াতের পূর্বে কসমের মাধ্যমে একটি কথা বা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে এবং সে কথা ও সংবাদের যথার্থতার জন্য অকাট্য ও বাস্তব কয়টি প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে, এরপর ১৪ নং আয়াতের শেষাংশে 'অনর্থক নয়' বলে কঠোর বাণী ও হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এসব বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি আরোপ করলে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় জমীর দ্বারা এখানে পবিত্র কুরআন নয় বরং পূর্বে উল্লেখ করার কথা এবং সংবাদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কারণেই মুফাস্‌সির ইবনে কাছীর এই মতটিকে উল্লেখ করেছেন এবং মুফাস্‌সির রাযী এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, সাহাবী ইবনে আব্বাস এবং মুফাস্‌সির কাতাদা থেকেও এর সমর্থন প্রতীয়মান হয়। মোটকথা, যদি উদ্দেশ্য কুরআন হয়, তা হলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে এই যে, কুরআন সত্য, বাজে কথা নয়। আর যদি উদ্দেশ্য পূর্বেকার সংবাদ এবং কথা হয়, তা হলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই হবে যে, পূর্বেকার সংবাদ এবং কথা, কোন ভিত্তিহীন কথা নয়, কোন বাজে কথা নয়। এভাবে আলোচ্য আয়াতে বিষয়টির ব্যাপারে কঠোরবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যাতে কেউ এটাকে ভিত্তিহীন মনে না করে।

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا... (তারা ভীষণ চক্রান্তে লেগে আছে। তাই আমিও কৌশল অবলম্বন করছি। সুতরাং তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, আরো কিছুকাল অবকাশ দাও।)

ইসলাম, ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন এবং বিশ্ব রসূলের নবুয়ত ও সততা প্রমাণিত হওয়ার পর এর প্রতি ঈমান স্থাপন এবং আনুগত্য কেবল নীতিগত দাবীই নয়, বরং জ্ঞানেরও দাবী বটে। কিন্তু মক্কার গণ্ডমূর্খ কাফের মুশরিকরা স্বীকৃতি দানের স্থলে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, চরম বিদ্রোহ পোষণ করে। কখনও বলে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন কি সম্ভব? দেহ পচে গলে মাটিতে মিশে যাবে– এ আবার পুনঃসংযোজিত হবে কী করে? ছোট শিশুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যেমন অনেক কিছু বলা হয়ে থাকে, তেমনি পুনর্জীবনের বলে আমাদেরকেও ভয় দেখানো হয়েছে। তারা এসব চক্রান্ত করতে থাকে বিধায় শেষ তিন আয়াতে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, 'তারা ভীষণ চক্রান্তে লেগে আছে। তাই

আমিও কৌশল অবলম্বন করছি। সুতরাং তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, আরো কিছুকাল অবকাশ দাও।" তারা যখন চক্রান্তের চরম সীমায় উপনীত হবে এবং চরম শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে, তখন আমি তাদেরকে চরমভাবে পাকড়াও করব।

(৪) সূরা আ'লা, মক্কী
১৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١	(১) তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর, যিনি অতি মহান।
الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢	(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।
وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣	(৩) এবং তিনি সুপরিমিত করে পথ নির্দেশনা করেছেন।
وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤	(৪) এবং যিনি উদ্ভিদ উদগত করেন।
فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥	(৫) অতঃপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেন।
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦	(৬) আমি তোমাকে পড়াবই, সুতরাং তুমি ভুলবে না।
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧	(৭) তবে তিনি (আল্লাহ) যা ইচ্ছা করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য এবং যা গোপন তা জানেন।
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨	(৮) আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়তকে সহজতর করে দিব।
فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩	(৯) অতএব উপদেশ উপকারী হলে তুমি উপদেশ দান কর।
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠	(১০) যে ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে।
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١	(১১) আর তা থেকে দূড়ে থাকবে সেই যে চরম হতভাগা।
الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢	(১২) যে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।
ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣	(১৩) অনন্তর সেখানে সে মরবেও না আবার জীবিত ও থাকবেনা।

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

سَبِّحِ তাসবীহ্ বর্ণনা কর, رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের, الْاَعْلَى মহান, সকলের উপরে, فَهَدٰى দিক নির্দেশনা করেছেন, اَخْرَجَ উৎপন্ন করেছেন, الْمَرْعٰى উদ্ভিদ, فَجَعَلَهٗ অতঃপর করেছেন, غُثَآءً আবর্জনা, اَحْوٰى কালো, ধূসর, سَنُقْرِئُكَ আমি তোমাকে পড়াব, فَلَا تَنْسٰى ফলে তুমি ভুলবে না, الْجَهْرَ প্রকাশ্য, يَخْفٰى গোপনে আছে, نُيَسِّرُكَ আমি তোমার জন্য সহজ করব, فَذَكِّرْ অতএব তুমি উপদেশ দান কর, اِنْ نَّفَعَتْ যদি উপকার হয়, উপদেশ, الذِّكْرٰى সে উপদেশ গ্রহণ করবে, سَيَذَّكَّرُ যে ভয় করে, مَنْ يَّخْشٰى তা থেকে উপেক্ষা করে চলবে, الْاَشْقَى হতভাগ্য, يَصْلَى পতিত হবে, النَّارَ الْكُبْرٰى ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে।

ভাবার্থ

হে প্রিয়নবী, তুমি তোমার অনুগত মু'মিনসহ তোমার 'রব'-এর তাসবীহ পড়তে থাক। তিনি স্বীয় মহত্ত্ব ও বড়ত্বের কারণেই তাসবীহের অধিকারী, উপরন্তু তিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সমস্ত সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, তার চাহিদা পূরণ করা ও প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থাপনা করেছেন। সবকিছুর মূলেই রয়েছে তার অবদান এবং কৃতিত্ব। কেবল মানুষ এবং জীব-জন্তুই নয়, বরং সবুজ সুন্দর ও শস্য শ্যামল বৃক্ষলতাও তাঁরই সৃষ্টি এবং অবদান, যা দেখতে কত মনোরম ও শোভনীয়! এই সব কিছুকেই একদিন তিনি অবর্জনায় পরিণত করবেন। জীবজন্তু এবং মানুষও একদিন শিশুকাল ও যৌবনকাল পাড়ি দিয়ে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধকাল পাড়ি দিয়ে মৃত দেহে পরিণত হবে। সূচনা হবে নতুন জগতের। যে জগত হল স্থায়ী। সেখানের শান্তি এবং অশান্তিই হচ্ছে আসল ও মৌলিক। এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা, ভীতি প্রদর্শন বা সুসংবাদ প্রদানের জন্যই আমি তোমাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কুরআন তোমার প্রতি নাযেল করেছি। যাতে এই কুরআন তুমি ভুলে না যাও তার জন্য আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তবে প্রয়োজনের তাকিদে এই কুরআনের কোন কোন বিষয় আমি রহিত করে থাকি, যা অনর্থক নয়। যেহেতু আমি জাহের-বাতেন, দৃশ্য-অদৃশ্য প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সর্ব বিষয়ে অবগত, তাই প্রয়োজন মত রহিতকরণ আমি যথাযথভাবেই করে থাকি। এই কুরআনকে সংরক্ষণ করা এবং এর তত্ত্ব, তাৎপর্য ও অর্থ অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে তোমার বোঝার জন্য একে আমি সহজতর করে দিয়েছি। সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং বিশ্বের মানবকে এজন্য নছীহত করতে থাক। এতে উপকার হবেই। কেননা, নছীহত গৃহীত না হলেও তুমি লাভবান হবে, আর গৃহীত হলে যারা গ্রহণ করবে তারাও লাভবান হবে। তবে জেনে রাখ যাদের ভেতর ভয় আছে, তারা নছীহত গ্রহণ করবে আর যাদের ভেতর ভয় নেই, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং জঘন্য। তারা অবশেষে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হবে, সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। সেখানে তারা বিন্দু মাত্র প্রশান্তিও পাবে না, যাকে জীবন বলা যেতে পারে।

সূরার নামকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ

● সূরার প্রথম শব্দ 'ছাব্বিহ'-এর অনুকরণে অনেকেই এর নাম সূরায়ে 'সাব্বিহা' রেখেছেন। তবে প্রথম আয়াতের 'আলা' শব্দের অনুকরণে 'সূরাতুল আলা' নামেই সূরাটি প্রসিদ্ধ।

● এক রুকু বিশিষ্ট এই সূরায় সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা ১৯টি, বাক্যের সংখ্যা ৭২টি আর শব্দের সংখ্যা মতান্তরে ২৯১ অথবা ২৯৯ অথবা ২৭১টি।

সূরাটি মাদানী না মক্কী?

ইবনুল কাইয়্যেমের উদ্ধৃতি মতে সূরাটি মাদানী। কেননা, এতে ঈদের নামায এবং ফিতরার আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। আর এই দুটির বিধান হিজরতের পর মদীনায় প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মুফাস্সির জালালুদ্দীন সুয়ূতী সূরাটির মাদানী হওয়ার মতকে নাকচ করে মক্কী হওয়াকে চূড়ান্ত মত বলে মন্তব্য করেছেন। জুমহুরের নিকটও সূরাটি মক্কী। আর মক্কী হওয়াটাই সঠিক। কেননা, ইমাম বোখারী, ইবনে আবী শাইবা এবং সাআদ কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আযিবের হাদীছে এর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। মুফাস্সির আল্লামা আলূসীও এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

যারা সূরাটিকে মাদানী বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের বক্তব্য এই যে, সূরাটিতে ঈদের নামায এবং ফিতরার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, আর উভয়টির বিধান মদীনায় প্রবর্তিত হয়েছে। এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা,

(ক) এর ভিত্তি হচ্ছে فصلى এবং زكى দুটি বাক্যের অর্থ ঈদের নামায এবং সদকায়ে ফিতর অর্থ গ্রহণ করা। অথচ এরূপ অর্থ গ্রহণে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামতই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থলে করা হবে।

(খ) অনেক সময় কোন বিষয়ে হুকুম মক্কায় প্রবর্তিত হয়েছে আর আয়াত মদীনা মুনাওয়ারায় নাযেল হয়েছে বলে আল্লামা যারকাশী এবং মুফাস্সির সুয়ূতী সহ মুফাস্সিরগণ মত ব্যক্ত করেছেন। উযু সংক্রান্ত আয়াত এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। সেমতে হতে পারে, উল্লিখিত উভয় হুকুম মক্কায় প্রবর্তিত হয়েছে, আর এ সংক্রান্ত আয়াত মদীনা মুনাওয়ারায় নাযেল হয়েছে। বর্ণিত ইবনে আযিবের হাদীছের কারণে এই তত্ত্বটি অত্যন্ত যথার্থ মনে হয়। সুতরাং সূরাটিকে মক্কী বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

যোগসূত্র

(ক) ইতিপূর্বের সূরাটিতে মানব সৃষ্টির বিষয়টি মৌলিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর আলোচ্য সূরাতে উদ্ভিদের বিষয়টিও মৌলিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ হিসেবে সূরায়ে তারিকের তুলনায় আলোচ্য সূরায় সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনার ব্যপকতা বিদ্যমান রয়েছে। মুফাস্সির আলূসীর মতে উভয় সূরার মধ্যে এই যোগসূত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

(খ) কিন্তু এখানে আর কোন যোগসূত্র নেই– এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে অন্যভাবেও যোগসূত্র সৃষ্টি হতে পারে। যথা: পূর্বের সূরায় পুনঃর্জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে আর আলোচ্য সূরায় পুনঃর্জীবনে যারা সৌভাগ্যশীল হবে তথা জান্নাতী হবে কিংবা হতভাগা তথা জাহান্নামী হবে তাদের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যোগসূত্রের এ দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ যোগসূত্র মেনে নিলে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ফুটে ওঠে।

www.maktabatulabrar.com

তাফসীর

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى **(তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা কর, যিনি অতি মহান।)**

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর প্রতি দিক-নির্দেশনার অবকাশ রয়েছে।

(১) উচ্চস্বরে যিকির

আয়াতে প্রথম বিষয় বলা হয়েছে উচ্চস্বরে যিকির করা। বিশ্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চস্বরে আল্লাহ পাকের নামের যিকির করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ পাকের নামে যিকির আন্তরিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তির অন্যতম উপায়। তবে যিকির উচ্চস্বরে করা চাই, না অনুচ্চস্বরে করা চাই পবিত্র আয়াত এবং হাদীছের আলোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় এবং করা হয়েছে। অনেকে উচ্চস্বরে যিকিরকে নিষেধ করেছেন, আবার অনেকে তা উত্তম বলে উক্তি করেছেন। নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হয় যে, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে উভয়ভাবে যিকির করা শরীয়তসম্মত। অবশ্য বিকট আওয়াজে ও সীমাহীন উচ্চস্বরে যিকির করার অবকাশ শরীয়তে মোটেই নেই। হৈ-হুল্লা করা, চিৎকার করা ও লাফালাফি করার অনুমতিও নেই মোটেই।

(২) নামায আরম্ভ করার নিয়ম

আয়াতে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে নামায শুরু করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম বাগাভী, হযরত হাসান বসরী এবং সালেহের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আলোচ্য সূরার ১৪-১৫নং আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তুর সাথে এই তাফসীরের গভীর সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়, যেখানে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্র হয়েছে আর স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে।' ইমাম রাযীর মতে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও এই মতটির সমর্থন অনুভূত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ .

সুতরাং তোমরা তাসবীহ কর যখন তোমরা সন্ধ্যা কর এবং যখন তোমরা সকাল কর। (সূরা রূম: ১৭)

ইমাম রাযীর মতে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এই মতটির সমর্থন অনুভূত হয়। কেননা, এই আয়াতটি নামাযের সময় সংক্রান্ত ব্যাপারে নাযেল হয়েছে বলে মুফাস্সিরীনদের ঐকমত্য রয়েছে। নামাযের মত একটি বিরাট ইবাদতের সুযোগ লাভ হলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং বরকতের আশায় আল্লাহর নাম নিয়ে নামায শুরু করার ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তদুপরি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুসারে মক্কার মুশরিক সমাজ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করত এবং তারা ইবাদতের ধারণায় তাওয়াফের সময় তাদের বাতিল উপাস্যদের নাম নিয়ে হাত তালি বাজাত। সুতরাং তাদের এই গর্হিত প্রচলনের প্রতিবাদে নামাযের শুরুতে আল্লাহ পাকের নাম নেয়ার নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণই বটে।

এজন্যেই মুসলিম উম্মাহ নামাযের প্রারম্ভ আল্লাহ পাকের নামের মাধ্যমে করে থাকে। কিন্তু আয়াত দ্বারা কোন নির্দিষ্ট নামের মাধ্যমে শুরু করার বাধ্য বাধকাতা নেই। সেহেতু হানাফী মাজহাব মতে আল্লাহর যে কোন নাম দিয়ে নামায আরম্ভ করা যেতে পারে। অবশ্য হাদীছে পাকে তাকবীরের মাধ্যমে আরম্ভের কথা বর্ণিত হয়েছে বিধায় তাকবীর-এর মাধ্যমে আরম্ভ করাই চূড়ান্ত মত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষ আদব

আয়াতে প্রিয়নবীকে আলোচ্য সূরাটি তেলাওয়াতের পূর্বে سبحان ربى الاعلى পড়তে নির্দেশ করা হয়েছে। হযরত আলী, ইব্নে মাসউদ, ইব্নে যুবায়ের, ইব্নে আব্বাস, ইব্নে উমর এবং আবূ মূসা প্রমূখ থেকে অনুরূপ আমলের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু নামায আরম্ভের পর কেরাত হিসেবে পাঠ করার প্রমাণ কোন সঠিক হাদীছে নেই। হযরত উবাই (রা.) থেকে এরূপ কেরাতের উদ্ধৃতি থাকলেও হযরত আলী (রা.) থেকে এরূপ কেরাত সাব্যস্ত নয় বলে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তিনি একদিন নামাযে سبح اسم ربك الاعلى পাঠ করার পর سبحان ربى الاعلى পাঠ করেছিলেন। নামায শেষে এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, سبحان ربى الاعلى কুরআনের আয়াত নয়। তাহলে প্রশ্ন হবে যে, হযরত আলী (রা.) পাঠ করলেন কী করে? এর উত্তর হল– তখন নামাযের ভিতর যিকির করার অনুমতি ছিল। তাই হযরত আলী (রা.) যিকির এবং তাসবীহ হিসেবে পাঠ করেছিলেন। অথবা হযরত আলী (রা.) একজন মুজতাহিদ হিসেবে স্বীয় ইজতেহাদের ভিত্তিতে পাঠ করে থাকবেন। কিন্তু তার মতের সাথে অন্যদের ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়নি। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকেও তাসবীহ হিসেবে পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) সাজদার তাসবীহ

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদার অবস্থায় এই তাসবীহ পাঠ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন فسبح باسم ربك العظيم নাযেল হলে রুকূতে سبحان ربى العظيم পাঠ করতে বলা হয়। বাস্তবে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রুকূ এবং সাজদায় ঐ তাসবীহসমূহ আদায় করতেন এবং উম্মতকে আদায় করতে নির্দেশ করেন, যা শরীয়তে কার্যকর রয়েছে। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা-এর ফযীলত

মুফাস্সির কুরতুবীর উদ্ধৃতি অনুসারে سبحان ربى الاعلى তাসবীহ সর্বপ্রথম হযরত মীকাইল ফেরেশতার মুখে উচ্চারিত হয়। এর উপকারিতা, বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে বিশ্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করে হযরত জিবরীল (আ.) বলেন যে, নামাযে এবং নামাযের বাইরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ এই তাসবীহ পাঠ করবে, এর ছাওয়াব আরশ, কুরসী এবং পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির তুলনায় অধিক ভারী এবং ওজনী হবে। শুধু তাই নয়, এই তাসবীহের জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'আমার প্রিয় বান্দা সত্যই বলেছে, আমি সকলের উপর সমাসীন, আমার উপরে কেউ নেই। শোন হে ফেরেশতা সমাজ! তোমরা সাক্ষী! আমি আমার এই বান্দার প্রতি

ক্ষমা ঘোষণা করলাম এবং তার জন্য জান্নাতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলাম। এই লোকটির মৃত্যু হলে হযরত মীকাঈল (আ.) প্রতিদিন তার কবর যিয়ারত করে থাকেন। কেয়ামতের দিন হযরত মীকাঈল (আ.) সসম্মানে তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করত সুপারিশ করে আল্লাহ পাকের অনুমতি লাভ করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

আল্লামা ছা'লাবী কর্তৃক কিতাবুল আরাইসের উদ্ধৃতি অনুসারে হযরত মিকাঈল ফেরেশতা ১৮শত পরের অধিকারী। যার এক পর থেকে অপরটির মধ্যে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব। আল্লাহ তাআলা হযরত মীকাঈল (আ.)-কে আরশ পরিদর্শন ও প্রদক্ষিণের অনুমতি দেন। হযরত মীকাঈল (আ.) বিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত একটানা বিচরণ করেও পরিপূর্ণ আরশ পরিদর্শনে ব্যর্থ হন। আল্লাহ পাক পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তি এবং দ্বিগুণ পর দান করে পুনরায় বিচরণের নির্দেশ করেন, তখন তিনি আরও ৩০ বৎসর উড়ে উড়ে বিচরণ করেও পরিপূর্ণ পরিদর্শনে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতা, তুমি তোমার সর্বশক্তি ব্যয় করে কেয়ামত পর্যন্ত বিচরণ অব্যাহত রাখলেও আমার পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ পাকের ইরশাদ শ্রবণ করে হযরত মিকাঈল (আ.) আশ্চর্যের সুরে বলে উঠেন, سبحان ربى الاعلى পরবর্তী সময় এই মর্মে سبح اسم ربك الاعلى আয়াতটি নাযেল হয়। হাদীছ দুটির সূত্র সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি অবগত নই। তবে উপর্যুক্ত তাসবীহের অগণিত বরকত এবং ফযীলতের কথা বোখারী, মুসলিমসহ হাদীছের বহু কিতাবের রেওয়ায়েতে বিদ্যমান রয়েছে। আর আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই।

(৫) সত্তার বড়ত্ব এবং পবিত্রতা

এ আয়াতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সত্তার বড়ত্ব এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে– নামাযে পবিত্রতা এবং বড়ত্ব নয়। কেননা, নাম কয়েকটি হরফের সংযোগের ফল। তাই নামের পবিত্রতা বর্ণনার তুলনায় সত্তার পবিত্রতা বর্ণনার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাহলে প্রশ্ন হবে আয়াতে اسم তথা নাম শব্দ উল্লেখ করা হল কেন? এর উত্তর হল– নাম কথাটা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সত্তা অধিক সম্মানী হলে তার সত্তার উল্লেখ না করে তার নামের উল্লেখ করার প্রচলন আছে। এমতাবস্থায় নাম লক্ষ্যবস্তু হয় না, বরং মূল লক্ষ্য হয় সত্তা। আলোচ্য আয়াতে তা-ই হয়েছে। আল্লামা আলূসীর মতে মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তাবারানী ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর হাদীছ এবং আব্দ ইব্নে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত হযরত আলী (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা অনেকেই এই তাফসীরের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম রাযীর উদ্ধৃতি অনুসারে তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই এই তাফসীরটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতে নিম্নোক্ত অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়।

(১) উপরোক্ত তাফসীর অনুসারে আয়াতে প্রথম যে অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়, তা হলো– আল্লাহর সত্তার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করা। যথা: তিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা ইত্যাদি। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এবং মুফাস্সির সুদ্দী থেকে এই অর্থ উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ পাকের যাত তথা সত্তা অতি মহান। সেই সাথে সাথে অপরিসীমও। যার কোন শেষ নেই। নবী রসূলগণের পক্ষেও

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহর প্রকৃত সত্তার অনুধাবন অসম্ভব। অসম্ভব তার সত্তানুসারে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা। সুতরাং অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ কারণেই একশ্রেণির নাস্তিক বস্তুবাদীরা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে। তাই ক্ষমতা বহির্ভূত এই নির্দেশ পবিত্র শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে কীরূপে? স্বয়ং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .

কাউকে তার ক্ষমতার অধিক দায়িত্ব দেয়া হয় না। (বাকারা: ২৮৬)

এমতাবস্থায় যে বিষয়টি আরো অধিক অলোচনার দাবী রাখে, তা হচ্ছে এই যে, দায়িত্ব প্রতিপালনে কামিয়াবী এবং সফলতা লাভের সুবাদে আল্লাহ পাক এ শ্রেণির সৃষ্টির প্রতি স্বীকৃতি দানে বাধিত করত ইরশাদ করেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ .

সপ্ত আকাশ ও তন্মধ্যস্থ সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৪৪)

অক্ষম সৃষ্টির যা দায়িত্ব হতে পারে না, তা প্রতিপালনে খোদায়ী সমর্থনের রহস্য খুবই অস্পষ্ট।

আসলে কোন সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহর সত্তানুপাতে তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টি কেবল তার ক্ষমতানুসারেই এই দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম। আর যাতে সক্ষম সৃষ্টি তথা মানুষ কেবল তাতেই আদিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে এই তত্ত্বটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে মানুষ যখন স্বীয় ক্ষমতানুসারে বড়ত্ব-মহত্ত্ব বর্ণনা করত স্বীয় অপারগতার কথা দীনতা হীনতার সুরে শাহী দরবারে পেশ করে, তখন করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে স্বীকৃতি দেন এবং মহা পুরস্কারে সৌভাগ্যশীল করেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হযরত দাউদ (আ.) তার প্রতি ইহসানের কৃতজ্ঞতা আদায়ের খোদায়ী নির্দেশ পালনে সদা সর্বদা নিয়োজিত থেকে একদিন মুনাজাত করে বললেন, 'হে আল্লাহ পাক, আমি তোমার সত্তানুসারে কৃতজ্ঞতা আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে চলেছি, আমি সম্পূর্ণ অপারগ। এর জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'তোমার এ অনুভূতি এবং মুনাজাতের কারণে আমি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞতা আদায়ে সফলতা অর্জন করেছ বলে ধরে নিলাম। বস্তুত আল্লাহ পাক অত্যন্ত করুণাময়, সকলের বেলায় তাঁর একই বিধান কার্যকর হয়।

(২) আয়াতে দ্বিতীয় যে অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়, তা হলো– শালীনতা এবং শিষ্টাচারিতার সাথে আল্লাহর সত্তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনার পাশাপাশি তার পবিত্রতা বর্ণনা করা। যাতে মুশরিক এবং কাফের সমাজ তার সত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার কটূক্তি করার সুযোগ না পায়। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এই অর্থের সমর্থন লাভ হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .

তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে না, অন্যথায় অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতা হেতু তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে। (সূরা আন'আম: ১০৮)

www.maktabatulabrar.com

প্রতিমাসমূহ সম্মানের পাত্র নয়, বরং সম্পূর্ণ ঘৃণার পাত্র। কিন্তু যদি তাদেরকে মন্দ বলা আল্লাহর প্রতি মন্দ আরোপের কারণ হয়, তাহলে তাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই বিরত থাকা প্রতিমার প্রতি সমর্থন অথবা সম্মান প্রদান স্বরূপ নয়, বরং আল্লাহ পাকের প্রতি মন্দারোপের অবকাশ প্রতিহতকরণের প্রয়োজনে।

বিধর্মীদের সমালোচনার তরীকা

এখানে থেকে বিধর্মীদের প্রতিবাদের পদ্ধতি প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান হয় যে, বিধর্মীদের সমালোচনা করার মুহূর্তে অশালীনতা ও গালি-গালাজের পথ পরিহার করে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতার পথ অবলম্বন করতে হবে। কেননা, অবাঞ্ছিত তরীকায় প্রতিবাদ প্রতিপক্ষের কেবল ক্ষিপ্ত হওয়ারই কারণ হয় না, বরং সত্য অনুধাবনে জড়তার সৃষ্টি করে এবং কটূক্তি করার মত ধৃষ্টতা অবলম্বনের পথ সুগম করে। এ কারণে এক্ষেত্রে কুরআন হাদীছে হেকমত অবলম্বন ও সদাচারণের মাধ্যমে অসাদাচরণের প্রতিবাদ করার তাকীদ আরোপিত হয়েছে। বলা হয়েছে,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ .

উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ কর। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ: ৩৪)

সদাচারণের পথ যেমন সত্য অনুধাবনে সহায়ক হয়, তেমনি শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে। আয়াতের শেষে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে।

(৩) আয়াতে তৃতীয় যে অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়, তা হলো– মুলহিদ এবং পথভ্রষ্টদের তরফ থেকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে আরোপিত অপবাদ এবং অপলাপের প্রয়াস থেকে মহা সত্তাকে পাক-পবিত্র করা। নাস্তিক সমাজ আল্লাহ পাকের সত্তাকেই অস্বীকার করে বসে আছে। এরা হচ্ছে নমরূদ এবং ফিরআউনের বংশধর। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং অগ্নি ও প্রতিমা পূজারীরা আল্লাহর সত্তার সাথে অংশীদারীত্বে বিশ্বাসী। এরা হচ্ছে আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের উত্তরসূরি। একশ্রেণির লোকেরা ভণ্ড, যারা প্রকৃতি এবং জনগণকে ক্ষমতার উৎস বলে ধ্বনি উড়ায়। মুতাজিলাদের মতে আল্লাহ পাক পাপ ও মন্দের স্রষ্টা নন। মুজাস্‌সিমারা আল্লাহ পাককে অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় বস্তু দেহ বিশিষ্ট মনে করে। আর মুশাব্বিহা সম্প্রদায় আল্লাহর জন্য সদৃশতা সাব্যস্ত করে। আয়াতে উম্মতের সম্মুখে এ সমস্ত অপলাপ ও বাতুলতা প্রতিহত করে তাদের সামনে আল্লাহ পাকের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বড়ত্ব এবং পবিত্রতা বর্ণনা করার দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য।

(৪) আয়াতে চতুর্থ যে অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়, তা হলো- আল্লাহর মহান সত্তার মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করার সময় উপস্থাপনায় সতর্কতা এবং সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা। অসতর্কতার মাধ্যমে উপস্থাপনার ভাষায় যেন বেয়াদবী, গোস্তাখী, অবহেলা, উদাসীনতা ও অহংকার প্রতিভাত না হয়। যে আন্তরিকতা, একাগ্রতা এবং আল্লাহর সত্তার শান-অক্ষুণ্ন থাকে। আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বড়ত্ব এবং পবিত্রতা বর্ণনা করা দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য।

(৫) আয়াতে পঞ্চম যে অর্থের অবকাশ সৃষ্টি হয়, তা হলো– মহান আল্লাহ পাককে সঠিক নামে স্মরণ করা। তাঁর সত্তার জন্য সুন্দর ও উপযুক্ত নাম রয়েছে। তারই মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা, নিজের পক্ষ থেকে কোন নাম নির্ধারণ না করা। কেননা, যেমন আল্লাহ পাকের সত্তার অসীমতা অনুধাবনের

ঊর্ধ্বে, তেমনি তার গুণাবলিও অসীম তথা মানবীয় জ্ঞান বহির্ভূত। অতএব সৃষ্টির পক্ষে তার জন্য নাম নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভুলের সুনিশ্চিত অবকাশ থেকে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাকের সত্তা যেমন মহান, নিখুঁত, পাক-পবিত্র ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে, তেমনি তার নামসমূহও মহান, নিখুঁত, পাক-পবিত্র ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাই আয়াতে পঞ্চম অর্থে মহান আল্লাহ পাককে সঠিক নামে স্মরণ করার যে অবকাশ বুঝে এসেছে তা পালনের বিভিন্ন তরীকা হতে পারে।

(ক) আল্লাহর নামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। নাপাক স্থানে, নাপাক পরিবেশে, ইসতেনজা অবস্থায় এবং শৌচাগারে তার নাম উচ্চারণ না করা।

(খ) আল্লাহর নাম সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ না করা, এই নামে সৃষ্টির নামকরণ না করা, নামের অর্থ বিকৃত না করা, আল্লাহর নামের এমন অর্থ না করা যা সৃষ্টির জন্য অনুমেয়। সর্বাবস্থায় আদব রক্ষা করা।

(গ) পাপাচারিতার সময়, পাপের পরিবেশে এবং আল্লাহর নামের সাথে ঘৃণা এবং বেয়াদবীমূলক আচরণের আশংকা রয়েছে এমন পরিবেশে তার নাম উচ্চারণ না করা।

ইমাম মালিক কর্তৃক আল্লাহর নামের সম্মান রক্ষার অপূর্ব নমুনা

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) যাচনাকারীকে কোন কিছু প্রদানে অক্ষম হলে সাধারণ মানুষের মত 'আল্লাহ দিবেন, আল্লাহ পাঠাবেন, আল্লাহ রিযিক দিবেন'– এরূপ বলতেন না, বরং অক্ষমতা প্রকাশ করতেন অথবা অন্য সময় আসতে বলতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

ان السائل اثقل شئ عليه سمعه وابغض اليه قول المسؤل ما يفيده رده فانا اجل اسم الله سبحانه من ان اذكره عن من يكره سماعه ولو فى ضمن جمله.

এ কথাগুলোর ভাবার্থ হলো, প্রার্থীকে কিছু দেয়া হবে না– এমন অর্থজ্ঞাপক যাবতীয় কথাই তার কাছে অত্যন্ত অপছন্দের লাগে। তাই না দেয়ার ভাব বুঝানোর জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করাকে আমি আল্লাহর নামের মর্যাদা রক্ষার খেলাফ মনে করি।

মুফাস্সির আলূসী বলেন, এই বক্তব্য ইমাম মালিকের খোদা আশক্তির অন্যতম প্রমাণ।

(ঘ) কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক এবং বস্তুবাদীরা আল্লাহ পাকের নামের বিকৃতি সাধন করে থাকে, অপপ্রয়োগ করে থাকে, গলদ অর্থ করে থাকে। তারা নিজেরাও এরূপ করে থাকে, অন্যদেরকেও তার প্ররোচনা দেয়। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে তারা তিনটি কাজ করে। (এক) আল্লাহ পাকের নামসমূহের অপব্যবহার করে থাকে। (দুই) আল্লাহ পাকের প্রতি অবাঞ্ছিত গুণাবলি আরোপ করে থাকে। (নিম্নে এ দুটি বিষয়ের কিছু নমুনা পেশ করা হল।) এবং (তিন) আল্লাহর সত্তা নিয়ে উপহাস করে।

আল্লাহর নামসমূহের অপব্যবহারের নমুনা

(ক) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ সুলাইমান ইব্নে মেহ্রান আ'মাশের বর্ণনানুসারে মক্কার মুশরিক সমাজ আল্লাহ পাকের নাম 'ইলাহ' থেকে তাদের মাবূদের নাম 'লাত' রেখেছে।

www.maktabatulabrar.com

(২) কুরাইশ সমাজের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের নাম 'আযীয' থেকে তাদের মাবূদের উয্যা নামকরণ করে।

(৩) বনী খুজায়া, খাযরাজ এবং আউস গোত্র আল্লাহ পাকের নাম 'মান্নান' থেকে তাদের মূর্তির মানাত নামকরণ করে।

(৪) খ্রিষ্টান সমাজ আল্লাহ পাকের নামের স্থলে আব, পিতা, বাবা, গর্ভ ইত্যাদি ব্যবহার করে হযরত ঈসাকে আল্লাহর স্থলে ধারণ করে।

(৫) হিন্দু এবং তাদের অনুসারীরা ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি নামকরণ করে এবং করে থাকে।

আল্লাহর প্রতি অবাঞ্ছিত গুণাবলি আরোপের নমুনা

(১) ইয়াহুদীরা আল্লাহর প্রতি অভাবী, ফকীর, কৃপণ, কর্মহীন ইত্যাদি অবাঞ্ছিত গুণ আরোপ করে থাকে।

(২) খ্রিষ্টান সমাজ মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী ও হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে।

(৩) ইয়াহুদীরা হযরত উযাইর (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে।

(৪) মক্কার কতক মুশরিক ফেরেশতা এবং মহিলা জিনকে আল্লাহর কন্যা বলে থাকে।

(৫) জাহ্মিয়া সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের গুণ বিশিষ্ট নামসমূহকে অর্থহীন এবং রূপক বলে উক্তি করে। তাদের মতে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন, দেখেন, কথা বলেন, দয়া করেন, জীবিত আছেন– এসব কিছুই অর্থহীন এবং রূপক।

(৬) মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহ পাক মানুষের মতই দেখেন, শোনেন। তিনি এ সমস্ত গুণাবলির ক্ষেত্রে মানুষের মতো।

(৭) মুআত্তাল সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের সমস্ত গুণাবলিকেই অস্বীকার করে।

নাস্তিক, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক, অগ্নিপূজকসহ সকল পথভ্রষ্ট গোমরাহ এবং খেদাদ্রোহী বিধর্মী কর্তৃক আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত এসব গর্হিত উক্তি ও কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে আল্লাহর রসূলকে পবিত্রতা বর্ণনা করার নির্দেশ করা হয়েছে।

সূরা আ'লার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাকের সত্তা এবং তাঁর নামের পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনার নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনায় আসা প্রয়োজন। তা হলো– আসলে আল্লাহ পাকের কোন নাম আছে কি না, থাকলে তার কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে কি না, এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কোন গুণ আছে কি না, থাকলে আল্লাহ পাকের গুণাবলির সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি কী? এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক এবং চূড়ান্ত তত্ত্ব নিরূপণের আবশ্যকতা রয়েছে বিধায় নিম্নে এগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে মত মতান্তর

(ক) আল্লামা ইব্নে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি অনুসারে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কারামতা সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের জাতি এবং ছিফাতী সর্বপ্রকার নামসমূহকেই অস্বীকার করে। তাদের মতে আল্লাহ পাকের প্রতি আরোপিত নামসমূহ রূপক বৈ আর কিছু নয়।

(২) মুফাস্‌সির রাযীর বর্ণনানুসারে জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের মতে খালিক, মুহয়ী, মুমীত, কাদীর, মাজীদ এবং ফায়িল ইত্যাদি নির্দিষ্ট কয়টি ব্যতীত আল্লাহর আর কোন গুণবাচক নাম নেই।

(৩) আবূ আলী জুব্বায়ীর অনুসারী মুতাজিলাদের মতে গুণ ভিত্তিক আল্লাহ পাকের কোন নাম নেই। তবে আল্লাহ পাকের জন্য উপযুক্ত তাঁর শান অনুপাতে শোভনীয় অর্থ এবং তত্ত্বমণ্ডিত শব্দ গ্রহণীয়। যেমন- কাজী আবূ বকর বাকেল্লানীকে এই মতামতের সমর্থনকারী হিসেবে অনেকেই গণ্য করেছেন।

(৪) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতানুসারে আল্লাহ পাকের জাতি (সত্তাবাচক) এবং ছিফাতী (গুণবাচক) নাম রয়েছে। এটাই চূড়ান্ত মতামত। কেননা, পবিত্র আয়াত এবং অসংখ্য হাদীছ দ্বারা এই মতের সঠিকতা প্রমাণিত হয়। উপরন্তু এই মতের উপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং মুসলিম উম্মার ঐকমত্য রয়েছে।

আল্লাহ পাকের নামের সংখ্যা প্রসঙ্গ

আল্লাহ পাকের জাতী এবং ছিফাতী নামের কোন নির্ধারিত সংখ্যা আছে কি না, থাকলে সেই সংখ্যা কত- এ নিয়ে আলোচকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ইবনে হায্‌ম তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল'-য়ে আল্লাহ পাকের ৯৯টি নামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

من زاد شيئا من عدده فقد الحد فى اسمائه .

'যারা ৯৯ এর অধিক নামের সমর্থন করে অথবা সাব্যস্ত করে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুলহিদ।'কেননা, হাদীছে পাকে ৯৯ এর সংখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। অএতব এর অধিক সংখ্যার দাবীদারগণ মূলত রসূলের প্রতি মিথ্যাচারী অপবাদকারী বিধায় কাফের।

কিন্তু নিরপেক্ষ এবং গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্‌নে হাযমের এই উক্তি ভিত্তিহীন। এটা পবিত্র আয়াত এবং হাদীছের তত্ত্ব ও অর্থ নিরূপণে তার অজ্ঞতার প্রতিফল। এ ধরনের উদ্ভট মত পেশ করা তার চিরাচরিত অভ্যাস। তার এরূপ অন্যান্য উদ্ভট মতামতের ন্যায় এই মতটিও সর্বমহলে প্রত্যাখাত রয়েছে। হাফেজ ইব্‌নে হাজার, আল্লামা আইনী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম গায্‌যালী, ইমাম বাগাভী এবং মুহাদ্দিস খাত্‌তাবীসহ অনেকেই ইব্‌নে হাযমের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আসলে ইব্‌নে হাযমের উক্তি খুবই দুঃখজনক এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ। কেননা, এক হাদীছে ৯৯ -এর উল্লেখ রয়েছে বিধায় সেটাই অধিক গ্রহণীয় হবে, সেটা না মানলে মুলহিদ ও কাফের হয়ে যেতে হবে, এ ব্যাপারে অন্য কোন হাদীছ বা আয়াতের বর্ণনা আর দেখা হবে না- এমন হলে এক হাদীছে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মুনাফেকের আলামত তিনটি।' অথচ অপর এক হাদীছে মুনাফেকের চারটি আলামতের কথা বলা হয়েছে। এক হাদীছে জাহান্নামীদেরকে ৭১টি সাপে দংশন করবে বলে ইরশাদ রয়েছে, আবার আর এক হাদীছে ৯৯টি সাপে দংশন করবে বলে ইরশাদ রয়েছে। এমতাবস্থায় একটি হাদীছে বর্ণিত মতকে সঠিক বলে মেনে নিলে অপরটির বর্ণনা না মানার কারণে ইবনে হাযম কথিত রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বলে কাফের বিবেচিত হতে হবে? অথচ এক্ষেত্রে ইবনে হাযম এ কথাই বলে থাকেন যে, হাদীছে বর্ণিত নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং অধিক

www.maktabatulabrar.com

সংখ্যা বুঝানোই আসল উদ্দেশ্য। হাদীছ বিশারদগণ এ ব্যাপারে মূলধারা নিরূপণ করেছেন। এই মূলধারা অনুসরণ না করায় ইব্‌নে হাযম ভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

অনুরূপ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন বাকেল্লানী এবং শেখ মুহাম্মাদ ইব্‌নে হাসান ফোরাক। তাদের মতে আল্লাহ পাকের মাত্র একটি নাম রয়েছে, এর অধিক কোন নাম নেই। এই মতটি কুরআন হাদীছ এবং মুসলিম উম্মাহর বিরোধী মত বিধায় সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাজ্য।

ইমাম রাযী তার প্রসিদ্ধ তাফসীরে (তাফসীরে কাবীরে) আল্লাহ পাকের পাঁচ হাজার নাম আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মতামত হলো, আল্লাহ পাকের অসংখ্য নাম রয়েছে। কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই বরং আয়াত এবং হাদীছে আরো অধিক সংখ্যার ইঙ্গিত রয়েছে। যথা: হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে। মুফাস্‌সির ইব্‌নে কাছীর হযরত ইব্‌নে আব্বাস, ইমাম শা'বী, মুফাস্‌সির সুদ্দী থেকেও এরূপ উদ্ধৃত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন।

এখানে এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সহ অনেকের হাদীছে আল্লাহর ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে, এর লক্ষ্যবস্তু কী? এ সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। যথা:

(১) ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীছে ৯৯টি নামের কথা বলা হয়েছে, এর অধিক নাম নেই- এ অর্থ করা একান্ত ভুল। ইমাম বায়হাকী থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

(২) আল্লামা খাত্‌তাবী বলেন,

ليس فيه نفى ما عداها من الزيادة عليها وانما التخصيص بالذكر لهذه الاسماء لانها اشهر الاسامى وابينها معانى وظهورها .

অর্থাৎ, এ হাদীছে অধিক নামের অস্বীকৃতি নেই। যেহেতু ৯৯টি নাম প্রসিদ্ধ এবং সেগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট এই জন্য বিশেষভাবে সেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন যদি বলা হয় খালেদের নিকট একশত টাকা অথবা একশত কাপড় আছে দান করার জন্য। এতে এর অধিক নেই বোঝা যায় না। হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.), হযরত ইবনে কাইয়্যেম (রহ.) এবং ইমাম বাগাভী (রহ.) থেকেও এরূপ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) শেখ আবূ মানছুর ও আবদুল ক্বাহের ইব্‌নে তাহের তামীমী বলেন, আবূ হুরাইরা (রা.)-এর হাদীছের কারণে ৯৯-এর অধিক নাম নেই বলা সঠিক নয়। কেননা, অন্যান্য হাদীছের দ্বারা আরও অধিক নামের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ৯৯ এর বিশেষত্ব এই যে,

ان معانى جميع اسمائه محضورة فى معانى هذه التسعة والتسعين .

সমস্ত নামের অর্থ এই ৯৯-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা, জুমহুরের মতানুসারে আল্লাহ পাকের আরো নাম রয়েছে, কেবল ৯৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সূরা আ'লা-র তাফসীর সম্পর্কিত এ পর্যন্ত পেশকৃত তথ্যসমূহের সিংহভাগ নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত-

১. বোখারী শরীফ- ১২৫/১১॥ ২. লাওয়ামিউল বাইয়্যেনা রাযী- ৪/৩॥ ৩. ইবনে কাছীর- ৩৬/১॥ ৪. আলফাজাল ইমাম হুমাম- ৩২/৫॥ ৫. ফাতহুল বারী- ২২১/১১॥ ৬. রিসালায়ে তাদমিরিয়্যা- ৬৩॥ ৭. ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যা- ২০৯/৬ ॥ ৮. আল ফারকু বাইনাল ফিরাক, বাগদাদী- ২১২॥ ৯. শরহুল আসমা, রাযী- ২৯॥ ১০. তারীখুল জাহামিয়া॥ ১১. আল মুনিয়্যাহ- ১০৭॥ ১২. আলাল শাহরাছনী- ৮৭/১॥ ১৩. তারীখে বাগদাদ- ২৭/৬ ॥ ১৪. শাজারাতুয্ যাহাব- ১৯০/২ ॥ ১৫. শুআবুল ঈমান বায়হাকী- ১৫/১ ॥ ১৬. ইতেকাদ- ২৩॥ ১৭. মানাকিবুশ শাফী- ৪০৩/১ ॥ ১৮. শরহুস সুন্নাহ বাগাভী- ২৯/৫ ॥ ১৯. শরহুত্ তাহাবিয়াহ- ৬৯ ॥ ২০.তাফসীরে কাবীর- ৩৭৭/৮ ॥ ২১. মাজহারী ॥ ২২. কুরতুবী ॥ ২৩. দুররুল মানছুর ॥ ২৪. রূহুল মাআনী ॥ ২৫. আল মাওয়াকিফ- ২৭০ ॥ ২৬. আসমা ওয়াছ ছিফাত- ৪১২ ॥ ২৭. আল গাফফার যাহাবী- ১৬৮ ॥ ২৮. মুশকিলুল হাদীছ ফোরাক- ১৪৬ ॥ ২৯. গায়াতুল মারাম আমিদী- ১৪১ ॥ ৩০. মুতাশাবাহুল কুরআন- ৩৫১/৭৩/১ ॥ ৩১. ইত্কান- ৬/২ ॥ ৩২. মানাহিলুল ইরফান- ১৮২/২ ॥ ৪৩. তুহফাতুল মুরীদ- ৫৭ ॥ ৪৪. খারীদাতুল বাহিয়্যাহ- ৭৫ ॥ ৪৫. আকীদাতুল ইসলামিয়্যাহ- ৩৮ ॥ ৪৬. আল হামোভিয়্যাতুল কুবরা- ৪০৭/১ ॥ ৪৭. ইকলীল- ২২/২ ॥ ৪৮. ছাওয়ায়িক- ১৫/১ ॥ ৪৯. গায়াতুল আমানী- ৪৬০/১ ॥ ৫০. নকজু তাসীসিল জাহমিয়্যাহ- ৫২০ ॥

ربك শব্দের ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে 'রব' (প্রতিপালক) শব্দটির উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ প্রতিপালক। মানুষের তিনটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই প্রতিটি স্তরের প্রতিপালক। প্রথম স্তর হল জননীর গর্ভে আসার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্তর। এই স্তরে আকাশ, পাতাল, আগুন, পানি এবং চন্দ্র ও সূর্যের আলো প্রভৃতি থেকে পুষ্টি এবং ভিটামিন সংগৃহীত হয়ে মানব দেহে প্রবিষ্ঠ হয়। দ্বিতীয় স্তর হল- এই পুষ্টি ও ভিটামীন শুক্র ও ডিম্বাণু হয়ে জননীর গর্ভাশয়ে আসে। অতঃপর কয়েক ধাপ অতিক্রম করত এক সময় শিশু আকারে ভূমিষ্ট হয়। তৃতীয় স্তর হল- এই শিশু ক্রমাগত উন্নতি সাধন করে যৌবনকালে উপনীত হয়, যৌবনকাল পাড়ি দিয়ে বৃদ্ধকালে পদার্পন করে। এই তিন স্তরে আল্লাহ পাক তার সার্বিক চাহিদা পূরণ করেন, তার উপযুক্ত লালন-পালন করেন, তার অন্ন বস্ত্রসহসহ সর্বপ্রকার জীবনোপকরণের ব্যবস্থাপনা করেন। যার তত্ত্বাবধানে এই সব আঞ্জাম পায় 'রব' শব্দটি তারই অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ কারণেই এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়। 'রব' গুণবাচক আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশের মধ্যে এসব রহস্যের প্রতি মনোনিবেশ করার ইঙ্গিত রয়েছে। এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করলে মানুষের সম্মুখে প্রকৃত স্রষ্টা এবং তার সত্তার পরিচয় লাভের পথ সুগম হয়, তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের রাস্তা হয় প্রশস্ত।

الاعلى শব্দের ব্যাখ্যা

আয়াতে সর্বশেষ الاعلى শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। অভিধানগতভাবে এর অর্থ 'উপর/উর্ধ্ব' হতে পারে। এই অর্থের সুবাদে মুজাস্সিমাহ এবং কাররামিয়া সম্প্রদায় আল্লাহ পাক উপরে অবস্থান করে আছেন বলে আক্বীদা পোষণ করে। এটা মূলত স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেয়া এবং স্রষ্টার উপর সৃষ্টির গুণ আরোপ করার নামান্তর। মুজাস্সিমাহ এবং কাররামিয়া সম্প্রদায় এরূপই করে থাকে। তাদের মতে মানুষের ন্যায় আল্লাহ পাকেরও হাড্ডি ও গোশত সম্বলিত দেহ রয়েছে। কাররামিয়া অনুসারী মুকাতিল ইবনে সুলাইমানও এরূপ আক্বীদা পোষণ করেছে। ইয়াহুদীদের মধ্যেও এরূপ

www.maktabatulabrar.com

আক্বীদা পেষণকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। আর খ্রিষ্টানদের মতে আল্লাহ পাক যিশুতে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এভাবেও স্রষ্টার উপর সৃষ্টির গুণ আরোপিত হয়ে গেল। হাল যুগের বাহায়ী এবং কাদীয়ানী সম্প্রদায়ও অনুরূপ আক্বীদা পোষণ করে থাকে।

আসলে আল্লাহ পাক কোথায় অবস্থিত- এ নিয়ে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, যার অনেকটা বিভ্রান্তিকরও। তাই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহ পাক কোথায় অবস্থিত?

জাহ্মিয়া সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহ পাক ডান-বাম এবং নীচ-উপর এই দিকসমূহ হতে উপর দিকে অবস্থান করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতে আল্লাহ পাক প্রকৃতভাবেই আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন। তার সুযোগ্য উত্তরসূরি ইবনুল কাইয়্যেম 'জুয়ূশ্ল ইজতিমাইয়্যাহ' কিতাবে বলেছেন, ইবনে তাইমিয়া ও জাহমিয়াদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। কেননা, জাহমিয়াদের মতে আল্লাহ পাক দিক বিশিষ্ট। তাই তিনি উপর দিকে অবস্থান করেন। আর ইবনে তাইমিয়ার মতে আল্লাহ পাক আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, তবে এর প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত রয়েছে। তার দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ পাক দেহ এবং দিক বিশিষ্ট নন।

উল্লিখিত মতসমূহ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধী এবং অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তিকর মতসমূহের সমর্থনে পবিত্র কুরআন এবং হাদীছ থেকেও প্রমাণাদি পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয় যে, আয়াত এবং হাদীছের তাফসীর ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনুসৃত উছূল তথা মূলধারা নিরূপণে ব্যর্থতা অথবা তা উপেক্ষারই অনিবার্য ফল হল এই বিভ্রান্তি। যার বিশদ বিবরণ আক্বীদার কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। মুফাস্সির রাযীসহ নির্ভরযোগ্য সকল মুফাস্সির এরূপ বিভ্রান্তিকর আক্বীদার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং যথার্থই করেছেন। এরূপ আক্বীদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণ সমূহ নিম্নরূপ-

(ক) উল্লিখিত মত মেনে নিলে প্রশ্ন দেখা দিবে যে, আল্লাহ পাক উপরে কোন নির্ধারিত সীমায় বিদ্যমান কি না। যদি নির্ধারিত সীমায় গণ্ডিবদ্ধ স্থানে বিদ্যমান থাকেন, তাহলে তার উপরেও স্থান অবশিষ্ট থাকবে। তাহলে আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুর উপরে হবেন কী করে? আর যদি গণ্ডিবদ্ধস্থানে না হন বরং উপরের সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত থাকেন, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাবে যে, উপরের সাথে সাথে নীচেও বিদ্যমান কি না। যদি নীচেও বিদ্যমান থাকেন, তাহলে উপরেই বিদ্যমান কথাটি সঠিক হলো কী করে? আর যদি নীচে বিদ্যমান না হন, তা হলে তিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান কথাটি সঠিক হল কী করে?

(খ) এমনিভাবে আল্লাহ উর্ধ্বে বিদ্যমান মেনে নিলে সেই উর্ধ্বে বলতে কী বোঝায়? আসমানে না আরশের উপরে? যদি আসমানে বিদ্যমান হন, তাহলে আসমান সাতটি, এমতাবস্থায় তিনি কোন আসমানে বিদ্যমান? যদি প্রত্যেক আসমানে বিদ্যমান বলা হয়, তাহলে আল্লাহকে অংশবিশিষ্ট স্বীকার করতে হবে, যা সঠিক নয়। আর যদি আল্লাহ পাককে অংশ বিশিষ্ট মানা থেকে বাঁচতে হয়, তাহলে মানতে হবে তিনি আরশের নীচে। এর কোনটিই সঠিক নয়।

(গ) আসমানের উপর হোক বা আরশের উপর হোক, এসব কিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং তার

অধীনস্থ। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাককে তাঁর স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট মানতে হবে এটাও সঠিক নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, الاعلى শব্দের উপর/উর্দ্ধ অর্থ সঠিক নয়।

একশ্রেণির মুলহিদ الاعلى শব্দের অর্থ 'বড়' এবং 'বৃহৎ' করে শিরকী আক্বীদা পোষণ করে থাকে। তাদের মতে এই পৃথিবীর লালন-পালনকর্তা মূলত দুজন। একজন 'বড়' আর একজন 'অতি বড়'। পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে বর্ণিত 'আজীম' শব্দের দ্বারা বড়জনকে আর الاعلى শব্দের দ্বারা অতিবড় জনকে বুঝানো হয়েছে। নামাযে রুকূর মধ্যে বড়জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, আর সাজদায় অতি বড়জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করতে বলা হয়েছে।

এই অর্থ মতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ আর থাকে না। অথচ আল্লাহ পাক লা-শারীক, তার কোন অংশীদার নেই। পবিত্র কুরআন এবং অসংখ্য হাদীছ দ্বারা তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যা অকাট্যভাবেই প্রমাণিত তা-ই বাস্তবও বটে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে الاعلى শব্দের উল্লিখিত দুটি অর্থের কোনটিই সঠিক নয়। বরং শব্দটির সঠিক অর্থ নিম্নরূপ:

(ক) الاعلى শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত এবং তার একচ্ছত্রতা বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর অসীম কুদরতের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং একাই লালন-পালন করেন, এতে তার কোন শরীক নেই এবং শরীকের প্রয়োজনও নেই।

(খ) এই শব্দের দ্বারা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব এবং বড়ত্বকে বুঝানো হয়েছে। তিনি এতো মহান যা মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা, ব্যক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে যথাযথ প্রশংসা করে শেষ করা কোনটিই সম্ভব নয়।

(গ) তিনি মহান এবং নিখুঁত, তাঁর কোন দোষ-ত্রুটি নেই।

বস্তুত আগত আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করলে উপরেল্লিখিত অর্থসমূহের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। আর হয় বলেই মুফাস্সিরগণ এই অর্থসমূহকেই আয়াতের সঠিক অর্থ বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীছে পাকেও এর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

আর যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা আল্লাহ পাক আরশে উপবিষ্ট আছেন বুঝায় অথবা এমন সব অর্থ বুঝা যা সৃষ্টির গুণাবলির সদৃশ মনে হয়, ঐ সমস্ত আয়াত এবং হাদীছ মানুষের বুঝের জন্য রূপক অর্থে মেনে নিতে হবে অথবা সেগুলো মুশাব্বাহাতের অন্তর্ভুক্ত। মুশাব্বাহাত বলা হয় যা মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে।

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى (যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।)

আল্লাহ পাক তার সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রেই ভারসাম্য, আনুপাতিকতা এবং সঠিক সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা কায়েম করেছেন, যার কোন বিকল্প নেই। এই ভারসাম্য, আনুপাতিকতা, কলাকৌশল, সৃষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি একদিকে যেমন তার অসীম কুদরতের পরিচায়ক, অপরদিকে তার অস্তিত্ব এবং একচ্ছত্রতার অপূর্ব নিদর্শন।

www.maktabatulabrar.com

خلق শব্দের ব্যাখ্যা

২নং আয়াতে আল্লাহ পাক 'স্রষ্টা' এই গুণটি সংযোজন করা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই হতে পারে।

(ক) আরাবী 'খালাক্ব' শব্দটি মূলত পদার্থ সৃষ্টিকে বুঝায়। আর সৃষ্ট একাধিক পদার্থ একত্রিত করে কোন কিছু তৈরি করাকে আবিষ্কার বলা হয়। সৃষ্টি এবং আবিষ্কার এক নয়। যারা আবিষ্কারকে সৃষ্টি এবং আবিষ্কারককে স্রষ্টা মনে করে, তাদের মূর্খতার প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

(খ) এক নং আয়াতে الاعلى শব্দটি আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ২নং আয়াতে সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম রাযীর মতে শেষোক্ত তত্ত্বটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

(গ) আয়াতে উল্লেখিত 'খালাকার' অর্থ করে আল্লামা মুজাজ বলেন,

خلق الانسان تعدل قامته ولم يجعله منكوسا كالبهائم .

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক মানুষকে সোজা করে সৃষ্টি করেছেন, পশুর মত বক্র করেননি।

মুফাস্সির জাহ্হাক বলেন, خلق ادم فسوى خلقه অর্থাৎ, আল্লাহ পাক হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং সঠিক সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। অনেকের মতে জননীর রেহেমে সৃষ্টি করার প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ হিসেবে আয়াতে মানব সৃষ্টির বিষয়টি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত। তবে কেবল মানব সৃষ্টিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এমন কোন আভাস আয়াতে নেই। উপরন্তু এ অর্থ 'খালাকার' ব্যাপক অর্থকে ক্ষুণ্ন করে।

(ঘ) মুফাস্সির কাল্বী 'খালাকা'-র অর্থ করে বলেন,

خلق كل ذى روح فسوى بين يديه وعينه ورجله .

আল্লাহ পাক সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য যথাযথভাবে হাত, পা, চক্ষু সংযোজন করেছেন।

এই অর্থ হিসেবে কেবল মানুষ নয়, বরং সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি 'খালাকা'-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। বয়ানুল কুরআনেও অনুরূপ অর্থ করা হয়েছে। আলোচ্য সূরার ৪নং আয়াতে উদ্ভিদ সৃষ্টির কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করাও এই অর্থের সমর্থন যোগায়।

(ঙ) কিন্তু এই অর্থ অনুপাতে প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদজগত খালাকার অর্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও জামাদাত তথা জড়জগত যেমন পাথর, মাটি ও লৌহজাত দ্রব্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে বলা যায় যে, এখানে সৃষ্টিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাণীজগত এবং প্রাণহীন জগত। প্রাণহীন জগতের মধ্যে জামাদাত (জড়জগত) এবং নাবাতাত (উদ্ভিদজগত) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। সর্বোত্তম হলো 'খালাকা'-র ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা, যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে প্রশ্ন দেখা দিবে যে, এখানে সমস্ত সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত থাকলে পরে ৪নং আয়াতে উদ্ভিদ সৃষ্টির কথা ভিন্নভাবে বলা হল কেন? এর উত্তর এই

দেয়া যায় যে, উদ্ভিদ জাতীয় সৃষ্টির পুনঃ উল্লেখ হয়েছে ذكر التخصيص بعد التعميم নীতির আওতায়। পবিত্র কুরআনে এবং হাদীছে এর অসংখ্য নজীর রয়েছে। ভাষাগতভাবেও এরূপ প্রচলন সর্বজন স্বীকৃত।

যাহোক আয়াত থেকে বোঝা গেল, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। এমন কোন কিছু নেই যার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নন, অন্য কেউ। এ পরম্পরায় আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা কি না– এ নিয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের একটু ভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা কি না

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহ পাক মানুষের স্রষ্টা বটে, কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা নন, কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে স্বীয় ক্ষমতাবলে নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। এখানে আল্লাহ পাকের কোন দখল নেই। তাদের বক্তব্য হল, মানুষ ভাল-মন্দ উভয় ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকে। এখন যদি বলা হয়, মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টাও আল্লাহ পাক, তা হলে আল্লাহ পাককে মন্দ কর্মকাণ্ডের স্রষ্টাও বলতে হয়। যা মোটেই সঠিক নয়। তা ছাড়া যদি ভাল মন্দ সব কর্মকাণ্ডের স্রষ্টাও আল্লাহ পাকই হন, কোন কর্মকাণ্ডে মানুষের কোন দখল না থাকে, তা হলে মানুষ অপারগ সাব্যস্ত হয়। আর অপারগ মানুষ 'মুকাল্লাফ' তথা স্বেচ্ছায় শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনের জন্য আদিষ্ট হতে পারে না। তদুপরি অপারগ হেতু তার গোনাহের ব্যাপারে সে দায়ী হয় না, ফলে গোনাহের কারণে তাকে শাস্তি দেয়াও বিধান সম্মত হতে পারে না। এমতাবস্থায় রসূলের আগমন, আসমানী কিতাব অবতীর্ণকরণ ইত্যাদি সবকিছুই অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকেই বোঝা যায়, মানুষ তার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী; মানুষ স্ব-ইচ্ছায় সব কর্মকাণ্ড করে থাকে। আল্লাহ পাক মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা নন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আল্লাহ পাক সব কিছুর স্রষ্টা, এমনকি মানুষের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডেরও তিনিই স্রষ্টা। তিনি ইরশাদ করেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

আল্লাহ পাক সব কিছুর স্রষ্টা। (সূরা আল-মু'মিন: ৬২)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সাফ্‌ফাত: ৯৬)

উভয় আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আল্লাহ পাক ভাল-মন্দ উভয় ধরনের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা। সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে,

ان الله خلق كل صانع وصنعته.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সমস্ত আবিষ্কারক এবং আবিষ্কৃত বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

এ সমস্ত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত সঠিক বলে সাব্যস্ত হয়। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি সমাধা করা যায়। কেননা, মানুষের তুলনায় মানুষের কর্মকাণ্ডের সংখ্যা অধিক। এখন যদি মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা মানুষ হয়, তা হলে আল্লাহর সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সৃষ্টি অধিক হবে, যা কোনক্রমেই সমীচীন মেনে নেয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহকে সবকাজের স্রষ্টা মেনে নিলে আল্লাহকে মন্দ কাজের স্রষ্টা মেনে নিতে হয়? এতে কোন অসুবিধে নেই। বস্তুত মন্দ জিনিস সৃষ্টি করা মন্দ নয়, বরং মন্দকে মন্দ ও খারাপ কাজে ব্যবহার করাই মন্দ। মন্দ জিনিসের মধ্যেও ভাল ও উপকারিতার দিক রয়েছে, সেই ভাল ও উপকারিতার কাজে সেটাকে ব্যবহার না করে সেটাকে মন্দ ও অপকারের কাজে ব্যবহার করাই হল মন্দ। আর মন্দকে স্বেচ্ছায় সম্পাদন করার মধ্যে মানুষের ইচ্ছার দখল থাকে, তাই সেজন্য তার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। মন্দকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের নেই, তবে মন্দ কর্মকাণ্ডে সেটাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। যাতে স্বেচ্ছায় মানুষ মন্দ কাজে লিপ্ত না হয় এজন্যেই রসূলের আগমন এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

আলোচ্য ২নং আয়াতে 'খালাকা' দ্বারাও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত সঠিক বলে সাব্যস্ত হয়। আল্লামা যামাখশারী তাফসীরে কাশশাফে এই আয়াতে 'খালাকা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও এ অর্থ তার নিজ মাযহাবের বিরোধী। ফাতহুল বারী, আইনী, শরহে মাওয়াকিফ, শরহুত তাহাভিয়া ইত্যাদি কিতাবে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾	(১৪) নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্র হয়েছে।
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾	(১৫) আর স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে।
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾	(১৬) বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।
وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾	(১৭) অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।
اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾	(১৮) এটা (শুধু কুরআনের দাবী নয় বরং) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও রয়েছে।
صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾	(১৯) অর্থাৎ, ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

শব্দার্থ

قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে, مَنْ সে ব্যক্তি যে, تَزَكّٰى পবিত্র হয়েছে, اِسْمَ رَبِّهٖ স্বীয় রবের নাম, ذَكَرَ স্মরণ করে, فَصَلّٰى এবং নামায আদায় করে, بَلْ বরং, تُؤْثِرُوْنَ তোমরা প্রাধান্য দাও, اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

পার্থিব জীবনকে, وَالْاٰخِرَةُ অথচ আখেরাত, خَيْرٌ বহুগুণে উত্তম, وَاَبْقٰى ও স্থায়ী, اِنَّ هٰذَا এটা (শুধু কুরআনের দাবী নয় বরং), الصُّحُفِ সহীফাসমূহে, الْاُوْلٰى পূর্ববর্তী।

তাফসীর

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى **(নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্র হয়েছে।)**

অর্থাৎ, যে, ব্যক্তি বাতিল আকীদা বিশ্বাস ও অসচ্চরিত্র থেকে নিজেকে পবিত্র করেছে এবং যাহেরী বাতেনী যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে আপনাকে মুক্ত রেখেছে, নিশ্চিতভাবে সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى **(আর স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে।)**

এ আয়াতে ফরয-নফল সব রকমের নামায অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এ আয়াতে আত্মশুদ্ধির তরীকা বাতানো হয়েছে। তা হলো– আল্লাহর অধিক যিকির ও নামায। কোন কোন তাফসীরকারক এখানে কথার মধ্যে উল্লিখিত যিকির দ্বারা তাকবীরে তাহরীমার সময় আল্লাহু আকবার বলা উদ্দেশ্য বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যিকির দ্বারা ঈদের তাকবীরসমূহ বুঝানো হয়েছে। আর নামায দ্বারা ঈদের নামায বুঝানো হয়েছে এবং পূর্বের আয়াত দ্বারা সদকায়ে ফিতর উদ্দেশ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى **(বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।)**

অর্থাৎ, এ কল্যাণ তোমাদের কীভাবে অর্জন হবে? তোমাদের তো আখেরাতের কোন চিন্তাই নেই; বরং তোমরা পার্থিব জীবনের আরাম আয়েশকেই বিশ্বাসগত ও কার্যত উভয় দিক থেকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ আখেরাতের জীবন সবদিক থেকে উত্তম ও চিরস্থায়ী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

অতএব বিশ্বাসগত ও কার্যত উভয় দিক থেকে পার্থিব জীবনের উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং আখেরাতমুখী জীবনযাপন অবলম্বন করা উচিত।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى **(এটা পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও রয়েছে।)**

অর্থাৎ, هٰذَا থেকে নিয়ে এ সূরার শেষ অবধি বর্ণিত বিষয়গুলো শুধু কুরআনে কারীমে নয়, বরং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও উল্লেখ ছিল। যে বিষয়গুলো কখনও রহিত হয়নি। এতে এর গুরুত্ব সহজে অনুমেয়। সহীহ আকীদা, আত্মার পরিশুদ্ধি, আল্লাহর যিকির এবং নামাযের বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও ছিল। এতে বোঝা যায়, এগুলো হল দ্বীনের উদ্দিষ্ট বিষয়। অথবা অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এই সূরার শেষে বর্ণিত বিষয়বস্তু (পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী কিতাব ও সহীফাসমূহেও ছিল।

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى **(অর্থাৎ, ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।)**

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত ছাড়াও সহীফা নাযেল হয়েছিল। কিংবা আয়াতের মূসার সহীফা বলে তাওরাতকেই বুঝানো হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর দশখানা সহীফা নাযেল হয়। (রূহুল মাআনী)

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহীফায় কী ছিল তা প্রশ্ন করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮৮) সূরা গাশিয়া, মক্কী
২৬ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ①	(১) তোমার নিকট কি সে মহা আচ্ছন্নকারী ঘটনার (কেয়ামতের) কোন সংবাদ পৌঁছেছে?
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②	(২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে লাঞ্ছিত।
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③	(৩) মুসিবত ক্লিষ্ট, (মুসিবত ভোগের দরুণ) ক্লান্ত হবে।
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④	(৪) তারা অতিশয় উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে।
تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤	(৫) তাদেরকে ফুটন্ত প্রস্রবন থেকে পানি পান করানো হবে।
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥	(৬) এক কাঁটাযুক্ত ঝাড় ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ⑦	(৭) যা না পুষ্ট করবে, আর না ক্ষুধা নিবারণ করবে।

শব্দার্থ

هَلْ اَتٰىكَ তোমার নিকট কি পৌঁছেছে? حَدِيْثُ কোন সংবাদ, الْغَاشِيَةِ সে সর্বগ্রাসী ঘটনার (কেয়ামতের), وُجُوْهٌ অনেক মুখমণ্ডল, يَوْمَئِذٍ সেদিন, خَاشِعَةٌ লাঞ্ছিত, عَامِلَةٌ মুসীবত ক্লিষ্ট, نَاصِبَةٌ (মুসীবত ভোগের দরুণ) কাতর হবে, تَصْلٰى তারা প্রবেশ করবে نَارًا আগুনে, حَامِيَةً জ্বলন্ত, تُسْقٰى তাদেরকে পানি পান করানো হবে, مِنْ عَيْنٍ ফুটন্ত প্রস্রবন থেকে, لَيْسَ لَهُمْ তাদের ভাগ্যে জুটবে না, طَعَامٌ কোন খাদ্য, اِلَّا ব্যতীত, ضَرِيْعٍ কাঁটাযুক্ত ঝাড়, لَا يُسْمِنُ না পুষ্ট করবে, مِنْ جُوْعٍ না ক্ষুধা নিবারণ করবে।

তাফসীর

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ **(তোমার নিকট কি সে সর্বগ্রাসী ঘটনার [কেয়ামতের] কোন সংবাদ পৌছেছে?)**

غاشية (গাশিয়া: কেয়ামত) কী?

আয়াতে বর্ণিত শব্দের আভিধানিক অর্থ যা আচ্ছন্ন করে দেয়, যেহেতু কেয়ামত সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে নিবে, এ কারণে এখানে অর্থ কেয়ামত করা হয়।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ **(সেদিন অনেক মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত।)**

কেয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের আলাদা আলাদা দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এখানে কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) কেয়ামতের দিন শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল অর্থাৎ, তারা নিজেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

(২) আখেরাতে তারা মুসীবত ক্লিষ্ট হবে।

(৩) মুসীবত ভোগের কারণে তারা ক্লান্ত ও কাতর হবে।

কোন কোন তাফসীরবিদের মতে প্রথম অবস্থা পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু অবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতে হবে। অর্থাৎ, অনেক কাফের মুশরিক দুনিয়াতে বাতিলপন্থায় ইবাদত ও কঠোর সাধনা করে থাকে, কিন্তু বাতিল তরীকায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য হবে না। ফলে দুনিয়াতেও তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত রইল, পরকালেও তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ **(তাদেরকে ফুটন্ত প্রস্রবন থেকে পানি পান করানো হবে।)**

দোযখের প্রচণ্ড উত্তাপে যখন কাফেররা পিপাসায় ছটফট করবে এবং পানি পানি বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে এ উত্তপ্ত নহর থেকে পানি দেয়া হবে, যা পান করতেই ঠোঁট কাবাবের ন্যায় ভুনা হয়ে যাবে। পেটের নাড়ি ভূড়ি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তড়িৎ আবার ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে চিরকাল তারা আযাব ভোগ করতে থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ **(এক কাটাযুক্ত ঝাড় ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।)**

আয়াতে বর্ণিত একটি কন্টকযুক্ত ঝাড় গুল্ম। যেটা খুবই তিতা, দুর্গন্ধময় ও উত্তপ্ত হয়ে থাকে। ক্ষুধায় যখন দোযখীরা চিৎকার করতে থাকবে, তখন তাদেরকে এটা খেতে দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ **(যা না পুষ্ট করবে, না ক্ষুধা নিবারণ করবে।)**

খাদ্যের উদ্দেশ্য সাধারণত স্বাদ গ্রহণ, পুষ্টি লাভ বা ক্ষুধা নিবারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এ দ্বারা কোনটাই হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন সমুজ্জ্বল হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨
(৯) নিজেদের কৃতকর্মের কারণে সন্তুষ্ট হবে।	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩
(১০) (আর তারা) থাকবে সমুচ্চ জান্নাতে।	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠
(১১) যেখানে কোন অসার কথা শুনবে না।	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١
(১২) সেখানে থাকবে বহমান ঝরনা।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢
(১৩) তথায় আছে উঁচু পালংকসমূহ।	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣
(১৪) এবং প্রস্তুত পান-পাত্রসমূহ।	وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤
(১৫) আর সারি সারি উপাধানসমূহ,	وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥
(১৬) এবং সর্বদিকে বিছানো গালিচাসমূহ।	وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦

শব্দার্থ

وُجُوْهٌ অনেক মুখমণ্ডল, يَوْمَئِذٍ সেদিন, نَاعِمَةٌ সমুজ্জ্বল হবে, لِسَعْيِهَا নিজেদের কৃতকর্মের কারণে, رَاضِيَةٌ সন্তুষ্ট হবে, جَنَّةٍ عَالِيَةٍ সমুচ্চ জান্নাত, لَا تَسْمَعُ শুনবে না, فِيْهَا যেখানে, لَا غِيَةً কোন অসার কথা, فِيْهَا সেখানে থাকবে, عَيْنٌ ঝরনা, جَارِيَةٌ বহমান, فِيْهَا তথায় আছে, سُرُرٌ পালংকসমূহ, مَّرْفُوْعَةٌ উঁচু, اَكْوَابٌ পানপাত্রসমূহ, مَّوْضُوْعَةٌ প্রস্তুত, نَمَارِقُ উপাধানসমূহ, مَصْفُوْفَةٌ সারি সারি, زَرَابِيُّ গালিচাসমূহ, مَبْثُوْثَةٌ বিছানো।

সারমর্ম

৮ নং থেকে ১৬ নং পর্যন্ত উপরিউক্ত আয়াতসমূহে জান্নাতীগণ জান্নাতে যেসব নায-নেয়ামত লাভ করবে তার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তাফসীর

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ **(অনেক মুখমণ্ডল সেদিন সমুজ্জ্বল হবে।)**

অর্থাৎ, নিজেদের চেষ্টা সাধনার সুফল সামনে দেখে তারা আনন্দে আটখানা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً **(যেখানে কোন অসার কথা শুনবে না।)**

গালমন্দ, বা অপমানজনক কোন কথা তো দূরের, কোন নিরর্থক কথাও তারা শুনবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ **(এবং প্রস্তুত পান-পাত্রসমূহ।)**

অর্থাৎ, এসব সামগ্রী তাদের নাগালের সামনেই থাকবে। যাতে যখনই মন চায় পেতে একটুও বিলম্ব না হয় এবং পানপাত্রসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে সংরক্ষিত থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ **(এবং সর্বদিকে বিছানো গালিচাসমূহ।)**

যাতে যখন যেভাবে মন চায় আরাম করে নিতে পারে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ারও কষ্ট করতে না হয়।

(১৭) তবে কি তারা উটের প্রতি লক্ষ করে না, কী (বিচিত্র) রূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
(১৮) আর আসমানের দিকে যে, কীরূপে উচ্চ করা হয়েছে?	وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
(১৯) আর পর্বতমালার দিকে, কীরূপে তা দাঁড় করানো হয়েছে?	وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
(২০) আর যমীনের দিকে, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে?	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
(২১) সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো কেবল উপদেশদাতা মাত্র।	فَذَكِّرْ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
(২২) তুমি তাদের উপর দারোগা নও।	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
(২৩) কিন্তু যে বিমুখ হবে এবং কুফরী করবে।	اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ﴿٢٣﴾
(২৪) তবে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
(২৫) নিশ্চয় আমারই নিকট তাদের আসতে হবে।	اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
(২৬) অতঃপর তাদের কাছ থেকে হিসেব নেয়া আমারই কাজ।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

শব্দার্থ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ তবে কি তারা লক্ষ্য করে না, اِلَى الْاِبِلِ উটের দিকে, كَيْفَ কী (বিচিত্র) রূপে, خُلِقَتْ সৃষ্টি করা হয়েছে? وَاِلَى السَّمَآءِ আর আসমানের দিকে যে, كَيْفَ কিরূপে, رُفِعَتْ উচ্চ করা হয়েছে? اِلَى الْجِبَالِ পর্বতমালার দিকে যে, نُصِبَتْ দাঁড় করানো হয়েছে, وَاِلَى الْاَرْضِ আর যমীনের দিকে, سُطِحَتْ বিছানো হয়েছে, فَذَكِّرْ সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, اِنَّمَا اَنْتَ তুমি তো কেবল, مُذَكِّرٌ উপদেশদাতা,

لَسْتَ তুমি নও, عَلَيْهِمْ তাদের উপর, بِمُصَيْطِرٍ দারোগা, اِلَّا কিন্তু, مَنْ تَوَلّٰى যে বিমুখ হবে, وَكَفَرَ এবং কুফরী করবে, يُعَذِّبُهُ اللّٰهُ আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন, الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি, اِلَيْنَا আমারই নিকট, اِيَابَهُمْ তাদের আসতে হবে, عَلَيْنَا আমারই কাজ, حِسَابَهُمْ তাদের কাছ থেকে হিসেব নেয়া।

যোগসূত্র

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফেরদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এরপর এ আয়াতসমূহে কেয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন আরবরা অধিকাংশ সময় বন বাদাড়ে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে থাকত উট, উপরে আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ট এবং আশেপাশে সারি সারি পর্বতমালা। তাই এ চারটি বস্তু সম্পর্কে তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। এতে তারা আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। ফলে আখেরাতের পুনর্জীবনের প্রতি ঈমান আনা সহজ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

তাফসীর

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ **(সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো কেবল উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের উপর দারোগা নও।)**

অর্থাৎ, এত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখেও যখন তারা চিন্তা-ভাবনা করছে না, তখন তুমিও তাদের ব্যাপারে অতিরিক্ত চিন্তায় পড় না। শুধু উপদেশ দিতে থাক। কারণ, তুমি উপদেশদাতা হিসেবে প্রেরিত হয়েছ, তুমি তো দারোগা নও যে, তাদেরকে জবরদস্তিমূলক মানতে বাধ্য করবে। দিল তো তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা, দিলের নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ।

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, দায়ীর দায়িত্ব হল দাওয়াত ও উপদেশ প্রদান করা। বাকী হেদায়েত একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে।

اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ **(আমারই নিকট তাদের আসতে হবে। অতঃপর তাদের কাছ থেকে হিসেব নেয়া আমারই কাজ।)**

এ দুই আয়াতে বুঝানো হয়েছে– যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম থেকে বিমুখ হল এবং তাঁর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল, সে আখেরাতের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। নিশ্চয় একদিন তাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে এবং আমি তাদের সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিব। তুমি তোমার দায়িত্ব আদায় কর। বাকীটা আমার দায়িত্ব।

www.maktabatulabrar.com

(৮৯) সূরা ফাজর, মক্কী
৩০ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) শপথ ফজরের সময়ের,	وَالْفَجْرِ ①
(২) আর দশ রজনীর,	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ②
(৩) আর জোড় ও বেজোড়ের,	وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③
(৪) আর শপথ রাতের, যখন তা গত হতে থাকে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ④
(৫) নিশ্চয় এতে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট শপথ রয়েছে।	هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ⑤

শব্দার্থ

وَالْفَجْرِ শপথ ফজরের সময়ের, وَالَّيْلِ দশ রজনীর, لَيَالٍ عَشْرٍ জোড় ও বেজোড়ের, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ শপথ রাতের, اِذَا যখন, يَسْرِ সে গত হতে থাকে, هَلْ নিশ্চয়, فِىْ ذٰلِكَ এতে রয়েছে, قَسَمٌ যথেষ্ট শপথ, لِّذِىْ حِجْرٍ জ্ঞানবানদের জন্য ।

তাফসীর

وَ الْفَجْرِ (শপথ ফজরের সময়ের,)

ফজর অর্থাৎ, সুবহে সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহা বিপব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَ لَيَالٍ عَشْرٍ (আর দশ রজনীর,)

এখানে 'দশ রজনী' বলে যিলহজ্জের দশদিন বুঝানো হয়েছে। হাদীছ শরীফে এ দশদিনের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ (আর জোড় ও বেজোড়ের,)

জোড় বলে যিলহজ্জের দশম তারিখ আর বেজোড় বলে নবম তারিখ বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ (নিশ্চয় এতে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট শপথ রয়েছে।)

এ চারটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন। উল্লিখিত কসমগুলো মোটেও সাধারণ নয়, বরং খুবই গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্ববহ। জ্ঞানীরা বুঝতে পারে। এতে কথার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) তোমার কি জানা নেই যে, তোমার প্রতিপালক আদ সম্প্রদায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑥
(৭) অর্থাৎ, ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভের ন্যায় (দীর্ঘ ও সুদৃঢ়) ছিল।	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑦
(৮) (সমগ্র পৃথিবীর) নগরসমূহে যাদের সদৃশ কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি।	الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ⑧
(৯) আর ছামূদের সাথে যারা কুরা উপত্যকায় পাহাড় কাটত (এবং গৃহ নির্মাণ করত)।	وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑨
(১০) আর বহু কীলকের অধিকারী ফিরআউনের সাথে।	وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ⑩

শব্দার্থ

اَلَمْ تَرَ তোমার কি জানা নেই, كَيْفَ কি فَعَلَ ব্যবহার করেছেন, رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক, بِعَادٍ আদ সম্প্রদায়ের সাথে, اِرَمَ অর্থাৎ, ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, ذَاتِ الْعِمَادِ সদৃশ দৈহিক গঠন বিশিষ্ট (দীর্ঘ ও সুদৃঢ়), لَمْ يُخْلَقْ সৃষ্টি হয়নি, مِثْلُهَا যাদের সদৃশ, ثَمُوْدَ ছামূদের সাথে, الَّذِيْنَ যারা, جَابُوا الصَّخْرَ পাহাড় কাটত, بِالْوَادِ (কুরা) উপত্যকায়, ذِى الْاَوْتَادِ বহু কীলকের অধিকারী।

সারমর্ম

এসব আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে তো অবধারিতই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) আদ জাতি, (২) ছামূদ গোত্র, (৩) ফিরআউন সম্প্রদায়।

ইরাম জাতির পরিচয়

এই জাতি আ'দ ও ইরাম উভয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা 'আদ হল 'আছের পুত্র এবং আ'ছ হল ইরামের পুত্র। ইরাম সাম ইব্নে নূহ (আ.)-এর পুত্র। সুতরাং কখনও এ জাতিকে তাদের পিতার

www.maktabatulabrar.com

নামানুসার আ'দ বলা হয়। আবার কখনও তাদের দাদার নামানুসারে ইরাম নামে অভিহিত করা হয় এবং এ ইরামের এক ছেলের নাম হল 'আবের, আর 'আবেরের সন্তানের নাম ছামূদ যার নামানুসারে একটি প্রসিদ্ধ জাতির নাম হল ছামূদ জাতি। এভাবে 'আদ ও ছামূদ' জাতিদ্বয়ের বংশ তালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। সুতরাং ইরাম শব্দটি 'আদ ও ছামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য হয়। আবার এ 'আদ জাতির মাঝে দু'সম্প্রদায় ছিল (১) প্রথম 'আদ যাদেরকে "আদে উলা" বলা হয় (২) দ্বিতীয় 'আদ যাদেরকে 'আদে উখরা' বলা হয়। তাই এখানে 'আদের সাথে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে প্রথম 'আদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তারা দ্বিতীয় 'আদের তুলনায় 'আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে 'আদে ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

তাফসীর

ارَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ **(ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে –যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভের ন্যায় [দীর্ঘ ও সুদৃঢ়] ছিল, নগরসমূহে যাদের সদৃশ কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি।)**

এই দুই আয়াতে 'আদ জাতির দৈহিক গঠন ও শক্তি সাহসের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। তারা দৈহিক গঠন ও শক্তি সাহসের ক্ষেত্রে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনে কারীম তাদের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে, এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কুরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। এ সম্পর্কে যেসব অদ্ভুত কথাবার্তা বলা হয় তা ইসরাঈলী রেওয়ায়াত দৃষ্টেই বলা হয়ে থাকে।

وَ ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ **(আর ছামূদের সাথে, যারা কুরা উপত্যকায় পাহাড় কাটত [এবং গৃহ নির্মাণ করত]।)**

ছামূদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান

ওয়াদিউল কুরা বা কুরা উপত্যকা তাদের শহরগুলোর মধ্যে একটি শহরের নাম। যেখানে তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। এই শহরগুলো হিযাজ ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে (বর্তমান সৌদি আরবের মদীনা থেকে উত্তরে) অবস্থিত। এসব স্থানে ছামূদ সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এখনও ওয়াদিল কুরায় ছামূদ সম্প্রদায়ের পাহাড় কেটে তৈরি করা ঘর বাড়ির নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পর্যটকরা তা পরিদর্শন করে থাকে।

وَ فِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ **(আর বহু কীলকের অধিকারী ফিরাউনের সাথে।)**

اوتاد শব্দটি وتد এর বহুবচন, যার অর্থ কীলক। যেহেতু ফিরআউন যাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করত তার চার হাত পায়ে কীলক মেরে শাস্তি দিত, তাই তাকে কীলকের অধিকারী বলা হয়েছে। ভিন্ন মতে এখানে কীলকের অধিকারী বলে সৈন্য সামন্তের অধিকারী বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তারা সামরিক প্রয়োজনে সাথে অনেক কীলক রাখত, এজন্যেই তাদের কীলকের অধিকারী বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١١﴾	(১১) যারা নগরসমূহে মস্তক উঁচু করে রেখেছিল।
فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾	(১২) এবং সেখানে বিস্তর ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾	(১৩) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।
اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾	(১৪) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ওতপেতে আছেন।
فَأَمَّا الْإِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾	(১৫) সুতরাং মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে (গর্ব করে) বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾	(১৬) আর যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন। অতঃপর তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।

শব্দার্থ

اَلَّذِيْنَ যারা, طَغَوْا মস্তক উচুঁ করে রেখেছিল, فِى الْبِلَادِ নগরসমূহে, اَكْثَرُوْا فِيْهَا সেখানে বিস্তর সৃষ্টি করে রেখেছিল, عَلَيْهِمْ তাদের উপর, سَوْطَ সোঁ, الْفَسَادَ ফাসাদ, فَصَبَّ সুতরাং হানলেন, رَبُّكَ তোমার রব, عَذَابٍ শাস্তির কশাঘাত, اِنَّ নিঃসন্দেহে, رَبَّكَ তোমার প্রতিপালক, لَبِالْمِرْصَادِ ঘাটিতে আছেন (ওৎপেতে আছে), فَاَمَّا الْاِنْسَانُ সুতরাং মানুষকে, اِذَا مَا যখন, اِبْتَلٰه পরীক্ষা করেন, رَبُّه তার প্রতিপালক, فَاَكْرَمَه অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন, وَنَعَّمَه ও সম্পদ দান করেন, فَيَقُوْلُ তখন সে (গর্ব করে) বলে, رَبِّىْٓ আমার প্রতিপালক, اَكْرَمَنِ আমাকে সম্মানিত করেছেন, وَاَمَّا اِذَا مَا আর যখন, اِبْتَلٰهُ (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, فَقَدَرَ عَلَيْهِ অতঃপর তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, اَهَانَنِ আমাকে হীন করেছেন।

সারমর্ম

আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, এসব জাতি অর্থ-সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্যের নেশায় উন্মাদ হয়ে এমন ঔদ্ধত্যপনা দেখিয়েছিল যে, তাদের উপর আর কোন শাসক নেই। অন্যায় ও পাপাচারের শাস্তি তাদের ভোগ করতে হবে না। অবশেষে যখন তাদের কুফর, অহংকার ও অন্যায়-অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে

www.maktabatulabrar.com

গেল, ক্ষমা ও অবকাশ দানের আর কোন সূরত অবশিষ্ট রইল না, তখনই প্রতাপশালী খোদা তাদের উপর আযাবের কশাঘাত হানলেন। ফলে তাদের বলবীর্য, অহমিকা ধূলোয় মিশে গেল এবং তাদের সহায়-সম্বল আর কোন কাজে এল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

তাফসীর

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ **(নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ওঁৎপেতে আছেন।)**

আয়াতে বর্ণিত مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়। এ অর্থে আল্লাহ বান্দার কাজ কর্মের পর্যবেক্ষক। আয়াতের উদ্দেশ্য হল ওঁৎপেতে থাকা। মানুষ যেমন আগমনকারী ও নিষ্ক্রমনকারীর সবকিছু গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও প্রতিটি বান্দার প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম ও গতি বিধির উপর দৃষ্টি রাখেন এবং সে অনুযায়ী সবাইকে শাস্তি ও প্রতিদান দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ (সুতরাং মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে [গর্ব করে] বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন। অতঃপর তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।)

আয়াতসমূহ থেকে শিক্ষণীয়

১৫ নং আয়াতে 'মানুষ' বলে মূলত কাফের মানুষকে বুঝানো হয়েছে। তবে ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত।

১৫ ও ১৬ নং আয়াতদ্বয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ যখন কাউকে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য দান করেন তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়।

(১) সে মনে করতে থাকে এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফল, যা আমার লাভ করাই সংগত। আমি এর যোগ্য পাত্র।

(২) আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি তা না হবে, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। পক্ষান্তরে কেউ অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। মোটকথা, তাদের দৃষ্টি দুনিয়ার জীবন ও বর্তমান অবস্থার উপর সীমাবদ্ধ থাকে এবং একমাত্র দুনিয়ার সুখ দুঃখকেই তারা ইজ্জত ও বেইজ্জতীর মাপকাঠি মনে করে। এ কথা তারা জানে না যে, উভয় অবস্থাই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। নেয়ামত দিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা ও কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে তার ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾	(১৭) কখনও এরূপ নয়। বরং তোমরা এতিমের সম্মান কর না।
وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾	(১৮) এবং অপরদেরকেও মিসকিনদের খাদ্যদানে উৎসাহিত কর না।
وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾	(১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সমস্তই আয়ত্ত করে খেয়ে ফেল (অর্থাৎ, কুক্ষিগত করে নাও)।
وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾	(২০) আর তোমরা ধন সম্পদের অত্যধিক মায়া রাখ।

শব্দার্থ

كَلَّا কখনও এরূপ নয়, بَلْ বরং, لَا تُكْرِمُوْنَ তোমরা সম্মান কর না, الْيَتِيْمَ এতীমের, لَا تَحٰٓضُّوْنَ উৎসাহিত কর না, عَلٰى طَعَامِ খাদ্যদানে, الْمِسْكِيْنِ মিসকীনদেরকে, تَاْكُلُوْنَ আয়ত্ত করে, খেয়ে ফেল, التُّرَاثَ মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি, اَكْلًا لَّمًّا সমস্তই আয়ত্ত, تُحِبُّوْنَ তোমরা মায়া রাখ, الْمَالَ ধন-সম্পদের, حُبًّا جَمًّا অত্যধিক মায়া।

তাফসীর

كَلَّا **(কখনও এরূপ নয়।)**

অর্থাৎ, তোমাদের উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের সমৃদ্ধি সৎ ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার আলামত নয়। তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও হীন হওয়ার দলীল নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরআউনের কোন দিন মাথা ব্যথাও হয়নি। অথচ আল্লাহর প্রিয় নবীগণ কতইনা কষ্ট ভোগ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ الخ **(বরং তোমরা এতীমের সম্মান কর না।)**

এখান থেকে ২০ নং আয়াতসমূহের শেষ পর্যন্ত কাফেরদের বিশেষ চারটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। যথা:

(১) 'তোমরা এতীমদের সম্মান কর না।' এখানে আসল উদ্দেশ্য তোমরা এতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না, তাদের ব্যয়ভার বহন কর না; বরং তাদের প্রতি জুলম কর। সম্মান কর না বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল তাদের পাওনা আদায় করে দিলেই দায়িত্ব পালন হয় না, বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে। নিজেদের সন্তানের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন) বোঝা গেল, এতীমদের হক আদায় করা এবং তাদের প্রতি ইকরাম করা ওয়াজিব।

(২) 'তোমরা মিসকীনদের খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান কর না।' অর্থাৎ, নিজেরা তো গরীব মিসকীনদের খাদ্য দান করই না, উপরন্তু অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব মিসকীনের হক রয়েছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না তাদের উপর হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

(৩) 'তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সমস্তই আয়ত্ত করে খেয়ে ফেল।' অর্থাৎ, মৃতের ওয়ারিছী সম্পত্তি হরণ করার বেলায় তোমরা হালাল-হারাম ও হক-নাহক কোন কিছুরই পরওয়া কর না, যা আয়ত্তে আসলে সবই হজম করে ফেল। নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। এভাবে তোমরা এতীম-মিসকীনদের হক নষ্ট করে থাক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) বোঝা গেল, মৃতের পরিত্যাজ্য সম্পদে প্রত্যেক হকদারের হক যথাযথভাবে আদায় করা ওয়াজিব।

(৪) 'তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া রাখ।' অর্থাৎ, সম্পদের মোহ ও ভালোবাসা তোমাদের অন্তরে কানায় কানায় ভরা। সুতরাং কেবল এটাই কামনা যে, যে কোন ভাবে সম্পদ হস্তগত হোক, এক পয়সাও হাত ফসকে বের না হোক, পরিণাম যা-ই হোক না কেন। এহেন অর্থ পুঁজা একমাত্র কাফেরের চরিত্র হতে পারে।

তবে 'অত্যধিক' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদের ভালোবাসা একপর্যায়ে নিন্দনীয় নয়। বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং এভাবে মজে যাওয়া যে, দ্বীন-শরী-য়তের তোয়াক্কা থাকল না, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব বদ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়ের কথা তথা পরকালের কথা বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আয়াতের এ অংশ থেকে বোঝা গেল, সম্পদের এমন মোহ যা মানুষকে হকদারের হক আদায় করা থেকে বিরত রাখে তা অবশ্যই নিন্দনীয়।

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾	(২১) কখনও এরূপ নয়, যখন জমীন (এ স্থিত পাহাড় পর্বত, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি অন্তরায়) কে ভেঙ্গে ভেঙ্গে (এবং) চূর্ণ বিচূর্ণ (করে জমীন এর বরাবর) করে দেয়া হবে।
وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾	(২২) আর তোমার প্রতিপালক এবং সারিসারি ভাবে ফেরেশতাগণ (হাশরের মাঠে) আগমন করবে।
وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾	(২৩) আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে, আর তখন বুঝ আসার সুযোগ রইল কোথায়? (অর্থাৎ, তখন বুঝে লাভ কি?)
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٤﴾	(২৪) (অতঃপর) সে বলবে, হায়! যদি আমি আমার এ (পরকালের) জীবনের জন্য কোন নেক আমল পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম।

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

كَلَّآ কখনও এরূপ নয়, اِذَا যখন, دُكَّتْ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, دَكًّا دَكًّا ভেঙ্গে ভেঙ্গে, وَجَاءَ আর (হাশরের মাঠে) আগমন করবে, رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক, وَالْمَلَكُ এবং ফেরেশতাগণ, صَفًّا صَفًّا সারিসারিভাবে, جِايْٓءَ আনা হবে, يَوْمَئِذٍ সেদিন, بِجَهَنَّمَ জাহান্নামকে সেদিন, বুঝবে, মানুষ, وَاَنّٰى لَهُ আর সুযোগ রইল কোথায়? الذِّكْرٰى বুঝ আসার, يَقُوْلُ সে বলবে, يٰلَيْتَنِىْ হায়! যদি আমি, قَدَّمْتُ (নেক আমল) পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম, لِحَيَاتِىْ আমার (পরকালের) জীবনের জন্য।

তাফসীর

كَلَّآ (কখনও এরূপ নয়,)

অর্থাৎ, তোমরা যে মনে কর এসব আমলের উপর কোন আযাব হবে না, তা মোটেও ঠিক নয়। বরং অবশ্যই শাস্তি হবে। সামনে শাস্তির সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا (যখন যমিনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।)

□□ শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া। এখানে কেয়ামতের ভূকম্পনকে বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবীর সবকিছুকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (আর তোমার প্রতিপালক এবং সারিসারিভাবে ফেরেশতাগণ আগমন করবে।)

অর্থাৎ, হিসেবের সময় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ কীভাবে আগমন করবেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। (বয়ানুল কুরআন)

وَ جِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে।)

অর্থাৎ, লাখ লাখ ফেরেশতা জাহান্নামকে স্বস্থান থেকে টেনে হাশর ওয়ালাদের সামনে উপস্থিত করবে। এর উদ্দেশ্য কী এবং কীভাবে জাহান্নামকে হাশর ময়দানে উপস্থিত করা হবে তার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى (সেদিন মানুষ বুঝবে, আর তখন বুঝ আসার সুযোগ রইল কোথায়?)

কাফেররা কেয়ামত দিবসে বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তাদের কী করা উচিৎ ছিল, আর তারা কী করেছে? কিন্তু তখন এ বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা, আখেরাত কর্ম জগত নয়, প্রতিদান জগত।

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ (সে বলবে হায়! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্য কোন নেক আমল পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম।)

সেদিন কাফেররা আকাংখা করে বলবে, হায়! যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু তখন এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ হবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾	(২৫) সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিবে না।
وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾	(২৬) এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।
يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾	(২৭) হে নফ্সে মুতমাইন্নাহ (অর্থাৎ প্রশান্ত আত্মা)!
ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾	(২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে চলো এভাবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾	(২৯) অতঃপর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও,
وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾	(৩০) আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।

শব্দার্থ

فَيَوْمَئِذٍ সেদিন, لَّا يُعَذِّبُ শাস্তি দিবে না, اَحَدٌ কেউ, عَذَابَهٗٓ তার (আল্লাহর) শাস্তির ন্যায়, لَّا يُوْثِقُ বন্ধন করতে পারবে না, وَثَاقَهٗٓ তাঁর বন্ধনের মত, اَحَدٌ কেউ, يٰٓاَيَّتُهَا হে, النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ নফ্সে মুতমাইন্নাহ (অর্থাৎ, প্রশান্ত আত্মা), ارْجِعِيْٓ তুমি ফিরে চল, اِلٰى দিকে, رَبِّكِ তোমার প্রতিপালকের, رَاضِيَةً (এভাবে যে, তুমি তার প্রতি) সন্তুষ্ট, مَّرْضِيَّةً (এবং তিনি তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট, فَادْخُلِيْ অতঃপর তুমি শামিল হয়ে যাও, فِيْ عِبٰدِيْ আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে, اُدْخُلِيْ প্রবেশ কর, جَنَّتِيْ আমার বেহেশতে।

তাফসীর

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ **(সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিবে না।)**

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা অপরাধীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দিবেন যা দুনিয়াতে কোন দিন কেউ কাউকে দেয়নি। (বয়ানুল কুরআন)

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ **(হে নফসে মুতমাইন্নাহ [অর্থাৎ প্রশান্ত আত্মা]।)**

'প্রশান্ত আত্মা' বলে সে সমস্ত আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যারা হক ও সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে কণামাত্র সন্দেহ, অস্থিরতা নেই এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির ও আনুগত্য দ্বারা তারা প্রশান্তি লাভ করে। আর আত্মা মানুষের প্রধান অংশ বলে মানুষকে আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً **(তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে চল। এভাবে যে, তুমি তার**

প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।)

অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, হে আল্লাহর যিকিরে শান্ত হৃদয়, তুমি তো পৃথিবীতে মাহবুবে হাকীকির সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক রাখতে। এখন সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে চল। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় মু'মিনকে মৃত্যুর সময়ও এ সুসংবাদ শোনানো হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

প্রশান্ত আত্মা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীক পায় না। (মাআরিফুল কুরআন)

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ. وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ **(অতঃপর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।)**

অর্থাৎ, প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এতে জানা যায়, যারা দুনিয়াতে দ্বীনদার লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে এটা তারই আলামত। (মাআরিফুল কুরআন)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা গেল, দুনিয়াতে সাধনা করে আত্মাকে প্রশান্ত আত্মায় পরিণত করতে পারলে জান্নাত লাভ করা যাবে। আর অন্য আয়াতে আছে যিকির দ্বারা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে থাকে। শেষ আয়াত থেকে বোঝা গেল, আত্মাকে প্রশান্ত আত্মায় পরিণত করতে হলে দুনিয়াতেও আল্লাহর নেক বান্দাদের সংসর্গ গ্রহণ করা উচিৎ।

(৯০) সূরা বালাদ, মক্কী
২০ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾	(১) আমি শপথ করছি এ নগরের।
وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾	(২) এবং তোমার জন্য এ নগরে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।
وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾	(৩) আর শপথ পিতার (আদমের) এবং সন্তান-সন্ততির।
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾	(৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।

শব্দার্থ

www.maktabatulabrar.com

لَآ أُقْسِمُ আমি শপথ করছি, بِهٰذَا এই, الْبَلَدِ নগরের, وَاَنْتَ এবং তোমার জন্য, حِلٌّ বৈধ হবে, بِهٰذَا الْبَلَدِ এ নগরে যুদ্ধ করা, وَوَالِدٍ আর শপথ পিতার (আদমের), وَمَا وَلَدَ এবং সন্তান সন্ততির, لَقَدْ নিশ্চয়, خَلَقْنَا আমি সৃষ্টি করেছি, الْاِنْسَانَ মানুষকে, فِيْ كَبَدٍ অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে।

তাফসীর

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ **(আমি শপথ করছি এ নগরের।)**

এখানে 'এ নগর' বলে মক্কানগরীকে বুঝানো হয়েছে।

وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ **(এবং তোমার জন্য এ নগরে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।)**

এ আয়াতে বর্ণিত حل শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। (১) এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব حل এর অর্থ হল অবস্থানকারী, অধিবাসী। এ মতে আয়াতের মর্ম এই যে, মক্কা নগরী নিজেও পবিত্র ও সম্মানিত। আবার তোমার বসবাসের কারণে এ নগরীর সম্মান দ্বিগুণ হয়েছে। (২) حل শব্দটি حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, তোমার জন্য মক্কার হারামে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তা করা হয়েছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন))

وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ **(আর শপথ পিতার [আদমের] এবং সন্তান-সন্ততির।)**

এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী আদমের শপথ করা হয়েছে। শপথের দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই পরবর্তী বক্তব্যের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব সৃষ্টি করার মানসে সমস্ত বনী আদমের শপথ করে পরবর্তী বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ **(নিশ্চয় আমি মানুষকে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।)**

এ আয়াতে শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। সর্বশেষ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজ কর্মের হিসেব দেয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আয়াত থেকে এই ফায়দা হাসিল হয় যে, মানুষের এ জীবনে কোন না কোন অসুবিধা লেগেই থাকবে। অতঃপর চিরসুখ-জান্নাত অথবা চির দুঃখ-জাহান্নাম। কাজেই বিপদে হতবল না হওয়া চাই। বরং বিপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে ধৈর্যধারণ করা এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকা উচিৎ। দুনিয়াতে যে কোন বিপদ আপদ আসলে মনে করা চাই যে, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। বিশেষত হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে,

الدنيا سجن المؤمن .

অর্থাৎ, দুনিয়া হলো মুমিনদের জন্য কারাগারস্বরূপ। অর্থাৎ, কারাগারে কষ্ট-ক্লেষ থাকা যেমন স্বাভাবিক, দুনিয়াতে মুমিন মুসলমানের কষ্ট-ক্লেষ থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝	(৫) সে কি এমন ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?
يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝	(৬) সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।
اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝	(৭) সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?
اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝	(৮) আমি কি তাকে দুটো চক্ষু প্রদান করিনি?
وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ ۝	(৯) আর জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট?
وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝	(১০) আর আমি তাকে (ভাল-মন্দ) উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

শব্দার্থ

اَيَحْسَبُ সে কি এমন ধারণা করে, اَنْ যে, لَنْ يَقْدِرَ ক্ষমতা চলবে না, عَلَيْهِ তার উপর, اَحَدٌ কারো, يَقُوْلُ সে বলে, اَهْلَكْتُ আমি ব্যয় করেছি, مَالًا ধন-সম্পদ, لُبَدًا প্রচুর, لَمْ يَرَه তাকে দেখেনি, اَحَدٌ কেউ, اَلَمْ نَجْعَلْ আমি কি প্রদান করিনি, لَه তাকে, عَيْنَيْنِ দুটো চক্ষু, لِسَانًا জিহ্বা, شَفَتَيْنِ দুটো ঠোঁট, هَدَيْنٰه আমি তাকে দেখিয়ে দিয়েছি, النَّجْدَيْنِ (ভাল-মন্দ) উভয় পথ।

তাফসীর

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ **(সে কি এমন ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না।)**

অর্থাৎ, কষ্ট-ক্লেশ এবং কোন না কোন বিপদ-আপদ যখন মানুষের জীবনে লেগেই থাকে, তা হলে তো উচিৎ ছিল তার মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হওয়া। নিজেকে আল্লাহর ফয়সালার অধীন মনে করে তাঁর অনুগত হওয়া এবং নিজের দীনতা ও মুখাপেক্ষিতার সার্বক্ষণিক চেতনা হৃদয়ে দৃঢ়মূল থাকা। কিন্তু না, সে তো মারাত্মক ভ্রমে নিপতিত আছে। তবে কি সে মনে করে তার উপর ক্ষমতাবান কোন সত্তা নেই, যিনি তার অবাধ্যচারিতার শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا **(সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।)**

অর্থাৎ, কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গৌরবের মনে করত। আবার মূল পরিমাণকে অতিরঞ্জিত করে অহংকারের সাথে বলত, আমি এত অধিক মাল খরচ করেছি। এরপরও কি কেউ আমার মোকাবেলায় সফল হতে পারে। কিন্তু কিছুদিন পরই সে জানতে পারবে, ব্যয়কৃত এ মাল তার জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ **(সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউ দেখেনি।)**

অর্থাৎ, বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি। তার জানা উচিৎ আল্লাহ সবকিছু দেখেন।

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ **(আমি কি তাকে দুটো চক্ষু প্রদান করিনি?)**

অর্থাৎ, যিনি মানুষকে দেখার জন্য চোখ প্রদান করলেন তিনি কি স্বয়ং দেখবেন না? নিশ্চয় যিনি সকলকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন তিনি হবেন সর্বদ্রষ্টা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ **(আর আমি তাকে [ভাল-মন্দ] উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছি।)**

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৌভাগ্য ও সাফল্য এবং অনিষ্ট ও ধ্বংস উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যাতে সে ধ্বংসের পথ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং কল্যাণের পথে চলতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(১১) অতঃপর সে (ধর্মের) ঘাঁটি অতিক্রম করেনি,	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
(১২) তোমার কি জানা আছে ঘাঁটি (দ্বারা) কী (উদ্দেশ্য)?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
(১৩) তা হলো কারো গর্দানকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করে দেওয়া (দাস মুক্তি)।	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
(১৪) অথবা খাদ্য দেওয়া অনাহারের দিনে,	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
(১৫) কোন আত্মীয় এতীমকে,	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
(১৬) বা ধূলি সম্বল মিসকিনকে (মুখাপেক্ষীকে)।	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

শব্দার্থ

فَلَا اقْتَحَمَ অতঃপর সে অতিক্রম করেনি, الْعَقَبَةَ (ধর্মের) ঘাঁটি, مَآ اَدْرٰىكَ তোমার কি জানা আছে, مَا الْعَقَبَةُ ঘাঁটি (দ্বারা) কি (উদ্দেশ্য)? فَكُّ (দাসত্ব হতে) মুক্ত করে দেওয়া, رَقَبَةٍ গর্দানকে (দাস/দাসীকে), اَوْ অথবা, اِطْعٰمٌ খাদ্য দেওয়া, فِيْ يَوْمٍ দিনে, ذِيْ مَسْغَبَةٍ অনাহারের, ذَا مَقْرَبَةٍ কোন আত্মীয়, يَّتِيْمًا এতীমকে, ذَا مَتْرَبَةٍ ধূলো সম্বল, مِسْكِيْنًا মিসকীনকে (মুখাপেক্ষীকে)।

তাফসীর

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ **(অতঃপর সে [ধর্মের] ঘাঁটি অতিক্রম করেনি,)**

এ আয়াতে বর্ণিত শব্দের অর্থ দুপাহাড়ের মধ্যবর্তী দূর্গম গিরিপথ। পাহাড়ী ঘাঁটি। এখানে ঘাঁটি বলে দ্বীন ও শরীয়াতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পাহাড়ী পথ অতিক্রম করা যেমন কষ্ট সাধ্য, তেমনি নফসের বিরুদ্ধে দ্বীনের উপর চলাও কষ্টকর। আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ প্রদত্ত এত অধিক নায-নেয়ামত ও হেদায়াতের যাবতীয় উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে মানুষ দ্বীন অবলম্বন করতে পারেনি, সে যদি নফসের একটু বিরুদ্ধাচরণ করে শরীয়তের উপর চলতে পারত, তবে সে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াতে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা ও সাধনা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন-মাসায়েলুস সুলূক)

فَكُّ رَقَبَةٍ الخ **(দাস/দাসী মুক্ত করে দেওয়া। ...)**

১৩-১৬ নং আয়াতসমূহে ঘাঁটি তথা শরীয়াতের কতিপয় বিশেষ বিধানের কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা:

(১) দাস মুক্ত করা। এটা বিরাট ছওয়াবের কাজ এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর।

(২) অনাহারের দিনে অন্নদান। যে কোন দিনে যে কাউকে অন্নদান ছওয়াবের কাজ। কিন্তু বিশেষ সময়, কোন কোন বিশেষ শ্রেণির লোককে খাদ্য দান করলে তা আরো বিরাট ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, অনাহারের দিনে অন্নদান অধিক ছওয়াবের কারণ হয় এবং বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতীমকে অন্নদান করা হয় তবে তাতে দ্বিগুণ ছওয়াব হয়। (এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার ছওয়াব। (দুই) আত্মীয়ের হক আদায় করার ছওয়াব। এমনিভাবে ধূলো সম্বল নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক ছওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত অধিক অভাবী হবে তাকে অন্নদাতার ছওয়াবও বৃদ্ধি পাবে।

(১৭) সর্বোপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের, যারা ঈমান আনে এবং যারা একে অন্যকে (ঈমানের উপর) ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) সদয় হওয়ার উপদেশ দেয়।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
(১৮) তারাই ডানপাশের সহচর (অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী)।	اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
(১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল, তারাই বামপাশের সহচর (অর্থাৎ হতভাগা)।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾
(২০) তাদের উপর আগুন পরিবেষ্টিত হবে, যা অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

ثُمَّ সর্বোপরি, كَانَ مِنَ অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের, الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান আনে, تَوَاصَوْا একে অন্যকে উপদেশ দেয়, بِالصَّبْرِ (ঈমানের উপর) ধৈর্যধারণের, بِالْمَرْحَمَةِ পরস্পরকে (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) সদয় হওয়ার, اُولٰٓئِكَ এরাই, اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ডানপাশের সহচর (অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী), وَ الَّذِيْنَ আর যারা, كَفَرُوْا অস্বীকার করল, بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহকে, اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ বামপাশের সহচর (অর্থাৎ হতভাগা), عَلَيْهِمْ তাদের উপর, نَارٌ আগুন, مُّؤْصَدَةٌ পরিবেষ্টিত হবে যা অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে।

তাফসীর

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (সর্বোপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের, যারা ঈমান আনে এবং যারা একে অন্যকে [ঈমানের উপর] ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে [আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি] সদয় হওয়ার উপদেশ দেয়।)

আয়াতে বা ঘাঁটির ব্যাখ্যায় তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) ঈমান আনা। ঈমান আনা হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, সকল আমল সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল শর্ত হল ঈমান।

(২) তারা নিজেরাও যাবতীয় নেক কাজের উপর অটল থাকে, মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং অন্যকেও এর প্রতি উপদেশ দেয়।

(৩) তারা অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে থাকে। ফলে অন্যকে কষ্ট দেয়া ও অন্যের প্রতি জুলুম করা থেকে নিজেরাও বেঁচে থাকে অপরকেও তার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াত দ্বারা বিশেষ যে বিষয়টি বোঝা গেল, তা হলো– নিজে সুপথে অটল থাকা এবং অন্যকে এর প্রতি উৎসাহিত করা মু'মিনের বিশেষ গুণ।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ (তারাই ডান পাশের সহচর (অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী)।)

অর্থাৎ, তারাই ভাগ্যবান মুবারক মানুষ। যারা আরশের ডান পাশে স্থান পাবেন এবং ডানহাতে আমলনামা লাভ করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ (আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল, তারাই বামপাশের সহচর [অর্থাৎ হতভাগা]।)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররাই প্রকৃত হতভাগা। তাদেরকে আরশের বাম পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বামহাতে আমলনামা পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ (তাদের উপর আগুন পরিবেষ্টিত হবে, যা অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে।)

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর তা থেকে তাদের বের হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। কেননা, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৯১) সূরা শামস, মক্কী
১৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١	(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।
وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢	(২) আর চাঁদের, যখন সে সূর্যের পশ্চাতে আসে।
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣	(৩) আর দিবসের, যখন সে সূর্যকে পূর্ণরূপে আলোকিত করে।
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤	(৪) আর রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥	(৫) আর আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর।
وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦	(৬) আর জমীনের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর।
وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧	(৭) আর (মানুষের) আত্মার এবং যিনি তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন তাঁর।

শব্দার্থ

وَ الشَّمْسِ শপথ সূর্যের, وَ الْقَمَرِ আর চাঁদের, اِذَا যখন, تَلٰهَا সে তার (সূর্যের) পশ্চাতে আসে, وَ النَّهَارِ আর দিবসের, اِذَا যখন, جَلّٰهَا সে তাকে (সূর্যকে) পূর্ণরূপে আলোকিত করে, وَ الَّيْلِ আর রাতের, اِذَا যখন, يَغْشٰهَا সে তাকে (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে, وَ السَّمَآءِ আর আসমানের, وَ مَا بَنٰهَا এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর, وَ الْاَرْضِ আর যমীনের, وَ مَا طَحٰهَا এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর, وَ نَفْسٍ আর (মানুষের) আত্মার, وَّ مَا سَوّٰهَا এবং যিনি তাকে যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেছেন তাঁর।

আয়াতসমূহের সারমর্ম

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বুঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে।

(১) প্রথম শপথ والشمس وضحها এখানে ضحى শব্দটি شمس এর বিশেষণ। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার আলো ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে বলে। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টি গোচর হয় এবং তীব্র প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

(২) দ্বিতীয় শপথ চাঁদের, যখন চাঁদ সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চাঁদ প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

(৩) তৃতীয় শপথ দিনের, যখন দিনের বেলায় সূর্য পূর্ণ আলো ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) চতুর্থ শপথ রাতের, যখন রাত সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয় এবং রাতের আঁধার খুব ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি দিনের আলোর সামান্য আভাও অবশিষ্ট না থাকে।

(৫) পঞ্চম শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর।

(৬) ষষ্ঠ শপথ যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর। আল্লাহ তাআলা যমীনকে এমনভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, যাতে অনায়াসে সকল মাখলূক সেখানে বসবাস করতে পারে।

(৭) সপ্তম শপথ মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন তাঁর। অর্থাৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতিসহ সবকিছুকে সুবিন্যস্ত করে তৈরি করেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অতঃপর তাকে (আত্মাকে) তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾
(৯) নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে (আত্মাকে) পবিত্র করে দিয়েছে।	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾
(১০) আর সে বিফলকাম হয়েছে, যে তাকে (আত্মাকে পাপ পংকিলতায়) প্রোথিত করে দিয়েছে।	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

শব্দার্থ

فَاَلْهَمَهَا অতঃপর তাকে (আত্মাকে) জ্ঞান দান করেছেন, فُجُوْرَهَا তার অসৎকর্মের, وَ تَقْوٰىهَا ও সৎকর্মের, قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে, مَنْ সে, زَكّٰىهَا যে তাকে (আত্মাকে) পবিত্র করে দিয়েছে, وَ قَدْ خَابَ আর বিফলকাম হয়েছে, مَنْ সে, دَسّٰىهَا যে তাকে (আত্মাকে পাপ পংকিলতায়) প্রোথিত করে দিয়েছে।

তাফসীর

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا **(অতঃপর তাকে [আত্মাকে] তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।)**

এ আয়াতটি সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের নফ্‌স সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে নফ্‌সের মাঝে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য

www.maktabatulabrar.com

হলো আল্লাহ তা'আলা মানব সত্তায় গোনাহ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন। কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি। বরং তাকে বিশেষ একটি ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় ভাল-মন্দ যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারে। ফলে সে তার এ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে ছওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا **(নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, যে আত্মাকে পবিত্র করে দিয়েছে।)**

আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার অর্থ হল যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিকে সুস্থ আকলের অনুগত করে দেয়া। আর আকলকে শরীয়তের বাধ্যগত করা, যাতে আত্মা ও হৃদয় উভয়ই আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর আলোকে আলোকোদ্ভাসিত হয়। এককথায় আত্মাকে পাপের পথ থেকে বিরত রেখে তাকওয়া ও নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছার অধীন করে দেয়াই আত্মাকে সংশোধন করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا **(আর সে বিফলকাম হয়েছে, যে তাকে (আত্মাকে পাপ পংকিলতায়) প্রোথিত করে দিয়েছে।)**

আত্মাকে প্রোথিত করা ও কলুষাচ্ছন্ন করার অর্থ হল আত্মার লাগাম খাহেশাত তথা কুপ্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেয়া। আকল-বুদ্ধি ও শরীয়তের কোন পরওয়াই না করা। ঠিক যেন খাহেশাতের বান্দা হয়ে যাওয়া। এমন মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৯ ও ১০ নং দুটি আয়াত থেকে বিশেষ ফায়দা এই বোঝা গেল যে, তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি হল যাবতীয় সফলতার চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত করল, সে ব্যক্তি ব্যর্থকাম, হতভাগা। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১১) ছামূদ জাতি নিজেদের অবাধ্যতা বশত (হযরত সালেহ আ. এর প্রতি) মিথ্যারোপ করেছে,	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا ﴿١١﴾
(১২) যখন সে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি (উষ্ট্রীকে বধ করার জন্য) দাঁড়াল (তৎপর হয়ে উঠল),	اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾
(১৩) তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলল, আল্লাহর উষ্ট্রী এবং তার পানি পান করার (পালা) থেকে সাবধান থাকবে।	فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾
(১৪) কিন্তু তারা রসূলকে অবিশ্বাস করল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে পা কেটে হত্যা করল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের দরুণ তাদের উপর ধ্বংসলীলা নাযেল করলেন এবং তা সর্বব্যাপী করে দিলেন।	فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾
(১৫) আর আল্লাহ এ ধ্বংসের কোন মন্দ পরিণামের আশঙ্কা করেন না।	وَلَا يَخَافُ عُقْبٰىهَا ﴿١٥﴾

শব্দার্থ

كَذَّبَتْ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে, ثَمُوْدُ ছামূদ জাতি, بِطَغْوٰىهَا নিজেদের অবাধ্য বশত, اِذِ যখন, انْۢبَعَثَ (উষ্ট্রীকে বধ করার জন্য) দাঁড়াল (তৎপর হয়ে উঠল), اَشْقٰىهَا সে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি। এ হতভাগা ব্যক্তির নাম ছিল কুদার ইবনে সালিফ। তার সাথে সে সম্প্রদায়ের অন্য আরও লোকও শরীক ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন) نَاقَةَ اللّٰهِ আল্লাহর উষ্ট্রী, وَ سُقْيٰهَا এবং তার পানি পান করার (পালা), فَكَذَّبُوْهُ সুতরাং তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল, فَعَقَرُوْهَا অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল, فَدَمْدَمَ ধ্বংসলীলা নাযেল করলেন, عَلَيْهِمْ তাদের উপর, رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক, بِذَنْۢبِهِمْ তাদের পাপের দরুণ, فَسَوّٰىهَا এবং তা সর্বব্যাপী করে দিলেন, وَ لَا يَخَافُ আর তিনি (আল্লাহ) কোন খারাবীর আশংকা করেন না, عُقْبٰهَا এ ধ্বংসের পরিণামে।

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতে খাহেশাতে নফসানীর অনুসরণ করলে ব্যর্থকাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সকল মানুষ খাহেশাতের অনুসরণ করে ব্যর্থকাম হয়েছে তাদের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো ছামূদ জাতির। সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

তাফসীর

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقْيٰهَا **(তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলল, আল্লাহর উষ্ট্রী এবং তার পানি পান করার [পালা] থেকে সাবধান থাকবে।)**

হযরত সালেহ (আ.) যখন তার সম্প্রদায়ের লোকদের উষ্ট্রীকে হত্যার সংকল্পের কথা জানতে পারেন, তখন উষ্ট্রী হত্যা করা এবং তার পানি বন্ধ করার ব্যাপারে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। আয়াতে সেই সতর্কবাণীর বর্ণনা এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

আয়াতে উষ্ট্রীকে 'আল্লাহর উষ্ট্রী' বলা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ উষ্ট্রীকে নবীর নবুয়তের দলীল হিসাবে পেশ করেছেন, তাই এটাকে আল্লাহর উষ্ট্রী বলা হয়েছে এবং এর সম্মান করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا **(সুতরাং তারা রসূলকে অবিশ্বাস করল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল।)** তখন তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের দরুণ তাদের উপর ধ্বংসলীলা নাযেল করলেন এবং তা সর্বব্যাপী করে দিলেন। আর আল্লাহ এ ধ্বংসের পরিণামে কোন খারাবীর আশংকা করেন না।

হযরত সালেহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে না অন্যথায় কঠিন আযাবে নিপতিত হবে। কিন্তু তারা নবীর কথাকে মিথ্যা মনে করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। পরিণামে তা-ই হল যা হযরত সালেহ (আ.) বলেছিলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আযাবকে সর্বব্যাপী করে দিলেন। কারণ, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ এ ধ্বংসের পরিণামে কোন খারাবীর আশংকা করেন না। একথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন রাজাধিরাজ বা প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে তাদের অবশিষ্ট লোক অথবা সমর্থকদের থেকে প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও বিদ্রোহের আশংকা করে থাকে। এখানে যারা অন্যকে হত্যা করে, অপরকে আক্রমণ করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ হতে পারে না। কারো পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশংকা নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আয়াতসমূহ থেকে বিশেষ একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল- নবীর প্রতি অবিশ্বাস ধ্বংস, বিপর্যয় ও আখেরাতের ভয়াবহ আযাবের কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৯২) সূরা লাইল, মক্কী
২১ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ①	(১) শপথ রজনীর, যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে।
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ②	(২) আর দিবসের, যখন তা আলোকিত হয়।
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ③	(৩) আর তাঁর, যিনি নরনারীকে সৃষ্টি করেছেন।
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④	(৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑤	(৫) সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায়) দান করেছে এবং ভয় করেছে,
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑥	(৬) আর ভাল কথাকে (ইসলাম ধর্মকে) সত্য বলে বিশ্বাস করেছে,
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑦	(৭) তবে আমি তাকে আরামের জিনিসের জন্য (নেক আমল ও জান্নাতের জন্য) উপকরণ দিয়ে দিব।

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿۸﴾	(৮) আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া থেকেছে,
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۹﴾	(৯) আর ভাল কথাকে (সত্য ধর্ম ইসলামকে) অবিশ্বাস করেছে।
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ؕ﴿۱۰﴾	(১০) তবে আমি তাকে কষ্টের বস্তু (বদ আমল ও দোযখ) এর জন্য উপায়-উপকরণ দান করব।
وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ؕ﴿۱۱﴾	(১১) আর তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে (দোযখে) অধঃপতিত হবে।

শব্দার্থ

وَاللَّيْلِ শপথ রাতের, اِذَا যখন, يَغْشٰى সে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে, وَالنَّهَارِ আর শপথ দিবসের, تَجَلّٰى সে আলোকিত হয়ে পড়ে, خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন, الذَّكَرَ নর ও নারীকে, اِنَّ নিশ্চয়, سَعْيَكُمْ তোমাদের প্রচেষ্টা, لَشَتّٰى বিভিন্ন ধরনের, فَاَمَّا সুতরাং, مَنْ যে ব্যক্তি, اَعْطٰى (আল্লাহর রাস্তায়) দান করেছে, وَ اتَّقٰى এবং ভয় করেছে, وَ صَدَّقَ আর সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, بِالْحُسْنٰى ভাল কথাকে (ইসলাম ধর্মকে), فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তাকে উপকরণ দিয়ে দিব, لِلْيُسْرٰى আরামের জিনিসের জন্য (নেক আমল ও জান্নাতের জন্য)। وَ اَمَّا مَنْۢ আর যে ব্যক্তি, بَخِلَ কার্পণ্য করেছে, وَ اسْتَغْنٰى এবং বে-পরোয়া থেকেছে, وَ كَذَّبَ আর অবিশ্বাস করেছে, بِالْحُسْنٰى ভাল কথাকে (সত্য ধর্ম ইসলামকে), فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তাকে উপায় উপকরণ দান করব, لِلْعُسْرٰى কষ্টের বস্তু (বদ আমল ও দোযখ)- এর জন্য, وَ مَا يُغْنِىْ আর তার কোন কাজে আসবে না, مَالُهٗ তার ধন-সম্পদ, যখন, تَرَدّٰى সে (দোযখে) অধঃপতিত হবে।

তাফসীর

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى (নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।)

অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যাবসায় করে থাকে। কিন্তু কিছু লোক তার অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। আবার কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারা অনন্ত আযাব ক্রয় করে নেয়। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হল নিজের আমলের পরিণতি চিন্তা করা। (মাআরিফুল কুরআন)

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى. وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (সুতরাং যে ব্যক্তি [আল্লাহর রাস্তায়] দান করেছে এবং ভয় করেছে আর ভাল কথাকে [ইসলাম ধর্মকে] সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। আমি তাকে আরামের জিনিসের জন্য (নেক আমল ও জান্নাতের জন্য) উপকরণ দিয়ে দিব।)

www.maktabatulabrar.com

এখানে ৫ ও ৬ নং আয়াতদ্বয়ে কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে যে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তার প্রথম শ্রেণির লোকদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে।

(২) আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে।

(৩) দ্বীন ইসলামকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

এর পরবর্তী ৭ নং আয়াতে এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নেক আমল ও জান্নাতের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সহজ করে দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল ও মাআরিফুল কুরআন)

এই উপায়-উপকরণ দান করার অর্থ অনায়াসে তার থেকে ভাল কাজ সংঘটিত হওয়া। আপ্সে আপ্ ভাল কাজের সামান প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

আয়াতে উল্লেখ করা শব্দের অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়। এখানে নেক আমল ও তার মাধ্যমে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى الخ (আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া থেকেছে আর ভাল কথাকে [সত্য ধর্ম ইসলামকে] অবিশ্বাস করেছে, আমি তাকে কষ্টের বস্তু [বদ আমল ও দোযখ] এর জন্য উপায়-উপকরণ দান করব।)

এখানে ৮ ও ৯ নং আয়াতদ্বয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের তিনটি কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) যে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করে তথা যাকাত এবং ওয়াজিব সদকাও আদায় করে না।

(২) আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বেপরওয়া ভাব দেখায়।

(৩) সত্যধর্ম ইসলামকে মিথ্যা মনে করে। (বয়ানুল ও মাআরিফুল কুরআন)

এর পরবর্তী ১০ ও ১১ নং আয়াতদ্বয়ে এই শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কষ্টের বস্তু [বদ আমল ও দোযখ] এর জন্য উপায়-উপকরণ দান করবেন। তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসবে না, যখন তারা দোযখে পতিত হবে। দোযখে পতিত হলেই বুঝে আসবে যে, ধন-সম্পদ প্রকৃত কোন কাজের নয়।

এই উপায়-উপকরণ দান করার অর্থ অনায়াসে তার থেকে মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়া। আপ্সে আপ্ মন্দ কাজের সামান প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– যে ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা ও শ্রমকে উপর্যুক্ত তিন বদ আমলে নিয়োজিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের পথ সহজ করে দেন। (বয়ানুল কুরআন)

১০ নং আয়াতে عسر শব্দের অর্থ কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে এ দ্বারা বদ আমল ও জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে।

(১২) আমার দায়িত্ব তো পথ প্রদর্শন করা।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
(১৩) আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল ও ইহকাল।	وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
(১৪) অতএব আমি তোমাদেরকে এক প্রজ্বলিত আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছি।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾
(১৫) সেখানে কেবল সে নিতান্ত হতভাগা প্রবেশ করবে,	لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
(১৬) যে (সত্য ধর্ম ইসলামকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾

শব্দার্থ

اِنَّ বাস্তবিকই, عَلَيْنَا আমার দায়িত্ব, لَلْهُدٰى পথ প্রদর্শন করা, وَ اِنَّ لَنَا আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে, لَلْاٰخِرَةَ পরকাল, الْاُوْلٰى এবং ইহকাল, فَاَنْذَرْتُكُمْ অতএব আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছি, نَارًا تَلَظّٰى এক প্রজ্বলিত আগুনের, لَا يَصْلٰىهَآ সেখানে প্রবেশ করবে না, الْاَشْقَى নিতান্ত হতভাগা, اِلَّا ব্যতীত, الَّذِىْ যে, كَذَّبَ (সত্য ধর্ম ইসলামকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, وَ تَوَلّٰى এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তাফসীর

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى **(আমার দায়িত্ব তো পথ প্রদর্শন করা।)**

আয়াতের উদ্দেশ্য হল কাউকে ভাল বা মন্দ কাজের উপর বাধ্য করা আল্লাহ তা'আলার হেকমতের পরিপন্থি। তবে তিনি স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর নিদর্শনস্বরূপ পথ প্রদর্শনকে নিজের কর্তব্য করে নিয়েছেন এবং তা তিনি প্রত্যেক মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভাল-মন্দ সবকিছু তিনি খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করবে, দুনিয়া-আখেরাতে তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى **(আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল এবং ইহকাল।)**

অর্থাৎ, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে আল্লাহরই রাজত্ব। তাই তিনি দুনিয়াতে পথ চলার জন্য কিছু বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আখেরাতে এর অনুসারী ও বিরুদ্ধাচারীকে প্রতিদান ও শাস্তি দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى **(অতএব আমি তোমাদেরকে এক প্রজ্বলিত আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছি।)**

সম্ভবত এখানে 'প্রজ্বলিত আগুন' দ্বারা জাহান্নামের সে স্তরকে বুঝানো হয়েছে যেটা মারাত্মক ধরনের অপরাধী ও চরম হতভাগাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى. الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى **(সেখানে কেবল সে নিতান্ত হতভাগা প্রবেশ করবে, যে [সত্য ধর্ম ইসলামকে] মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং [তা থেকে] মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।)**

অর্থাৎ, এই জাহান্নামে চিরকালের জন্য নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলা বাহুল্য, এরূপ মিথ্যারোপকারী কাফেরই হতে পারে। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(১৭) আর অবশ্যই সেখান থেকে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে, যে পরম মুত্তাকী।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
(১৮) যে স্বীয় ধন-সম্পদ এ উদ্দেশ্যে দান করে যেন সে পবিত্র হয়।	الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾
(১৯) আর তার উপর কারো অনুগ্রহ ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হয়।	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾
(২০) নিজের মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
(২১) সে তো অচিরেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

শব্দার্থ

وَ سَيُجَنَّبُهَا আর সেখান থেকে দূরে রাখা হবে, الْاَتْقَى যে পরম মুত্তাকী, الَّذِىْ যে, يُؤْتِىْ দান করে, مَالَهٗ স্বীয় ধন-সম্পদ, يَتَزَكّٰى যেন সে পবিত্র হয়, وَ مَا لِاَحَدٍ আর কারো ছিল না, عِنْدَهٗ তার উপর, مِنْ نِّعْمَةٍ কোন অনুগ্রহ, تُجْزٰى যে, তার প্রতিদান দিতে হয়, اِلَّا ব্যতীত, ابْتِغَآءَ অন্বেষণ, وَجْهِ রَبِّهِ সন্তুষ্টি, الْاَعْلٰى নিজের মহান প্রতিপালকের, وَ لَسَوْفَ সে তো অচিরেই, يَرْضٰى সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

তাফসীর

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى **(আর সেখান থেকে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে, যে পরম মুত্তাকী। যে স্বীয় ধন-সম্পদ এ উদ্দেশে দান করে যেন সে পবিত্র হয়।)**

এতে খোদাভীরু সৌভাগ্যশালীদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যারা পরম মুত্তাকী এবং আত্মশুদ্ধি ও একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা নফসকে কৃপণতা, লোভ-লালসা এবং গোনাহ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্য রাখে, রিয়া তথা নাম যশ বা পার্থিব অন্য কোন স্বার্থ চিন্তা রাখে না, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে।)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, সম্পদ ব্যয় করতে হবে, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তথা নফসের লোভ-লালসার প্রবৃত্তি দমন করার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে।

www.maktabatulabrar.com

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى (নিজের মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।)

অর্থাৎ, এ ব্যয়ের দ্বারা কারো অনুগ্রহের প্রতিদান উদ্দেশ্য নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানই উদ্দেশ্য। এতে ইখলাস ও নিষ্ঠার চরম পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, কারো অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়াও একটি বাঞ্ছিত দান। যদিও তা ফযীলতের দিক থেকে প্রারম্ভিক দানের সমতুল্য নয়। সুতরাং যখন এ ব্যক্তির দান এর থেকেও মুক্ত, তখন রিয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি গোনাহের সংমিশ্রণ থেকে তো অবশ্যই মুক্ত হবে। আর এটা হল পরিপূর্ণ ইখলাস।

وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى (সে তো অচিরেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব কোন উপকার চায়নি, আল্লাহ তাআলা তাকে পরকালে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত দান করবেন। এ আয়াতে ইখলাসের সাথে সম্পদ ব্যয়ের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, এরূপ ব্যয়ের প্রতিদানে জান্নাতের নেয়ামত লাভ হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এ আয়াতসমূহের বক্তব্য যদিও ব্যাপক এবং এতে এ ধরনের চরিত্রের অধিকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু অনেক বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরার ১৭নং আয়াত থেকে নিয়ে সর্বশেষ ২১নং পর্যন্ত আয়াতগুলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর শানে নাযেল হয়েছে। মুসতাদরাক হাকিম-গ্রন্থে হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোন মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দি দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কুহাফা বললেন, তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্ত করেই দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলামদেরকে মুক্ত করা উচিৎ। যাতে সে ভবিষ্যতে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উত্তরে বললেন, কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করে থাকি। (মাযহারী) যে সব গোলামকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করতে হতো। বরং তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

আয়াতসমূহের বিশেষ ফায়দা

সুতরাং الاتقى الخ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উচ্চ ফযীলত এবং তাঁর জান্নাতী হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কতই না সৌভাগ্যশালী সে বান্দা, যাঁর اتقى 'পরম মুত্তাকী' হওয়া স্বয়ং কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে। আর কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, ان اكرمكم عند الله اتقكم 'পরম মুত্তাকীই আল্লাহর নিকট পরম মর্যাদাবান।' এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যাকে ولسوف يرضى (সে তো অচিরেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে) বলে সুসংবাদ শুনিয়েছেন। (রাযিআল্লাহু আনহু।) [ফাওয়ায়েদে উছমানী]

www.maktabatulabrar.com

(৯৩) সূরা দুহা, মক্কী
১১ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالضُّحٰى ①	(১) শপথ পূর্বাহ্নের।
وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ②	(২) আর রজনীর, যখন তা নিঝুম (গভীর) হয়।
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③	(৩) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাক্ত করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ④	(৪) আর অবশ্যই তোমার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণ শ্রেয়।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑤	(৫) আর অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (আখেরাতে অনন্ত নায-নেয়ামত) দান করবেন, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

শব্দার্থ

وَ الضُّحٰى শপথ পূর্বাহ্নের, وَ الَّيْلِ আর রজনীর, اِذَا যখন, سَجٰى তা নিঝুম (গভীর) হয়, مَا وَدَّعَكَ তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি, رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক, مَا قَلٰى বিরূপ হননি, وَ لَلْاٰخِرَةُ وَ আর অবশ্যই পরকাল, خَيْرٌ বহুগুণ শ্রেয়, لَّكَ তোমার জন্য, مِنَ الْاُوْلٰى ইহকাল অপেক্ষা, وَ لَسَوْفَ আর অচিরেই, يُعْطِيْكَ তোমাকে দান করবেন, رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক, فَتَرْضٰى ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

শানে নুযূল

একদা অসুস্থতার দরুণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'তিন রাত ইবাদতের জন্য উঠতে পারেননি। তখন এক খবীছ মহিলা বলেছিল, মনে হয় তোমাকে তোমার শয়তান পরিত্যাগ করেছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালিয়েছিল। আবার ঘটনাক্রমে কিছুদিন ওহী আসাও বন্ধ ছিল। এতে অন্যান্য মুশরিকরাও বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মাদকে তাঁর আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। মোটকথা, এসব কটূক্তির জবাবে সূরা যুহা অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

সারমর্ম

এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা দিনের প্রথম ভাগ এবং গভীর রজনীর শপথ করত কাফেরদের সকল ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিহার করেননি এবং তোমার প্রতি দুশমনিও করেননি। বরং যেভাবে তিনি (আল্লাহ তাআলা) প্রকাশ্যে তার হেকমত ও কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং দিনের পর রাত রাতের পর দিন আবর্তিত করেন, বাতেনী বিষয়েও ঠিক এ অবস্থা মনে কর। যদি সূর্যের আলোর পর রাতের আঁধারি আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রমাণ না হয়, আর না এর কোন প্রমাণ আছে যে, আঁধারির পর আর কখনও আলো আসবে না, তবে সামান্য কয়দিন ওহী বন্ধ থাকার দরুণ এটা কীভাবে মনে করা যায় যে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবীর প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং সব সময়ের জন্য ওহীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পরিহার করা তো দূরের কথা, বরং তাকে উভয় জাহানের নিরবিচ্ছিন্ন নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

তাফসীর

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى **(তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগও করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।)**

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন মুশরিকদের এসব উক্তি দ্বারা তুমি পেরেশান হবে না। তোমাকে পরিহার করা তো দূরের কথা বরং তুমি উভয় জাহানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা ভূষিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى **(আর অবশ্যই তোমার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণ শ্রেয়।)**

এখানে শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ ইহকাল ও পরকাল নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে মুশরিকরা তোমার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে এর অসারতা তো তারা ইহকালেই দেখে নিবে। অধিকন্তু আমি তোমাকে পরকালে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে তোমাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ামত দান করা হবে। আবার এখানে اولى واخره এর শাব্দিক অর্থও নেয়া যেতে পারে। অতএব اخرة অর্থ পরবর্তী অবস্থা যেমন اولى অর্থ প্রথম অবস্থা। সেমতে আয়াতের অর্থ হলো, তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে।

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى **(আর অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে [আখেরাতে অনন্ত নায-নেয়ামত] দান করবেন, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে।)**

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা তোমাকে আখেরাতে এত নায-নেয়ামত ও সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এতে কি দিবেন তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রত্যেক কাম্য বস্তুই প্রচুর পরিমাণে দিবেন। (বয়ানুল ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬) তিনি কি তোমাকে এতিমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦
(৭) আর তিনি তোমাকে (পথ ও শরীয়ত সম্পর্কে) অনবহিত পেয়েছেন। তাই তোমাকে পথের দিশা দিয়েছেন।	وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧
(৮) আর তোমাকে সম্বলহীন পেয়েছেন, তাই তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন।	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨

শব্দার্থ

اَلَمْ يَجِدْكَ তিনি কি তোমাকে পাননি? يَتِيْمًا এতীম রূপে, فَاٰوٰى অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, وَ وَجَدَكَ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেয়েছেন, ضَآلًّا অনবহিত, فَهَدٰى তাই তোমাকে পথের দিশা দিয়েছেন, وَ وَجَدَكَ আর তোমাকে পেয়েছেন, عَآئِلًا সম্বলহীন, فَاَغْنٰى তাই তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন।

যোগসূত্র

উপরে কাফেরদের বলাবলির জবাবে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইহকাল ও পরকালের খোদায়ী নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তিনটি বিশেষ নেয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তাফসীর

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى (তিনি কি তোমাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।)

এটা প্রথম নেয়ামত। অর্থাৎ আমি তোমাকে পিতৃহীন পেয়েছি। তোমার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও রেখে যাননি, যদ্বারা তোমার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ, প্রথমে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের, অতঃপর পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে তোমার প্রতি অগাধ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে তোমার লালন-পালন করেছেন। অতঃপর মদীনায় সর্বোত্তম আশ্রয় দান করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى (আর আল্লাহ তোমাকে [পথ ও শরীয়ত সম্পর্কে] অনবহিত পেয়েছেন, (তাই তোমাকে পথের দিশা দিয়েছেন।)

এখানে দ্বিতীয় নেয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে) অর্থাৎ নবুয়ত লাভের পূর্বে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদায়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা

নবুয়ত দান করে তাঁকে শরীয়তের পথ নির্দেশ করেছেন। আর ওহীর পূর্বে শরীয়তের জ্ঞান না থাকার মাঝে কোন ত্রুটি নেই। (বয়ানুল কুরআন)

وَ وَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى (আর তোমাকে সম্বলহীন পেয়েছেন। সুতরাং তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন।)

এ আয়াতে তৃতীয় নেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সহায়-সম্বলহীন পেয়েছেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ধন-সম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.)-কে বিয়ে করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩	(৯) অতএব তুমি এতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না।
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠	(১০) আর সওয়ালকারীকে ধমক দিবে না।
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١	(১১) আর স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও দানসমূহের আলোচনা করতে থাক।

শব্দার্থ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ অতএব এতীমের প্রতি, فَلَا تَقْهَرْ তুমি কঠোরতা করবে না, وَ اَمَّا السَّآئِلَ আর সওয়ালকারীকে, فَلَا تَنْهَرْ ধমক দিবে না, وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও দান সমূহের, فَحَدِّثْ আলোচনা করতে থাক।

যোগসূত্র

পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তিনটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তিনটি আয়াতে সেই তিনটি নেয়ামতের মোকাবেলায় শোকর জ্ঞাপনার্থে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনটি বিশেষ নির্দেশ প্রদানের বর্ণনা এসেছে।

তাফসীর

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ (অতএব তুমি এতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না।)

প্রথম নির্দেশ হল, এতীমের প্রতি কঠোরতা না করা। এতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ না করা; বরং তার প্রতি দয়াপরবশ থাকা এবং তার খোঁজ খবর নেয়া উচিৎ। যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে এতীম অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন। তুমিও এতীমদেরকে আশ্রয় দাও।

وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ (আর সওয়ালকারীকে ধমক দিবে না।)

দ্বিতীয় নির্দেশ হল সওয়ালকারী সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক না দেয়া। এতে অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী অন্তর্ভুক্ত। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায়

www.maktabatulabrar.com

অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। তবে যদি সওয়ালকারী নাছোড় বান্দা হয়ে দাঁড়ায় এবং নরম ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করার পরও সে পিছু না ছাড়ে, তখন প্রয়োজনে তাকে ধমক দেয়াও জায়েয হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (আর স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও দানসমূহের আলোচনা করতে থাক।)

তৃতীয় নির্দেশ এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা কর। বিশেষত হেদায়াতের নেয়ামতের কথা আলোচনা করতে থাক, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং হেদায়াতের বাণী প্রচার প্রসার করা তো তোমার নবুয়তের দায়িত্বও বটে। সম্ভবত শব্দ হতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা কাজ ও অনুমোদন পরিভাষাগতভাবে হাদীছ নামে অভিহিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

- আয়াত থেকে বোঝা যায় আল্লাহর নেয়ামতের শোকর জ্ঞাপনার্থে নিজের খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও গুণাবলি প্রকাশ করা জায়েয আছে। কিন্তু লোক দেখানো বা অহংকার হিসেবে জায়েয নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)
- আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর মর্জি মোতাবেক ব্যয় করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৯৪) সূরা ইনশিরাহ, মক্কী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١	(১) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রসারিত করে দিইনি?
وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢	(২) আর আমি তোমার উপর থেকে তোমার সে ভার অপসারিত করেছি,
الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣	(৩) যা তোমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল (অর্থাৎ, যা ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক)।
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤	(৪) আর আমি তোমার কল্যাণে তোমার আলোচনা ও খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি।

শব্দার্থ

اَلَمْ نَشْرَحْ আমি কি প্রসারিত করে দিইনি, لَكَ তোমার কল্যাণে, صَدْرَكَ তোমার বক্ষ, وَ وَضَعْنَا আমি অপসারিত করেছি, عَنْكَ তোমার উপর হতে, وِزْرَكَ তোমার সে ভার, الَّذِيْ যা, اَنْقَضَ ভেঙ্গে রেখেছিল,

ظَهْرَكَ তোমার মেরুদণ্ড, وَ رَفَعْنَا আমি সমুন্নত করেছি, لَكَ তোমার কল্যাণে, ذِكْرَكَ তোমার আলোচনা ও খ্যাতিকে।

সারমর্ম

আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও সূরা দুহা-র ন্যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা দুহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

তাফসীর

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ প্রসারিত করে দিইনি?)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমি তোমার বক্ষকে অগাধ জ্ঞান, তত্ত্বকথা এবং উত্তম চরিত্র মাধুরীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি এবং রিসালাতের গুরুদায়িত্ব বহন করার মত বিশাল সাহসিকতা দিয়েছি। যেন তুমি অপরিসীম ধৈর্য সহিষ্ণুতার সাথে অসংখ্য শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম হও। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (আর আমি তোমার উপর হতে তোমার সে ভার অপসারিত করেছি, যা তোমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল [অর্থাৎ, যা ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক])।

এ আয়াতে যে ভারের কথা বলা হয়েছে, সে ভার কী ছিল? তাফসীরকারকদের থেকে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যথা:–

(১) প্রথম দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ওহী অবতরণ খুবই গুরুতর ও কষ্টদায়ক ছিল। অতঃপর তা আছান হয়েছে।

(২) প্রথম দিকে রিসালাতের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে হৃদয়ের উপর বিরাট বোঝা অনুভব হত। পরে তা অপসারিত হয়।

(৩) 'ভার' দ্বারা সেসব মুবাহ বিষয় বুঝানো হয়েছে, যা কখনও তিনি সংগত মনে করে করে ফেলতেন, পরে তা অসংগত বা অনুত্তম প্রতিপন্ন হলে তিনি তাঁর সমুচ্চ মর্যাদা ও অতিশয় নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার দরুণ এত অধিক চিন্তিত হয়ে পড়তেন, যেমন কেউ গোনাহের কারণে হয়। তাই এ আয়াতে সে সকল মুবাহ বিষয়ে কোনরূপ শাস্তি না হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (আর আমি তোমার কল্যাণে তোমার আলোচনা ও খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, দ্বীনের শিয়ারসমূহ যথা নামায, আযান, ইকামত ও কালিমায়ে তায়্যিবাহ ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা যেখানে মানুষকে তার আনুগত্যের

www.maktabatulabrar.com

আদেশ দিয়েছেন সেখনে সাথে সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাবেদারীরও নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥	(৫) সুতরাং (আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে,) নিশ্চয় বর্তমান মুশকিলসমূহের সাথে আছানী আছে।
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦	(৬) নিশ্চয় বর্তমান মুশকিল সমূহের সাথে আছানী রয়েছে।
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧	(৭) অতএব যখনই তুমি অবসর পাও তখনই সাধনা কর।
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨	(৮) এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ কর।

শব্দার্থ

فَاِنَّ সুতরাং নিশ্চয়, مَعَ الْعُسْرِ (বর্তমান) মুশকিলসমূহের সাথে আছে, يُسْرًا আছানী, مَعَ الْعُسْرِ বর্তমান মুশকিলসমূহের সাথে রয়েছে, يُسْرًا আছানী, فَاِذَا অতএব যখনই, فَرَغْتَ তুমি অবসর পাও, فَانْصَبْ তখনই সাধনা কর, وَ اِلٰى رَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি, فَارْغَبْ মনোনিবেশ কর।

তাফসীর

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (সুতরাং [আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে,] নিশ্চয় বর্তমান মুশকিলসমূহের সাথে আছানী আছে। নিশ্চয় বর্তমান মুশকিলসমূহের সাথে আছানী রয়েছে।)

অর্থাৎ, আমি তো তোমার মানসিক কষ্ট দূরীভূত করে তোমাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেছি। তেমনি জাগতিক কষ্টের ব্যাপারেও তুমি আমার দয়া ও অনুগ্রহের আশাবাদী থাক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বর্তমান কষ্টসমূহের পর স্বস্তি আসবে। আবার বলছি, নিশ্চয় বর্তমান কষ্টসমূহের পরপরই স্বস্তি আসবে। বস্তুত হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় একে একে সেসব মুশকিল বিদূরিত হয়েছে।

এ আয়াতে আরবী সাহিত্যের একটি নীতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তা হলো– আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লামসহকারে উল্লেখ করা হয়, তা হলে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক বস্তুসত্তা বুঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন উভয় স্থানে আলিফ লাম সহকারে উল্লেখ হয়েছে, এতে বোঝা গেল উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ, কষ্ট বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسر শব্দটি উভয় স্থানে আলিফ লাম ব্যতিরেকে উল্লেখ হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় দ্বিতীয়

يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে ان مع العسر يسرا -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল একই কষ্টের জন্য দুটি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'নয়। বরং উদ্দেশ্য অধিক ও অনেক।

মোটকথা, আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কষ্ট তার পর একাধিক আছানী ও স্বস্তি নিয়ে আসবে। এখনও আল্লাহর স্বাভাবিক নীতি এটাই যে, কেউ বিপদ আপদে পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হয় এবং সাহায্য বিলম্ব দেখে হতাশ না হয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক প্রকারের নয় বিভিন্ন রকমের আছানীর পথ খুলে দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ **(অতএব যখনই তুমি অবসর পাও তখনই সাধনা কর এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।)**

অর্থাৎ, যখন তুমি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে অবসর পাও, তখন নির্জনে বসে আল্লাহর ইবাদত, নামায, যিকির, ইসতিগফার ও দু'আয় আত্মনিয়োগ কর। স্মর্তব্য যে, দাওয়াত তাবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা-ভাবনা করা এ সবই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য সর্ববৃহৎ ইবাদত ছিল। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তুমি কেবল পরোক্ষ ইবাদত করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাও, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হবে। কারণ এটাই প্রকৃত ইবাদত এবং মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন ইবাদত, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

فاذا فرغت فانصب আয়াত থেকে জানা যায় উলামায়ে কেরাম –যারা দ্বীনী শিক্ষা, দ্বীনের প্রচার, সমাজ সংস্কার ও জন সংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন– তাদের কিছু সময় নির্জনে আল্লাহর ইবাদত, যিকির ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে ব্যয় করা উচিৎ। এছাড়া তা'লীম তাবলীগের কাজ কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৯৫) সূরা তীন, মক্কী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①	(১) শপথ আঞ্জীর ও জয়তুনের।
وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②	(২) আর সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পাহাড়ের।

www.maktabatulabrar.com

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③	(৩) আর এ শান্তিময় (নিরাপদ) নগরীর।
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④	(৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।

শব্দার্থ

শপথ আঞ্জীরের, وَ الزَّيْتُوْنِ ও যায়তূনের, আর طُوْرِ তূর পাহাড়ের, سِيْنِيْنَ সিনাই প্রান্তরস্থ, ' এ (নিরাপদ) নগরীর, الْاَمِيْنِ শান্তিময়, لَقَدْ خَلَقْنَا নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি, الْاِنْسَانَ মানুষকে, فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ সুন্দরতম গঠনে।

তাফসীর

এ সূরার প্রথম তিন আয়াতে চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (১) আঞ্জীর বৃক্ষ, (২) যায়তূন বৃক্ষ, (৩) সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত (৪) মক্কা মুকাররমা। এ বিশেষ শপথের কারণ এ হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় আঞ্জীর ও যায়তূন বৃক্ষও খুব উপকারী। এটাও সম্ভব যে, এখানে তীন ও যায়তূন উল্লেখ করে সে স্থানকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা অগণিত পয়গম্বরের আবাসভূমি। এভাবে উপর্যুক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যেখানে বিশেষ বিশেষ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন।

التين (তীন) কি?

এক জাতীয় বৃক্ষ ও তার ফল উভয়কেই 'তীন' বলা হয়। এ জাতীয় বৃক্ষ বহু প্রকারের এবং এর ফলের মধ্যে বহু ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ থাকে। এগুলোর মধ্যে কতক ফল মানুষ খায়। এ বৃক্ষ সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে। উর্দূভাষায় এর অনুবাদ করা হয় আঞ্জীর ফল হিসাবে। বাংলাভাষায় কেউ কেউ এটাকে ডুমুর বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান সৌদি আরবে তীন নামে বাজারে যে ফল পাওয়া যায়, সেটা অনেকটা আমাদের দেশের ডুমুর ফলের মতই।

আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আঞ্জীর ও যায়তূন বৃক্ষ বিপুল উপকারী বস্তু।

طور (তূর)-এর পরিচয়

'তূর' একটি পাহাড়ের নাম, যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তাআলার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করেছেন। পাহাড়টি বর্তমান আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে (সুয়েজ সাগরের উপকূলবর্তী স্থানে) অবস্থিত। السنين (সিনীন) অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম।

البلد الامين (নিরাপদ নগরী) বলে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। যেটা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মভূমি ও বাসস্থান।

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা, হারাম অতিশয় মর্যাদাময় নগরী।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ **(নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।)**

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের দৈহিক অবয়ব এবং আকার আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করেছেন এবং তার স্বভাবের মাঝে এমন সব যোগ্যতা ও গুণাবলি সন্নিবিষ্ট রেখেছেন যার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সে ফেরেশতারও উর্ধ্বে স্থান করে নিতে পারে। মোটকথা, দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টজীবের তুলনায় উত্তম করে পয়দা করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অতঃপর আমি তাকে হীনদের চেয়েও হীনতমে পরিণত করি।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
(৬) কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে (তারা ব্যতিক্রম)। বস্তুত তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে যা কখনও শেষ হবে না।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦
(৭) সুতরাং এরপর কোন্ জিনিস তোমাকে কেয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧
(৮) আল্লাহই কি সকল বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

শব্দার্থ

ثُمَّ অতঃপর, رَدَدْنٰهُ আমি তাকে পরিণত করি, اَسْفَلَ হীনদের চেয়েও হীনতমে, اِلَّا কিন্তু, الَّذِيْنَ যারা, اٰمَنُوْا ঈমান এনেছে, وَ عَمِلُوا করেছে, الصّٰلِحٰتِ ভাল কাজ, فَلَهُمْ সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে, اَجْرٌ এরূপ প্রতিদান, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ যা কখনও শেষ হবে না, فَمَا সুতরাং কোন্ জিনিস, بَعْدُ এরপর, يُكَذِّبُكَ তোমাকে অবিশ্বাসী করছে, بِالدِّيْنِ কেয়ামত সম্বন্ধে, اَلَيْسَ اللّٰهُ আল্লাহই কি নন, بِاَحْكَمِ শ্রেষ্ঠ বিচারক, الْحٰكِمِيْنَ সকল বিচারক অপেক্ষা।

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীত বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ছিল তেমনি পরিশেষে সে হীনদের চেয়েও হীন হয়ে যায়।

তাফসীর

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ **(অতঃপর আমি তাকে হীনদের চেয়েও হীনতমে পরিণত করি।)**

বলা বাহুল্য এ হীনতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক থেকে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য তাকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টি গোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। এ তাফসীর অনুসারে পরবর্তী আয়াতে মু'মিন সৎকর্মশীলদের যে ব্যতিক্রম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, নেককার মু'মিনগণ বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য হলো, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না। দুনিয়াতে তারা বার্ধক্যের অপারগতার সম্মুখীন হলেও আখেরাতে তাদের জন্য উচ্চতা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত কারণে আমল হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তি-সামর্থ্য অবস্থায় করত। কিংবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, পরবর্তী আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াত থেকে সৃষ্ট একটি সন্দেহের অপনোদন করা উদ্দেশ্য, তা হলো পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতা থেকে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, বুড়ো মানুষ উভয় জাহানে হীন হবে। এর জবাবে মু'মিনদেরকে ব্যতিক্রম করে বলা হয়েছে যে, সৎকর্মী মু'মিন বার্ধক্যজনিত কারণে দুনিয়াতে অকর্মন্য হলেও আখেরাতে রয়েছে তার জন্য অনিঃশেষ প্রতিদান। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ কথাটি কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। সেমতে আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তো তাকে অনেক যোগ্য বানিয়েছেন, কিন্তু সে সত্য ধর্মকে অস্বীকার করার কারণে চুতষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এটা তার কর্মদোষ।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ (সুতরাং এরপর কোন্ জিনিস তোমাকে কেয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?)

এতে কেয়ামত অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরতের উপর্যুক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের পক্ষে আখেরাতকে মিথ্যা মনে করার কী অবকাশ থাকতে পারে? হ্যাঁ, মিথ্যা মনে করার একটি অবস্থা হতে পারে; যদি এ পৃথিবীকে একটি উদ্দেশ্যহীন কারখানা মেনে নেয়া হয়, যেখানে কারো কোন হুকুমত নেই, কোন আইন-কানূন নেই, ভাল-মন্দের কোন বিচার নেই। এর জবাবে সামনে আয়াতে ইরশাদ হয়েছে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ আল্লাহই কি সকল বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (আল্লাহই কি সকল বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার রাজত্বের সামনে সকলের রাজত্ব তুচ্ছ। যখন এ পৃথিবীর দুর্বল থেকে দুর্বল সরকারও অনুগতদের পুরস্কৃত করে এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়, তা হলে যিনি আহকামুল হাকিমীন তাঁর থেকে কেন ভাল-মন্দের প্রতিফল আশা করা হবে না? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

একটি বিশেষ আমল

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা তীনের اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে, তার উচিৎ على ذلك من الشاهدين বলা। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

(৯৬) সূরা আলাক্ব, মক্কী
১৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ①	(১) পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②	(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে লেগে থাকা জমাট রক্ত থেকে।
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③	(৩) তুমি পড় আর তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত দানশীল।
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④	(৪) যিনি কলমের সাহয্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤	(৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানত না।

শব্দার্থ

اِقْرَاْ তুমি পাঠ কর, بِاسْمِ নামে, رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের, الَّذِىْ যিনি, خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন, الْاِنْسَانَ মানুষকে, عَلَقٍ مِنْ জমাট রক্ত থেকে, وَرَبُّكَ و আর তোমার পালনকর্তা, الْاَكْرَمُ অত্যন্ত দানশীল, عَلَّمَ শিক্ষা দিয়েছেন, بِالْقَلَمِ কলমের সাহয্যে, عَلَّمَ শিক্ষা দিয়েছেন, مَا لَمْ يَعْلَمْ যা সে জানত না।

তাফসীর

সর্বপ্রথম কুরআনের যে আয়াত নাযেল হয়

এ সূরার শুরু থেকে ما لم يعلم পর্যন্ত প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় এবং এটাই প্রথম ওহী। নবুয়ত প্রাপ্তির নিকটবর্তীকালে একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে এলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, اقرء পড়ুন। রাসুল বললেন, ما انا بقارئ আমি পড়তে শিখিনি। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) একে একে দু'বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সজোরে আলিঙ্গন করেন এবং ছেড়ে দেয়ার পর বলেন, পড়ুন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই জবাব দিলেন, ما انا بقارئ আমি পড়তে শিখিনি। তৃতীয় বার হযরত জিবরাঈল (আ.) সজোরে আলিঙ্গন করে বলেন, اقرء باسم ربك الذى خلق (অর্থাৎ, পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।) এবার তিনি শুরু থেকে ما لم يعلم পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযেল হয়

কুরআনে কারীমের সর্বশেষ আয়াত কোন্‌টি নাযেল হয় এ বিষয়ে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত–

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

কেউ কেউ এর পূর্বের ২৮০ নং আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটিই সবার শেষে নাযেল হয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেছেন, এই দুই উক্তির মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। উভয় আয়াতই একই সঙ্গে নাযেল হয়, যেমন কুরআনে কারীমের তারতীব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কেউ প্রথম আয়াতের কথা এবং কেউ শেষ আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-ও বলেছেন, এ দুটি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই; উভয় আয়াতই একই প্রসঙ্গে অর্থাৎ, সূদ প্রসঙ্গে এবং একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে حرف عطف (সংযোগ অব্যয়) যোগে সংযুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা নিছা-র সর্বশেষ আয়াত (১৭৬ নং আয়াত)। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, ফারায়েয তথা মীরাছ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে এটি নাযেল হয়। এ হিসেবে এ আয়াতটিকে সর্বশেষ বলা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নয়। (الاتقان فى علوم القران للسيوطى থেকে গৃহীত)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।)

অর্থাৎ, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমার মাঝে পাঠ করার যোগ্যতাও সৃষ্টি করে দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াতে বর্ণিত باسم ربك (পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে) কথা থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে কুরআন পাঠ শুরু করা মুস্তাহাব।

আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়, ইসলামের প্রথম ওহী ছিল اقرء এতে শিক্ষার গুরুত্ব সহজে অনুমেয়।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ **(সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।)**

মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়। এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এ সবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী স্তর। আয়াতে এই মধ্যবর্তী স্তর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা যিনি একখণ্ড জমাট রক্তকে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সুগঠিত মানুষে পরিণত করেছেন, তিনি একজন উম্মীকে কারী (পাঠকারী) বানাতেও সক্ষম হবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ **(তুমি পড়, আর তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত দানশীল।)**

অর্থাৎ, যে শান ও মর্যাদায় তোমার তারবিয়্যাত করা হয়েছে, তাতে তোমার পরিপূর্ণ যোগ্যতা

www.maktabatulabrar.com

দিবালোকের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। সুতরাং তোমার দিক থেকে যোগ্যতার কোন ত্রুটি নেই। ঐ দিকে আল্লাহর তরফ থেকে কোন কার্পণ্যও নেই, বরং তিনি পরম দয়াময়, অনুগ্রহশীল। কাজেই ফয়েয লাভে বাধা কোথায়। অবশ্যই তুমি ফয়েযপ্রাপ্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ **(যিনি কলমের সাহয্যে শিক্ষা দিয়েছেন।)**

মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখ হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র ও সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। আয়াতের উদ্দেশ্য হল- কলমের সাহায্যে ইল্ম আল্লাহই দিয়ে থাকেন। কলম ছাড়াও তিনিই দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, কলম ও লিখন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ **(শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।)**

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যম অসংখ্য। শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। মানব সন্তান মায়ের পেট থেকে তো কিছুই শিখে আসে না, তা হলে তাকে ধীরে ধীরে কে শিক্ষা দেয়? সুতরাং সে আল্লাহ তাআলা যিনি মানুষকে অজ্ঞ থেকে জ্ঞানী বানান, তিনি নিজের এক উম্মী নবীকে আরিফে কামিল, বরং সকল আরিফদের সর্দার বানিয়ে দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) সত্য সত্যই (বস্তুত) নিশ্চয় মানুষ (কাফের) সীমালঙ্ঘন করে থাকে।	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦
(৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧
(৮) হে শ্রোতা, তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨
(৯) হে শ্রোতা, আচ্ছা তার অবস্থা বল, যে নিষেধ করে	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝٩
(১০) (আমার) এক (বিশিষ্ট) বান্দাকে; যখন সে নামায পড়ে।	عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠

শব্দার্থ

كَلَّآ সত্য সত্যই (বস্তুত), اِنَّ নিশ্চয়, الْاِنْسَانَ মানুষ, لَيَطْغٰى সীমালঙ্ঘন করে থাকে, اَنْ এ কারণে যে, رَّاٰهُ সে নিজেকে মনে করে, اسْتَغْنٰى অমুখাপেক্ষী, اِلٰى رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের দিকেই, الرُّجْعٰى সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, اَرَءَيْتَ আচ্ছা বল, الَّذِىْ তার অবস্থা, يَنْهٰى নিষেধ করে, عَبْدًا এক বান্দাকে,; اِذَا যখন, صَلّٰى সে নামায পড়ে।

www.maktabatulabrar.com

তাফসীর

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى (সত্য সত্যই নিশ্চয় মানুষ [কাফির] সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।)

এই ৬ ও ৭ নং আয়াতদ্বয়ে সাধারণ মানুষদের বিশেষত কাফেরদের একটি নৈতিক দুর্বলতার কথা বিধৃত হয়েছে, তা হলো মানুষ যখন নিজেকে কারো মুখাপেক্ষী মনে করে না, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন এবং জুলুম-নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে তার সত্তাকে ভুলে ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মত্ত হয়ে আর কাউকে পরওয়া করে না। অথচ এটা তার নিতান্ত বোকামী। সে যদিও মাখলূক থেকে কিছুটা অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ থেকে কখনও মুখাপেক্ষী হীন হতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ([হে শ্রোতা,] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।)

এ আয়াতে সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল মন্দ সবকিছুর হিসেব দিতে হবে। তখন অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى الخ (হে শ্রোতা, আচ্ছা তার অবস্থা বল, যে নিষেধ করে [আমার] এক [বিশিষ্ট] বান্দাকে; যখন সে নামায পড়ে।)

এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শুরু করেন। তখন আবূ জাহ্‌ল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতেও সে (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায পড়লে সে সাজদা অবস্থায় তার (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর) ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দিবে। এর জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সে অহংকারী অবাধ্য লোকটাকে দেখ, তার নিজের তো আল্লাহ তাআলার সামনে অবনত হওয়ার তাওফীক হয় না, অন্য বান্দা আল্লাহর সামনে সাজদাবনত হলে সে তাঁকেও দেখতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর বান্দাকে নামায থেকে বাধা দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। অতএব যে সমস্ত কাজ দ্বারা কোন নামাযীর নামাযে ব্যাঘাত ঘটে, তাও অবশ্যই নিষিদ্ধ নিঃসন্দেহে।

(১১) হে শ্রোতা, আচ্ছা এটা তো বলো, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে।	اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١
(১২) অথবা সে (অন্যদেরকেও) তাকওয়া শিক্ষা দেয়, (তবে কি তার বিরোধিতা সংগত হয়?)	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢

(১৩) হে শ্রোতা, আচ্ছা বলো তো, যদি সে (সত্য ধর্মকে) মিথ্যারোপ করে এবং বিমুখ হয়।	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾
(১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ (তার কার্যাবলি) দেখছেন।	اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

শব্দার্থ

اَرَءَيْتَ আচ্ছা বলো তো, اِنْ যদি, كَانَ সে (বান্দা) থাকে, عَلَى الْهُدٰى সৎপথে, اَوْ অথবা, اَمَرَ সে (অন্যদেরকেও) তাকওয়া শিক্ষা দেয়, اَرَءَيْتَ আচ্ছা বলত, اِنْ যদি, كَذَّبَ সে (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, تَوَلّٰى বিমুখ হয় اَلَمْ يَعْلَمْ সে কি জানে না, بِاَنَّ اللّٰهَ যে, আল্লাহ, يَرٰى (তার কার্যাবলি) দেখছেন।

তাফসীর

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى **(আচ্ছা এটা তো বলো যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে। অথবা সে [অন্যদেরকেও] তাকওয়া শিক্ষা দেয়, [তবে কি তার বিরোধিতা সংগত হয়?])**

অর্থাৎ, যদি আল্লাহর সে বিশেষ বান্দা নিজেও পরিপূর্ণ হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং অন্যকেও হেদায়াতের তালীম দেন, তবে কি তার এ বিরোধিতা জঘন্য অপরাধ নয়? (বয়ানুল কুরআন)

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى **(আচ্ছা বলো তো, যদি সে [সত্য ধর্মকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বিমুখ হয়।)**

অর্থাৎ, এ নিষেধকারীর আকীদা আমল কিছুই নেই। এমতাবস্থায় কি তার এ বিরোধিতা মারাত্মক গর্হিত কাজ নয়?

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى **(সে কি জানে না যে, আল্লাহ [তার কার্যাবলি] দেখছেন।)**

অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কী দেখছেন এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি সবকিছু দেখছেন। বিশেষত এ নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন।

(১৫) কখনও নয়, যদি সে ফিরে না আসে, তবে মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়ে নিয়ে আসব।	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
(১৬) যে কেশগুচ্ছ মিথ্যা ও পাপযুক্ত।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
(১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে ডাকুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾

(১৮) আমিও দোযখের পেয়াদাদেরকে আহ্বান করব।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
(১৯) তার কখনও এরূপ করা উচিৎ নয়, তুমি তার কথা মানবে না। তুমি (রীতিমত) সাজদা করতে (নামায পড়তে) থাক এবং নৈকট্য লাভ করতে থাক।	كَلَّا ط لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ السَّجْدَة

শব্দার্থ

كَلَّا কখনও নয়, لَئِنْ যদি, لَّمْ يَنْتَهِ সে ফিরে না আসে, لَنَسْفَعًۢا তবে অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়ে নিয়ে আসব, بِالنَّاصِيَةِ মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, نَاصِيَةٍ যে কেশগুচ্ছ, كَاذِبَةٍ মিথ্যা, خَاطِئَةٍ পাপযুক্ত, فَلْيَدْعُ অতএব সে ডাকুক, نَادِيَهٗ তার সভাসদদেরকে, سَنَدْعُ আমিও আহবান করব, الزَّبَانِيَةَ দোযখের পিয়াদাদেরকে, كَلَّا কখনও (এরূপ করা উচিৎ) নয়, لَا تُطِعْهُ তুমি তার কথা মানবে না, اسْجُدْ তুমি সাজদা করতে (নামায পড়তে) থাক, اقْتَرِبْ নৈকট্য লাভ করতে থাক।

তাফসীর

كَلَّا (কখনও নয়)

অর্থাৎ, কখনও তার এরূপ করা উচিৎ নয়।

لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ (যদি সে ফিরে না আসে, তবে মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়ে নিয়ে আসব।)

অর্থাৎ, সে এখন কান খুলে ভাল করে শুনে নিক। যদি এ জঘন্য অপকর্ম থেকে সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তাকে নিকৃষ্ট কয়দীর ন্যায় মস্তকের অগ্রভাগের চুল ধরে হেঁচড়াব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (যে কেশগুচ্ছ মিথ্যা ও পাপযুক্ত।)

অর্থাৎ, এ কেশ যার, সে মিথ্যা এবং পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ঠিক যেন মিথ্যা ও পাপ তার কেশের পরতে পরতে অনুপ্রবেশ করেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ . سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (অতএব সে তার সভাসদদেরকে ডাকুক। আমিও দোযখের পিয়াদাদেরকে আহবান করব।)

শানে নুযূল

একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন। আবূ জাহল দেখে বলল, আমি তোমাকে বারবার এর থেকে নিষেধ করেছি। একথা শুনে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

www.maktabatulabrar.com

ধমক দিলেন। তখন সে বলল, দেখুন মক্কায় আমার পরিষদ সবচেয়ে বড়। আবূ জাহল আরও বলল, আবার যদি তোমাকে নামায পড়তে দেখি, তবে পা দ্বারা তোমার ঘাড় চেপে ধরব। সুতরাং আরেক দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে হীন অভিপ্রায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে যেতেই হঠাৎ পিছিয়ে আসল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করার পর বলল, অগ্রসর হতেই আমি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দেখতে পেলাম। সেখানে পাখা বিশিষ্ট জন্তুসমূহ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ জানতে পেরে বললেন তারা ফেরেশতা ছিল। আবূ জাহল আরেকটু অগ্রসর হলে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলত। এ প্রেক্ষিতে আয়াত কয়টি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

যেহেতু জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ডাকা তার সভাসদদের আহ্বান করার সাথে শর্তযুক্ত ছিল, তাই শর্ত না পাওয়ার কারণে জাহান্নামের প্রহরীদের ডাকা হয়নি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে যদি তার সভাসদদেরকে আহ্বান করত, তবে প্রহরী ফেরেশতাগণ তাকে প্রকাশ্যে পাকড়াও করত। (বয়ানুল কুরআন)

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ **(তার কখনও এরূপ করা উচিৎ নয়, তুমি তার কথা মানবে না। তুমি [রীতিমত] সাজদা করতে [নামায পড়তে] থাক এবং নৈকট্য লাভ করতে থাক।)**

এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, তুমি আবূ জাহলের কথায় কর্ণপাত করবে না। বরং পূর্বের ন্যায় যথারীতি সাজদায় ও নামাযে মশগুল থাক এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে থাক। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– সাজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইবাদত দ্বারা বিশেষত নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। কাজেই ইবাদতই মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

(৪) সূরা ক্বদর, মক্কী
৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١
(২) আর তোমার কিছু জানা আছে শবে কদর (কদরের রাত) কেমন জিনিস?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢
(৩) কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

(৪) সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে।	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤
(৫) (আর সে রাত) আগাগোড়া শান্তি। সে রাত ফজর হওয়া পর্যন্ত (বরকতময়) থাকে।	سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

শব্দার্থ

اِنَّا নিশ্চয় আমি, اَنْزَلْنٰهُ সেটা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, لَيْلَةِ الْقَدْرِ কদরের রজনীতে, وَ مَآ اَدْرٰىكَ তোমার কিছু জানা আছে কি, مَا কেমন জিনিস? لَيْلَةُ الْقَدْرِ শবে কদর, কদরের রাত, خَيْرٌ উত্তম, مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ হাজার মাস অপেক্ষাও, تَنَزَّلُ অবতরণ করেন (পৃথিবীতে), الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ, وَ الرُّوْحُ এবং রূহুল কুদুস (জিবরাঈল), فِيْهَا সে রাতে, بِاِذْنِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে, مِنْ كُلِّ اَمْرٍ প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে, سَلٰمٌ আগাগোড়া শান্তি, هِىَ সে রাত, حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর হওয়া পর্যন্ত।

শানে নুযূল

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে একহাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র ত্যাগ করেনি। মুসলমানগণ একথা শোনে বিস্মিত হলে আল্লাহ তাআলা সূরা কদর নাযেল করেন। আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাযেল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, শবে কদর এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। (মাআরিফুল কুরআন)

তাফসীর

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে।)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআনে পাক শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানে এ রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌছাতে থাকেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

القدر (কদর) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

'কদর' শব্দের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লাইলাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রজনী বলা হয়েছে। 'কদর' শব্দের আরেক অর্থ তাকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। যেহেতু এ রাতে পরবর্তী একবছরের অবধারিত বিধিলিপি, ব্যবস্থাপক এবং

www.maktabatulabrar.com

প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়, তাই এ রজনীকে 'লায়লাতুল কদর' বলা হয়।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ (কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।)

লাইলাতুল কদরের ফযীলত

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে ছওয়াব, কদরের রাতে ইবাদতের ছওয়াব তার চেয়ে অধিক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

শবে কদরের ফযীলত বয়ান করে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখে ছওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস রেখে ছওয়াবের আশায় শবে কদরে এবাদত করে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের বিরাট এক দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকিরে মশগুল থাকে তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। ৪ নং আয়াতে 'প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু' বলে এ রহমত এবং শান্তি বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

লাইলাতুল কদর কোন্ রাত?

লাইলাতুল কদর বা শবে কদর কোন্ রাত– এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায়, শবে কদর রমযান মাসে। ইরশাদ হয়েছে شهر رمضان الذى انزل فيه القران এবং সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায়, রমযানের শেষ দশ দিনে, বিশেষত শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতসমূহে তালাশ করা উচিৎ। আবার সাতাশে রজনীর ব্যাপারে প্রবল ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শবে কদর সব সময়ের জন্য, কোন এক নির্দিষ্ট রাতে অবধারিত নয়। হতে পারে এক রমযানে এক রাতে হবে তো অপর রমযানে অন্য রাতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ (সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস [জিবরাঈল] স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে [পৃথিবীতে] অবতরণ করেন।)

অর্থাৎ, এ রাত রহমত, শান্তি ও একাগ্রতার রাত। এ রাতে আল্লাহওয়ালাগণ তাঁদের ইবাদতে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করে থাকেন। বস্তুত এটা ফেরেশতার মাধ্যমে অবতারিত আল্লাহর রহমত ও বরকতেরই প্রভাব। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ রাতে হযরত

www.maktabatulabrar.com

জিবরাঈল (আ.) এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ ইবাদতকারী ও যিকিরকারীদের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) পূর্বে বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু' বলে এ রহমত এবং শান্তি বুঝানো হয়েছে।

এই আয়াতের এক ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, এই রাতে বিশেষ এক ধরনের রহমতের ফেরেশতা নাযেল হয়। এ থেকে বোঝা যায় এ রাতটা বিশেষ একটা রহমতের রাত। অর্থাৎ, এ রাতে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত হয়ে থাকে। তাই এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদত করা চাই।

سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ([আর সে রাত] আগাগোড়া শান্তি। সেরাত ফজর হওয়া পর্যন্ত [বরকতময়] থাকে।)

শবে কদরের এ বরকত রাতের কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয়। বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৯৮) সূরা বাইয়িনা, মক্কী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

(১) আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-নাসারা) ও মুশরিক, যারা কাফের ছিল তারা (কুফর থেকে কখনও) প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②

(২) (অর্থাৎ,) আল্লাহর এক রসূল যে (তাদেরকে) পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দিবে।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ③

(৩) যাতে সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।

শব্দার্থ

لَمْ يَكُنِ ছিলনা, الَّذِيْنَ যারা, كَفَرُوْا কাফির ছিল, اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাব (ইয়াহুদী- নাসারা), الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিক, مُنْفَكِّيْنَ প্রত্যাবর্তনকারী, حَتّٰى যে পর্যন্ত না, تَاْتِيَهُمُ তাদের নিকট উপস্থিত হয়, الْبَيِّنَةُ সুস্পষ্ট প্রমাণ, رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর এক রসূল, يَتْلُوْا যে পাঠ করে শুনিয়ে দিবে, صُحُفًا সহীফাসমূহ, مُطَهَّرَةً পবিত্র, فِيْهَا যাতে, كُتُبٌ قَيِّمَةٌ সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।

তাফসীর

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (আহ্‌লে কিতাব [ইয়াহুদী-নাসারা] ও মুশরিক, যারা কাফের ছিল তারা [কুফ্‌র হতে কখনও] প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।)

অর্থাৎ, আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের গোমরাহী এতখানি চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তাদের সরে আসার কোন আশা ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে মহান রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো। সুতরাং তিনি তাদেরকে সে সব হুকুম-আহকাম শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সহীফা থেকে নয় বরং স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ([অর্থাৎ,] আল্লাহর এক রসূল যে [তাদেরকে] পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দিবে।)

صحف শব্দটি صحيفه এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকে সহীফা বলা হয়। এখানে 'সহীফা' বলে কুরআনক শরীফকে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (যাতে সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।)

এ আয়াতে বর্ণিত كتب শব্দটি كتاب (কিতাব)-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। কিতাবের আরেক অর্থ আদেশ ও বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। এখানেও দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤
(৫) অথচ তাদের প্রতি (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) কেবল এ নির্দেশই হয়েছিল যে, আল্লাহর ইবাদত করবে, ইবাদতকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট রেখে (সকল বাতিল মত ও পথ থেকে একনিষ্ঠ হয়ে। আর নামাযের পাবন্দী করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সে (উল্লিখিত) সঠিক বিষয়সমূহের তরীকা।	وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

শব্দার্থ

مَا تَفَرَّقَ বিভক্ত হয়নি, الَّذِيْنَ যাদেরকে, اُوْتُوا প্রদান করা হয়েছিল, الْكِتٰبَ কিতাব, اِلَّا তবে, مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ তাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর, الْبَيِّنَةُ স্পষ্ট প্রমাণ, وَمَآ اُمِرُوْٓا তাদের প্রতি (পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহে) নির্দেশ দেয়া হয়নি, اِلَّا তবে, لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, مُخْلِصِيْنَ لَهُ তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট রেখে, الدِّيْنَ দ্বীনকে, حُنَفَآءَ একনিষ্ঠ হয়ে, يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ নামাযের পাবন্দী করার, يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ যাকাত প্রদান করার, وَذٰلِكَ এটাই, دِيْنُ الْقَيِّمَةِ সে (উল্লিখিত) সঠিক বিষয়সমূহের তরীকা।

তাফসীর

وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।)

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে আহ্‌লে কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশীগ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলি এবং তাঁর প্রতি কুরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ, শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছু তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল, আর অনেকেই কাফের হয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (অথচ তাদের প্রতি [পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে] কেবল এ নির্দেশই হয়েছিল যে, আল্লাহর ইবাদত করবে, ইবাদতকে তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট রেখে [সকল বাতিল মত ও পথ হতে] একনিষ্ঠ হয়ে। আর নামাযের পাবন্দী করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সে [উল্লিখিত] সঠিক বিষয়সমূহের তরীকা।)

অর্থাৎ, আহ্‌লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে, যাকাত দিতে। এর পর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। আর যদি قيمه শব্দটি كتب এর বিশেষণ হয় (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে كتب অর্থ আদেশ ও বিষয়বস্তু) তখন এর উদ্দেশ্য কুরআনিক বিধি-বিধান হবে। সেমতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত শরীয়াতের বিধি-বিধানও হুবহু তা-ই। কাজেই তাদের বিরোধিতা করার তো কোন সুযোগ নেই। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৬) আহলে কিতাব ও মুশরিক যারা কাফের হয়েছে তারা দোযখের আগুনের মধ্যে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারাই নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞
(৭) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞
(৮) তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এটা সে ব্যক্তির জন্যে, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।	جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۞

শব্দার্থ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়েছে, مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে, فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ দোযখের আগুনের মধ্যে থাকবে, خٰلِدِيْنَ সদা সর্বদা অবস্থান করবে, فِيْهَا সেখানে, وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ যারা ঈমান এনেছে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিকৃষ্ট সৃষ্টি, شَرُّ الْبَرِيَّةِ তারাই, اُولٰٓئِكَ هُمْ নিঃসন্দেহে, اِنَّ এবং নেক কাজ করেছে, خَيْرُ الْبَرِيَّةِ তারাই, اُولٰٓئِكَ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, جَزَآؤُهُمْ তাদের প্রতিদান, عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট, جَنّٰتُ عَدْنٍ সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ, تَجْرِىْ প্রবাহিত থাকবে, مِنْ تَحْتِهَا যার তলদেশ দিয়ে, الْاَنْهٰرُ নহরসমূহ, خٰلِدِيْنَ অনন্তকাল অবস্থান করবে, فِيْهَا সেখানে, رَضِىَ اللّٰهُ আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন, عَنْهُمْ তাদের প্রতি, وَ رَضُوْا তারা সন্তুষ্ট থাকবে, عَنْهُ তার (আল্লাহর) প্রতি, ذٰلِكَ এটা, لِمَنْ সে ব্যক্তির জন্যে যে, خَشِىَ ভয় করে, رَبَّهٗ তার পালনকর্তাকে।

তাফসীর

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (আহলে কিতাব ও মুশরিক যারা কাফের হয়েছে তারা দোযখের আগুনের মধ্যে হবে, সেখানে তারা সদা সর্বদা অবস্থান করবে। তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি।)

অর্থাৎ, ইলমের দাবীদার আহলে কিতাব হোক, বা মূর্খ মুশরিক হোক, হক প্রত্যাখ্যানকারী সকলের পরিণতি এক ও অভিন্ন। সেটা হল জাহান্নাম, যেখান থেকে কোন দিন তারা মুক্তি পাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত থেকে বোঝা গেল, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। বস্তুত ইয়াহুদী-নাসারা প্রভৃতি ইসলাম পূর্ব কোন ধর্মানুসারীদের ধর্মই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এগুলোতে হকের সাথে বাতিলের প্রচণ্ড সংমিশ্রণ এগুলোর গ্রহণযোগ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে।)

যারা হক প্রত্যাখ্যানকারী, কাফের, তারা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও হীন, নিকৃষ্ট। যেমন সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে,

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا .

অর্থাৎ, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও বিভ্রান্ত। (সূরা ফুরকান: ৪৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ **(নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।)**

আয়াত থেকে বোঝা গেল, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি হল ঈমান ও আমলে সালেহ তথা নেক আমল। যারা ঈমান ও আমলে সালেহের অধিকারী, তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তারাই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মর্যাদার অধিকারী। চাই তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হোক বা না হোক।

ঈমান ও আমলে সালেহ দ্বারা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি তাদের কতক ফেরেশতা থেকেও অগ্রসর হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে।)

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ (তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।)

এখানে জান্নাতীদের প্রতি আল্লাহর সর্ববৃহৎ ও সর্ব উৎকৃষ্ট নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে, তা হল আল্লাহর চিরসন্তুষ্টি। এটাই জান্নাতের সকল নেয়ামতের রূহ তথা প্রাণ। আল্লাহ পাক কর্তৃক জান্নাতীদের সামনের এই ঘোষণা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতীদের মনে জান্নাতের অসংখ্য নায নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও একটা অপূর্ণতা ও অশান্তি বিরাজ করতে থাকবে। এই ঘোষণার পর তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি এসে যাবে।

জান্নাতীদের সকল কামনা, প্রত্যাশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কোন কিছুই অপূর্ণ থাকবে না। এবং তারা কখনও কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের সম্মুখীন হবে না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ **(এটা সে ব্যক্তির জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।)**

আয়াতের এ অংশে আল্লাহর ভয়কে সকল দ্বীনী উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নেয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারো অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয় সৃষ্টি হয় তাকেই خشية বলা হয়। এ ভয়ই মানুষকে সর্বাবস্থায় সকল কজে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট রাখে। এই ভীতিই মানুষকে আল্লাহর কামেল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(৯৯) সূরা যিলযাল, মাদানী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) যখন জমীনকে তার ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ①
(২) আর জমীন স্বীয় বোঝাকে বের করে দিবে।	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ②
(৩) আর (এ অবস্থা দেখে কাফের) মানুষ বলবে এর কী হল?	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ③
(৪) সেদিন জমীন নিজের সমস্ত খবর ব্যক্ত করে দিবে।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ④
(৫) এই কারণে যে, তার প্রতি তোমার রবের এই নির্দেশই হবে।	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑤

শব্দার্থ

اِذَا যখন, زُلْزِلَتِ প্রকম্পিত করা হবে, الْاَرْضُ যমীনকে, زِلْزَالَهَا তার ভীষণ কম্পনে, اَخْرَجَتِ বের করে দিবে, الْاَرْضُ যমিন, اَثْقَالَهَا স্বীয় বোঝাকে, وَ قَالَ আর (এ অবস্থা দেখে কাফের) বলবে, الْاِنْسَانُ মানুষ, لَهَا مَا এর কী হল? يَوْمَئِذٍ সেদিন, تُحَدِّثُ যমীন ব্যক্ত করে দিবে, اَخْبَارَهَا নিজের সমস্ত খবর, بِاَنَّ এই কারণে যে, رَبَّكَ তোমার রব, اَوْحٰى لَهَا তার প্রতি এই নির্দেশই দিবেন।

তাফসীর

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا **(যখন যমিনকে তার ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।)**

এখানে কম্পন দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়কার কম্পন বুঝানো হয়েছে। কারণ এরপর কেয়ামতের তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফুঁৎকারে পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যমীনের সাথে একাকার হয়ে যাবে। ফলে গোটা হাশরের মাঠ হবে পরিষ্কার সমতল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا **(আর যমীন স্বীয় বোঝাকে বের করে দিবে।)**

'বোঝা' বলে যাবতীয় মৃতদেহ এবং যমীনে প্রোথিত সোনা রূপা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। কেয়ামতের দিন যমীন এ সব কিছু উদগীরণ করে দিবে। কিন্তু কেউ তা গ্রহণকারী হবে না। তখন সকলের সামনে এ ধন-সম্পদের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا **(আর (এ অবস্থা দেখে কাফের) মানুষ বলবে এর কী হল?)**

অর্থাৎ, যেহেতু এ কাফেররা পূর্ব থেকে কেয়ামত অস্বীকারকারী ছিল। তাই তারা এসব ঘটনা সংঘটিত হতে দেখে আশ্চার্যান্বিত হবে এবং বলবে, পৃথিবীর কী হয়েছে যে, এমন ভীষণ ভাবে কম্পিত হচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ সবকিছু উদগীরণ করে দিচ্ছে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا **(সেদিন যমিন নিজের সমস্ত খবর ব্যক্ত করে দিবে। এ কারণে যে, তার প্রতি তোমার রবের এই নির্দেশই হবে।)**

অর্থাৎ, মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছু ভূপৃষ্ঠে সম্পন্ন করেছে, ভূমি তার সবকিছু সেদিন প্রকাশ করে দিবে। আজকালকের ভাষায় এভাবে বলা যায়- সকল আমলের রেকর্ড ভূমিতে সংরক্ষিত আছে। কেয়ামত দিবসে আল্লাহর নির্দেশে তা খুলে দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑥
(৭) সুতরাং যে কেউ (পৃথিবীতে) অনুপরিমাণ নেক কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ⑦
(৮) আর যে কেউ অনুপরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ⑧

শব্দার্থ

يَوْمَئِذٍ সেদিন, يَصْدُرُ প্রকাশ পাবে, النَّاسُ মানুষ, اَشْتَاتًا বিভিন্ন দলে, لِّيُرَوْا কারণ তাদেরকে দেখানো হবে, اَعْمَالَهُمْ তাদের কৃতকর্ম, فَمَنْ সুতরাং যে কেউ, يَعْمَلْ করবে, ذَرَّةٍ অণু, مِثْقَالَ পরিমাণ, خَيْرًا নেক কাজ, يَرَهٗ সে তা দেখতে পাবে, وَ مَنْ যে কেউ يَعْمَلْ করবে, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণুপরিমাণ, شَرًّا বদ আমল, يَرَهٗ সে তা দেখতে পাবে।

তাফসীর

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ (সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।)

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ কবর থেকে উঠে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। যেমন এক দল হবে ব্যভিচারীদের, আরেক দল হবে অত্যাচারীদের। এমনিভাবে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের মাঠে একত্র হবে। কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, হিসাব-কিতাবের পর মানুষ যখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন কিছু জামাআত জান্নাতী সাব্যস্ত হয়ে জান্নাতে এবং কিছু জামাআত জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه (সুতরাং যে কেউ [পৃথিবীতে] অনুপরিমাণ নেক কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।)

এখানে خير বা নেক কাজ বলে শরীয়তসম্মত সৎকর্মকে বুঝানো হয়েছে, যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়েছে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সৎকর্ম নয়। আয়াতের সারমর্ম হল, কেউ যদি ঈমানের সাথে সামান্য নেক আমলও করে, তার প্রতিদান সে কেয়ামতের দিন অবশ্যই দেখতে পাবে। তবে শর্ত হলো এ নেক কাজটা নেক কাজ হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে কুফর, শিরকে লিপ্ত হলে এটা নেকী হিসেবে গণ্যই হবে না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

فمن يعمل مثقال ذرة الخ থেকে বোঝা যায়, যার মধ্যে অনুপরিমাণ ঈমান থাকবে সে যতবড় পাপী হোক না কেন, অবশেষে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদানুযায়ী প্রত্যেক নেক কাজের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন নেক আমল না থাকলেও ঈমানও একটি বিরাট নেক আমল। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ভাল কাজ করে থাকলে ঈমানের অভাবে আখেরাতে তা ধর্তব্য হবে না। তাকে দুনিয়াতে তার প্রতিদান দিয়ে দেয়া হবে।

مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه (আর যে কেউ অনুপরিমাণ বদ আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে।)

এখানে এমন সব বদআমল বুঝানো হয়েছে বান্দা জীবদ্দশায় যেগুলো থেকে তওবা করেনি। কেননা, কুরআন-হাদীছের অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(১০০) সূরা আদিয়াত, মক্কী
১১ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ①	(১) শপথ সে সকল ঘোড়ার, যারা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ায়।
فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ②	(২) অতঃপর (পাথরের উপর) ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।
فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ③	(৩) অতঃপর প্রভাতকালে অভিযান করে।
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ④	(৪) অতঃপর সে সময়ে ধূলি উড়ায়।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤	(৫) অতঃপর সে সময়ে শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ⑥	(৬) নিশ্চয় (কাফের) মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ⑦	(৭) আর এটা সে নিজেও ভালোভাবে অবগত আছে।
وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ⑧	(৮) এবং সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল।
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ⑨	(৯) তার কি সে সময়টি জানা নেই যখন কবরে যা আছে তা পুনরুত্থিত হবে।
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ⑩	(১০) এবং অন্তরসমূহে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে।
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ⑪	(১১) নিশ্চয় সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

শব্দার্থ

وَالْعٰدِيٰتِ শপথ সে সকল ঘোড়ার যারা দৌড়ায়, ضَبْحًا হাঁপাতে হাঁপাতে, فَالْمُوْرِيٰتِ অতঃপর অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে, قَدْحًا (পাথরের উপর) ক্ষুরাঘাতে, فَالْمُغِيْرٰتِ অতঃপর অভিযান করে, صُبْحًا প্রভাতকালে, فَاَثَرْنَ অতঃপর সে উড়ায়, بِهٖ সে সময়ে, نَقْعًا ধূলি, فَوَسَطْنَ অতঃপর সে ঢুকে পড়ে, بِهٖ সে সময়ে, جَمْعًا শত্রুদলের অভ্যন্তরে, اِنَّ নিশ্চয়, الْاِنْسَانَ (কাফের) মানুষ, لِرَبِّهٖ স্বীয় প্রতিপালকের, لَكَنُوْدٌ বড়ই অকৃতজ্ঞ, । وَ اِنَّهٗ আর অবশ্যই সে, عَلٰى ذٰلِكَ এবিষয়ে, لَشَهِيْدٌ স্বাক্ষী (অর্থাৎ, ভালভাবে অবগত আছে), لِحُبِّ الْخَيْرِ ধন-সম্পদের মোহে, لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত প্রবল, اَفَلَا يَعْلَمُ সে কি জানে না, اِذَا যখন, بُعْثِرَ পুনরুত্থিত হবে, مَا যা কিছু, فِى الْقُبُوْرِ কবরে আছে, حُصِّلَ প্রকাশ করা হবে, مَا যা কিছু, فِى الصُّدُوْرِ অন্তরসমূহে আছে, اِنَّ নিশ্চয়, رَبَّهُمْ তাদের প্রতিপালক, بِهِمْ তাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে, يَوْمَئِذٍ সেদিন, لَّخَبِيْرٌ পূর্ণ অবহিত আছেন।

সূরার সারমর্ম

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা জেহাদ ও সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। শপথ করার উদ্দেশ্য হল নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত করে প্রকাশ করা। কুরআনে কারীম যে বস্তুর শপথ করে কোন

www.maktabatulabrar.com

বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী স্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হলো, সামরিক অশ্বযুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে কত কঠোর খেদমতই না আঞ্জাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস পানি মানুষ দেয় তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখ সে মানুষের কতটুকু অনুগ্রহ কীভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য কর, আল্লাহ তাআলা তাকে একফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অথচ মানুষ এতসব উচ্চ অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। সে বড়ই অকৃতজ্ঞ! (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

আরবের লোকেরা অশ্বারোহণে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে অশ্ব ব্যবহারে খুব পটু ছিল। অতএব এ কসমগুলো তাদের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

তাফসীর

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا (অতঃপর [পাথরের উপর] ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।)

লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে, তখন অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হয়।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا (অতঃপর প্রভাতকালে অভিযান করে।)

আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্বশত রাতের অন্ধকারে হানা দেয়াকে দূষণীয় মনে করত।

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا (অতঃপর সে সময়ে [প্রভাতকালে] ধূলো উড়ায়।)

প্রভাতকালে ধূলো উড়া ঘোড়ার অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, সাধারণত এটা ধূলো উত্থিত হওয়ার সময় নয়। এ সময় ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলো উড়তে পারে। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ (নিশ্চয় [কাফের] মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।)

নিশ্চয় কাফের মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের বড়ই অকৃতজ্ঞ। যখন সে একটা বিশ্বস্ত প্রাণীর তুল্যও কৃতজ্ঞতা আনুগত্য প্রকাশ করতে পারল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

মানুষ অকৃতজ্ঞ। সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ও অনুগ্রহকে ভুলে যায়, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা ভিন্ন। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ (আর এটা সে নিজেও ভালভাবে অবগত আছে।)

অর্থাৎ, মানুষ নিজেই নিজের কৃতঘ্নতার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। একটু চিন্তা করলেই তার হৃদয় তাকে বলে দিবে তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ (এবং সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল।)

অর্থাৎ, লোভ-লালসা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়ে সে তার পরিণতিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বসেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

মানুষ ধন-সম্পদের লালসায় মত্ত। ঈমানদারগণ ও সৎকর্ম পরায়ণশীলগণ ব্যতীত। (আইছারুত্তাফাসীর)

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ (তার কি সে সময়টি জানা নেই যখন কবরে যা আছে তা পুনরুত্থিত হবে।)

অর্থাৎ, সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন মৃতদেহসমূহকে কবর থেকে জীবিত করে বের করা হবে। তখন তারা দেখতে পাবে এ মাল তাদের কী কাজে আসবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ حُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ (এবং অন্তরসমূহে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে।)

অর্থাৎ, ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দ যা কিছু অন্তরে লুক্কায়িত আছে সেদিন সব কিছু প্রকাশ পেয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ (নিশ্চয় সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।)

অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ তাআলা সববিষয়ে সর্বদা সবিশেষ অবগত আছেন; কিন্তু কেয়ামত দিবসে এ কথার ইল্‌ম সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর কারো অস্বীকার করার কোন অবকাশ থাকবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০১) সূরা ক্বারিয়াহ, মক্কী
১১ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلْقَارِعَةُ ①	(১) সেই করাঘাত কারী ঘটনা,
مَا الْقَارِعَةُ ②	(২) কী সেই করাঘাত কারী ঘটনা,?
وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ③	(৩) তুমি কিছু জান কি কেমন সে সেই করাঘাত কারী ঘটনা,?
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ④	(৪) যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের ন্যায় হয়ে যাবে।
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑤	(৫) এবং পাহাড়সমূহ ধূনিত রংগিন পশমের মত হয়ে যাবে।

শব্দার্থ

اَلْقَارِعَةُ মহাপ্রলয়, قرع শব্দের অর্থ খট খট করা, সজোরে আঘাত করা, যাতে ভীষণ শব্দ হয় এবং এরূপ সজোরে আঘাতকারীকে قارع বলা হয়। এখানে এ শব্দটি কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় কেয়ামত শব্দটি স্ত্রীবাচক, তাই এখানে قارع ব্যবহার না করে قارعة স্ত্রীবাচক ব্যবহার করা হয়েছে। مَا الْقَارِعَةُ কী সে মহাপ্রলয়? وَ مَآ اَدْرٰىكَ তুমি কিছু জান কি? مَا الْقَارِعَةُ কেমন সে মহাপ্রলয়, يَوْمَ যেদিন, يَكُوْنُ হয়ে যাবে, النَّاسُ মানুষ, كَالْفَرَاشِ পতংগের ন্যায়, الْمَبْثُوْثُ বিক্ষিপ্ত, تَكُوْنُ হয়ে যাবে, الْجِبَالُ পাহাড়সমূহ, كَالْعِهْنِ রঙ্গিন পশমের মত, الْمَنْفُوْشِ ধূনিত।

তাফসীর

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ (তুমি কিছু জান কি কেমন সে মহাপ্রলয়?)

অর্থাৎ, কেয়ামতের সে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা কী বর্ণনা করা হবে? এর কিছুমাত্র নিদর্শন সামনে বর্ণনা করা হল, যাতে তার ভীষণতা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ (যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হয়ে যাবে।)

অর্থাৎ, প্রত্যেকে অস্থির চিত্তে এক এক দিকে ছুটাছুটি করবে। এখানে দুর্বলতা, অস্থিরতা ও সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে মানুষকে পঙ্গপালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ (এবং পাহাড়সমূহ ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত হয়ে যাবে।)

ধূনকার যেমন পশম বা তুলাকে ধূনিত করে উড়িয়ে দেয়, তেমনি পাহাড় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। রঙ্গিন পশমের সাথে সম্ভবত এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, তা খুবই দুর্বল ও হালকা হয়ে থাকে। তাছাড়া কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে পাহাড়েরও বিভিন্ন প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ومن الجبال جده بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অতঃপর (আমল ওজন করার পর) যার (ঈমানের) পালা ভারী হবে,	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦
(৭) সে তো বাসনারূপ জীবনযাপন করবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧
(৮) আর যার (ঈমানের) পালা হালকা হবে,	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨
(৯) তবে তার বাসস্থান হবে 'হাবিয়াহ'।	فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩
(১০) আর তোমার কিছু জানা আছে তা কী জিনিস?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠
(১১) তা লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত আগুন।	نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

فَاَمَّا অতঃপর, مَنْ যার, ثَقُلَتْ ভারী হবে, مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা, فَهُوَ সে তো, فِيْ عِيْشَةٍ জীবন যাপন করবে, رَّاضِيَةٍ বাসনারূপ, وَ اَمَّا مَنْ আর যার, خَفَّتْ হালকা হবে, مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা, فَاُمُّهٗ তবে তার বাসস্থান হবে, هَاوِيَةٌ 'হাবিয়াহ', مَآ اَدْرٰىكَ তোমার কিছু জানা আছে, مَا هِيَهْ তা কী জিনিস? نَارٌ আগুন, حَامِيَةٌ লেলিহান শিখায় প্রজ্জ্বলিত।

তাফসীর

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ . فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (অতঃপর (আমল ওজন করার পর) যার (ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে তো বাসনারূপ জীবনযাপন করবে।)

আমলের ওজন প্রসঙ্গ

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় যে, সম্ভবত বান্দার আমলের ওজন দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারী এবং কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। অতঃপর মু'মিনদের মধ্যে নেককার ও বদকারের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজনকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে– কুরআন পাকে সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মশীল মু'মিনদের শাস্তি ও প্রতিদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা নেক ও বদ মিশ্র আমল করে কুরআন পাকে সাধারণভাবে তাদের শাস্তি বা প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের আমল ওজন করা হবে, গণনা করা হবে বলা হয়নি। আর আমলের ওজন বাড়ে ইখলাস ও নিষ্ঠা এবং সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে। সুতরাং যার আমল যত ইখলাস ও আন্তরিকতাপূর্ণ হবে এবং সুন্নাত অনুযায়ী হবে, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন তত বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, সদকা খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু ইখলাস ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে। আল্লাহর নিকট আমলের পরিমাণের চেয়ে আমলের অন্তর্নিহীত কাইফিয়্যাতের মূল্য অধিক।

ইখলাস ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আমলের ওজন বাড়ে। কাজেই আল্লাহর কাছে কেবল সংখ্যা নয় গুণগত মানই অধিক পছন্দনীয়।

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ . فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ **(আর যার [ঈমানের] পাল্লা হালকা হবে, তার বাসস্থান হবে 'হাবিয়াহ'।)**

৮ ও ৯ নং আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় কেয়ামতের দিন বান্দার ভাল-মন্দ সব আমল ওজন করা হবে।

(১০২) সূরা তাকাছুর, মক্কী
৮ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١	(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে।
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢	(২) এমনকি তোমরা কবরসমূহে গিয়ে উপনীত হও।
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣	(৩) (পার্থিব ধন সম্পদ) কখনও (গর্বের বস্তু) নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤	(৪) আবারও (তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে,পার্থিব ধন-সম্পদ) কখনও (গর্বের বস্তু এবং আখেরাত কখনও ভুলে থাকার বিষয়) নয়। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥	(৫) কখনও নয় যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে (তাহলে কখনও এমন অহংকার ও গাফিলতির শিকার হতে না)।
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦	(৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧	(৭) আবার বলছি, নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে যা চাক্ষুষ প্রত্যয়।
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨	(৮) অতঃপর (আরেকটি কথা শোন) অবশ্যই তোমরা সেদিন সকলেই নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

শব্দার্থ

اَلْهٰكُمُ তোমাদেরকে গাফিল করে রাখে, التَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, حَتّٰى এমনকি, زُرْتُمُ তোমরা উপনীত হও, الْمَقَابِرَ কবরসমূহে গিয়ে, كَلَّا কখনও নয়, سوف শীঘ্রই, تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে, ثُمَّ আবারও (তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে), كَلَّا কখনও নয়, سَوْفَ অচিরেই, تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে

www.maktabatulabrar.com

পারবে, كَلَّا কখনও নয়, لو যদি, تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে, عِلْمَ الْيَقِيْنِ নিশ্চিতরূপে, لَتَرَوُنَّ তোমরা অবশ্যই দেখবে, الْجَحِيْمَ জাহান্নাম, ثُمَّ আবার বলছি, لَتَرَوُنَّهَا নিশ্চয় তোমরা তা দেখবে, عَيْنَ الْيَقِيْنِ যা চাক্ষুষ প্রত্যয়, ثُمَّ অতঃপর (আরেকটি কথা শোন), لَتُسْئَلُنَّ অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে, يَوْمَئِذٍ সেদিন, عَنِ النَّعِيْمِ নেয়ামত সম্বন্ধে।

তাফসীর

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ **(প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে।)**

আয়াতের মর্ম হল ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে। কারণ, তোমরা পরকালকে বিশ্বাস কর না। আর এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় এবং মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। তখন গিয়ে তোমাদের হুঁশ হয় যে, তোমরা মারাত্মক উদাসীনতা এবং ভুলের মাঝে লিপ্ত ছিলে। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ **(এমনকি তোমরা কবরসমূহে গিয়ে উপনীত হও।)**

এখানে 'কবরসমূহে গিয়ে উপনীত হও'-এর অর্থ হল কবরে পৌছা। (মাআরিফুল কুরআন)

এ আয়াত থেকে আযাবে কবরের সত্যতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ([পার্থিব ধন-সম্পদ] কখনও [গর্বের বস্তু] নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।)

অর্থাৎ, তোমরা কবরে উপনীত হয়েই জানতে পারবে বা কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েই জানতে পারবে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ গর্বের বস্তু ছিল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, পার্থিব ধন-সম্পদ কখনও গর্বের বস্তু এবং আখেরাত কখনও ভুলে থাকার বিষয় নয়। (বয়ানুল কুরআন)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ **(কখনও নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে [তাহলে কখনও এমন অহংকার ও গাফলতের শিকার হতে না]।)**

অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে তোমরা মৃত্যুর পর নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে তা যদি তোমরা পূর্বেই দলীল প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত অবগত হতে, তাহলে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং আখেরাত থেকে উদাসীন হতে না। (বয়ানুল কুরআন)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ **(আবার বলছি, নিশ্চয় তোমরা তা [জাহান্নাম] এমন দেখা দেখবে যা চাক্ষুষ প্রত্যয়।)**

عين اليقين এর অর্থ এমন প্রত্যয় যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। কেবল দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যয় নয়, এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। (বয়ানুল কুরআন)

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (অতঃপর [আরেকটি কথা শোন] অবশ্যই তোমরা সেদিন সকলেই নেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।)

পূর্ববর্তী সম্বোধনগুলো কাফেরদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছিল। আর এ আয়াতের সম্বোধনটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আয়াতের মর্ম হল তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, সে নেয়ামতসমূহের শোকর তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর আনুগত্য করেছ কি না এবং পাপ কাজে তা ব্যয় করেছ কি না? (বয়ানুল কুরআন)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন কাফের সকলকেই আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অতএব আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় না করে ধন-সম্পদের মোহে মত্ত থাকা খুবই গর্হিত কাজ। আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করার তরীকা হল মুখেও শোকর আদায় করা এবং আমলের মাধ্যমেও শোকর আদায় করা।

(১০৩) সূরা আসর, মক্কী
৩ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَالْعَصْرِ ۝١	(১) শপথ কালের।
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢	(২) নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣	(৩) কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলসমূহ করেছে এবং একে অন্যকে হকের উপর অটল থাকার উপদেশ দিতে থাকে এবং পরস্পরকে (নেক আমলের) পাবন্দ থাকার (ধৈর্য ধারণ করার) উপদেশ দিতে থাকে। (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।)

শব্দার্থ

وَ الْعصْرِ শপথ কালের, اِنَّ নিশ্চয়, الْاِنْسَانَ মানুষ, لَفِيْ خُسْرٍ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, اِلَّا কিন্তু, الَّذِيْنَ যারা, اٰمَنُوْا ঈমান এনেছে, وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক আমল করেছে, وَ تَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে, بِالْحَقِّ হকের উপর অটল থাকার, وَ تَوَاصَوْا এবং পরস্পরকে উপদেশ দিতে থাকে, بِالصَّبْرِ (নেক আমলের) পাবন্দ থাকার।

www.maktabatulabrar.com

সূরার সারমর্ম

সূরা আসর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ততম সূরা। কিন্তু এমনই অর্থপূর্ণ যে, মানুষের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা কালের কসম করে বলেছেন, মানব-জাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। তবে এ ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে। যথা:-

(১) ঈমান,
(২) নেক আমল,
(৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দান ও
(৪) আল্লাহর পথে কষ্ট-ক্লেশের উপর সবর এবং নেক আমলের উপর পাবন্দ থাকার জন্যে একে অন্যকে উপদেশ দান।

এ চারটি আমলের প্রথম দুটি আত্মসংশোধনের সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে প্রথমত মানুষ নিজে কামেল ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়। আর শেষ দুটি অন্যের হেদায়াত ও সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত। এটা হল তাকমীল তথা অন্যকে পরিপূর্ণ ও সংশোধিত করার সাধনা।

স্মর্তব্য যে, মানুষের সব কর্ম, গতি-বিধি, উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছু কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এ সূরায় যেসব আমলের আদেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও কালেরই দিবা রাত্রিতে সংঘটিত হয়, তাই কালের শপথ করা হয়েছে।

সূরার শিক্ষা

এ সূরা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নাজাতের জন্যে নিজের আমল সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং অন্যকে সত্যের প্রতি আহ্বান করাও জরুরী। বিশেষত নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অধীনস্তদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা একটি অবশ্য পালনীয় ওয়াজিব।

(১০৪) সূরা হুমাযাহ, মক্কী
৯ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١	(১) অতিশয় অনিষ্ট রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যে, যে (কারো) অগোচরে নিন্দা করে (এবং) সাক্ষাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।
الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢	(২) যে (লোভের আতিশয্যে) সম্পদ জমায় এবং তা বারবার গণনা করে।
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣	(৩) সে ধারণা করে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে।

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤	(৪) কখনও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥	(৫) আর তুমি কিছু জান কি 'হুতামাহ' কী?
نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦	(৬) তা আল্লাহর আগুন যা (তাঁর নির্দেশে) প্রজ্বলিত করা হয়েছে।
الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧	(৭) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨	(৮) তা (আগুন) তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে।
فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩	(৯) (এভাবে যে, তারা আগুনের) সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে (বেষ্টিত হবে)।

শব্দার্থ

وَيْلٌ অতিশয় অনিষ্ঠ রয়েছে, لِّكُلِّ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যে, هُمَزَةٍ যে (কারো) অগোচরে নিন্দা করে, لُّمَزَةٍ সাক্ষাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, الَّذِيْ যে, جَمَعَ জমায়, مَالًا সম্পদ, وَّ عَدَّدَهٗ এবং তা বার বার গণনা করে, يَحْسَبُ সে ধারণা করে যে, مَالَهٗ তার ধন-সম্পদ, اَخْلَدَهٗ চিরকাল তার সাথে থাকবে, كَلَّا কখনও নয়, لَيُنْۢبَذَنَّ সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে, فِي الْحُطَمَةِ হুতামায়, مَا اَدْرٰىكَ তুমি কিছু জান কি, مَا الْحُطَمَةُ হুতামাহ কী, نَارُ اللّٰهِ আল্লাহর আগুন, الْمُوْقَدَةُ যা (তাঁর নির্দেশে) প্রজ্বলিত করা হয়েছে, تَطَّلِعُ পৌছবে, عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে, اِنَّهَا তা (আগুন) عَلَيْهِمْ তাদের উপর, مُّؤْصَدَةٌ আবদ্ধ করে দেয়া হবে, فِيْ عَمَدٍ (এই ভাবে যে, তারা আগুনের) স্তম্ভসমূহের মধ্যে (বেষ্টিত হবে।), مُّمَدَّدَةٍ সুদীর্ঘ।

সূরার সারমর্ম

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে,

(১) গীবত তথা পশ্চাতে পরনিন্দা করা,

(২) সামনা সামনি কাউকে মন্দ বলা, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। এ দুটি কাজই মারাত্মক গোনাহ।

(৩) অর্থ সঞ্চয় তথা অর্থ লিপ্সা। এখানে অর্থ সঞ্চয় বলে এমন অর্থ সঞ্চয়কে বুঝানো হয়েছে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয়, কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়। কারণ, কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ সাক্ষ্য দেয় যে, মাল জমা করা সর্বাবস্থায় হারাম নয়।

www.maktabatulabrar.com

তাফসীর

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (অতিশয় অনিষ্ট রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যে, যে [কারো] অগোচরে নিন্দা করে [এবং] সাক্ষাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।)

আয়াত থেকে বোঝা গেল গীবত তথা পরনিন্দা করা, কাউকে দোষারোপ করা এবং কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হারাম ও জঘন্য অপরাধ।

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ (যে [লোভের আতিশয্যে] সম্পদ জমায় এবং তা বার বার গণনা করে।)

মালের অতিশয় মহব্বত ও খুশীতে সে বার বার গণনা করে এবং এতে মজা পায়। (বয়ানুল কুরআন)

আয়াত থেকে বোঝা গেল– অর্থ লিপ্সা একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি এবং এটা বহু আত্মিক ব্যাধির উৎস। বরং বহু অপরাধের উৎস। অর্থ লিপ্সা থেকেই মানুষ হালাল-হারামের বাছ-বিচার ছেড়ে দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের পথে অগ্রসর হয়, অন্যকে ঠকায়, অন্যের সম্পদ আত্মাসাৎ করে। এভাবে অর্থ লিপ্সা বহু পাপের মূল।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ (সে ধারণা করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে।)

অর্থাৎ, তার অবস্থা দেখে মনে হয় এ সম্পদ কখনও তার থেকে পৃথক হবে না, বরং তার সম্পদ তাকে সর্বদা আসমানী যমিনী বিপদ থেকে রক্ষা করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (কখনও নয়। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।)

অর্থাৎ, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তার মাল তো কবর পর্যন্তও তার সাথে যাবে না। সকল ধন-সম্পদ এমনিই পড়ে থাকবে। আর সে হতভাগা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

حطمة (হুতামাহ) এমন আগুনকে বলে, যা তার মাঝে নিক্ষিপ্ত সব কিছুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ (তা আল্লাহর আগুন যা [তাঁর নির্দেশে] প্রজ্বলিত করা হয়েছে, যা [শরীরে লাগা মাত্রই] হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।)

অর্থাৎ, এ আগুন কোন মানুষের প্রজ্বলিত নয়। আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা শরীরে লাগতেই হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌছে যাবে। দুনিয়ার আগুণে প্রথম শরীর আক্রান্ত হয়, তা থেকে হৃদয়ে উপলব্ধি পৌছে, পক্ষান্তরে জাহান্নামের আগুণ প্রথমেই হৃদয়ে গিয়ে পৌছবে। তাই বলা হয়েছে এ আগুন শরীরে লাগা মাত্রই হৃদপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ (তা [সে আগুন] তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে।)

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করত দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং বের হবার কোন পথ থাকবে না (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০৫) সূরা ফীল, মক্কী
৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) তোমার কি জানা নেই যে, তোমার প্রতিপালক হাতীওয়ালাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি।	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ②
(৩) এবং তাদের উপর তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।	وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③
(৪) যারা তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করছিল।	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④
(৫) সুতরাং তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভুসি সদৃশ করে দিলেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

শব্দার্থ

اَلَمْ تَرَ তোমার কি জানা নাই যে, كَيْفَ কীরূপ, ব্যবহার করেছেন, رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক, بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ হাতী ওয়ালাদের সাথে, اَلَمْ يَجْعَلْ তিনি কি করে দেননি, كَيْدَهُمْ তাদের চক্রান্তকে, فِىْ تَضْلِيْلٍ ব্যর্থ, اَرْسَلَ তিনি প্রেরণ করেন, عَلَيْهِمْ তাদের উপর, طَيْرًا পক্ষী, اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে, تَرْمِيْهِمْ যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করছিল, بِحِجَارَةٍ পাথর, مِّنْ سِجِّيْلٍ কংকর জাতীয়, فَجَعَلَهُمْ সুতরাং তিনি তাদেরকে করে দিলেন, كَعَصْفٍ ভূষি সদৃশ, مَّاْكُوْلٍ ভক্ষিত।

তাফসীর

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (তোমার কি জানা নেই যে, তোমার প্রতিপালক হাতী ওয়ালাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?)

الم تر -এর শাব্দিক অর্থ হল তুমি কি দেখনি? ভাবার্থ করা হয়েছে, তোমার কি জানা নেই? বু ঝানো হয়েছে যে, হাতীওয়ালাদের সাথে তোমার রব যে ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই তোমার জানা আছে। কেননা, এ ঘটনা হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত

www.maktabatulabrar.com

হয়েছিল এবং লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। এমন নিকটতম যুগের এবং সর্বজনবিদিত হওয়ার কারণে এর ইল্‌ম ও জানাকে কুরআনে কারীম বা দেখা দ্বারা প্রকাশ করেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

আসহাবে ফীল তথা হাতীওয়ালাদের ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:-

হাবশার বাদশাহের পক্ষ থেকে আবরাহা নামক এক ব্যক্তি ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন। তিনি সমগ্র আরবের লোকদেরকে হজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করতে দেখে ইচ্ছা করলেন, যেন লোকেরা মক্কায় না গিয়ে তার কাছে সমবেত হয়। কৌশল হিসাবে তিনি স্বীয় খ্রিষ্টান ধর্মের নামের উপর একটি আলীশান গির্জা নির্মাণের মনস্থির করলেন। যেখানে সবধরনের সুযোগ সুবিধা থাকবে। এভাবে মানুষ সাধা-সিধা ধাঁচের তৈরী কাবা গৃহকে ছেড়ে কারুকার্য খচিত গির্জার দিকে ছুটে আসবে। সুতরাং তিনি ইয়ামানের সানআয় বিপুল অর্থ ব্যয় করে কৃত্রিম কাবা নির্মান করেন। কিন্তু কেউ সেদিকে মুখ তুলে চাইল না। বিশেষত আরবের কুরাইশরা এ সংবাদ জানতে পেরে খুবই ক্রোধান্বিত হয় এবং রাগের মাথায় কেউ সেখানে গিয়ে মল নিক্ষেপ করে। ভিন্ন মতে কতিপয় আরব অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল যা বাতাসে উড়ে গিয়ে গির্জার গায়ে লাগে। 'আবরাহা' রাগে ক্রোধে খানায়ে কাবা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী ও হাতি নিয়ে সদম্ভে রওয়ানা হয়। পথে কোন আরব গোত্র বাধা দিলে তাদেরকে পরাভূত করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে হস্তিবাহিনী সামনে এগিয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের পিতামহ খাজা আব্দুল মুত্তালিব তখন কুরাইশের সর্দার এবং কাবা গৃহের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি এ সংবাদ জানতে পেরে লোক সকলকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। কাবা যার ঘর তিনি স্বয়ং তার হেফাজত করবেন। পথ পরিষ্কার দেখে আবরাহার বিশ্বাস জন্মাল যে, 'কাবা' ধ্বংস করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মক্কার নিকটবর্তী ওয়াদি-এ মুহাসসার নামক স্থানে পৌঁছে তারা সমুদ্রের দিক থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে সবুজ ও হলুদ বর্ণের পাখি দেখতে পেল। প্রত্যেক পাখির ঠোঁটে এবং পায়ে ছোট ছোট কংকর ছিল। এ অদ্ভূত পাখিকুল দলে দলে হস্তি বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে থাকল। আল্লাহর কী অপার কুদরত, সে কংকরগুলো বন্দুকের গুলির চেয়েও অধিক কার্যকরী ছিল। যার গায়ে পড়ত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যেত এবং মারাত্মক বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দিত। অনেকে সেখানেই ধ্বংস হয়েছে। যারা পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে তারা বিভিন্ন রকমের মারাত্মক কষ্ট ভোগ করে মারা গেছে। এ ঘটনা হযরত রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়। ভিন্ন মতে ঠিক ঐ দিনেই রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মলাভ করেন। যেন এটা দুনিয়াতে তাঁর আগমনের আগমনী বার্তা ছিল এবং একটি গায়েবী ইঙ্গিত ছিল যে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বীয় ঘর 'কাবার' হেফাজত করেছেন তেমনি স্বীয় নবীরও হেফাজত করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ **(এবং তাদের উপর তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন।)**

ابابيل শব্দটি ابالة এর বহুবচন। এর অর্থ পাখির ঝাঁক, কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়, এ পাখি আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

موثر وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হলেন حقيقى তথা সবকিছুর প্রকৃত কর্মবিধায়ক। যাহেরী আসবাব ও উপায়-উপকরণ উপলক্ষ্য মাত্র। (বয়ানুল কুরআন)

আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তাআলা হলেন কাদিরে মুত্লাক তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস দ্বারাও বিশাল শক্তিধর বাহিনীকে নির্মূল করে দিতে পারেন। অতএব কাফের শক্তিদের এ কথা মনে রেখে মুসলমানদের শক্তির দুর্বলতা দেখে তাদেরকে নির্মূল করে দেয়ার চিন্তা থেকে বিরত হওয়া উচিত। আবার মুসলমানদেরও কাফেরদের শক্তি দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়া উচিত নয়। তাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী সামান সংগ্রহের পর আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা রেখে চলতে হবে।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (যারা [পাখিগুলি] তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করছিল।)

ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয় সে কংকরকে سجيل বলা হয়। আল্লাহ তাআলার কুদরতে এ কংকরসমূহ গুলির চেয়ে বেশী কাজ করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ (সুতরাং তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষি সদৃশ করে দিলেন।)

عصف শব্দের অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-ভিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটাকে চর্বন করে তখন এ তৃণ আর তৃণ থাকে না। আল্লাহর অপার কুদরতে কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহা বাহিনীর অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(১০৬) সূরা কুরাইশ, মক্কী
৪ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①	(১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে,
اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ②	(২) অর্থাৎ, শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③	(৩) অতএব (এ নেয়ামতের শোকর আদায় করণার্থে) তাদের উচিৎ যেন তারা এ কাবা গৃহের মালিকের ইবাদত করে।
الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④	(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, আর ভয়-ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

لِاِيْلٰفِ অভ্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে, قُرَيْشٍ কুরায়শদের, رِحْلَةَ সফরের, الشِّتَآءِ শীত, الصَّيْفِ গ্রীষ্ম, فَلْيَعْبُدُوْا অতএব তারা যেন ইবাদত করে, رَبَّ মালিকের, الْبَيْتِ এ (কাবা) গৃহের, الَّذِىْٓ যিনি, اَطْعَمَهُمْ তাদেরকে আহার দিয়েছেন, مِّنْ جُوْعٍ ক্ষুধায়, اٰمَنَهُمْ তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, مِّنْ خَوْفٍ ভয়-ভীতি হতে।

তাফসীর

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۔ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ **(যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।)**

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগ বাগিচাও নেই, যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহের উপর মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সেমতে তারা বছরে দু'টি বাণিজ্যিক সফরে অভ্যস্ত ছিল। একটি শামে, অপরটি ইয়ামানে। শাম ঠান্ডা দেশ ছিল বিধায় গ্রীষ্মকালে তারা শাম সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামান গরম দেশ হওয়ার কারণে তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহ শরীফের খাদেম হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদ-আপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ তথা নেয়ামতের তুলে ধরে পরবর্তী আয়াতে এসব নেয়ামতের শোকর আদায় করা কথা বলেছেন। সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ **(অতএব [এ নেয়ামতের শোকর আদায় করণার্থে] তাদের উচিৎ যেন তারা এ কাবা গৃহের মালিকের ইবাদত করে।)**

নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কুরাইশদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এ গৃহের মালিকের ইবাদত কর। যেহেতু এ গৃহই তোমাদের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। এ গৃহের বরকতেই তোমরা নিরাপদে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করছ। শান্তি ও সম্মানের জীবনযাপন করছ। তবুও সে গৃহের মালিকের ইবাদত কেন করছ না? তাঁর প্রিয় নবীকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? এটা কি চরম অকৃতজ্ঞতা নয়? যদি তাত্ত্বিক আলোচনা না বুঝ, তবে এ মোটাকথা বুঝতে তো কোন অসুবিধে থাকার কথা নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ **(যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, আর ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।)**

অর্থাৎ, সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার সমস্তই আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। পানাহারের যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়েছেন। দেশে বিদেশে শান্তি, নিরাপত্তা এবং বিরল সম্মান দান করেছেন। অতএব সেই খোদার জন্য তাদের নিবেদিত হওয়া উচিত। এভাবে সকলেরই আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত।

সূরার শিক্ষণীয় বিষয়াদি

● আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব এবং তদীয় প্রদত্ত নেয়ামতকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।

● ইবাদত একমাত্র আল্লাহর ওয়াজিব।

● হযরত মির্যা মাযহার জানে জানান (রহ.) বলেছেন, সবধরনের বালা-মুসীবত দূর করার জন্যে সূরা কুরাইশ একটি পরীক্ষিত ও অব্যর্থ আমল। (মাআরিফুল কুরআন)

● কোন দ্বীনী বিষয়ের কল্যাণে কেউ ধন-সম্পদ বা মান-মর্যাদা প্রাপ্ত হলে যেমন বায়তুল্লাহর বরকতে কুরাইশরা লাভ করেছিল, তার উচিৎ কোন প্রকার অহমিকায় লিপ্ত না হয়ে এবং একে নিজের প্রাপ্য হক মনে না করে আল্লাহর শোকর ও আনুগত্যে মশগুল থাকা। (বয়ানুল কুরআন)

(১০৭) সূরা মা'উন, মক্কী
৭ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে?	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ①
(২) সুতরাং (তুমি যদি সে ব্যক্তির অবস্থা শুনতে চাও তবে শোন) সে তো সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।	فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ②
(৩) আর সে অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে উৎসাহ দেয় না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③
(৪) অতএব বড় সর্বনাশ এমন নামাজিদের জন্যে,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④
(৫) যারা স্বীয় নামাজ ভুলে থাকে।	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤
(৬) (আর) যারা এরূপ যে, (যখন নামাজ পড়ে তখন) রিয়াকারী করে। (অর্থাৎ, লোক দেখানো নামায পড়ে)	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑥
(৭) এবং তারা যাকাত মোটেই দেয় না।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑦

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

اَرَءَيْتَ তুমি কি দেখেছ, الَّذِىْ সে ব্যক্তিকে যে, يُكَذِّبُ মিথ্যা সাব্যস্ত করে, بِالدِّيْنِ প্রতিফল দিবস কে, فَذٰلِكَ সুতরাং সে তো, الَّذِىْ সেই ব্যক্তি যে, يَدُعُّ ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়, الْيَتِيْمَ এতীমকে, لَا يَحُضُّ সে উৎসাহ দেয় না, لِلْمُصَلِّيْنَ এমন নামাযীদের জন্যে, الَّذِيْنَ যারা, هُمْ তারা, عَنْ صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামায, سَاهُوْنَ ভুলে থাকে, هُمْ যারা এরূপ যে, يُرَآءُوْنَ রিয়াকারী করে, وَ يَمْنَعُوْنَ তারা মোটেই দেয় না, الْمَاعُوْنَ যাকাত।

সূরার সারমর্ম

এ সূরায় কাফের ও মুনাফেকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মু'মিন ব্যক্তি যেহেতু বিচার দিবসকে অস্বীকার করে না, সেহেতু তার থেকে এসব দুষ্কর্ম হয়ে গেলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠোর গোনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও এ সূরায় বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য হবে না। এ কারণে সূরার প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কোন অবিশ্বাসী কাফেরই এসব করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম সমূহ হল,

(১) এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার।
(২) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেয়া।
(৩) লোক দেখানো নামায পড়া এবং
(৪) যাকাত না দেয়া।

এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয়, কঠোর গোনাহ। আর যদি কেউ কুফরবশত এসব কর্ম করে তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখ বাস। সূরায় বড় সর্বনাশ বলে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

তাফসীর

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ **(তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ, যে প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।)**

অর্থাৎ, সে কাফের মনে করে শেষ বিচার হবে না। ভালো-মন্দের কোন প্রতিফল মিলবে না। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এখানে 'দ্বীন' অর্থ ইসলাম ধর্ম। অর্থাৎ, সে দ্বীনকে অস্বীকার করে, তার কাছে দ্বীন বলতে কিছুই নেই।

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ **(সে তো সেই ব্যক্তি যে এতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।)**

অর্থাৎ, এতীমের প্রতি সহমর্মিতা দূরের কথা বরং তার সাথে নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আয়াত থেকে বোঝা গেল, এতীমের প্রতি রূঢ় ব্যবহার এবং অভাবী ও দরিদ্রজনকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কাফেরের কাজ। মু'মিনের মাঝে এসব মন্দগুণ না থাকা চাই।

وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ **(আর সে অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে উৎসাহ দেয় না।)**

অর্থাৎ, সে এতখানি জঘন্য কৃপণ, না নিজে অভাবীকে খাদ্য দান করে, না অন্যদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এতীম ও গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া করা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে একটি উত্তম চরিত্র বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এহেন সর্ববাদী গুণ থেকেও বঞ্চিত হয় সে মানুষ নয়, পশু। দ্বীন-ধর্মের সাথে তার কী সম্পর্ক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ **(অতএব বড় সর্বনাশ এমন নামাযীদের জন্যে, যারা স্বীয় নামায ভুলে থাকে।)**

এটা মুনাফেকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী প্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে তারা সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর সুযোগ হলে পড়ে নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই মুনাফেকদের অভ্যাস। ساهون শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, নামাযের প্রতি উদাসীনতা মুনাফেকের গুণ। কোন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে এ দোষ থাকতে পারে না।

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ **(যারা এরূপ যে, রিয়াকারী করে।)**

এখানে মুনাফেকদের আর একটা অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এরূপ, যখন নামায পড়ে তখন রিয়াকারী করে অর্থাৎ, লোক দেখানো নামায পড়ে। শুধু নামাযই শুধু নয়, বরং মুনাফেকদের কোন আমলই রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয় না। আল্লাহকে নয় মাখলূককে সন্তুষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে।)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো, রিয়া হচ্ছে মুনাফেকের গুণ। কোন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে এ দোষ থাকতে পারে না।

وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ **(এবং তারা যাকাত মোটেই দেয় না।)**

যাকাত প্রকাশ্যে প্রদান করা যেহেতু শরীয়তে আদিষ্ট নয়, তাই তারা যাকাত সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলে। পক্ষান্তরে নামায জামাআতের সাথে প্রকাশ্যে আদায় করার নির্দেশ রয়েছে, তাই কখনও কখনও লোক দেখানোর স্থলে পড়ে নেয়। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এখানে বলে এমন ব্যবহার্য বস্তুকে বুঝানো হয়েছে, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয়, যেগুলোর লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়। যেন কুড়াল, কোদাল, রান্না বান্নার পাত্র ইত্যাদি। এ মতানুযায়ী আয়াতের মর্ম হল মুনাফেকদের চরম নীচুতাকে ফুটিয়ে তোলা, তারা যাকাত কী দিবে; ব্যবহার্য জিনিস দেয়ার মধ্যে তারা নেই, এতেও তারা কৃপণতা করে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, কৃপণতা মুনাফেকের গুণ। কোন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে এ দোষ থাকতে পারে না।

সারকথা, এ সূরায় হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা, উদাসীনতা, রিয়া ও কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

(১০৮) সূরা কাউছার, মক্কী
৩ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

(১) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউছার দান করেছি।	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١
(২) অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় আর কুরবানী কর।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢
(৩) নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই লেজকাটা (বে-নাম নিশান হবে)।	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

শব্দার্থ

اِنَّا নিশ্চয়, اَعْطَيْنٰكَ আমি তোমাকে দান করেছি, الْكَوْثَرَ কাউছার, فَصَلِّ অতএব তুমি নামায পড়, لِرَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে, وَانْحَرْ আর কুরবানী কর, اِنَّ নিঃসন্দেহে, شَانِئَكَ তোমার শত্রু الْاَبْتَرُ লেজ কাটা (বে-নাম নিশান হবে)।

শানে নুযূল

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র হযরত কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফেররা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অর্থাৎ নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। তাদের মধ্যে আস ইবনে ওয়ায়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন আলোচনা হলে সে বলত, আরে তাঁর কথা বাদ দাও, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম নেয়ারও কেউ থাকবে না এবং তার প্রচারিত দ্বীনও বাকী থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়।

তাফসীর

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউছার দান করেছি।)

"কাউছার" অর্থ প্রভূত কল্যাণ। পার্থিব-অপার্থিব এবং দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় নেয়ামত এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর ওসীলায় এ উম্মত লাভ করতে থাকবে। সেসব নেয়ামতের মাঝে একটি বড় নেয়ামত হল 'হাউযে কাউছার'। এটা জান্নাতের একটি নহর, যা আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করার ওয়াদা করেছেন।

এ হাউয থেকে কেয়ামতের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে পানি পান করাবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানীন)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহকাল পরকালের অজস্র কল্যাণ প্রদান করেছেন। উভয় জাহানে তাঁকে দান করেছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় আর কুরবানী কর।)

এ আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউছার অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ শোনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দুটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

(১) নামায।

(২) কুরবানী।

নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মাঝে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কুরবানী আর্থিক ইবাদত সমূহের মাঝে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহর নামে কুরবানী করা মুশরিকদের রীতি নীতির বিরুদ্ধে একটি জেহাদ বটে। তারা প্রতিমার নামে কুরবানী করত।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই লেজ কাটা [বে-নাম নিশান হবে]।)

এ সূরায় কাফেরদের উপহাসের জবাব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। কন্যা সন্তানের মাধ্যমে হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অনন্তর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহানী সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিক সংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর সমষ্টি অপেক্ষাও বেশি হবে।

কোন কোন কাফের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কটূক্তি করে বলত, এ ব্যক্তির কোন পুত্রসন্তান নেই। কাজেই মৃত্যুর পর তার নাম নেয়ার কেউ থাকবে না। এমন ব্যক্তিকে তারা ابتر (আবতার) বলে ডাকত। মূলত লেজকাটাকে ابتر বলা হয়। মৃত্যু পরবর্তীতে যার নাম নেয়ার কেউ থাকে না, তাকে লেজকাটার সাথে তুলনা করে 'আবতার' বলা হয়। কাফেরদের এ কটূক্তির জবাবে এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন, অনন্তকাল পর্যন্ত আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে যাঁর নাম, জন্ম অবধি অসংখ্য অগণিত মানব হৃদয়ে যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন, যার আগমনে মানবতা পেয়েছে মুক্তির দিশা, আপন-পর সকলে যাঁর সত্যতা স্বীকার করেছে অকুণ্ঠ চিত্তে, সে মহামানব কোন দিন নির্বংশ হতে পারেন না। তিনি বে-নাম নিশান হবেন না কখনও, বরং তাঁর বিরুদ্ধবাদী শত্রুরাই হয়েছে নাম নিশানহীন। তাদের নাম নেয়ার মতো কেউ আজ পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

ان شانئك هو الابتر থেকে বোঝা যায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। তেমনিভাবে খাটি ওয়ারিছে নবী হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদেরও একই পরিণতি হয়ে থাকে। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। (বয়ানুল কুরআন)

(১০৯) সূরা কাফিরূন, মক্কী
৬ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١	(১) তুমি (সে কাফেরদেরকে) বলে দাও, হে কাফেররা,
لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢	(২) না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি,
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣	(৩) আর না তোমরা আমার মা'বূদের ইবাদত কর।
وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤	(৪) আর না (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব,
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥	(৫) আর না তোমরা আমার মা'বূদের ইবাদত করবে।
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦	(৬) তোমরা তোমাদের প্রতিফল পাবে। আর আমি আমার প্রতিফল প্রাপ্ত হবো।

শব্দার্থ

قُلْ তুমি বলে দাও, يٰٓاَيُّهَا হে, الْكٰفِرُوْنَ কাফেরগণ, لَآ اَعْبُدُ না আমি উপাসনা করি, مَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা যার উপাসনা কর, وَ لَآ اَنْتُمْ আর না তোমরা, عٰبِدُوْنَ ইবাদত কর, مَآ اَعْبُدُ আমি যার ইবাদত করি, وَ لَآ আর না (ভবিষ্যতেও) আমি, عَابِدٌ উপাসনা করব, مَّا عَبَدْتُّمْ তোমরা যার উপাসনা কর, وَ لَآ اَنْتُمْ আর না তোমরা, عٰبِدُوْنَ ইবাদত করবে, مَآ اَعْبُدُ আমি যার ইবাদত করি, لَكُمْ তোমাদের জন্য রয়েছে, دِيْنُكُمْ তোমাদের প্রতিফল, وَ لِيَ আমার জন্য রয়েছে, دِيْنِ (আমার) প্রতিফল।

শানে নুযূল

একবার কতিপয় কুরাইশ সর্দার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসে বলল, আসুন আমরা পরস্পরের মধ্যে এ শান্তি চুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের

উপাসনা করবেন আরেক বছর আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদত করব। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদের ক্রিয়া কর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদতের আদেশ দেয়া হয়।

তাফসীর

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, আর না তোমরা আমার মা'বূদের ইবাদত কর।)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যে সকল কৃত্রিম মা'বূদ রচনা করে রেখেছ, এক্ষণে আমি তোমাদের সে সকল উপাস্যের উপাসনা করি না। আর তোমরাও কোন রূপ শরীক নির্ধারণ ছাড়া সে মহান আল্লাহর ইবাদত কর না আমি যাঁর ইবাদত করি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (আর না (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব আর না তোমরা আমার মা'বূদের ইবাদত করবে।)

অর্থাৎ, ভবিষ্যতেও আমি কখনও তোমাদের উপাস্যের পূজা করব না। আর তোমরাও আমার এক মা'বূদের ইবাদত করবে না। আয়াতের সারমর্ম হলো আমি একত্ববাদী হয়ে শিরক করতে পারব না, না এখন, না ভবিষ্যতে কখনও। আর তোমরাও মুশরিক থাকা অবস্থায় একত্ববাদী সাব্যস্ত হতে পারবে না, এখনও নয় ভবিষ্যতে কখনও নয়। মোটকথা, এক মুহূর্তের জন্যও তাওহীদ ও শিরক একত্র হতে পারে না।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ (তোমরা তোমাদের প্রতিফল পাবে। আর আমি আমার প্রতিফল প্রাপ্ত হব।)

এ আয়াতে তাওহীদ ও শিরকের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। যে যেমন কর্ম করবে তাকে তেমন ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কোন কোন তাফসীরবিদ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমরা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট রয়েছি, তোমরা দুর্ভাগ্যবশত যে পথ অবলম্বন করেছ তা তোমাদের জন্যে মুবারক হোক। তবে স্মরণ রাখবে প্রত্যেককে স্বীয় কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

● তাওহীদ ও শিরক মুহূর্তের জন্যও একত্র হতে পারে না। অতএব যারা সর্ব-ধর্ম সমন্বয় করে চলতে চায়, তাদের মতবাদ ভ্রান্ত। একশ্রেণির লোক উপর্যুক্ত আয়াতের দোহাই দিয়ে নিজেদেরকে ধর্ম থেকে মুক্ত রাখার অপপ্রয়াস গ্রহণ করে থাকে এই বলে যে, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের।' অথচ আয়াতের শানে নুযূল দেখলে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ তাদের বক্তব্যের পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হয়।

● যে চুক্তি বা সন্ধি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। যেহেতু মুশরিকদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে, তাই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধিকে নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে যে চুক্তি ইসলামের মূলনীতি ও স্বার্থ বিরোধী নয়; প্রয়োজনে কাফেরদের সাথে এমন চুক্তি করা বৈধ আছে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

(১১০) সূরা নাসর, মাদানী
৩ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١	(১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় এসে পৌছবে।
وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢	(২) আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣	(৩) তখন তুমি তোমার রবের স্বপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করতে থাক এবং তাঁর নিকট মাগফিরাতের দরখাস্ত কর। নিশ্চয় তিনি হলেন অতিশয় তওবা কবূলকারী।

শব্দার্থ

اِذَا যখন, جَآءَ এসে পৌছবে, نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য, وَ الْفَتْحُ ও (মক্কা) বিজয়, رَاَيْتَ তুমি দেখবে, النَّاسَ মানুষকে, يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহর দ্বীনে, اَفْوَاجًا দলে দলে, فَسَبِّحْ তখন তুমি পাঠ করতে থাক তাসবীহ, بِحَمْدِ স্বপ্রশংস, رَبِّكَ তোমার রবের, وَ اسْتَغْفِرْهُ এবং তাঁর নিকট মাগফিরাতের দরখাস্ত কর, اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি, كَانَ হলেন, تَوَّابًا অতিশয় তওবা কবূলকারী।

সূরা নাযেল হওয়া প্রসঙ্গ

সর্বসম্মতিক্রমে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে বিধায় এর আরেক নাম 'তাওদী' (বিদায় প্রদান করা)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাসর কুরআনে কারীমের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এর পর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। এ সূরার আয়াতের ভাষা দৃষ্টে বোঝা যায়, এ সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। রূহুল মাআনী-তে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে।

তাফসীর

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ (যখন আল্লাহর সাহায্য ও [মক্কা] বিজয় এসে পৌছবে।)

এ আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। তাছাড়া অধিকাংশ আরব গোত্রসমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল

মক্কা বিজয়ের প্রতি। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি সিদ্ধান্ত বিধায়ক বিষয়। সেমতে মক্কা বিজয়ের পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এমনিভাবে গোটা আরব উপদ্বীপ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ **(তখন তুমি তোমার রবের স্বপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করতে থাক।)**

একাধিক হাদীছ ও সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায়, এ সূরায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সেমতে আয়াতের সারমর্ম হল তোমার দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এখন আখেরাতের সফর নিকটবর্তী। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে আখেরাত অভিমুখী হও এবং পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে আল্লাহর তাসবীহ তাহমীদ পাঠে মশগুল থাক এবং এ বিজয়ের উপর আল্লাহর শোকর আদায় কর।

وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (এবং তাঁর নিকট মাগফিরাতের দরখাস্ত কর। নিশ্চয় তিনি হলেন অতিশয় তওবা কবূলকারী।)

অর্থাৎ, নিজের জন্যে এবং উম্মতের জন্যে ইসতিগফার করতে থাক। কেননা, এটাই বান্দার কাজ। ইসতিগফার করার জন্য গোনাহ সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল–

১. বিজয়ের পর অহংকার নয়, বরং আল্লাহর হুজূরে আরো অধিক বিনয়াবনত হওয়া চাই এবং তাঁর তাসবীহ, তাহমীদ ও ইসতিগফারে রত থাকা চাই।

২. তাবলীগ ও ইরশাদ এবং দ্বীনের অন্যান্য কাজ থেকে অবসর পাওয়ার পর সরাসরি আল্লাহ অভিমুখী হওয়া উচিৎ। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশি পরিমাণে তাসবীহ ও ইসতিগফার করা বাঞ্ছণীয়। এভাবে আল্লাহর কাছে পবিত্র অবস্থায় পৌঁছা সম্ভব।

(১১১) সূরা লাহাব, মক্কী
৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١	(১) ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।
مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢	(২) না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে আর না তার উপার্জন।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ ۝٣	(৩) অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে।
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ ۝٤	(৪) এবং তার স্ত্রীও, যে কাঠ বহন করে আনে।
فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥	(৫) তার গলদেশে একটি রশি হবে খুব পাকানো।

শব্দার্থ

تَبَّتْ ধ্বংস হোক, يَدَا হস্তদ্বয়, اَبِىْ لَهَبٍ আবূ লাহাবের, وَّ تَبَّ এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, مَآ اَغْنٰى না কোন কাজে এসেছে, عَنْهُ তার, مَالُهٗ তার ধন-সম্পদ, وَ مَا كَسَبَ আর না তার উপার্জন, سَيَصْلٰى অচিরেই সে প্রবেশ করবে, نَارًا আগুনে, ذَاتَ لَهَبٍ লেলিহান, وَّ امْرَاَتُهٗ তার স্ত্রীও, حَمَّالَةَ বহনকারিনী, الْحَطَبِ কাঠ, فِىْ جِيْدِهَا তার গলদেশে, حَبْلٌ একটি রশি হবে, مِّنْ مَّسَدٍ খুব পাকানো।

শানে নুযূল

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকটতর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকদেরকে সতর্ক কর।) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশে يا صباحاه বলে অথবা আব্দে মানাফ ও আব্দে মুত্তালিব ইত্যাদি গোত্রের নাম সহকারে ডাক দিলেন। ডাক শুনে তারা সকলে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আমি বলি একটি শত্রুদল ক্রমশ এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে এক বাক্যে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ভীষণ আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করছি। একথা শোনে আবূ লাহাব বলে উঠল, تبا لك الهذا جمعتنا অর্থাৎ, ধ্বংস হও তুমি এজন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? অতঃপর সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর মারতে উদ্যত হল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

তাফসীর

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ (ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।)

যেহেতু মানুষের অধিকাংশ কাজ সম্পাদনে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই দু'হাত বলে ব্যক্তি সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যানুসারে পরবর্তী বাক্য وتب তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কারো কারো মতে যেহেতু অধিকাংশ আমল হাত দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাই প্রথম বাক্য দ্বারা আমল ধ্বংস হওয়া এবং দ্বিতীয় বাক্য وتب দ্বারা ব্যক্তি ধ্বংস হওয়া বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, আয়াতের মর্ম হল সে

www.maktabatulabrar.com

এভাবে ধ্বংস হবে যে, তার সকল কৌশলও ব্যর্থ হবে। আর বদ-দুআর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার ধ্বংসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা। বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় পেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে পৃথক জায়গায় রেখে আসে। শেষ পর্যন্ত এ অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। তিনদিন পর্যন্ত কেউ তার মৃতদেহ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-নওকর দ্বারা তাকে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُه وَ مَا كَسَبَ (না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে আর না তার উপার্জন।)

ما كسب (যা সে উপার্জন করেছে।) এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা উপার্জিত মুনাফা বা সন্তান সন্ততিও হতে পারে। কেননা, মানুষের সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল তখন ধন-সম্পদ ও ধন-সম্পদ থেকে উপার্জিত মুনাফা এবং সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই তার কোন কাজে আসল না। এতো হল তার দুনিয়ার অবস্থা। আর মৃত্যুর পর সে এক ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতএব তার উপার্জন ইহকাল পরকাল কোথায়ও কাজে এল না।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে।)

অর্থ লেলিহান। আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল উয্যা। সে ছিল আব্দুল মুত্তালিবের অন্যতম সন্তান। অতিশয় চকচকে গৌর বর্ণের হওয়ার কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। সম্ভবত তার ডাক নামের সাথে মিল রেখে এখানে আগুনের বিশেষণ ذات لهب উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআন তার নাম আবূ লাহাব অক্ষুণ্ন রেখে এদিকে ইংগিত করেছে যে, মানুষ তাকে আবূ লাহাব বলে ডাকে তার চেহারা আগুনের মত চকচকে লাল হওয়ার কারণে, বস্তুত শেষ পরিণতির দিক থেকেও সে ابولهب নামে পরিচিত হওয়ার যোগ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ امْرَاَتُه حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (এবং তার স্ত্রীও, যে কাঠ বহন করে আনে।)

আবূ লাহাবের মত তার স্ত্রীও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। তাকে উম্মে জামীল নামে ডাকা হত। আয়াতে বলা হয়েছে এ হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে তাকে حمالة الحطب বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ কাঠ বা খড়ি বহনকারিণী। অর্থাৎ, এ মহিলা বন জংগল থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ী আহরণ করে আনত এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তার পথে বিছিয়ে রাখত। তার এ নীচ ও হীন কাজকে কুরআন حمالة الحطب বলে ব্যক্ত করেছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, তার এ অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে 'যাক্কুম' ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ী এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে আগুন আরো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। আবার কতিপয় তাফসীরবিদের মতে এখানে আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী حمالة الحطب অর্থ চোগলখোর বা পশ্চাতে নিন্দাকারী। শুকনো কাঠ একত্র করে যেমন সহজে অগ্নি সংযোগ করা যায়, তেমনি পর নিন্দাকারী ব্যক্তিবর্গও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আবূ লাহাবের পত্নী পরোক্ষ নিন্দা কার্যের সাথেও জড়িত ছিল, তাই তাকে حمالة الحطب বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (তার গলদেশে একটি রশি হবে খুব পাকানো।)

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে মজবূত ও পাকানো রশি বলে জাহান্নামের বেড়ি ও শৃঙ্খল বুঝানো হয়েছে এবং এ উপমা বা তুলনা করা হয়েছে حمالة الحطب এর প্রতি লক্ষ্য রেখে। কেননা, কাঠের বোঝা বহন করার সময় সাধারণত রশির প্রয়োজন হয়। কথিত আছে, আবূ লাহাব পত্নীর গলদেশে একটি মূল্যবান হার ছিল। এ হার সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতায় ব্যয় করার শপথ করেছিল। তাই প্রয়োজন ছিল দোযখেও যেন তার গলা হার শূন্য না থাকে। কি আশ্চর্য ব্যাপার এ হতভাগিনীর মৃত্যুও এভাবে হয়েছিল। কাঠের বোঝার রশিতে গলায় প্যাঁচ লাগে। এতে সে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

সূরার বিশেষ শিক্ষা

১. আল্লাহর মাকবূল বান্দাদেরকে কষ্ট দিলে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। (বয়ানুল কুরআন– মাসায়েলুস সুলূক)

২. কুফর ও শিরকের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন কাজে আসবে না। আবূ লাহাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা ছিল। অথচ সে জাহান্নামী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নবীকে কষ্ট দেয়া কুফর এবং হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১১২) সূরা ইখলাস, মক্কী
৪ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١	(১) তুমি বলে দাও যে, তিনি অর্থাৎ, আল্লাহ এক।
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢	(২) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣	(৩) তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আর তিনিও কারো সন্তান নন।
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤	(৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

www.maktabatulabrar.com

শব্দার্থ

قُلْ তুমি বলে দাও, هُوَ তিনি, اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ, اَحَدٌ এক, الصَّمَدُ মুখাপেক্ষীহীন, لَمْ يَلِدْ তিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি, وَ لَمْ يُوْلَدْ তিনিও কারো সন্তান নন, لَمْ يَكُنْ لَّهٗ তাঁর নেই, كُفُوًا সমতুল্য, اَحَدٌ কেউ।

শানে নুযূল

মুশরিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর গুণাবলি এবং বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল, যার জবাবে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

সূরার ফযীলত

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম, তিরমিযী)

● এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে, তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়। (ইবনে কাছীর)

তাফসীর

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ **(তুমি বলে দাও যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।)**

قل 'তুমি বলে দাও' এ কথার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

الله 'আল্লাহ' এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সকল গুণের আধার এবং সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত।

احد'واحد অর্থ এক। অর্থাৎ, তিনি তাঁর সত্তা এবং গুণাবলির দিক থেকে এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ **(আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।)**

صمد সেই সত্তা যাঁর কাছে মানুষ তার প্রয়োজন পেশ করে এবং সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই ইবাদত একমাত্র তাঁরই হবে।

لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ **(তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আর তিনিও কারো সন্তান নন।)**

যারা আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল এটা তাদের জবাব। আয়াতের মর্ম হল সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার নয়। অতএব তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ **(এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।)**

অর্থাৎ, কোন দিক থেকে আল্লাহর কোন সমতুল্য নেই এবং আকার-আকৃতিতেও কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

www.maktabatulabrar.com

(১১৩) সূরা ফালাক, মাদানী
৫ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①	(১) তুমি বল, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি,
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ②	(২) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অনিষ্ট থেকে।
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ③	(৩) আর (বিশেষত) অন্ধকার রাতের অনিষ্টতা থেকে যখন তার অন্ধকার ছেয়ে যায়।
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ④	(৪) এবং (বিশেষত) সে নারীদের অনিষ্টতা থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহের উপর (পড়ে পড়ে) ফুঁ মারে (যাদু করার উদ্দেশ্যে)।
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤	(৫) আর হিংসা পোষণকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করতে থাকে।

শব্দার্থ

قُلْ তুমি বল, اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, بِرَبِّ মালিকের, الْفَلَقِ প্রভাতের, مِنْ شَرِّ অপকারিতা হতে, مَا خَلَقَ যা সৃষ্টি করেছেন তার, وَ مِنْ شَرِّ আর অনিষ্টতা থেকে, غَاسِقٍ অন্ধকার রাতের, اِذَا যখন, وَقَبَ সে রাত এসে উপস্থিত হয়, مِنْ شَرِّ এবং অনিষ্টতা থেকে, النَّفّٰثٰتِ যে নারীরা, ফুঁ মারে, فِى الْعُقَدِ গ্রন্থিসমূহে, وَ مِنْ شَرِّ আর অপকারিতা থেকে, حَاسِدٍ হিংসা পোষণকারীর, اِذَا যখন, حَسَدَ সে হিংসা করতে থাকে।

শানে নুযূল

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি হল লাবীদ ইবনে আসলাম নামক জনৈক ইয়াহুদী ও তার কন্যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করে। তাঁতের সূতা কিংবা রশিতে বা চুলে কিছু পড়ে তাতে এগারটি গ্রন্থি লাগায়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে একটি বালক হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজকর্ম করত। ইয়াহুদী তার মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের সূতায় এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনী সহ সে গ্রন্থিগুলো খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে একটি কূপে প্রস্তরখণ্ডের নিচে চাপা দিয়ে

রাখা হয়। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদুগ্রস্ত হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা ফালাক এবং পরবর্তী সূরা নাস অবতীর্ণ হয়। ওহীর মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুর স্থান জানিয়ে দেয়া হয়। সেমতে সেখান থেকে যাদুর বস্তুসমূহ উদ্ধার করা হয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) উক্ত সূরাদ্বয়ের এগারটি আয়াত পড়তে থাকেন। ফলে এক একটি আয়াত পাঠান্তে এক একটি গ্রন্থি খুলতে থাকে। আর গ্রন্থিগুলো খোলার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুভব করতে থাকেন যেন একটি বোঝা তাঁর উপর থেকে সরে গেছে। হযরত জিবরাঈল (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উক্ত ইয়াহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চিনতেনও। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। তাই জীবনে তিনি সে ইয়াহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

তাফসীর

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (তুমি বল, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি,)

'ফালাক' শব্দের অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য রাত শেষ হয়ে ভোর হওয়া। এ আয়াতে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে এই গুণকে অবলম্বন করার রহস্য এ হতে পারে যে, রাতের অন্ধকার প্রায়শঃ অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সে বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইংগিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দিবেন।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর অপকারিতা হতে।)

প্রত্যক্ষ অনিষ্ট –যদ্দারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায় এবং পরোক্ষ অনিষ্ট –যা বালা-মুসীবতের কারণ হয় যেমন কুফর শিরক ইত্যাদি, এ উভয়বিধ অনিষ্টই আয়াতের শামিল। সুতরাং আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আরো তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এ স্থানের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। তাহল যাদু সাধারণতঃ রাতেই বেশী হয়ে থাকে, আর গ্রন্থিতে ফুঁ দেয়ার প্রসংগ উল্লেখের কারণ তো সুস্পষ্ট যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবেই যাদু করা হয়েছিল। আর হিংসা ছিল এ যাদুর মূল কারণ। সুতরাং যাদুর সাথে সম্পর্কিত সব কিছু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে গেল। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (আর [বিশেষত] অন্ধকার রাতের অনিষ্টতা থেকে, যখন সে রাত এসে উপস্থিত হয়।)

রাতের বেলায় জিন শয়তান, ইতর প্রাণী, কীট পতংগ ও চোর ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাতের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

مِنْ وَ

www.maktabatulabrar.com

شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ **(এবং [বিশেষত] সে নারীদের অনিষ্টতা থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহের উপর [পড়ে পড়ে] ফুঁ মারে [যাদু করার উদ্দেশ্যে]।)**

অর্থ ফুঁ দেয়া। আর অর্থ ফুঁ দানকারিনী। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। এটা অর্থাৎ, প্রাণী ও ব্যক্তির বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। কারণ, যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে। তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়। সে ঘটনায় ওলীদের কন্যারা পিতার নির্দেশে যাদু করেছিল। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ **(আর হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করতে থাকে।)**

হিংসার কারণেই ইয়াহুদী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যাদু করেছিল। ইয়াহুদী ও মুনাফেকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে জ্বলত। তাই বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

সূরার শিক্ষণীয় বিষয়াদি

১. ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় লাভ-লোকসান আল্লাহ তাআলার করায়ত্ত। অতএব উভয় জাহানের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকার এবং উভয় জগতের লাভ উপার্জন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে দিয়ে দেয়া এবং আমল আখলাকে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া।

২. যাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। নবীদের উপরও যাদু ক্রিয়াশীল হতে পারে। আগুন পানি ইত্যাদি সকল বস্তুর যেমন স্বাভাবিক ক্রিয়া রয়েছে এবং নবীগণ এগুলোর ক্রিয়ার উর্ধ্বে নন, যাদুর প্রতিক্রিয়াও তেমনি একটি ব্যাপার। কাজেই নবীর যাদুগ্রস্ত হওয়ার মাঝে অস্বাভাবিকতা বা অবাস্তবতার কিছুই নেই।

৩. হকের বিরুদ্ধে বাতিলের অবলম্বিত উপায়-উপকরণ আহ্লে হকের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই এবং এটা হক বাতিলের মাপকাঠিও নয়। (বয়ানুল কুরআন–মাসায়েলুস সুলূক)

৪. কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যাদু করা হারাম।

৫. কারো নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া এবং তার অবসান কামনা করাকে হাসাদ বা হিংসা বলা হয়। এটা হারাম, মহাপাপ। হাসাদ দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের ক্ষতি সাধিত হয়। হাসাদ বা হিংসার কাছাকাছি আরেকটি শব্দ রয়েছে غبطه (গিবতা) তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারো নেয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ সুখ ও নেয়ামত কামনা করা। এটা জায়েয বরং দ্বীনী বিষয়ে উত্তম।

(১১৪) সূরা নাস, মাদানী
৬ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾	(১) তুমি বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের,
مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾	(২) মানুষের অধিপতির,
اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾	(৩) মানুষের মা'বূদের।
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾	(৪) কুপ্ররোচনা দানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর (অর্থাৎ, শয়তানের) অনিষ্ট থেকে।
الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾	(৫) যে, কুপ্ররোচনা দেয় মানুষের অন্তরে।
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾	(৬) সে (প্ররোচনা দানকারী) জিন হোক অথবা মানুষ (অর্থাৎ, মানব ও জিন উভয় শ্রেণির শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।)

শব্দার্থ

قُلْ তুমি বল, اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, بِرَبِّ প্রতিপালকের, النَّاسِ মানুষের, مَلِكِ অধিপতির, النَّاسِ মানুষের, اِلٰهِ النَّاسِ মানুষের মা'বূদের, مِنْ شَرِّ অনিষ্ট থেকে, الْوَسْوَاسِ কু-প্ররোচনা দানকারীর, الْخَنَّاسِ পশ্চাদপসরণকারীর, الَّذِىْ যে, يُوَسْوِسُ কু-প্ররোচনা দেয়, فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ মানুষের অন্তরে, مِنَ الْجِنَّةِ (সে প্ররোচনা দানকারী) জিন হোক, وَ النَّاسِ অথবা মানুষ।

যোগসূত্র

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পরকালীন বালা-মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর। তাই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআনে পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

তাফসীর

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (তুমি বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বূদের।)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতিপালক, মালিক, অধিপতি ও মাবূদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর প্রত্যেকটি গুণ হেফাজত ও সংরক্ষণ দাবী করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার মধ্যে একত্র আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এ গুণত্রয়ের সমষ্টি নয়, তাই আল্লাহ তাআলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ (কু-প্ররোচনা দানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর [অর্থাৎ, শয়তানের] অনিষ্ট থেকে।)

যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সে বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وسواس শব্দটি একটি মূল ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে মুবালাগাহ বা অতিরঞ্জনের নীতি অনুযায়ী শয়তানকে وسواس বা কুমন্ত্রণা বলে দেয়া হয়েছে। সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন কথার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এর অর্থ অনুভব করে, কিন্তু কোন আওয়াজ শোনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বা কুপ্ররোচনা বলা হয়।

خناس শব্দটি خنس থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। তাই خناس শব্দের অর্থ পশ্চাদপসরণকারী। এখানে خناس বলে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে পেছনে সরে যাওয়া তার অভ্যাস। মানুষ গাফেল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর আল্লাহর যিকির করলে আবার সে পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারা অবিরাম চলতে থাকে।

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ **(যে, কু-প্ররোচনা দেয় মানুষের অন্তরে। সে [প্ররোচনা দানকারী] জিন হোক অথবা মানুষ [অর্থাৎ, মানব ও জিন উভয় শ্রেণির শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।])**

অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনাকারী জিনের মধ্য থেকেও হয় আবার মানুষের মধ্য থেকেও হয়। জিন শয়তান অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখে, প্ররোচনা দেয়। আর মানুষ শয়তান সামনে এসে এমন কথা বলে, যা থেকে কারো মনে কোন বিষয়ে সন্দেহ সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, মানুষ শয়তান বলে নফ্সের (মনের) কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মন্দ কাজের আদেশ দেয় তেমনি নফ্সও মন্দ কাজেরই আদেশ দেয়।

সূরার শিক্ষা

১. জিন শয়তান ও মানব শয়তানের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিৎ। আর আশ্রয় গ্রহণ করার নিয়ম হল হৃদয়ের জাগৃতির সাথে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সূরা ফালাক ও সূরা নাস- সূরাদ্বয়ে নিজে আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুল রাখা এবং অপরকে এর শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলেই শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়ার সুযোগ পায়। কাজেই শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং গাফলত থেকে সুরক্ষার মজবুত দুর্গ হল আল্লাহর যিকির। (মাসায়েলে সুলূক)

www.maktabatulabrar.com

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর বিশেষ উপকারিতা

সূরা ফালাক ও সূরা নাস- সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। তাই হাদীছ শরীফে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এ সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। (আবূ দাউদ নাসায়ী) অন্য হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ইখলাস ও কুল আউযু সূরাদ্বয় সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করলে পাঠকারী প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। (মাযহারী)

কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে মিল

কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে অদ্ভুদ মিল রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে কুরআনে কারীম শুরু করেছেন, যার সারমর্ম হল আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তাঁর সাহায্য ও সীরাতে মুসতাকীমে চলার তাওফীক প্রার্থনা করা। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারের প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। এই জাল ছিন্ন করার কার্যকরপন্থা হল আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করা। তাই কুরআনে কারীমের শেষ সূরায় আল্লাহর আশ্রয় কামনার বিষয় উল্লেখের দ্বারা কুরআনে কারীম সমাপ্ত করা হয়েছে।

সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com